ভারতবর্ষের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

THREE-YEAR
& TWO-YEAR
DEGREE
COURSE

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. পি.,
এম. এ. (কলিকাতা ও অক্স্‌ফোর্ড), বি. লিট. (অক্স্‌ফোর্ড,),
ব্যারিস্টার অ্যাট-ল,
অন্ধ্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক,
সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড :: কলিকাতা ৯

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
॥ জুলাই ১৯৬০ ॥

মূল্য : টাকা ৭·৫০ ন. প.

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন : কলিকাতা ৯) হইতে শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমার চেয়ে কৃতবিদ্য এক বন্ধু এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড লিখবেন স্থির ছিল। অনিবার্য কারণে তিনি লিখতে পারেন নি বলে আমাকেই সেই কাজের ভার নিতে হয়েছে। এ রচনা যে ত্রুটিবর্জিত নয়, তা আমি বেশ জানি; সান্ত্বনা শুধু এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মতো ব্যাপক ও গভীর ও কতকাংশে জটিল বিষয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ একাধারে প্রায় অসম্ভব।

কেবল ইতিহাসের কতকগুলো ঘটনা সাজিয়ে না দিয়ে আমি চেষ্টা করেছি যাতে পাঠকের মনে ইতিহাস সম্পর্কে মমতা জাগ্রত হয়, যাতে তথ্যের আস্বাদ পেয়ে জিজ্ঞাসার উদ্রেক ঘটে, যাতে অধ্যয়ন বিদ্যার্থীকে জ্ঞানান্বেষী করে তোলে। আর ভারতবর্ষের ইতিহাস এমনই বিচিত্র, এমনই অপার বৈভবে পরিপূর্ণ, আর আমরা যারা ভারতবাসী তাদের কাছে এমনই মনোগ্রাহী যে অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র হিসাবে এর তুলনা নেই।

শিক্ষাব্যবস্থায় এখনও পরীক্ষা অপরিহার্য। পরীক্ষার প্রয়োজনে জ্ঞাতব্য তথ্য আয়ত্ত করার কাজে বই থেকে সহায়তা প্রত্যাশা করা বিদ্যার্থীদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। যাতে সেই সহায়তার অভাব না ঘটে, সেজন্য পার্শ্বটীকা, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুখোপাধ্যায় এই কাজটির ভার নিয়ে আমাকে ঋণী করে রেখেছেন।

অবশ্য বিদ্যার্থীদের সর্বদা স্মরণ করতে হবে যে শুধু পরীক্ষার ভয়ে কয়েকটি বিষয় স্থির করে নিয়ে তথ্যের তালিকা কণ্ঠস্থ করতে গেলে ইতিহাসে অধিকার জন্মাবে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়ের অভাবে পরীক্ষার ফলও আশানুরূপ হবে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যথার্থ আগ্রহ সঞ্চার করা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আগ্রহ বিনা ইতিহাসে কোনরূপ বুৎপত্তি সম্ভব নয়।

এদেশের প্রাচীন ইতিহাস এখনও সুপরিজ্ঞাত নয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পূর্বে কোন তারিখ সম্বন্ধে নিশ্চিতি নেই; পরেও বহু প্রশ্ন সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে এখনও বিতণ্ডা; বেদের বয়স নিয়ে বাদানুবাদ সহজে মিটবার নয়। পাণিনিকে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে রাখা হয়েছে, কিন্তু সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত শুধু এই যে তিনি কিছুতেই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তী হতে পারেন না। গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে বিতর্কের অবসান ঘটে নি। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী, কিন্তু এখানেও ঘোর তর্ক, কোন কোন অংশ পরবর্তী-যুগে প্রক্ষিপ্ত হওয়া খুবই সম্ভব। কালিদাস গুপ্তযুগে কিংবা শুঙ্গ শাসনে কিংবা তারও পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিনা, তা নিয়ে গবেষকদের মতভেদ একেবারে ক্ষান্ত হয়নি।

ইতিহাসে কালানুক্রমিতার মূল্য খুব বেশী, তাই তারিখের গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে তারিখ নিয়ে একটু গণ্ডগোল অবশ্যম্ভাবী। এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই; তথ্যের অসম্পূর্ণতা ইতিহাসের মূল গতিচ্ছন্দকে ব্যাহত করে নি, বরঞ্চ গবেষককে কালের সমাপ্তিহীন সন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছে।

পাঠকের সুবিধার জন্য একটি গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে; বলা বাহুল্য এটি অসম্পূর্ণ, সকল জ্ঞাতব্য গ্রন্থের উল্লেখ সংক্ষেপে সম্ভব নয়। যে ছাত্র পরীক্ষায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর যে পাঠকের জিজ্ঞাসা জাগ্রত, বহুগ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় বিনা তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে না, আর সে পরিচয় যে অতি সুখকর তাতে সন্দেহ নেই।

আশা করছি যে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সফল হবে, আর ভরসা রাখি যে বাংলা ভাষায় অচিরে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ অথচ সুপাঠ্য রচনা প্রকাশের ব্যাপক ব্যবস্থা হবে।

নয়াদিল্লী
১০শে জুন, ১৯৬০

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ বিষয়-নির্দেশ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়॥

দশম অধ্যায়॥

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার যুক্তি হিসাবে একদা প্রচারিত হত যে এদেশ একটা ভৌগোলিক আখ্যা মাত্র, এর কোন সত্তা নেই, ঐক্য নেই, স্বাতন্ত্র্য নেই। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই যে যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ ইতিহাসের মঞ্চে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, চীন ভিন্ন অন্য কোন দেশের এমন সুদীর্ঘ অথচ নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা নেই। দেশের মাটির প্রতি মমতা তাই আমাদের মজ্জাগত; দেশপ্রেম আমাদের বিদেশ থেকে ধার করে এনে শিখতে হয় নি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", এই অবিস্মরণীয় মহামন্ত্র বহু যুগ পূর্বেই রামায়ণের মহাকবির শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল।

নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা

দেশপ্রেমের সুপ্রাচীন কা... গত ঐতিহ্য

ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব ও নাম পরিচয়

কিংবদন্তী বলে যে বৈদিক যুগের ভরত রাজার নাম অনুযায়ী ভারতবর্ষের নামকরণ হয়েছিল। সম্ভবত খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতকে লিপিবদ্ধ বিষ্ণুপুরাণে আছে :

ভারতবর্ষ না... সম্পর্কে কিংবদন্তী

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্
বর্ষং তদ্‌ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।

"সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত দেশের নাম ভারত; সেখানে ভরতের সন্ততি বাস করে।" বহুকাল পূর্বে মহাচীন ব্যতিরেকে এশিয়ার মধ্যভাগ জম্বুদ্বীপ নামে আখ্যাত হত; ভারতবর্ষ এই জম্বুদ্বীপেরই অংশ। দ্বীপের কথা বলা হয় সম্ভবত সেই অন্ধকার অতীতকে স্মরণ করে, যখন আজ যেখানে হিমালয় সেখানে ছিল সমুদ্র, আদিযুগের কোন্ ভূবিপর্যয়ের ফলস্বরূপ যেখানে গিরিরাজের আবির্ভাব হয়েছে। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে রচিত পাণিনি-ব্যাকরণে দ্বাবিংশ জনপদের মধ্যে ভারতের উল্লেখ আছে। এর প্রায় সাড়ে পাঁচশো বৎসর পরে, আনুমানিক

পাণিনি-ব্যাকরণে ভারতের নামোল্লেখ

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ সনে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের আর্যাবর্ত নাম উল্লিখিত হয়েছে। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৩ সনে কলিঙ্গ সম্রাট খারবেল-এর হাথিগুম্ফা প্রস্তর ফলকে "ভারধবস" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়; সম্ভবত এই নাম গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ বলে প্রখ্যাত হয়েছিল।

খারবেল-লেখে 'ভারধবস' নামের উল্লেখ

"হিন্দু", "হিন্দ্", "ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিও আমাদের জ্ঞাতব্য। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট দরায়ুস্ বর্তমান সিন্ধু অঞ্চলকে নাম দিয়েছিলেন 'হিদু' বা 'হিন্দু'; বিতস্তা (ঝিলম), বিপাশা, শতদ্রু এবং আধুনিক নামে পরিচিত রাভি ও চেনাব, সিন্ধুনদের এই পঞ্চশাখাকে এবং যমজ ভগিনীর মতো গঙ্গা ও যমুনাকে নিয়ে যে সপ্তসিন্ধু বিদেশীকে মুগ্ধ করেছিল, তাই থেকে হিন্দু নামের উদ্ভব। গ্রীকরা এসে সিন্ধুকে বলত "ইণ্ডস্" (Indos)। খ্রীষ্টপরবর্তী প্রথম শতাব্দীতে চীনা ইতিবৃত্তে এ দেশকে বলা হয়েছে "তিয়েন্-চু" (Tien-tu) কিংবা চুয়ান্-তু (Chuan-tu); এই শব্দেরও উদ্ভব "সিন্ধু" থেকে। অষ্টম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং লিখে গেছেন যে এদেশের শুধু উত্তরাঞ্চলের লোক "হিন্দু" নামে অভিহিত, অন্যত্র এ নাম তারা নিজেরাই জানে না। এই অল্পখ্যাত নামই পরবর্তী যুগে সর্বত্র প্রচলিত হয়েছিল। যাকে আমরা হিন্দু সভ্যতা বলে জানি, তারই বিরাট ঐতিহাসিক অবদান হল বহুবিস্তৃত ভারতবর্ষকে এক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূত্রে গ্রথিত করা এবং আর্য ও দ্রাবিড় ধারার সংমিশ্রণে ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যকে পর্যন্ত সংহতির শক্তিতে রূপায়িত করা।

হিন্দ্ বা ইণ্ডিয়া নামের উৎপত্তি

ভারতের চীনা নাম : 'তিয়েন্-চু' বা 'চুয়ান্-তু'

'হিন্দু' নামের ব্যাপ্তি ও হিন্দু সভ্যতার অবদান

এদেশকে মহাদেশ বললে অত্যুক্তি হয় না; "হিমবৎ-সেতু পর্যন্তম্" "সহস্র যোজনব্যাপী" এদেশ সম্বন্ধে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীক কাহিনীকার হেরডটস্ বলেছিলেন যে তখনকার জানা সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। "ভারত" নামের সঙ্গে তাই "বর্ষ" শব্দটি যোগ করে দেওয়া হয়; অধুনা খণ্ডিত দেশের রাষ্ট্রগত পরিবর্তন যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষই হল এর ইতিহাসবিশ্রুত আখ্যা।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক 'হেরডটস্'

ভারতবর্ষ পরিচয় ও আঞ্চলিক বিভাগ

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা আর কামাখ্যা থেকে দ্বারকা পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূখণ্ডের অগণিত বর্ণনা ঋষি আর কবিদের মুখে ধ্বনিত হয়েছে। আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথের অনুপম রচনা :

নীলসিন্ধু জলধৌত চরণতল, অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল, শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী। রবীন্দ্রনাথের ভারতবন্দনা

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে মহাকবি কালিদাসের কালজয়ী শ্লোক :

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥ কালিদাসের হিমালয়-প্রশস্তি

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল

হিমালয়দান পুষ্ট উত্তরাপথ

দেবতাত্মা হিমালয় হল ভারতবর্ষের শিরোভূষণ। হিমালয় কন্দরোত্থিত নদীমালা স্তন্যদান করে সমগ্র উত্তরাপথকে লালন করে এসেছে। উত্তর থেকে তুষারশীতল বায়ু ছুটে এসে হিমালয়ের প্রাচীর অতিক্রম করতে পারে না; তাই শীতের প্রাক্কালে উত্তর এশিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে এসে ভারতবর্ষে আশ্রয় নেয়। এদেশের আবহ-ব্যবস্থাকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করছে হিমালয়ের অবস্থিতি। কালিদাসের যক্ষ হিমালয়ের মেঘকে দূত করে পাঠাতে চেয়েছিল তার প্রিয়ার কাছে—এই মেঘের শোভাযাত্রা যেন হিমালয়েরই আজ্ঞাবহ হয়ে পিপাসার্ত দেশকে বর্ষণগুণে সঞ্জীবিত করেছে। আষাঢ়ের প্রথমে ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর থেকে মরসুমী বায়ু উত্তরে ধাবিত হয়ে হিমালয়ের স্পর্শে ভেঙে পড়ে, তিন মাস ধরে তখন যে বর্ষা চলে, তাতে জলের অনুপাত হল দেশের সমগ্র বৃষ্টিপাতের নয়-দশমাংশ। এদেশের পুরাণ-কথায় হিমালয় যে দুর্গতিহারিণী দুর্গার জনক, তার তাৎপর্যও যেন এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

হিমালয়-নির্দেশিত আবহ-ব্যবস্থা

হিমালয় নামের সম্ভাব্য পৌরাণিক তাৎপর্য

হিমালয়ের দৈর্ঘ্য হল দেড় হাজার মাইলেরও বেশী; অন্তত চল্লিশটি শৃঙ্গের উচ্চতা হল ২৪,০০০ ফুটেরও বেশী। এই সুবিপুল পর্বতপ্রাচীর যেন ভারতবর্ষকে একটা স্বতন্ত্র জগৎরূপে রক্ষা করে এসেছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সমাজগঠনের যে নিরবচ্ছিন্ন পরিচয় মেলে, বুদ্ধদেব আজ জন্মগ্রহণ করলে আড়াই হাজার বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যে এদেশকে অপরিচিত মনে করতেন না, তার একটা প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে হিমালয়ের বরাভয় ছত্রচ্ছায়ায় এদেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও পরম্পরা রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের অক্লান্ত পরিক্রমায় পর্বতরাজিও পরিপূর্ণভাবে প্রতিবন্ধকতা করতে পারে না। শুধু অশান্ত যাযাবর বা খাদ্যের ও স্বস্তির সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ জনসমষ্টি নয়, রাজ্যবিস্তারের তৃপ্তিহীন তাড়নায় দুঃসাহসী আক্রমণকারীর কাছে হিমালয়ের প্রাকার একেবারে অলঙ্ঘ্য

হিমালয়ের আয়তন

হিমালয়-রক্ষিত ভারতের স্বাতন্ত্র্য

থাকে নি। গিরিবর্ত্ম দিয়ে তাই যুগ থেকে যুগান্তরে বিদেশীর আগমন এদেশে হয়েছে; কিন্তু তারা শুধু যে যুদ্ধবিগ্রহ করতে এসেছে তা নয়। বহির্বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রীসম্বন্ধ স্থাপনেও এই যোগাযোগ সাহায্য করেছে। ভারতবর্ষের জঙ্ঘা স্পর্শ করে যে সমুদ্র অবস্থিত রয়েছে, তারই মতো হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম বেয়ে শুধু যোদ্ধার দল আসে নি; এসেছে বণিক, এসেছে তীর্থযাত্রী, ঘটেছে শান্তি ও সভ্যতার অগ্রগতি। যেদিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে হিমালয়ের স্থান হল অনন্য।

হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম পথে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ

ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই জানা যাবে যে উত্তর-পশ্চিমে পামির পর্বতসন্ধি থেকে পূর্ব সীমান্তে আসাম পর্যন্ত হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত মহাপ্রাচীর যেন এদেশের রক্ষক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেশভাগের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আজ পাকিস্তানের অন্তর্গত। হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে ভারতের সংযোগ এখন নেই। কিন্তু ভারতের অন্তর্ভূত কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা থেকে সোভিয়েত দেশ ও আফগানিস্তান অনতিদূরেই অবস্থিত; লাডাক অঞ্চল চীনের সীমানা স্পর্শ করে রয়েছে। উত্তর-পূর্বে রয়েছে নেপাল, সিকিম এবং ভুটান; এদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শুধু ভৌগোলিক নয়, নানাদিক থেকেই ঘনিষ্ঠ। হিমালয় এবং তার শাখাপ্রশাখা চীনের তিব্বত অঞ্চল এবং ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। পর্বতশ্রেণী দুর্লঙ্ঘ্য হলেও কয়েকটি স্থানে তার প্রস্তরবর্ম ভেদ করে মানুষের গতিবিধি সম্ভব; তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন ভারতের নীতি হলেও সীমান্ত রক্ষা বিষয়ে অবহিত হওয়া সর্বদাই প্রয়োজন।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হিমালয়ের গুরুত্ব

ভারতের সীমান্তবর্তী দেশসমূহ

আর্যাবর্তের সমতলভূমি

হিমালয়ের দক্ষিণে বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম আর্যাবর্ত, যার উল্লেখ আছে পতঞ্জলির ব্যাকরণে। একদিকে পঞ্চনদ ও অন্যদিকে গঙ্গা-যমুনা এবং তার শাখাপ্রশাখা এই ভূখণ্ডকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করে তুলতে সহায় হয়েছে। এখানে ঘটেছে কৃষিকর্মের বিকাশ আর সঙ্গে সঙ্গে জনবসতির বৃদ্ধি। নদীমাতৃক ভূমিতে স্বতই পল্লী ও নগরীর উন্নতি সম্ভব হয়েছে, সভ্যতার ভিত্তি পত্তন ঘটেছে দৃঢ়ভাবে। ভারতমানসে আর্যাবর্তের বৈশিষ্ট্য তাই অমূলক নয়; ভারত-ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল

আর্যাবর্ত নামপরিচয়

আর্যাবর্তের গুরুত্ব

এখানে। সমগ্র ভারত-ভূখণ্ডকে মূলত একই সভ্যতার যোগসূত্রে গ্রথিত করার অভিযান এই আর্যাবর্ত থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

আর্যাবর্ত কিংবা চলিত ভাষায় যাকে বলা হয় হিন্দুস্থান, হল এক বিস্তীর্ণ এবং প্রধানত সমতলক্ষেত্র, যেখানে পঞ্চনদ এবং গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ এদেশের সমৃদ্ধি ও স্বর্ণপ্রসূ খ্যাতি সৃষ্টি করেছে। এই সমভূমি বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতরাজি পর্যন্ত। পূর্বে ও পশ্চিমে বর্তমান ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সীমান্ত হল ২৬০০ মাইল দীর্ঘ। হিন্দুস্থানের পশ্চিমে রয়েছে পঞ্জাবের সমতল আর রাজস্থানের মরুভূমি; উর্বর গাঙ্গেয় উপত্যকা মধ্যস্থলে অবস্থিত; উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা আর দক্ষিণ-পূর্বে হল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ। আর্যাবর্ত-পরিচয়

বিন্ধ্য ও দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকা অঞ্চল

বিন্ধ্যগিরিরাজি ভারতবর্ষকে যেন দুই স্পষ্টীকৃত খণ্ডে বিভক্ত করে রেখেছে: উত্তরে আর্যাবর্ত, আর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের বিপুল অধিত্যকা। বিন্ধ্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর পর্বতবাধার ফলে ফ্রান্স এবং স্পেন (মধ্যে পীরেনে [Pyrene'es] পর্বত) আর ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড (মধ্যে শেভিয়ট্ [Cheviots] পাহাড়) বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়েছিল। স্বপণ্ডিত পাণিক্কর বলেছেন যে এদেশে আর্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথ স্বতন্ত্র রেখায় ইতিহাসে দেখা দিলে তা বিস্ময়ের বস্তু হত না, কিন্তু হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত এক দেশের যে বিরাট পরিকল্পনা এদেশে জেগে উঠেছিল তার মূল্য যে কত বেশী তা বুঝি যখন দেখি যে বিন্ধ্যের বাধা অতিক্রান্ত হল। পুরাণকথায় উল্লেখ আছে অগস্ত্য মুনির কথা, যিনি প্রথম যাত্রা করেছিলেন দক্ষিণাপথের দিকে, বিন্ধ্য যাঁর আজ্ঞায় মস্তক অবনত করে পথ ছেড়ে দিয়েছিল, যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে উত্তরাপথের মানুষ এবং তাদের চিন্তা ও কর্ম দক্ষিণাপথে ছড়িয়ে পড়েছিল। খুবই স্মরণীয় যে অগস্ত্য আজও দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র পিতৃস্থানীয় ঋষি বলে পূজিত। ভারত-বিভাজক বিন্ধ্য পাণিক্করের মন্তব্য এক দেশ-বোধের নিকট বিন্ধ্যের নতি-স্বীকার ঋষি অগস্ত্য

দক্ষিণাপথের উত্তর ভাগ হল মধ্যভারতের মালভূমি। বিন্ধ্যের দক্ষিণে যে বিশাল অধিত্যকা রয়েছে তার পশ্চিমে পশ্চিমঘাট এবং পূর্বে পূর্বঘাট গিরিশ্রেণী উপকূল বেয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে। উভয় দিকে পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি রয়েছে। রাজস্থান ভিন্ন এদেশের প্রত্যেকটি প্রান্তে নিজস্ব নদীব্যবস্থা আছে। দাক্ষিণাত্যে মধ্যভারতের মালভূমি সমুদ্র উপকূল-বর্তী নিম্নভূমি

দক্ষিণ ভারতের নদী-ব্যবস্থা

বিন্ধ্য থেকে নির্গত হয়ে নর্মদা এবং আরাবল্লী পর্বত থেকে বেরিয়ে তাপ্তি পশ্চিমবাহিনী হয়ে আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে। পূর্ববাহিনী নদীর মধ্যে রয়েছে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, এরা পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে কাবেরী ও পেনার নদী।

ভারতবর্ষের প্রধান দুটি বিভাগ : উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ

সাধারণত ভারতবর্ষকে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ এই দুই ভূখণ্ডে বিভক্ত করা হয়। মানচিত্রে কর্কট ক্রান্তির অবস্থান লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে বিন্ধ্যের উত্তরে রয়েছে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল—বৎসরের কয়েকমাস গ্রীষ্ম অসহ্য মনে হলেও এই হল আর্যাবর্তের বিজ্ঞানসম্মত আবহ বর্ণনা। দক্ষিণে তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত বিশাল উপদ্বীপ হল গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত, শীত সেখানে ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। কেউ কেউ মনে করেন যে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যে মালভূমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত, তাকে ভূগোলের দিক থেকে একটা পৃথক অঞ্চল বলা চলে। নিষ্প্রাণ মানচিত্রকে কেউ ভালোবাসে না, কিন্তু আমাদের এই মরকত মণি-তুল্য দেশের উত্তুঙ্গ পর্বত, গভীর অরণ্য, আর স্তন্যদায়িনী জননীর মতো স্রোতস্বিনী নদীকে ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে ভালোবেসে এসেছে। স্বয়ং প্রকৃতি যেন ভারতবর্ষকে এক বিশিষ্ট ভৌগোলিক সত্তা দিয়েই আশীর্বাদ করেছে।

সুদূর দক্ষিণের মালভূমি

উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের উপর তাহার প্রভাব

উত্তরাপথের বৈশিষ্ট্য

পূর্বেই বলা হয়েছে যে হিমালয়ের তুষার গলে সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বহু নদ-নদী নানা শাখাপ্রশাখায় নির্গত হয়ে উত্তরাপথকে উর্বর ও সমৃদ্ধ করেছে। সেখানে জনবসতি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে; সুপ্রশস্ত অঞ্চলে দুর্ভেদ্য ভৌগোলিক বাধা না থাকায় মাঝে মাঝে সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের বৈশিষ্ট্য হল অন্যবিধ; উভয় পার্শ্বে সমুদ্র থাকায় বহির্বাণিজ্যের বিকাশ সেখানে সহজে ঘটেছে। সমুদ্র দেশকে দেশান্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যরূপে ঘটে যোগাযোগ, বাণিজ্যসম্পর্ক। অতি প্রাচীন যুগ থেকে দেখা যায় যে ভৃগুকচ্ছ (বর্তমান ব্রোচ) হতে মুজিরিস্ (বর্তমান ক্র্যাঙ্গানোর) পর্যন্ত আমাদের পশ্চিম উপকূলে যে বহু বন্দর ছিল তাদের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্যসম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। তেমনই পূর্ব উপকূল থেকে

দাক্ষিণাত্যের বৈশিষ্ট্য

বাণিজ্যপোত যেত প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। দাক্ষিণাত্য প্রস্থে আর্যাবর্তের তুলনায় অপ্রশস্ত বলে সেখানে কোন একটি সাম্রাজ্যের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে একাধিক শক্তির উত্থান-পতন বেশী দেখা গিয়েছে।

বহু স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয়

প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব

ভারতবর্ষে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। এদেশের ভূমিতে যেমন একদিকে দেখা যায় উর্বরতার পরাকাষ্ঠা, তেমনই আছে মরুভূমি, আছে উষর প্রান্তর। কোথাও অল্প আয়াসে সচ্ছল জীবনযাত্রা অসম্ভব নয়, আর কোথাও পার্বত্য বা মরুপ্রধান অঞ্চলে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে হয়ে থাকে। কোথাও গ্রীষ্মের বিরতি নেই, আর কোথাও (কাশ্মীর, হিমাচল প্রভৃতি অঞ্চলের মতো স্থানে) বৎসরে চারমাস প্রচণ্ড শীত চলে, তুষারপাত পর্যন্ত ঘটে। আসাম, বাংলা, হিমালয়ের সানুদেশ, দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অংশে প্রচুর বারিপাত হয়ে থাকে, আবার কোথাও (যেমন রাজস্থানে) বৃষ্টির পরিমাণ একান্ত স্বল্প। এদেশের বেলাভূমি থেকে পার্বত্য প্রদেশ পর্যন্ত সর্বত্রই জনপদ ছড়িয়ে রয়েছে ; পার্বত্য ও অরণ্য-অঞ্চলে বহু আদি-বাসীর নিবাস। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাদের জীবন চলে এক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র তালে। গঙ্গা-যমুনার কল্যাণে যে সুজলা সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে, সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা পার্বত্য কিংবা সীমান্ত অঞ্চলের লোকের তুলনায় কতকটা পৃথক। সমগ্র দেশের কথা ভাবলে অবশ্য আমরা বুঝব যে প্রকৃতির প্রসাদ থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয় নি, বরঞ্চ তা বেশী পেয়েছে বলেই যুগে যুগে এদেশের উপর বিদেশীর লুব্ধদৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

ভূমিগত বৈচিত্র্য

নৈসর্গিক বৈচিত্র্য

জীবনধারার পার্থক্য

ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলেই অনুকূল পরিবেশের ফলে জীবনসংগ্রাম অতিরিক্ত কঠোর না হওয়ায় দৈনন্দিন দুশ্চিন্তা থেকে কতকটা পরিত্রাণ পেয়ে ভারতবাসী জ্ঞান, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে ব্যাপৃত হতে পেরেছে। এদেশের সমাজ ও সভ্যতার যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর, কিন্তু বাস্তব পরিবেশের আনুকূল্য বিনা তা সম্ভব হত না। প্রকৃতি কৃপণ হলে এদেশের ইতিহাস হত অন্যরূপ। সঙ্গে সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে প্রকৃতির প্রসাদ ভারতবর্ষের বহুজনকে শ্রমবিমুখ করেছে, সচ্ছলতা অল্প আয়াসে লভ্য ছিল বলে কঠোর জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে মানুষ যে সমস্ত গুণ আয়ত্ত করতে পারে তা থেকে বহুলাংশে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। গ্রীক, কুশাণ, শক, পহ্লব, হূন, তুর্কী, মুঘল প্রভৃতি

সচ্ছল জীবন-যাত্রা : সুফল

কুফল

আক্রমণকারী তাই এসে রাজ্যস্থাপন করতে পেরেছে। আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে যারা এসেছিল এদেশ বিধ্বস্ত করতে, তারাই ভারতবর্ষের উদার অঙ্গনে মিশে গিয়েছে—"শক হূন দল, পাঠান মোগল, এক দেহে হল লীন," কবির একথা অসত্য নয়। প্রকৃতির প্রসাদে এদেশের জীবনযাত্রা ও চিত্তবৃত্তি যেভাবে গঠিত হয়েছিল তারই ফলস্বরূপ এই বিচিত্র ঘটনা সম্ভব হয়েছে।

ভারতের সমন্বয়ী প্রতিভা

ভারতের বিশালত্বের ফল :

বিশাল আমাদের এই দেশ। এই বিশালত্বই অনেক সময় রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। এত বড় দেশে একটিমাত্র রাজশক্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা মৌর্য ও মুঘল যুগে হয়েছিল ; কিন্তু বিজ্ঞানের প্রয়োগ যখন ছিল সীমাবদ্ধ, যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন দুর্বল, তখন তা সম্ভব হওয়ার পথে ছিল অগণিত বিঘ্ন। তাই বিভিন্ন যুগে একাধিক সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, আর মাঝে মাঝে দূরত্বের সুযোগ নিয়ে বাংলা, গুজরাট, কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তি নিয়ে ইংরাজ এদেশে আসার আগে পর্যন্ত তাই সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব প্রায়ই ঘটেছে। নিছক রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে দুঃখময় মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের সমগ্র ইতিহাসে ক্ষুদ্রতাকে লঙ্ঘন করে ভূমার আস্বাদ প্রকৃতই অনির্বচনীয়।

সাম্রাজ্যের অস্থায়িত্ব

স্বাধীন আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব

ভারতীয় চিত্তে 'ভূমা'র সহজ অনুভূতি

ভারতবর্ষ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যমণি

ইয়োরোপে ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থলে ইতালীর মতো দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যমণিরূপেই যেন ভারতবর্ষের অবস্থান। পূর্বে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বৃহত্তর ভারত বা বামনপুরাণে উল্লিখিত "দ্বীপান্তর ভারত" এদেশের বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিস্তারের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। ইরান, আরব ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সঙ্গে এদেশের যোগাযোগ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ভারত বিজয়ে তাই ইংরাজের গর্বের পরিসীমা ছিল না ; তাদের "রাজমুকুটে উজ্জ্বলতম মাণিক্য" বলে ভারতবর্ষ বর্ণিত হত। পরাধীন যে অবস্থায় এই মাণিক্যের দ্যুতি আমাদের বিদ্রূপ করত, মর্মপীড়ার কারণ হত, আজ তার অবসান ঘটেছে। ইতিহাসের নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত হয়েছে।

ভারতের বৈচিত্র্য ও মূলগত ঐক্যবোধ

ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে যে ইংরাজ আসার আগে এই বিপুল ভারতবর্ষে কোন এক রাজশক্তির দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠা অনিবার্য কারণেই সম্ভব হয় নি।

ভারতের নানাবিধ বৈচিত্র্য

আমরা একথাও জানি যে ভারতবাসীদের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য অল্প নয়। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত গেলে আকৃতির প্রভেদ, এমন কি গাত্রচর্মের তারতম্যও চোখে পড়বে। বিভিন্ন ভাষায় আমরা কথা বলে থাকি; উপভাষার সংখ্যা হল অগণিত। ধর্মভেদ বিনা এদেশে আছে জাতিভেদ, সম্প্রদায় ভেদ, এমনকি গোত্র ও গোষ্ঠী নিয়েও ভেদাভেদ আছে। নৈসর্গিক অবস্থায় যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনই এদেশে আছে বহু উপজাতি যাদের জীবনযাত্রা আদিম পদ্ধতিকে অতিক্রম করে নি, আর আছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিখরে অধিষ্ঠিত বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি। কোথাও এদেশের মানুষ এখনও শিকার করে কিংবা জঙ্গল জ্বালিয়ে দিয়ে বিনাকৃষিকর্মে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে আর কোথাও বা চলে জ্ঞানবিজ্ঞানের অবারিত চর্চা। আজও এই বৈচিত্র্য বর্তমান বলে মনে হতে পারে যে হয়তো বা ইংরাজ সাম্রাজ্য-দর্পীদের দাবি অসত্য নয়। হয়তো একথা ঠিক যে তারাই এদেশের সর্বত্র শাসনযন্ত্র বসিয়ে এখানে ঐক্যের ভাব এনে দিয়েছে। ইংরাজ শাসনের আমলে সারা দেশে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তখন বিজ্ঞানের কল্যাণে সর্বদেশেই ঐ এক ধারা লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাছাড়া ভুললে চলবে না যে আমাদেরই নিজস্ব চিন্তায় ঐক্যের ঐতিহ্য বহুযুগ ধরে সুপুষ্ট হয়ে ভারতবাসীর আত্মস্থ হয়ে গিয়েছে।

ইংরাজ শাসনে ঐক্যবোধের বৃদ্ধি

ভারতীয়দের সহজাত ঐক্যবোধ

"হিমবৎ-সেতু-পর্যন্তম্" যে ভারতবর্ষ "সহস্র যোজন"ব্যাপী বলে বর্ণিত, তার কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। "গঙ্গা-মৌক্তিক-হারিণী", "হিমবৎ-বিন্ধ্য-কুণ্ডলা" প্রভৃতি কাব্যরসসিক্ত আখ্যার সাক্ষাৎ আমরা বারবার পেয়ে থাকি। মনুসংহিতায় এদেশকে বলা হয়েছে "দেবনির্মিতম্ দেশম্"। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে মধ্যদেশ, হিমবন্ত, উত্তরাপথ, দক্ষিণাপথ, পূর্বান্ত, অপরান্ত এই ছয় ভাগে বিভক্ত ভারতবর্ষ শুধু ভোগভূমি নয়, ভারতবর্ষ হল সকলের কর্মভূমি। সমগ্র দেশ সম্বন্ধে চেতনা ও অনুভূতি বহুকাল ধরে আমাদের আছে।

ভারতবর্ষে ঐক্য-বোধের ঐতিহ্য

বৈদিক যুগে সমগ্র ভারতবর্ষ একত্রিত হওয়ার কোন বাস্তব সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তখনই একরাট, সম্রাট, বৈরাট, প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ প্রায় মেলে। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচলন থেকেও জানা যায় যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে একীকরণের কল্পনা শুধু মনের বিলাস থেকে যায় নি, সে বিষয়ে বাস্তব চেষ্টাও হয়েছে। অগস্ত্যযাত্রা হল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে অন্তত সংস্কৃতির সূত্রে বেঁধে দেওয়ার সমুজ্জ্বল প্রতীক।

বৈদিক যুগে রাষ্ট্রীয় একী-করণের চেষ্টা

বহু-র মধ্যে এক-এর সন্ধান

বহু-র মধ্যে এক-এর সন্ধান ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র বলে কথিত হয়েছে। বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে, পরস্পর সম্পর্কে শুধু সহিষ্ণু নয়, শ্রদ্ধান্বিত হয়ে, মূলগত ঐক্যের দিকে তাই আমাদের যে আকর্ষণ, তা একটা ঐতিহাসিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন যে "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" যুগ যুগ ধরে যারা যাতায়াত করেছে, তারা "দেবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে", তখন তিনি কল্পনাবিলাস করেন নি, ঐতিহাসিক সত্যেরই কাব্যরূপ দিয়েছিলেন।

হিন্দুদের মধ্যে বেদ, উপনিষদ্ ইত্যাদির সর্বজনীন আবেদন

ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত। এদের মধ্যে অসংখ্য প্রভেদ থাকলেও বেদ সম্বন্ধে সকলের অপার শ্রদ্ধা; উপনিষদ্, গীতা, বিভিন্ন সংহিতা সকলের কাছে পূত ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃত; রামায়ণ-মহাভারতে যে ভারতের মর্মকথা কীর্তিত হয়েছে তা সকলের বিশ্বাস। বৌদ্ধ ও জৈন আন্দোলন এই ঐক্যবোধকে দুর্বল করে নি; বুদ্ধকে তো হিন্দুরা বিষ্ণুর নবম অবতার বলে পূজা করে থাকে। ষড়দর্শনের পারস্পরিক প্রভেদ কিংবা লোকায়ত দর্শনের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড এই ঐক্যের সৌধকে টলাতে পারে নি।

ভাষাগত ঐক্য: প্রকৃত ও সংস্কৃতের দেশব্যাপী প্রসার

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আমাদের এই বিরাট দেশের প্রায় সর্বত্র অশোক তাঁর ধর্ম ও নীতি প্রচার করেছিলেন একটিমাত্র ভাষায়, তা হল প্রাকৃত। তার কিছু পর থেকে সংস্কৃত ভাষার চর্চা সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয়েছে। তক্ষশিলা থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত রামায়ণ-মহাভারত পঠিত হয়েছে, দেবভাষা বলে বর্ণিত সংস্কৃতের প্রসার ঘটেছে।

অখণ্ড ভারতের কল্পনা: সপ্তনদী সপ্ততীর্থ সপ্তকুলাচল

অখণ্ড ভারতবর্ষের কল্পনা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে যখন আমরা দেখি যে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু এবং কাবেরী হল আমাদের সপ্তনদী; যখন শুনি যে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) এবং দ্বারাবতী (দ্বারকা) হল সপ্ততীর্থ; যখন জানি যে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য, পারিপাত্র হল এদেশের সপ্তকুলাচল। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই নদী, তীর্থ, পর্বত, সবই সারা দেশকে জুড়ে রয়েছে।

ভারতব্যাপী তীর্থ সংস্থান

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সকলেরই তীর্থ ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষে। হিঙ্গুল (বেলুচিস্তানের মরুতীর্থ হিংলাজ) থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত দেবীদর্শন আজও বহু শাক্তের কাম্য। হিমালয়স্থিত কেদারনাথ থেকে দক্ষিণ সাগরধৌত রামেশ্বর মন্দির পর্যন্ত না গেলে শৈবের মনে শান্তি নেই। বদ্রিনারায়ণ থেকে দ্বারকা ও কাঞ্চী পর্যন্ত পরিক্রমা

বিনা বৈষ্ণবের মন অতৃপ্ত। ভক্ত হিন্দুর শেষ ইচ্ছা হল যেন মৃত্যুর পর শবদাহ হয় কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে, আর শ্রাদ্ধ দেয় উত্তর পুরুষেরা হরিদ্বার বা ধনুষ্কোটিতে, প্রয়াগ বা পুষ্করে, পুরী বা প্রভাসে, কুরুক্ষেত্র কিংবা অমরকণ্টকে। পুণ্যকামী হিন্দুর মনে ভারতের অখণ্ডতা হল অবধারিত সত্য; তীর্থস্থানের তালিকা যেন ভারতীয় ভূগোলেরই এক অধ্যায়। সর্বত্র একই মন্ত্র আজ উচ্চারিত হয়; নিত্যকর্মপদ্ধতি সর্বত্র আজও প্রায় অভিন্ন। হিন্দুর ধর্ম ও আচার সর্বভারতীয় ঐক্যের ভিত্তিভূমির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম ও আচার বিষয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য

ভাষার বিভেদ এদেশে আছে, কিন্তু প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মূল উৎস হল সংস্কৃত। বাঙালীর মনে পড়বে মাইকেল মধুসূদনের আশ্বাস; বাংলা যখন হল সংস্কৃতের মতো ঐশ্বর্যশালিনী ভাষার দুহিতা, তখন তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার তো কারণ নেই। উত্তর ভারতের সকল প্রধান ভাষা এবং দক্ষিণে গুজরাটী, মরাঠী প্রভৃতি সংস্কৃত থেকে উদগত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। দক্ষিণে তামিল, তেলুগু, কন্নাড় এবং মালয়ালম ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব প্রভূত; তামিলের স্বাতন্ত্র্য সব চেয়ে বেশী, কিন্তু সেখানেও সংস্কৃতের স্থান কম নয়। উর্দু ভাষার স্বকীয়তা অনস্বীকার্য; ব্যাকরণের দিক থেকে হিন্দীর সঙ্গে তার বিভেদ নেই, তবু তার লিপি আলাদা আর ফারসী থেকে ধার করে আনা শব্দের অনুপাত বেশী, কিন্তু সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত শব্দের প্রয়োগ উর্দুতে একেবারেই অল্প নয়। এমনকি বলা চলে যে ভারতবর্ষের ঐক্যবিধান প্রতিভারই এক জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হল হিন্দী আর ফারসী ভেঙে উর্দুর আবির্ভাব।

ভারতীয় ঐক্যবোধে সংস্কৃতের প্রভাব

উর্দু ঐক্যবিধান প্রতিভার দৃষ্টান্ত

ভারতবর্ষে মুসলিম রাজশক্তির অভ্যুদয়ে ঐক্য সম্বন্ধে প্রদেশের পূর্বাভ্যস্ত চেতনা খণ্ডিত হতে পারে নি। হিন্দু ও মুসলিম প্রথমে পরস্পর বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা অতিক্রম করল, তখন উভয়ের মধ্যে যেন একটা বুঝাপড়া লক্ষ্য করা যায়। অল্‌বেরুনি থেকে আরম্ভ করে বহু মুসলিম মনীষী হিন্দুদের জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধর্মকাহিনী বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। পৌত্তলিক হিন্দু এবং একেশ্বর বাদে অটল বিশ্বাসী মুসলিমের মধ্যে আদান-প্রদান এতদূর ঘটে যে তৈমুর শাহ্‌ দিল্লীর মুসলিম সুলতানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা ধর্মগত কর্তব্য বলে ঘোষণা পর্যন্ত করেন। পরবর্তী যুগে ইংরাজ যখন এদেশে আসে, তখন তার লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব শীঘ্র যথাসম্ভব অধিক ঐশ্বর্য হস্তগত করে স্বদেশে ফিরে যাওয়া। মুসলিম আগন্তুকেরা অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষেরই

মুসলিম যুগের ঐক্য-প্রচেষ্টা

হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাবজনিত আদান-প্রদান

মুসলমানদের ভারতীয়তে রূপান্তর

অধিবাসী হয়ে পড়ে। এদেশে ভিন্ন অন্য কোথাও তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। তাই আজ হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই কাছে আকবর বা শের শাহের মতো নৃপতি, দারাশিকো-র মতো দার্শনিক, আমীর খস্‌রু ও আবুল ফজ্‌ল-এর মতো মনীষী, সমানভাবে শ্রদ্ধার্হ। সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় হিন্দু ও মুসলিম ধারার সৃষ্টিশীল সংমিশ্রণে ভারতশিল্প গড়ে ওঠে। মুসলিম আইন এদেশে প্রচলিত হয়ে তাকে এখানকারই বস্তু বলে সবাই গ্রহণ করে। উর্দুর মাধ্যমে উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সহায়তা পেতে থাকে; রামমোহন রায় এবং তাঁর পরবর্তীরাও ফারসী ভাষা যত্ন করে শিখতে কুণ্ঠিত হতেন না। পরিচ্ছদে, রন্ধনবিদ্যায়, আদবকায়দায় উভয় ধারার মিলন খুবই উল্লেখযোগ্য। ইসলাম তার খড়্গ নিয়ে এদেশে এসেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু ক্রমশ এদেশেরই জীবন ও সংস্কৃতি-স্রোতে শক্তিশালী অথচ অভিন্ন প্রবাহরূপে ইসলামের মর্যাদা ভারতবর্ষে স্বীকৃত হয়েছে।

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় শিল্পের উদ্ভব

প্রাচীন ভারতে খ্রীষ্টধর্মের ভারতীয়করণ

ইয়োরোপে খ্রীষ্টধর্ম যাওয়ার বহু পূর্বে দক্ষিণ ভারতে, মালাবার ও মাদ্রাজ অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম এসেছিল। ভারত সংস্কৃতির যে যজ্ঞশালা তার দ্বার অবারিত বলে তাকেও কেউ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা নিয়ে প্রত্যাখ্যান করে নি। ভারতবর্ষের এই একান্ত অতিথিপরায়ণতার ফলস্বরূপই দেখা যায় যে খ্রীষ্টধর্মের ভারতীয়করণও এখানে ঘটেছে। বিদেশাগত ধর্ম ও আচারের সার সত্তাকে বিকৃত না করেই এদেশ তাকে অনেকাংশে আত্মস্থ করতে পেরেছে। ধর্মবিশ্বাসের বিভেদ ভারতীয় খ্রীষ্টানকে অপর ধর্মাবলম্বী থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে নি।

জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতে ঐক্যবোধ স্মরণীয় ঘটনা

যন্ত্রযুগের অভ্যুত্থানের পূর্বে এত বিশাল দেশে স্থায়ী অথচ সর্বব্যাপী রাষ্ট্র স্থাপন সম্ভব হয় নি। এটা ভারতের বৈশিষ্ট্য নয়। বিশ্বের সর্বত্র এই বিধি লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক অর্থে জাতীয়তার জন্মও হয়েছে গত দেড়শো থেকে দুশো বৎসরের মধ্যে। সুতরাং সেদিক থেকেও এদেশে প্রকৃত জাতীয়তা বলে আখ্যা দেওয়া যায় এমন বস্তুর অভাব ইতিহাসে দেখলে বিচলিত হওয়ার অর্থ হয় না। মনে রাখা দরকার যে তদানীন্তন পরিস্থিতিতে প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা প্রকৃতই স্মরণীয়। ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতবর্ষের মূলগত ঐক্যবোধ কিভাবে যুগ থেকে যুগান্তরে প্রকাশ পেয়েছে, তা হল আমাদের এক প্রধান জ্ঞাতব্য।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ইতিহাসের উপাদান

খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বে নাকি বলা হয় যে খ্রীষ্টজন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। একজন বিশপ চুলচেরা হিসাব করে এটাও বুঝি ঠিক করে দেন যে এক মঙ্গলবার সকাল ন'টার সময় ভগবান ঐ কর্মটি করেছিলেন! বৈজ্ঞানিক গবেষণা অবশ্য এ সমস্ত রূপকথার প্রচলন ঘুচিয়ে দিয়েছে। আজ আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল বহু কোটি বর্ষ পূর্বে। সম্ভবত পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষ বলে চেনা যায় এমন জীবের দেখা মিলেছিল। যাকে আমরা সভ্যতা বলে জানি তার ইতিহাস যে কত সংক্ষিপ্ত, তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বৎসরের আগের খবর আমরা জানি অতি অল্প; তার বেশী পিছনে সভ্যতার ইতিবৃত্তকে টেনে নিয়ে যাওয়া কঠিন।

খ্রীষ্টধর্মমতে পৃথিবীর জন্মকাল

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত

প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানের অভাব

ভারতবর্ষের সভ্যতা হল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম। অন্তত পাঁচ হাজার কিংবা সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস আমাদের পঠিতব্য। এক যুগ থেকে অন্য যুগে নিষ্ক্রমণ যখন ঘটেছে, তখন যোগসূত্র মাঝে মাঝে নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলেও এই পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাসের সন্ধান আমাদের রাখতে হবে। ধারাবাহিকতা এক এক সময় নিঃসন্দিগ্ধ তথ্যের অভাবে ক্ষুণ্ণ ও খণ্ডিত হয়েছে; আশা এই যে গবেষণার অগ্রগতি এই ফাঁকগুলিকে ভবিষ্যতে পূরিয়ে দিতে পারবে।

ভারত সভ্যতার প্রাচীনত্ব

ভারত ইতিহাসের ব্যাপ্তি

ইতিহাসের ধারাবাহিকতার অভাব

ইতিহাসকে এদেশে "পঞ্চম বেদ" বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি প্রাচীনকালে প্রত্যেক গুণী ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য ছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু একথা সত্য যে প্রখর বিচার ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনা বিষয়ে প্রাচীন যুগের ভারতীয় মন বিশেষ আগ্রহ বোধ করে নি। নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে এখনও আমাদের অনীহা অপনোদিত হয় নি। বহুদিনের দেশমান্য নেতা শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী সম্প্রতি বলেছিলেন যে কবে যে তাঁর জন্মতারিখ তা

বিচার-নিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচনায় ঔদাসীন্য

সঠিকভাবে তাঁর জানা নেই! তত্ত্বকে গুহায় নিহিত করে তথ্য সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলকে প্রায়ই নিবৃত্ত রাখা হয়েছে; সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থেকে সমাজ-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা সম্বন্ধে যেন ঔদাসীন্য এসেছে; হয়তো বা মায়াবাদের প্রসার এই ঔদাসীন্যকে ঘনীভূত করেছে। কারণ যাই হোক, এটা বিস্ময়ের বিষয় নয় যে অল্‌বেরুনির মতো মনীষী বলে গেছেন: "হিন্দুরা ইতিহাসের ক্রমানুক্রমিকতার দিকে বেশী মনোযোগ দেয় না।"

অল্‌বেরুনির মন্তব্য

ভারতের ঐতিহাসিক উপাদানের শ্রেণীবিভাগ

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ যে দুরূহ, তাতে সন্দেহ নেই। আধুনিক যুগে বিদেশী ও ভারতীয় বিদ্বান এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হয়েছেন; এখনও গবেষণা চলছে, বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখনও আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন; বলা যেতে পারে তখন থেকেই আমাদের লিখিত ইতিহাসের সূত্রপাত, যদিও এদেশের সভ্যতার বিবরণ তার অন্তত তিন হাজার কিংবা সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে আরম্ভ হয়েছে। গ্রীক ইতিবৃত্তে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নামোল্লেখ আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম অকাট্য তারিখ ঐ সূত্রে আমরা জেনেছি। আলেকজাণ্ডার এদেশে আসার পূর্বে যে দীর্ঘ যুগের পরিচয় বিনা ভারতবর্ষের ইতিহাস আয়ত্ত হয় না, তাকে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান থেকে সযত্নে ও সাবধানে সংগ্রহ করতে হয়েছে।

লিখিত ইতিহাসের সূত্রপাত কাল

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম অকাট্য তারিখ

এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানকে সাধারণত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। শিলালেখ ও তাম্রশাসন; মুদ্রা; ভূ-গর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অন্যান্য প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন; বেদ, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত থেকে বিবিধ ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ ইত্যাদি (সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায়); ইতিহাসের অনুরূপ রচনাবলী, এবং বিদেশী পর্যটকদের লিখিত বিবরণ—এগুলি হল ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল উপাদান। এদের সন্ধান যে শুধু এদেশেই মেলে, তা নয়; ভারত-সংস্কৃতি যেখানে যেখানে বিস্তৃত হয়েছে, সেখানেই এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মঙ্গোলিয়া আর চীন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বহু দেশে ভারত-ইতিহাসের উপাদান বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

উপাদানের বিভিন্ন শ্রেণী

শিলালেখ ও তাম্রফলক

শিলালেখ ও তাম্রফলক থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তার মূল্য খুব বেশী। অবশ্য অনেক সময় সভাকবিকে দিয়ে রাজার কোন কীর্তিকথা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে প্রচার করার জন্য এগুলি লেখা হত। এলাহাবাদে স্তম্ভগাত্রে সভাকবি হরিষেণ-লিখিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল। আইহোল নামক স্থানে পাওয়া গেছে রবিসেন-রচিত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রশস্তি। নাসিকে রয়েছে বিখ্যাত সাতবাহন নরপতি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির প্রশস্তি। সন্দেহ নেই যে এরূপ প্রশস্তিতে আড়ম্বর ও অতিরঞ্জন কিছু থাকবেই ; কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার অকাট্য সাক্ষ্য হিসাবে এর মূল্য প্রভূত। ঘটনার তারিখ নির্দিষ্ট করতে, কিংবা ব্যক্তি ও ঘটনার মধ্যে সাযুজ্য নির্ধারণে এর সহায়তা অল্প নয়। লোহা, সোনা, রূপা, পিতল, তামা, 'ব্রন্‌জ', মাটি, মাটির জিনিস, ইট, পাথর, মণিমাণিক্য প্রভৃতি ছিল এই লিপির বাহন। পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত বোঘজ-কোই (খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ১৪০০) লেখমালা থেকে কোন কোন আর্য-দেবতার সবচেয়ে পুরাতন উল্লেখ পাওয়া যায়। তা থেকে আর্যদের ভারতবর্ষে আগমন সম্বন্ধে তথ্য কতকটা স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়। ঠিক তেমনই পারস্যের বেহিস্তান-ফলক থেকে জানা যায় যে পারসীকরা একদা ভারত সীমান্তের একাংশ তাদের অধিকারে এনেছিল। সবচেয়ে বিখ্যাত হল অশোকের বহুবিস্তৃত শিলালিপিসমূহ। গুহায়, পর্বতগাত্রে, প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ থেকে আজও 'দেবগণের প্রিয়' সম্রাট প্রিয়দর্শীর (অশোক) জীবন ও আদর্শ এই শিলালিপির মাধ্যমে জগৎ সমক্ষে প্রচারিত হচ্ছে। ১৮৩৪ সালে জেম্‌স প্রিন্সেপ অশোকের এই শিলালেখের অর্থোদ্‌গম করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। উড়িষ্যার হাথিগুম্ফা গুহায় কলিঙ্গরাজ খারভেল-এর গৌরব কাহিনী উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে (খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতক)। বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত গিরনারে সৌরাষ্ট্রের শক ক্ষত্রপ (রাজপ্রতিনিধি) রুদ্রদামনের শিলালেখ রয়েছে সংস্কৃত ভাষায় ; এর চেয়ে প্রাচীন সংস্কৃত লেখমালা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রতিনিধি সেখানে এক বিরাট পুষ্করিণী খনন করান, আর তাই রুদ্রদামন মেরামত করিয়েছিলেন, ৮০০ বৎসর এই পূর্তকার্যের নিদর্শন টিকে ছিল। নানাঘাট, কার্লি প্রভৃতি নানা স্থানে বহু শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়েছে ; আন্ধ্র রাজবংশের দানশীলতা প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য এভাবে পাওয়া

এলাহাবাদ ও আইহোল-প্রশস্তি

নাসিক-প্রশস্তি

শিলালিপি ও তাম্রফলকের ঐতিহাসিক মূল্য

বোঘজ-কোই লেখমালা

বেহিস্তান ফলক

অশোকের শিলালিপি

হাথিগুম্ফা শিলালেখ

গিরনার শিলালেখ

নানাঘাট ও কার্লির শিলালেখ

ভিতারি শিলালিপি · *খালিমপুর তাম্রফলক* · *অন্যান্য শিলালেখ*

যায়। পূর্বোক্ত এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-সম্পর্কিত বিবরণ মেলে। ভিতারি শিলালিপিতে স্কন্দগুপ্ত কিভাবে হূন আক্রমণকারীদের পরাভূত করেন তার উল্লেখ রয়েছে। হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সংবাদ অনুরূপ সূত্র থেকে পাওয়া যায়। খালিমপুর তাম্রফলক থেকে বাংলার পাল সম্রাট ধর্মপালের সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পল্লভ, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি প্রখ্যাত রাজবংশের বহু শিলালেখ ও তাম্রশাসন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে। বৃহত্তর ভারতে চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি অঞ্চলে উৎকীর্ণ বহু লিপি থেকে ভারতের বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিস্তার বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মী-লিপি · *খরোষ্ঠি-লিপি*

যে লিপি উদ্ধার করে ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত অধ্যায় সম্বন্ধে আলোকপাত ঘটেছে, তা প্রায়ই লেখা হয়েছে বাঁ থেকে ডান দিকে ব্রাহ্মী হরফে ; প্রধানত উত্তর-পশ্চিম এবং সন্নিকটস্থ অঞ্চলে পাওয়া গেছে খরোষ্ঠি-লিপি, যা লেখা হত ডান দিক থেকে বাঁয়ে। এই সব লিপির পাঠোদ্ধারে কানিংহাম, ফ্লীট প্রভৃতি পণ্ডিতের অবদান প্রভূত। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, তামিল, তেলুগু, কন্নাদ প্রভৃতি ভাষাতে বহু লেখমালার সন্ধান মিলেছে।

মুদ্রা

প্রাচীন মুদ্রার গুরুত্ব · *দক্ষিণ ভারতে রোমক মুদ্রার আধিক্য* · *উত্তর ভারতে গ্রীক ও সীদিয়ান মুদ্রা*

শিলা বা তাম্রলেখের তুলনায় প্রাচীন মুদ্রার গুরুত্ব কম হলেও তা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর নয়। ভারতীয় এবং বিদেশী মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় তদানীন্তন ইতিহাসের পাঠোদ্ধার সহজ হয়েছে ; এই তথ্যের প্রধান প্রমাণ হল মুদ্রা। দাক্ষিণাত্যে আবিষ্কৃত মুদ্রার পরিমাণ হল সবচেয়ে বেশী ; দাক্ষিণাত্যে বহুসংখ্যক মুদ্রাভাণ্ড পাওয়া গেছে ; তার অধিকাংশ হল রোমক মুদ্রায় পূর্ণ। বহির্বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘ উপকূল, বিশেষ করে রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যে বিপুল বাণিজ্য ছিল তার মূল কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ ভারত। এই সব রোমক মুদ্রা তার পরিচয় বহন করছে। উত্তর ভারতে ব্যাকট্রিয়ান (গ্রীক) এবং সীদিয়ান রাজাদের রাজ্যকাল, রাজ্যসীমা প্রভৃতি তথ্য প্রায় শুধু মুদ্রার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। এই সব মুদ্রা বিনা তাঁদের কার্যকলাপের কথা প্রায় অজ্ঞাতেই থেকে যেত। কুশাণ ও গুপ্তযুগের অতি সুমার্জিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। ব্যাকট্রিয়ান, শক প্রভৃতি রাজাদের নামধাম মুদ্রা

থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ; তেমনই দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজবংশের রৌপ্যমুদ্রারও গুরুত্ব প্রভূত। সাধারণত অনুমান করা হয় যে যেখানে কোন রাজার মুদ্রা পাওয়া গেছে, সেই এলাকা তার রাজ্যের অন্তর্ভূত। এই হিসাবে মাঝে মাঝে ভুল ঘটলেও, মোটামুটি ঠিক ধরে নেওয়া অসঙ্গত নয়। তাছাড়া মুদ্রাগুলির ছাঁচ, হরফ, লেখা, আঁকা ছবি থেকে বহু অনুমান সম্ভব ; যে ধাতুতে মুদ্রা নির্মিত, তার ধরন থেকেও সভ্যতার স্তর সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। শিলালিপির নির্ভুল পাঠ থেকে অবশ্য যে তথ্য সংগৃহীত হয়, তা মুদ্রা থেকে পাওয়া খবরের চেয়ে দামী। কিন্তু এই মুদ্রার পাঠোদ্ধার এবং অন্যান্য সংকেত থেকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট সাবধান প্রয়োজনীয়।

সাতবাহন রৌপ্য মুদ্রা

মুদ্রা-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

ভূপৃষ্ঠে এবং ভূগর্ভে এমন বহু বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে, যার গুরুত্ব অপরিসীম। অখণ্ড ভারতবর্ষে যাকে বলা হত সিন্ধুপ্রদেশ সেখানে অবস্থিত মহেঞ্জোদড়ো এবং (পশ্চিম) পঞ্জাবের হড়প্পা থেকে সিন্ধু সভ্যতার যে বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের গৌরবস্বরূপ ; বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে নূতন তথ্য এর ফলে সংযোজিত হয়েছে। বর্তমান ভারতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উদ্যোগে খননকার্য চলছে ; দক্ষিণে গুজরাটে অবস্থিত রংপুর এবং উত্তরে পঞ্জাবে অবস্থিত রূপার এবং উত্তরপ্রদেশে মীরাট নগরের নিকটস্থ আলমগীরপুরে হড়প্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সিন্ধু-সভ্যতার যুগ এবং পরবর্তী অধ্যায়ের সন্ধিক্ষণ সম্বন্ধে সংবাদ হয়তো অনতিবিলম্বে মিলবে। পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে উত্তর ভারতে নালন্দা, কৌশাম্বী, মহাস্থানগড় এবং দক্ষিণ ভারতে নাগার্জুনিকোণ্ডা, অমরাবতী প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে খননকার্যের ফলে বহু মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সারনাথের স্তূপ, সাঞ্চীস্তূপ দেওগড়ের মন্দির, অজন্তা ও ইলোরা, কার্লি ও এলিফান্টা, খাজুরাহো, মহাবলিপুরম, কাঞ্চী, পল্লভ ও চোল রাজগণের উদ্যোগে নির্মিত দক্ষিণ ভারতের আকাশচুম্বী মন্দির, কর্ণাটকে বেলুড় ও হালেবিদ, উড়িষ্যায় কোণারক ও ভুবনেশ্বর—এ তালিকা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে যে অপরূপ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তার মহিমান্বিত প্রমাণ আমরা আজও চাক্ষুষ করতে পারি। প্রত্নতত্ত্বের কল্যাণে ভারতের লুপ্ত গৌরব আজ অনেকাংশে উদ্ধার

সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন : মহেঞ্জোদড়ো, হড়প্পা, রংপুর ও রূপার

পরবর্তী যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

পেয়েছে। ইংরাজ শাসন সম্পর্কে অন্তত একটা ভালো কথা বলা যায় যে এক সময় এ ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও পরে ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতের প্রত্নগৌরব রক্ষা ও অনুশীলন বিষয়ে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন।

প্রত্নতত্ত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

প্রত্নতত্ত্ব থেকে সংস্কৃতি ব্যাপারে সংবাদ যে শুধু পাওয়া যায়, তা নয়। ধর্ম এবং সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধেও বহু তথ্য এ থেকে মেলে। শিল্পগত ব্যাপারে অগ্রগতির সঙ্গে সাধারণ জীবনের অগ্রগতি নিঃসম্পর্ক নয়; সেদিক দিয়ে প্রত্নতত্ত্বের সমধিক গুরুত্ব আছে। খনন করতে গিয়ে প্রায়ই দেখা যায় যে স্তরের নীচে স্তর রয়েছে; বিভিন্ন স্তরের নির্মাণপদ্ধতি ও কৌশল হল ভিন্ন। এরূপ আবিষ্কার থেকেই বিভিন্ন স্তরের কালক্রম নির্ধারণ সম্ভব হয়।

বেদ, পুরাণ ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রন্থ

প্রাগ্‌মৌর্যযুগের ঐতিহাসিক উপাদান

সাহিত্য, পুরাণ কথা ইত্যাদি যে প্রাচীন ইতিহাসের এক প্রধান উপাদান তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বিশেষত আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পূর্ববর্তী ইতিহাস জানতে হলে সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, শিল্পরচনা, বিজ্ঞান-আলোচনা প্রভৃতির শরণ না নিয়ে উপায় নেই। প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গের কথা; আর্য সভ্যতার এই প্রাচীনতম নিদর্শন থেকে সমসাময়িক সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদ, ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র প্রভৃতি থেকে তখনকার মানুষের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা, তার তত্ত্বজ্ঞান, তার দর্শনচর্চা প্রভৃতির সংবাদ মেলে। সামাজিক জীবন ও ব্যক্তির বিকাশ সম্বন্ধেও বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। রামায়ণ-মহাভারত এই দুই মহাকাব্য হল ভারতের জীবন ও আদর্শ বিষয়ে এক অতুল ও অক্ষয় ভাণ্ডার—তদানীন্তন রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে এ যেন বিশ্বকোষ-বিশেষ। তাই প্রবচন চলে এসেছে: "যা নেই 'ভারতে', তা নেই ভারতে।" মহাভারতে যা অনুল্লিখিত, তা যেন অবশ্যম্ভাবী ভাবে ভারতবর্ষেই অনুপস্থিত! বৌদ্ধ জাতকমালা থেকে সমসাময়িক সমাজের সুন্দর আলেখ্য পাওয়া যায়; সিংহলে সংকলিত 'মহাবংশ', 'দীপবংশ', 'দিব্যাবদন' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে অশোক সম্বন্ধে বিশেষত বহু তথ্য পাওয়া যায়। মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নারদস্মৃতি, শুক্রনীতি প্রভৃতির কথা

বেদ, উপনিষদ ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্র

রামায়ণ ও মহাভারত

বৌদ্ধ জাতক ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ

স্মৃতি

অর্থশাস্ত্র
অষ্টাদশ পুরাণ

অনেকের মনে পড়বে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে রাষ্ট্র ও সমাজ বিষয়ে যে কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে, তার ইয়ত্তা নেই। অষ্টাদশ পুরাণের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়; এতে আছে বংশাবলীর বিবরণ, 'বংশ', 'মন্বন্তর', 'বংশানুচরিত' প্রভৃতি ব্যাপারে আগ্রহ যেন ইতিহাসবোধেরই ইঙ্গিত দেখায়। পার্জিটর এই বংশাবলীকে অনেকাংশে ভিত্তি করে ইতিহাসের পাঠোদ্ধার চেষ্টা করেছেন। আবার ধর্মসম্পর্করহিত রচনা থেকেও অনেক সংবাদ আমরা পাই। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি ব্যাকরণ-গ্রন্থ, গার্গীসংহিতার মতো বিজ্ঞান-রচনা, ভাস, কালিদাস, অশ্বঘোষ থেকে আরম্ভ করে অগণিত কবির কাব্য নানা দিক থেকে ঐতিহাসিকের কাজে লেগেছে।

পাণিনি
পতঞ্জলি
গার্গীসংহিতা
ও বিভিন্ন
কাব্যগ্রন্থ

ইতিহাস-গ্রন্থ ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ

প্রাচীন ভারতের
ইতিহাস-গ্রন্থ

ইতিহাস-রচনা ব্যাপারে প্রাচীন ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ হলেও আমাদের কয়েকখানি গ্রন্থ ইতিহাসরূপে একেবারে স্বল্পমূল্য নয়। কহ্লন-কৃত "রাজতরঙ্গিণী" (দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা কাশ্মীরের ইতিহাস), সপ্তম শতাব্দীতে লেখা বাণভট্ট-কৃত "হর্ষচরিত", বিহ্লন-কৃত "চালুক্যরাজ বিক্রমাঙ্কদেবচরিত", সন্ধ্যাকরনন্দী-কৃত "রামচরিত", বাক্‌পতিরাজের "গৌড়বহো", চাঁদ বরদই-কৃত "পৃথ্বীরাজ-রসো" প্রভৃতি রচনা প্রকৃতই স্মরণীয়। এদের ঠিক ইতিহাস বলা অবশ্য কঠিন; তথ্যের সত্যতা যাচাই করে তবেই তাকে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার রীতি এরা গ্রহণ করেন নি, প্রায়ই কল্পনা ও অতিরঞ্জনের পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকরনন্দী এমন ভাবে "রামচরিত" লিখেছিলেন যাতে রামায়ণের রামচন্দ্র এবং বাংলার পালরাজ রামপালের সৌসাদৃশ্য ফুটে ওঠে; এতে কাব্যরচনা অসম্ভব নয়, কিন্তু ইতিহাস খণ্ডিত হয়ে পড়ে। মুসলিম যুগে প্রকৃত ইতিহাস-রচনার বহু দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু হিন্দুযুগে যথার্থ ইতিহাস লেখার প্রয়াস যে ঘটে নি, তা অস্বীকার করা যায় না।

মন্তব্য

বৈদেশিক
পর্যটকগণ

বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে ভারত-ইতিহাসের বহু তথ্যই আমরা পেয়েছি। গ্রীস, রোম, চীন, আরব, তিব্বত প্রভৃতি নানা দেশ থেকে এঁরা এসেছেন, কেউ রাজদূত হয়ে, কেউ বাণিজ্যব্যপদেশে, কেউ তীর্থ করতে, কেউ বা শুধু ভ্রমণের নেশায়। পারসীকরা কিছুকাল ভারতের উত্তর-পশ্চিমে একাংশ দখল করে, কিন্তু শিলালেখ ছাড়া কোন বৃত্তান্ত

পারস্য থেকে এখনও পাওয়া যায় নি। আলেকজাণ্ডার এদেশে আসেন

গ্রীকদের বিবরণী

সদলবলে ; তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর বেশ কিছুকাল ধরে গ্রীক লেখকরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখেন। আলেকজাণ্ডারের অভিযান বিষয়ে বর্ণনা আছে কুইন্টস্ কুর্টিয়ুস্, ডায়োডোরস্, আরিয়ান্, প্লুটার্ক প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকের গ্রন্থে। পরে সেলিউকস্ মেগাস্থিনিস্‌কে রাজদূত করে

মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা'

পাঠান মৌর্য রাজসভায় ; মেগাস্থিনিসের লেখা "ইণ্ডিকা" পাওয়া যায় নি, কিন্তু তা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে আরিয়ান্, স্ট্রাবো, জস্টিন্ প্রভৃতি পরবর্তী লেখকের রচনায়, আর এই খণ্ড খণ্ড উদ্ধৃতি থেকেই মৌর্য যুগের

টলেমি-র ভৌগোলিক বিবরণ

ভারত সম্পর্কে চমৎকার ছবি মেলে। বিখ্যাত টলেমি(Ptolemy)-র ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ থেকেও অনেক দামী জিনিস পাওয়া গেছে। কোন্ এক অজানা গ্রীক নাবিক খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকে ভারত

পেরিপ্লস্

সাগর, বিভিন্ন বন্দর এবং আমদানি-রপ্তানি সম্বন্ধে এক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লেখেন ; তার নাম হল পেরিপ্লস্ ("Periplus of the Erythraean Sea")।

চীনা পর্যটক

গ্রীকদের পরে উল্লেখ করা দরকার চীনা পর্যটকদের কথা—গুপ্তযুগে আসেন ফা-হিয়েন, হর্ষবর্ধনের শাসনকালে হিউয়েন-সাং এবং আরও পরে

তিব্বতী তারানাথ

ইৎ সিং। তিব্বতের এক প্রসিদ্ধ কাহিনীকার তারানাথ এদেশে এসেছিলেন। হিন্দু শাসন যখন উত্তর ভারতে নির্বাপিত হতে চলেছে,

মনীষী অল্‌বেরুনি

তারই কিছু পূর্বে আসেন আরব দেশ থেকে মুসলিম মনীষী অল্‌বেরুনি ; তাঁর গ্রন্থ, এবং সুলেমান, অল্‌মসুদি প্রভৃতি আরব লেখকের রচনা থেকে এদেশের ইতিহাস সংকলনে সাহায্য মেলে।

মুসলিম শাসনকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদানের অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্যতা

এর আগে বলা হয়েছে যে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুসলমান লেখকদের রচিত ইতিহাস পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী ইতিহাস-পদবাচ্য। সরকারী দফ্‌তরে কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ আগের চেয়ে যত্ন করে রাখার বন্দোবস্ত তখন হয়েছিল। অবশ্য উত্তর ভারতে বহুবার আক্রমণ ঘটেছে ; প্রকৃতির শত্রুতায়, বিশেষ করে আবহাওয়ার দোষে, অনেক জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে। শোনা যায় যে আকবরের বিরাট গ্রন্থাগারে নাকি ২৪,০০০ পাণ্ডুলিপি ছিল, যার কোন চিহ্ন পরে মেলে নি।

মুসলিম যুগের ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে সংকলন প্রকাশ করেছিলেন এলিয়ট্ ও ডাউসন্। মিন্‌হাজউদ্‌দীন-এর "তবাকত-ই-নাসীরি", জিয়াউদ্‌দীন্ বরানি-র "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী", আবুল ফজ্‌ল্-এর "আইন-

ই-আকবরী" ও "আকবর নামা", বদৌনী-র "মুন্তাখাব-উৎ-তওয়ারিখ্", কাফি খান-এর "মুন্তাখাব-উল্-লুবাব" প্রভৃতি রচনা মাঝে মাঝে পক্ষপাত-দুষ্ট হলেও খুবই মূল্যবান ; কালানুক্রমিকতা ও তথ্যের সত্যতা নির্ধারণ সম্বন্ধে ধারণা এঁদের সকলেরই ছিল। আরও যাঁদের নাম করা উচিত, তাঁদের মধ্যে আছেন ঐতিহাসিক ফিরিস্তা এবং সর্ববিদ্যাপারঙ্গম আমীর খস্রু। বাবর এবং জহাঙ্গীর "স্মৃতিকথা" লিখেছিলেন ; গুলবদন বেগম লেখেন "হুমায়ুন-নামা" ; তিনজন মিলে "শাহ্‌জহান্-নামা" লেখা হয় ; "আলমগীর নামা" আর "মশীর-ই-আলমগীরী" উল্লেখযোগ্য। আরও পরবর্তীযুগ সম্বন্ধে স্মরণীয় হল গোলাম হুসেন-কৃত "সিয়র-উল্-মুতাখরিন্।"

মুসলমান ঐতিহাসিক ঃ

বাবর, জহাঙ্গীর, প্রভৃতির আত্মজীবনী

গোলাম হুসেন

স্থলতানী শাসনকালে তুঘলক রাজবংশ যখন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে আছে, তখন মরক্কো থেকে আসেন ইব্‌ন্ বতুতা। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বিদেশী পর্যটক হয়ে এসেছিলেন ইতালীয় নিকোলোকন্তি, আরব আবদুর্ রজাক্ এবং রুশদেশ থেকে আথানেসিয়স্ নিকিতিন। ষোড়শ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্য দেশের বহু প্রতিনিধিকে এদেশে দেখা যায়—ইংরাজ ফিচ্, টেরি, টমাস রো ; ফরাসী বের্নিয়ের, তাভের্নিয়ের ; ইতালিয়ান মানুচি ; পর্তুগীজ মন্‌সেরাত, ইত্যাদি। ইংরাজ শাসনকালে বিশপ হেবর-এরও নাম এখানে করা চলে। এঁরা সবাই যা লিখে গেছেন, তা ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান।

স্থলতানী আমল থেকে ভারতে আগত বিদেশী পর্যটক

ষোড়শ শতাব্দীর ইরোপীয় পর্যটকগণ

অওরংজেবের শাসনকালে প্রকাশ হত এক রকমের সরকারী সংবাদ-পত্র—"আখবরাৎ"। পেশোয়ার দফ্‌তরে রাখা দলিল থেকে বাছাই করে মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক সরদেশাই গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইংরাজদের কুঠি আর কারখানাতে বহু কাগজপত্র রাখা হত ; তার কিছু পরে প্রকাশ হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী পর্যটক জাক্‌মঁ বলেন যে ইংরাজদের রাজত্ব চলছে কাগজের জোরে। এ থেকে ইতিহাসের উপাদান বড় কম মেলে না ; আর উইল্‌কস, কানিংহাম, গ্রাণ্ট ডফ্ প্রভৃতি মহীশূর, শিখ এবং মারাঠাদের সম্বন্ধে যে ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীতে লেখেন, তাতে নিজেদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যও তাঁরা দিয়েছেন।

আখবরাৎ

ইংরাজ কুঠির কাগজপত্র

উইল্‌কস, কানিংহাম প্রভৃতি রচিত ইতিহাস-গ্রন্থ

হিন্দুযুগে নিছক ঐতিহাসিক রচনার যে অভাব ছিল, পরবর্তী কাল থেকে সে অভাব মিটে গিয়েছিল। ইতিহাসের যে উপাদান পূর্বযুগে ছিল না, পরে তা হল প্রচুর। সাহিত্য, মুদ্রা, স্থাপত্য প্রভৃতি অন্যান্য যে উপাদানের কথা বলা হয়েছে, তা ভিন্নরূপ হলেও পরবর্তী যুগে ইতিহাস

ঐতিহাসিক উপাদানের প্রাচুর্য

নির্ধারণে সাহায্য করেছে। এই সব প্রাথমিক উপাদান থেকে সংকলিত বহু গবেষণা-গ্রন্থ আছে। সাধারণভাবে দেশের ইতিহাস আয়ত্ত করে নিয়ে তার পরই সেই মূল গ্রন্থগুলির আস্বাদ সার্থক হতে পারে। ইতিহাসে আগ্রহ এলে তার পর আসবে নিষ্ঠা, আসবে "জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা", জিজ্ঞাসা, আসবে গবেষণার প্রেরণা। আমাদের বিরাট দেশের ইতিহাসে যে বহু প্রশ্ন এখনও উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে, তার সমাধান-ভার আজ যারা ছাত্র তাদেরই নিতে হবে।

সমাধান-সাপেক্ষ অনুত্তরিত ভারতের ঐতিহাসিক প্রশ্ন

ইতিহাসের প্রারম্ভ ঃ সিন্ধু সভ্যতার কথা

মানব সভ্যতার আদি কথা

ভূ-তত্ত্ব, প্রত্নবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি প্রকরণের সাহায্যে পৃথিবীতে মানব-জীবনের আদিম বৃত্তান্ত সংগ্রহের চেষ্টা পণ্ডিতেরা করেছেন। বহু প্রাচীনকালের মানুষের জীবনযাত্রার মূক সাক্ষ্য হিসাবে যে প্রস্তর বা সমাধি বা কঙ্কাল বা মৃৎভাণ্ডের সন্ধান মিলেছে, মানুষ জ্ঞানের জোরে যেন তাকে কথা বলিয়েছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা ছবি টেনে বার করতে পেরেছে। দশহাজার বৎসর পূর্বে মানুষের সমাজ কেমন ছিল তার খবর খুঁজে পাওয়া কৃতিত্ব হিসাবে সাবমেরিন বা এরোপ্লেন চালাবার নিয়মকানুন আবিষ্কার করার চেয়ে কম নয়। প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর কাছে তাই ইতিহাস একান্ত মোহনীয়। *মানুষের জীবনযাত্রার মূক সাক্ষ্য*

পুরাতন ও নূতন প্রস্তর-যুগ

সবচেয়ে পুরানো যে সময়ের কথা আমরা কতকটা জানি তাকে বলা হয়েছে পুরাতন প্রস্তর-যুগ (Palaeolithic Age)। তখনকার নানা আকারের যে প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় যে তা দিয়ে সম্ভবত মানুষ বনের জানোয়ার শিকার করত, হয়তো বা হাতুড়ির মতো কাজে লাগাত, কিংবা কোন জিনিস কাটতে বা ভাঙতে বা তার মধ্যে গর্ত করতে ঐ পাথর ব্যবহার করত। বহুকাল আগে ভারতবর্ষে এই পুরাতন প্রস্তর-যুগের প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার মানুষ কৃষিকর্ম জানত না, বনের জানোয়ার মেরে সেই মাংস, আর গাছের ফলমূল ইত্যাদি খেয়ে তারা জীবনধারণ করত। আগুনের ব্যবহার তারা বোধ হয় জানত না, মাটির ভাঁড় ইত্যাদি তৈরি করতেও তখন শেখে নি। বন্য জন্তুর ভয়ে তারা কোথাও কোথাও গাছপালা, আর পাতা দিয়ে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে হয়তো থাকত। কিন্তু খুব সম্ভব তাদের থাকার কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। ধাতুর ব্যবহার তারা একেবারেই জানত না, আর তাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল যে পাথর, সেগুলিও ছিল ভোঁতা ধরনের, তা দিয়ে কাজ চালানো সহজ ছিল না। *পুরাতন প্রস্তর-যুগ* *পুরাতন প্রস্তর যুগের জীবন-যাত্রা*

বহুকাল ধরে এই আদিম অবস্থা চলার পর একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা গেল। পাথরের ভোঁতা হাতিয়ারের বদলে এবার মানুষ শিখেছিল পাথর দিয়ে ছুঁচালো অস্ত্র তৈরি করতে, তাকে পালিশ করে মসৃণ করতে আর নানাভাবে কাজের উপযোগী করে তুলতে। এই যুগকে নাম দেওয়া হয়েছে নব্য প্রস্তর-যুগ (Neolithic Age)। বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে তখনও এখনকার মানুষের পরিচয় হয় নি ; তবে অনুমান করা হয়েছে যে সোনার সন্ধান তারা পেয়েছিল। হয়তো তাদের সরল মনে সোনার বাহার কিছু বিস্ময় এনে দিয়েছিল, কিন্তু তাকে বিশেষ কোন কাজে লাগানো সম্ভব হয় নি। এই যুগে কৃষিকর্মের প্রথম ক্ষীণ সাক্ষাৎ মেলে ; শুধু প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর না করে নিজের পরিশ্রমে ও চেষ্টায় মানুষ শস্য ও ফল উৎপাদনে প্রথম পদক্ষেপ তখন করতে থাকে। কাঠ বা পাথর ঠুকে আগুন জ্বালতে তখন মানুষ শিখেছে। আস্তে আস্তে হাত দিয়ে মাটির জিনিস গড়া, আর ক্রমে কুমোরের চাকা আবিষ্কার করা হল তাদের কৃতিত্ব। প্রায়ই তখন তারা থাকত গুহার মধ্যে ; শিকার আর সবাই মিলে নাচের ছবি সেই গুহাগাত্রে তারা এঁকে রেখে গেছে। যদি মনে করি যে তাদের হাত ছিল অনিপুণ, তা হলে মস্ত ভুল করা হবে। মাটির ভাঁড়ে আর গুহার গায়ে আঁকা তাদের ছবি মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে রসোত্তীর্ণ ; এক এক সময় যা দেখা গেছে তা একেবারে পাকা শিল্পীর হাত। আন্দাজ করা গেছে যে তারা একরকম কাপড় বুনতেও শিখেছিল। কেউ মারা গেলে তখন কবর দেওয়া হত ; মৃতদেহের সঙ্গে যে মাটির পাত্র রেখে দেওয়া হত তার কিছু কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এই নব্য প্রস্তর-যুগের বহু নিদর্শনের সন্ধান মিলেছে ; উত্তরেও কিছু পাওয়া গেছে। মাদ্রাজের বেলারী জেলায় তখনকার পাথরের অস্ত্র এক জায়গায় এত বেশী দেখা গেছে যে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সম্ভবত সেখানে ঐরকম হাতিয়ার বানানোর একটা কারখানা-গোছের কিছু ছিল।

নব্য প্রস্তর-যুগ

জীবনধারার পরিবর্তন : সোনার সঙ্গে পরিচয়

কৃষিকর্মের সূত্রপাত

আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি ও কুমোরের চাকা আবিষ্কার

গুহাচিত্র-রচনা

বয়ন-বিদ্যা

দক্ষিণ ভারতে নব্য প্রস্তর-যুগের নিদর্শনের প্রাচুর্য

তারপর লক্ষ্য করা যায় যে বিভিন্ন ধাতুর প্রচলন ধীরে ধীরে আরম্ভ হচ্ছে। তাম্র ও লৌহযুগে মানুষের অগ্রগতি আরও স্পষ্ট ও দ্রুত ঘটতে পারল, লৌহনির্মিত দ্রব্যাদির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার গতিবেগ পরিবর্তিত হয়ে গেল। সাধারণত পণ্ডিতেরা বলেন যে উত্তর ভারতে নব্য প্রস্তর-যুগ সাঙ্গ হয়ে তাম্রের ব্যবহার বাড়ছে, তামার অস্ত্র, বর্শাফলক, কুঠার প্রভৃতি জিনিস দেখা যাচ্ছে বুঝা যায়। দক্ষিণ ভারতে তাম্রযুগ

নব্য প্রস্তরোত্তর তাম্রযুগ ও লৌহযুগ

বলে কোন কালন্তর সে ভাবে লক্ষ্য করা যায় না ; মনে হয় যেন প্রস্তর-যুগ থেকে সরাসরি লৌহযুগে সংক্রমণ সেখানে ঘটে।

সিন্ধু সভ্যতা

ঋগ্বেদ যখন রচিত হয় তখন তাম্রযুগ চলছে কিংবা লৌহযুগের প্রারম্ভ ঘটেছে, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের অভিমত হল এই যে তখন লৌহের প্রচলনই লক্ষিত হয়। যাই হোক, ঋগ্বেদেরও পূর্ববর্তী কালের খবর আমরা পাই সেই সুপ্রাচীন সভ্যতার বিবরণ থেকে, যার নাম দেওয়া হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা। লৌহের ব্যবহার তখনও ব্যাপক হয় নি, কিন্তু সেই সভ্যতার ব্যাপ্তি ও দীপ্তি বাস্তবিকই গভীর মনোযোগ আকর্ষণের অধিকার রাখে।

ঋগ্বেদের পূর্ববর্তী কালের সভ্যতা

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত মহেঞ্জোদড়োতে এবং পঞ্জাবের মন্টগোমরি জেলায় হড়প্পা-তে যে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলতে থাকে, তার ফলে জানা যায় যে মিশর, অ্যাসীরিয়া, ব্যাবিলনিয়া প্রভৃতির সমসাময়িক এক সভ্যতা পাঁচ হাজার বৎসরেরও পূর্বে ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছিল। সভ্যতার ইতিবৃত্তে এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈদিক যে সংস্কৃতি এদেশে আর্য সভ্যতার প্রথম মহৎ অবদান, তাকেই আমরা সেদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন গরিমা বলে জানতাম। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা কালের দিক থেকে বৈদিক যুগেরও পুরোধা ; এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রায় সকলে একমত। মিশরের নীল নদ, পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর উপর প্রধানত নির্ভর করে যেমন বহুকাল পূর্বে বিপুল সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনই এদেশেও প্রায় সমসাময়িক এবং বহুবিস্তৃত এক সভ্যতার সন্ধান গবেষকেরা পেলেন, ইতিহাসে নূতন এবং গৌরবমণ্ডিত অধ্যায় সংযোজিত হল। এই বহুমূল্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব সর্বপ্রথমে বাঙালী বিদ্বান রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। মার্শাল, ম্যাকে, দীক্ষিত, ননীগোপাল মজুমদার, মার্টিমার-হুইলর প্রভৃতি পণ্ডিতদের এই গবেষণায় বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। সম্প্রতি ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্য যেভাবে খনন কার্য চলেছে, তা খুবই প্রশংসার্হ।

মহেঞ্জোদড়ো ও হড়প্পা

সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কর্তা

সিন্ধু সভ্যতার ব্যাপ্তি : গুজরাট

সিন্ধু নদের এলাকা থেকে বহু দূরে অবস্থিত স্থানেও সিন্ধু সভ্যতার বিশিষ্ট নিদর্শনের অনুরূপ আবিষ্কার ঘটেছে। গুজরাটের রংপুর, লোথাল প্রভৃতি স্থানে নর্মদা নদীর এলাকায় যেন হড়প্পারই এক রূপান্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। লোথালে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্নানের ঘর, নর্দমা, ছোটখাট জাহাজের উপযোগী বন্দর, 'ডক্' প্রভৃতি এত খুঁজে পাওয়া গেছে যে মহেঞ্জোদড়ো আর হড়প্পার সঙ্গে এর নাম করা উচিত। উত্তরে পূর্ব-পঞ্জাবে অবস্থিত রূপার অঞ্চলেও সিন্ধু সভ্যতারই অনুরূপ বহু নিদর্শন, বিশেষ করে বিচিত্র মৃৎভাণ্ডের ভগ্নাবশেষ মিলেছে। রাজস্থানের বিকানীরের কাছাকাছি অঞ্চলে বালি খুঁড়ে যেসব জিনিস পাওয়া গেছে, তাতেও আছে সিন্ধু সভ্যতার ছাপ। যে অঞ্চল দিয়ে গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত, সেখানেও হড়প্পার সঙ্গে তুলনীয়, নিদর্শন মিলেছে। সম্প্রতি মীরটের কাছে আলমগীরপুর বলে জায়গায় খননকার্য চালিয়ে যে আবিষ্কার ঘটেছে, তার তাৎপর্য খুবই বেশী। মহেঞ্জোদড়ো ও হড়প্পা এই উভয় স্থানই আজ পাকিস্তানে; কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার এবং তার সঙ্গে পরবর্তী যুগের সম্পর্ক বিষয়ে ভারতেই গবেষণা ও খননকার্য চলছে আজ বেশী। বাস্তবিকই সিন্ধু সভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যে সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে 'সিন্ধু সভ্যতা' নাম পর্যন্ত হয়তো একটু বদলাতে হতে পারে; খননকার্য আরও চলতে থাকলে এ বিষয়ে আরও বহু তথ্য নিশ্চয়ই সংগৃহীত হবে।

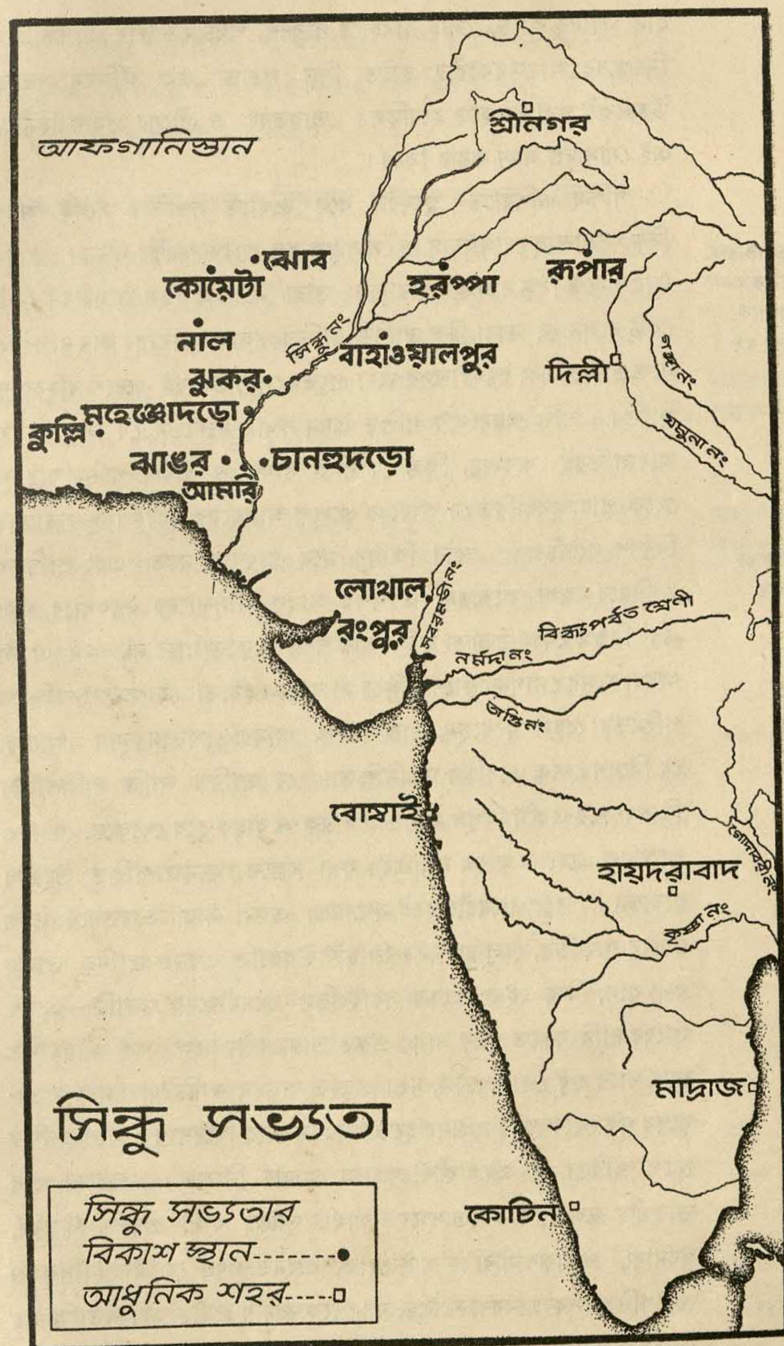
পূর্ব-পঞ্জাব

রাজস্থান

মীরট

ঈজিয়ন্ সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার তুলনামূলক বিচার

ক্রীট, মিনস্, ট্রয়, মাইকিনি প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীমান্. আর্থর এভান্স্ প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিক মাটি খুঁড়ে গ্রীসের পুরাকাহিনীকে দুই হাজার বৎসর পিছিয়ে দিতে পেরেছিলেন। হোমর-এর যুগের বহু পূর্বে যে গ্রীস ও তার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে এক সমুন্নত সভ্যতা সংগঠিত হয়েছিল, তার সংবাদ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনেছিল। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার তারই সঙ্গে তুলনীয়। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে এদেশে যেমন বেদের যুগ থেকে ইতিহাসের প্রারম্ভ মনে করা হত, গ্রীসেও তেমনই উনিশ শতকের শেষ ভাগের পূর্বে ধরে নেওয়া হত যে হোমরের সময়ই হল সেখানকার সভ্যতার প্রথম অধ্যায়। সিন্ধু সভ্যতার লিপি আজও পণ্ডিতেরা পড়ে অর্থোদ্গম করতে পারেন নি; গ্রীসের ঈজিয়ন্ (Aegean) সভ্যতা সম্পর্কেও তাই বলা চলে, তার লিপি আজও অপঠিত। ঈজিয়ন্ সভ্যতার মতোই সিন্ধু সভ্যতাকে পরাজয় মানতে হয়েছিল সভ্যতার পরিমাপে যারা


আফগানিস্তান
শ্রীনগর
ঝোব
কোয়েটা
হরপ্পা
রূপার
নাল
সিন্ধু নং
বাহাওয়ালপুর
দিল্লী
গঙ্গা নং
ঝুকর
মহেঞ্জোদড়ো
কুল্লি
যমুনা নং
ঝাঙর
চানহুদড়ো
আমরি
লোথাল
সবরমতী নং
বিন্ধ্যপর্বত শ্রেণী
রংপুর
নর্মদা নং
তাপ্তি নং
বোম্বাই
গোদাবরী নং
হায়দরাবাদ
কৃষ্ণা নং
মাদ্রাজ
সিন্ধু সভ্যতা
সিন্ধু সভ্যতার
বিকাশ স্থান
আধুনিক শহর
কোচিন

হীন তাদের কাছে, লৌহ ব্যবহারে পারদর্শী অথচ সভ্যতার মাপকাঠিতে নিম্নস্তরের আক্রমণকারীর হাতে সিন্ধু সভ্যতা এবং ঈজিয়ন্ সভ্যতা উভয়কেই পরাভূত হতে হয়েছিল। ভারতবর্ষ ও গ্রীসের পুরাকাহিনীতে এই সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করার বিষয়।

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কে ?— এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত

পশ্চিম এশিয়াতে সুমেরীয় বলে প্রখ্যাত সভ্যতার সঙ্গেই অবশ্য সিন্ধু সভ্যতার যোগাযোগ ও সৌসাদৃশ্য হল আরও স্মরণীয় ঘটনা। কারও কারও মতে সিন্ধু সভ্যতার যারা স্রষ্টা, তারা নিজেরাই ছিল সুমেরীয়। কেউ কেউ বলেন যে তারা ছিল দ্রাবিড় জাতির লোক, আবার কারও কারও মতে দ্রাবিড় এবং সুমেরীয়দের মধ্যে প্রভেদ নেই, উভয়েই এদেশে বহিরাগত জাতি। অতি অল্পসংখ্যক পণ্ডিত এমন কথাও বলেছেন যে সিন্ধু সভ্যতা আর্যজাতিরই অবদান, কিন্তু যে সমস্ত সাক্ষ্য ও প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে প্রায় অবধারিত যে আর্যদের এদেশে আগমনের পূর্বেই সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। একটা জিনিস মনে রাখবার মতো এবং পাণিক্কর এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, এদেশের আসল বাসিন্দাদের একেবারে খাস এবং নিজস্ব কোন সভ্যতা সৃষ্টি করার শক্তি থাকতে পারে না, এমন একটা ধারণা মনের গোপন কোণে লুকিয়ে না রাখলে হয়তো যে সমস্ত অভিমত পণ্ডিতেরা প্রচার করেছেন, তার সাক্ষাৎ আমরা পেতাম না। আর্যেরা যে বিদেশ থেকে এসেছিল তা নিশ্চিত। যে দ্রাবিড় জাতি দাক্ষিণাত্যে বিশেষ করে একটা বিপুল সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়ে থেকেছে, তারাও বাস্তবিক এদেশের মানুষ নয়, এই কথা বলতে অনেক পণ্ডিত উদ্‌গ্রীব হয়েছেন। তারা সুমেরীয়দেরই সমগোত্র, একদা সারা ভারতবর্ষে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল, বেলুচিস্তানের 'ব্রাহুই' উপজাতি এখনও দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে, কিন্তু এই দ্রাবিড়েরা সবাই ছিল সুমেরীয়দের স্বজাতি—এদেশ তাদের দাবি করতে পারে না! প্রকৃত ভারতবর্ষীয় বলে তাই পরিগণিত হতে পারে শুধু কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম জাতি যারা নব্য প্রস্তর-যুগের পর থেকে আর অগ্রসর হতে পারে নি আর বিদেশাগত সভ্য জাতির চাপে পার্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। তাছাড়া খাস ভারতীয় বলে দাবি করতে পারে গোর্খা, ভুটিয়া, খাসী প্রভৃতি পীতবর্ণ, খর্বনাসা, প্রত্যন্তবাসীরা। যাই হোক, এখনও পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক গবেষণা ঘটেছে, তা থেকে প্রমাণ হয়েছে বলা অত্যুক্তি নয় যে যাকে আমরা দ্রাবিড় সভ্যতা বলে পরিগণিত করে এসেছি, তা বৈদেশিক

পাণিক্করের অভিমত

পাণিক্করের সিদ্ধান্ত

প্রভাব বিনাই স্বতন্ত্রভাবে দাক্ষিণাত্যে বিকাশ পেয়েছে, এবং পরে বহিরাগত আর্য সংস্কৃতি ও জীবনধারার সংমিশ্রণের ফলে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে।

মহেঞ্জোদড়োর নগর-পরিকল্পনা ও সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন

সিন্ধু সভ্যতার কালনির্ধারণ একেবারে অকাট্য নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় বলা নিরাপদ। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে খনন কার্যের ফলে যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হল পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ। মহেঞ্জোদড়োতে মনে হয় যে শহরটি কয়েকবার ধ্বংস হয়ে পুনর্নির্মিত হয়েছিল ; সাতটি বিভিন্ন স্তরের সন্ধান সেখানে পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রকৃতই বিস্ময়কর হল শহরের পরিধি ও বৈশিষ্ট্য। নাগরিক সভ্যতার বিকাশ জগতের অন্যত্র কোথাও তখনও এতদূর ঘটেছে বলে ইতিহাসের জানা নেই। কৃষিকর্ম বিনা খাদ্যোৎপাদন সম্ভব নয়, সুতরাং তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা দাঁড়িয়েছিল নগরকে কেন্দ্র করে, এবং সেজন্যই নগরজীবনের আশ্চর্য অগ্রগতি তখন লক্ষ্য করা যায়। সুপরিসর শহরে বহু গৃহের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে ; দুটি মাত্র ঘর নিয়ে বাড়ি থেকে আরম্ভ করে সামনে পঁচাশী ফুট লম্বা আর প্রস্থে সাতানব্বই ফুট অট্টালিকা দেখা গেছে। ইষ্টক নির্মিত দোতলা বাড়ির সংখ্যাই ছিল বেশী ; কোন কোন বাড়ি ছিল আরও উঁচু। দরজা, জানালা, সিঁড়ি, বাঁধানো মেঝে, উঠান ইত্যাদি থেকে তখনকার জীবনযাত্রার মান কতকটা জানা যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে প্রত্যেক বাড়িতে পাতকুয়া, স্নানের ঘর ও জলনিকাশের বন্দোবস্ত থাকত। আলাদা রান্নাঘর, স্নানের ঘর ও শৌচাগারের আয়োজন দেখে বুঝা যায় যে নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে ধারণা কত অগ্রসর হয়েছিল। শহরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা আর চওড়া ; সরু গলিও ছিল, আর সেগুলি সোজা এসে বড় রাস্তায় মিশত। রাস্তায় জলনিকাশের জন্য পাকা নর্দমা আর চাপা নালীর যে ব্যবস্থা ছিল তা অতি চমৎকার। পুরাতন পৃথিবীর কোথাও নগরজীবনের এমন সৌষ্ঠব ও আয়োজন ছিল না ; এমন কি বলা যায় যে খ্রীষ্টাব্দের উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত শহরকে পরিষ্কার রাখার এমন নিখুঁত বন্দোবস্ত আর কোথাও দেখা যায় নি।

সিন্ধু সভ্যতার কাল নিরূপণ—

মহেঞ্জোদড়োর পুরাতন নগর

মহেঞ্জোদড়োর নগরসভ্যতা

ঘরবাড়ি

রাস্তা

পাকা নর্দমা

নগরজীবনের মান

মহেঞ্জোদড়োতে কয়েকটি প্রকাণ্ড ইমারত পাওয়া গেছে। বড় বড় থামওয়ালা মস্ত 'হল-ঘরে'র সংখ্যা নেহাত কম নয়, তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আশী ফুট। এই বিরাট বাড়িগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হত বলা শক্ত—প্রাসাদ কি দেবস্থান কি নগরপালিকাগৃহ, জোর করে বলা যায় না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইমারত হল একটা বিরাট স্নানাগার; মাঝখানে একটা মস্ত উঠান, তার চারদিকে ঘর আর 'গ্যালারি', আর উঠানের ঠিক মধ্যস্থলে সাঁতার কাটার জন্য প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা, যা ছিল দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট আর গভীরতায় ৮ ফুট। পাঁচ হাজার বৎসরেরও বেশী এই যে স্নানাগার কালের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে টিকে রয়েছে, তা প্রকৃতই বিশ্বের এক বিস্ময়। স্নানাগারের পুরো দৈর্ঘ্য হল ১৮০ ফুট আর প্রস্থ হল ১০৮ ফুট; বাইরের দেওয়াল প্রায় আট ফুট চওড়া। গৃহনির্মাণ ও পূর্ত কার্য সম্বন্ধে তখনকার সভ্যতা যে অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছিল, তা সত্যই স্মরণীয়।

বড় হল-ঘর

স্নানাগার

পরিচিত ধাতু

লৌহের চিহ্ন সিন্ধু সভ্যতার যুগে কোথাও মেলে না। তামা, রূপা, ব্রন্জ, চীনা মাটির জিনিস একেবারে অজানা ছিল না, কিন্তু তাদের ব্যবহার ছিল কম। পোড়ামাটির তৈরী অনেক পাত্র, জলাধার, পুতুল, নারীমূর্তি ইত্যাদি যা পাওয়া গেছে, তাদের উপর কারুকার্য আর মাঝে মাঝে পালিশ অতি সুন্দর। কয়েক শত ছোট ছোট 'সীল' আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু তার হরফ অজানা বলে পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নি। দু-একজন পণ্ডিত অনুমানের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তের চেষ্টায় লেগেছেন, কিন্তু তার বিশেষ কোন ফল এখনও হয় নি। সিন্ধু সভ্যতার লিপি এখনও আমাদের কাছে মূক বলে তখনকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক খবর পেলেও সেই সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আর পূর্বেই আমরা দেখেছি যে এর ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ নয়।

পোড়ামাটির জিনিস

সীল

সীলের উপর অঙ্কিত হরফ

আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে তখনকার স্ত্রীপুরুষ বসনভূষণ সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিল। বিলাসিতার বহু পরিচয়ও পাওয়া যায়। কার্পাসের বস্ত্র ব্যবহার প্রচলিত ছিল; মাঝে মাঝে পশমও ব্যবহৃত হত। গলার হার, আংটি, বালা, বাজুবন্ধ প্রভৃতি অলঙ্কার স্ত্রীপুরুষ উভয়েই পরত। নাকছাবি, কানের দুল, পায়ের মল, কোমরের বিছা ইত্যাদি ছিল শুধু মেয়েদের পরার গয়না। সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত প্রভৃতি দিয়ে অলঙ্কার গড়া হত; দামী পাথরের

তখনকার দিনের বসনভূষণ

গয়নার উপাদান

গয়নাও প্রচলিত ছিল। আকারের বৈচিত্র্যে এবং কারুকর্মের শোভায় তখনকার অলঙ্কার যে মনোহারী ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

খাদ্য

খাদ্যের প্রধান উপাদান ছিল গম; যব অজানা ছিল না। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খাওয়ার রেওয়াজ তখন ছিল। গৃহকর্মের জন্য ধাতুনির্মিত দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করা হত; সাধারণত মাটির পাত্র দিয়েই কাজ চলত। হাড় কিংবা হাতীর দাঁতের চিরুনি ও ছুঁচ, তামা আর ব্রন্‌জের তৈরী কুঠার, কাস্তে, ছুরি, ক্ষুর, মাছ ধরার বঁড়শি প্রভৃতি জিনিস পাওয়া গেছে। পাশার ঘুঁটি দেখে মনে হয় তখন ঐ খেলার প্রচলন ছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনার মধ্যে চেয়ার আর চাকাওয়ালা গাড়ি দেখা গেছে; অনুমান করা চলে যে তখন ঐ সব বস্তু ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগত।

তৈজসপত্র

প্রয়োজনীয় কারিগরি দ্রব্যাদি ও খেলনা

কৃষি

নগরকেন্দ্রিক হলেও তখনকার সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কৃষিকর্মের বিকাশ নিশ্চয়ই ঘটেছিল। গম, যব, কার্পাসের চাষ খুব হত। কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির শিল্পক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল; হাতীর দাঁত, পাথর আর মণিমুক্তার কাজে যারা দক্ষ, তাদেরও স্থান কম ছিল না। মানুষ তখন ষাঁড়, মহিষ, ভেড়া, হাতী, উট প্রভৃতি জানোয়ারকে পোষ মানিয়েছিল। খেলনায় কুকুরের মূর্তি দেখে মনে হয় যে কুকুরও সম্ভবত তখন গৃহপালিত হয়েছিল। ঘোড়া সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; সম্ভবত ঘোড়াকে লড়াইয়ের কাজে লাগিয়ে আর্যেরা এদিক থেকে সিন্ধু সভ্যতাকে পরাজিত করতে সাহায্য পেয়েছিল।

কারিগর

গৃহপালিত জন্তু

সীলের সম্ভাবিত ব্যবহার

যে সমস্ত 'সীল' পাওয়া গেছে, সেগুলো বোধ হয় প্রধানত ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার হত। শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা নয়, এশিয়ার বহু অঞ্চলের সঙ্গেও বাণিজ্য সম্পর্ক তখন স্থাপিত হয়েছিল। সীলগুলির উপর ছবির মতো হরফে যা লেখা আছে, তার পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নি, হলে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য আমরা জানতে পারব। অনেক সীলে নানা রকম জানোয়ারের ছবি আছে; তাদের মধ্যে আসল জানোয়ার ছাড়া কতকগুলো কাল্পনিক পশুর প্রতিকৃতি রয়েছে মনে হয়। শিল্পের বিচারে এর দাম কম নয়; মাঝে মাঝে প্রকৃত রসোত্তীর্ণ কাজও চোখে পড়ে। হড়প্পাতে যে পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে, তা স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে খুবই মূল্যবান। অবশ্য মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার তুলনায় সিন্ধুস্থাপত্য অনেকটা নিষ্প্রভ, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন ছোটখাট

সীলের উপর অঙ্কিত ছবি

হড়প্পার পাথর-মূর্তি

জিনিস এখানে যা মিলেছে তা পরিমাণে বেশী এবং মাঝে মাঝে তার শিল্পমূল্য কম নয়।

সিন্ধু সভ্যতায় হিন্দুধর্মের অনেক মূলগত বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎকার

মন্দির বা দেবস্থান বলে স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় এমন কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি, কিন্তু তখনকার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্র থেকে অনুমান করতে পারা অসম্ভব নয়। এমন কি পণ্ডিতেরা একথাও বলেন যে হিন্দুধর্মের বহু মূলগত বৈশিষ্ট্য সে যুগে দেখা যায়, বৈদিক যুগের পূর্বে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বেই তার সূত্রপাত ঘটে। শিব এবং কালীর অর্চনা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়তো ঘটেছিল সিন্ধু সভ্যতার যুগে।

প্রতীক পূজা

মাতৃপূজা

তখন গাছ, পাথর এবং ষাঁড়, কুমীর, সাপ প্রভৃতি জানোয়ারকে পবিত্র মনে করা হত, প্রতীক হিসাবে তার পূজাও সম্ভবত হত। এ ধরনের ব্যাপার নানা দেশে দেখা গিয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করার বস্তু এই যে বহু পরবর্তী যুগের শক্তি পূজার সমার্থক না হলেও পোড়ামাটির তৈরী মাতৃমূর্তি এত বেশী পাওয়া গেছে যে তখন প্রকৃতিকে মাতৃরূপে অর্চনা করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল বললে ভুল হবে না। একটি বিখ্যাত 'সীলে'র উপর প্রতিকৃতি আছে এক ত্রিমূর্তি-বিশিষ্ট পুরুষের, তিনি বসেছেন যোগাসনে, আর চারদিকে রয়েছে পশুর দল। অনুমান করা হয়েছে যে সম্ভবত ইনি হলেন পশুপতি মহাদেব। আবার ঠিক শিবলিঙ্গের আকারে বহু প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে বলে, মনে হয় যে তখন লিঙ্গপূজারও প্রচলন হয়েছিল। ঋগ্বেদে লিঙ্গপূজকদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু পরে যজুর্বেদে (এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে) লিঙ্গের স্থান স্বীকৃত হয়েছিল। বৈদিক যুগের প্রথমে মহাদেব শিবের কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু যজুর্বেদে মহেশ্বরের নাম কথিত হয়েছে। শক্তিপূজা, মাতৃমূর্তি পরিকল্পনা ইত্যাদি বৈদিক আর্যদের প্রথম যুগে অজ্ঞাত, পরবর্তী কালে এর বিকাশ ঘটতে থাকে, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার সময়ে আমরা তার আভাস পাই। প্রাক্ আর্যযুগেই যে ভারতীয় সভ্যতার বহু মূল বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল, তা সিন্ধু সভ্যতার অসম্পূর্ণ বিবরণ থেকেই আমরা জানতে পারি।

পশুপতি মহাদেব ও লিঙ্গপূজা

বিচার ও সিদ্ধান্ত

সিন্ধু সভ্যতা বনাম আর্য সভ্যতা

একটু পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক, নাগরিক জীবনের বিস্ময়কর বিকাশ তার বৈশিষ্ট্য। বৈদিক আর্যদের জীবন কেন্দ্রীভূত ছিল গ্রামে; গো-পালন, গো-চারণ নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকত, শহর সম্বন্ধে কোন ধারণা প্রথমে তাদের ছিল

না। সিন্ধু-সভ্যতার তুলনায় তারা পশ্চাৎপদ ছিল, কিন্তু ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে যে সভ্যতায় অগ্রগামী হলেই সর্বদা জীবনসংগ্রামে জয়লাভ সম্ভব হয় না। রোমক সাম্রাজ্য বর্বর জাতিপুঞ্জের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল, মোঙ্গোল অভিযানে চীন ও খলিফার শক্তি ধ্বংস হয়েছিল, তুর্কদের আঘাতে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের সুসভ্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। সভ্যতার হিসাবে যারা হীন, শক্তিতে, সাহসে, উদ্দীপনায় তারা যে সর্বদা হীন হবে তা নয়। বৈদিক আর্যেরা সভ্যতার মাপকাঠিতে সিন্ধু সভ্যতার সমকক্ষ ছিল না, কিন্তু বহুদিনের সমৃদ্ধি অনেক সময় যে অবসাদ আনে তা থেকে তারা মুক্ত ছিল। সম্ভবত লোহার ব্যবহার তারা জানত আর ঘোড়াকে কাজে লাগাতে পারত বলে তাদের যুদ্ধক্ষমতাও বেশী ছিল। সিন্ধু সভ্যতা যে সমস্ত অঞ্চলে বিস্তৃত, সেখানে কোথাও কোথাও অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে; বাণিজ্যে ব্যাপৃত বলে সেখানকার অধিবাসীরা যে যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ ছিল, তা নয়। তাদেরই 'দুর্গ' এবং 'পুর'গুলি জয় করে বৈদিক আর্যেরা উল্লসিত হয়েছিল; দেবরাজ ইন্দ্রের এক নাম তাই হল 'পুরন্দর'—যিনি 'পুর' বা নগরকে ধ্বংস করেছিলেন। একস্থানে একত্র অনেক কঙ্কাল এবং প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে; সম্ভবত সেখানে যুদ্ধ হয়েছিল আর নগরবাসীরা শত্রুর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছিল। তুলনামূলক বিচার

রীতিনীতি, জীবনধারা, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি দিক থেকে সিন্ধু উপত্যকা ও বৈদিক আর্যদের প্রভেদ লক্ষ্য করার বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে যে ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধুযুগের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; প্রাক্‌বৈদিক যুগ থেকে এদেশের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে, এই তথ্য খুবই মূল্যবান। বেদের বয়স নিয়ে বহু তর্ক হয়েছে। অবশ্য যাঁরা বিশ্বাস করেন যে বেদ অপৌরুষেয়, শ্রুতিরূপে তা হল সনাতন, অনাদিকাল হতে প্রচলিত, তাঁরা ইতিহাসকেই অস্বীকার করেন, কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বৈদিক যুগের পূর্বেই এদেশে সিন্ধু সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছিল খ্রীষ্টজন্মের তিন কিংবা সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে। বৈদিক আর্যদের নিয়েই কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় লিখিত হত। বর্তমানে সেই অধ্যায়েরই উপক্রমণিকা রূপে আমরা সিন্ধু সভ্যতার বিবরণ জানবার চেষ্টা করে থাকি। সিন্ধু সভ্যতা ভারত-ইতিহাসের উপক্রমণিকা

আর্য জাতি ও বৈদিক যুগের কর্মকাণ্ড

পণ্ডিতেরা প্রায় সকলে মনে করেন যে একেবারে অবিমিশ্র কোন জাতি কোথাও নেই, মানুষ যখন দেশ থেকে দেশান্তরে বসতি ও স্বস্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে তখন ক্রমাগত বিভিন্ন বংশধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। ভারতবর্ষ থেকে ইয়োরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে যারা অনেক সময় আর্য বলে অভিহিত হয়েছে, নিছক জাতিগত ঐক্য তাদের আছে মনে করা ভুল। কিন্তু 'ইন্দো-ইয়োরোপীয়' আখ্যা কোন বিশিষ্ট জাতি সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে প্রযোজ্য না হলেও কয়েকটি প্রধান ভাষা সম্বন্ধে তার প্রয়োগ অসমীচীন নয়। সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, পারসীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলি যেন একই পরিবারভুক্ত; কোন এক অন্ধকার অতীতে হয়তো একই মূল ভাষা থেকে এই শাখাপ্রশাখা উদ্ভূত হয়েছিল। ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত এবং সংস্কৃতজ শব্দের সাদৃশ্য বেশ উল্লেখযোগ্য। ঐ মূল ভাষা যারা ব্যবহার করত, তাদের আর্য বলে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; জাতিতত্ত্বের দিক থেকে না হলেও ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এর একটা সঙ্গতি আছে। আর যাই হোক, বৈদিক যে সভ্যতার পত্তন এদেশে খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক দুই হাজার কিংবা আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে হয়েছিল, তার সঙ্গে আর্য বলে পরিগণিত জনসমষ্টির নাম অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত রয়েছে।

আর্য জাতিগত সংজ্ঞা নহে

ইন্দো-ইয়োরোপীয় কথাটি ভাষা সম্পর্কে প্রযোজ্য

আর্য জাতি একভাষাভাষী জনসমষ্টি

বিজ্ঞান যেখানে কোন সর্বগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নি, সেখানে এদেশের জাতিগত রূপ সম্বন্ধে অতি সতর্কে এবং বহু সংশয় নিয়ে কয়েকটি কথা এখানে হয়তো বলা দরকার। কিছুকাল আগে পর্যন্ত নৃতাত্ত্বিকেরা সাধারণত ভারতবাসীকে সাত-আটটি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে দেখেছিলেন, যেমন বলা হত যে বাঙালীরা মোঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয়, মোঙ্গোল এবং দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙালীর উদ্ভব। কিন্তু এই মত এবং জাতিবিভাগ পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন মোটামুটি বলা যায় যে জাতির দিক থেকে ভারতবর্ষের বিপুল বৈচিত্র্য এখনও কিয়ৎ পরিমাণে

ভারতের নৃতাত্ত্বিক জাতিবিভাগ

লক্ষ্য করা চলে। 'নর্ডিক' জাতির লক্ষণ সংবলিত মানুষ দেখা যায় প্রধানত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, পঞ্জাবে এবং কতকাংশে রাজস্থানে ; আবার মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের মতো কেউ কেউ অন্য এলাকায় বাস করলেও এই দলে পড়েন। নর্ডিকরা সাধারণত দীর্ঘশির হয়ে থাকে, কিন্তু বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, কর্ণাটক, তামিল অঞ্চলের কোন কোন অংশে যারা বাস করে, তারা সাধারণত প্রশস্তশির (Brachycephalic)। ভূমধ্যসাগরীয় বলে আখ্যাত জাতিলক্ষণ দেখা যায় কর্ণাটক, তামিলনাদ, কেরালা, এবং কিছু পরিমাণে পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজস্থান এবং গাঙ্গেয় উপত্যকাতে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, সিকিম, ভুটান, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত, হিমাচলের কোন কোন অংশে মোঙ্গোলয়েড, অর্থাৎ মোঙ্গোলিয়ান-ঘেঁষা চেহারা দেখা যায়। এককালে হয়তো যারা এদেশের বহু স্থানে ছিল, সেই নিগ্রীটো জাতির লোক এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ; তবে আন্দামান প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে এখনও এদের দেখা মেলে। এ ছাড়া উল্লেখ করতে হয় প্রটো-অস্ট্রেলয়েড জাতির ; ভারতবর্ষের সর্বত্র যাদের নিম্নশ্রেণীর লোক বলা হয়, তাদের মধ্যে এখনও এই জাতির লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে ছয়টি বর্গের কথা আছে ; কিন্তু বিভিন্ন বর্গের লোক যে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছে, তা নয়। হঠাৎ দক্ষিণ ভারতের কোথাও অবিকল 'ককেশিয়ন' খরনাসিকা, দীর্ঘশির চেহারা মিলবে, আবার উত্তর-পশ্চিমে চিত্রল, গিলগিট প্রভৃতি স্থানে প্রশস্তশির মানুষ দেখা যাবে। তাই জাতি-বিভক্তির উপর খুব বেশী জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই ; বিজ্ঞানও এ বিষয়ে সর্বসম্মত বিচার উপস্থাপিত করতে পারে নি। বরঞ্চ ইতিহাসে যদি কোন কথা সত্য হয় তো তা হল এই যে যুগযুগ ধরে ক্রমাগত ভিন্ন জাতির মধ্যে মেলামেশা হয়েছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মতো কয়েকটা জায়গা ছাড়া কোথাও অবিমিশ্র (pure) জাতি বলে কিছু নেই, বিভিন্ন জাতির আসা-যাওয়া, মেলা-মেশা, আদান-প্রদান প্রভৃতির মধ্য দিয়েই মানুষ বড় হয়েছে, সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

'নর্ডিক'

প্রশস্তশির

ভূমধ্যসাগরীয়

মোঙ্গোলয়েড

নিগ্রীটো

প্রটো-অস্ট্রেলয়েড

বিভিন্ন জাতির লোকের বিক্ষিপ্ত বসবাস

সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের অভাব

মন্তব্য

আর্য জাতির বসতি সন্ধান

দেড়শো বৎসরেরও কিছু পূর্বে ইয়োরোপ যখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল, তখন থেকে পাশ্চাত্য

আর্য জাতির আদি বাসস্থান সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী মতবাদ

পণ্ডিতেরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত থেকেছেন যে ভারতীয় আর্যেরা এদেশে বহিরাগত। এই আর্যদের আদি নিবাস কারও মতে উত্তর মেরু অঞ্চলে, আবার কারও মতে রাশিয়ার দক্ষিণে ককেশস এলাকায়। নরওয়ে, সুইডেন থেকে তুর্কী ও আর্মেনিয়া পর্যন্ত নানা দেশকে এদের আদিভূমি বলে অনুমান করা হয়েছে; অনেকে বলেন যে মধ্য এশিয়ার কোন অঞ্চল থেকে আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের স্বপক্ষে যুক্তি সবচেয়ে জোরাল।

বোঘজ-কোই লেখমালা

এই প্রশ্নের পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয় কিন্তু সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কয়েকটি ঘটনা থেকে যার কালনির্দেশও অনেকটা নিশ্চিত। তুর্কীর বর্তমান রাজধানী আঙ্কারা থেকে অল্প দূরে বোঘজ-কোই নামে এক গ্রাম আছে; এখানে খ্রীষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে শক্তিশালী 'হিট্টাইট' (Hittite) রাজ্যের রাজধানী ছিল। দক্ষিণে অবস্থিত 'মিতন্নি' রাজ্য হিট্টাইটদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর মৈত্রীস্থাপনের জন্য দুই রাজবংশ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়; আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ সনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

আর্য দেবতাদের প্রথম নির্দিষ্ট উল্লেখ

এই উপলক্ষে স্মরণীয় যে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, নাসত্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) এই কয়েকটি আর্য দেবতার উল্লেখ সন্ধিতে রয়েছে। তখন যে পশ্চিম এশিয়াতে আর্য দেবতাদের অর্চনা প্রচলিত, তা এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বোঘজ-কোই-নির্ভর সিদ্ধান্ত

ঐ অঞ্চলে আর্য জাতিরা যে জনপদ স্থাপনা করেছিল, তাও হল এক সিদ্ধান্ত। এ থেকে এগিয়ে বলা হয়েছে যে পিতৃভূমি ছেড়ে অন্যত্র স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সন্ধানে আর্যেরা বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়েছিল; কেউ কেউ প্রাচীন পারস্যে বসতি স্থাপন করে। আবার কেউ কেউ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে ভারতবর্ষে সিন্ধু উপত্যকার উত্তর ভাগে এসে হাজির হয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ১৪০০ সনে কি আর্যেরা উত্তরের কোন দেশ থেকে ভারত অভিমুখে চলেছিল, না ইতিপূর্বে ভারতে প্রতিষ্ঠিত আর্য সংস্কৃতির বিস্তার পশ্চিম এশিয়ার দিকে চলছিল? প্রাচীন আর্যদের যে সাহিত্যের পরিচয় আমরা পাই, তা থেকে এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। শুধু এইটুকুই নিশ্চিতভাবে আমরা জানি যে বোঘজ-কোই লেখমালা তদানীন্তন আর্য সভ্যতার বিস্তৃতির সাক্ষ্য; কোথায় তার উদয়, আর কি ভাবে তার বিকীরণ ঘটছিল, তা এখনও আমাদের অজানা। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে আর্যদের প্রাচীনতম অবদান ঋগ্বেদে কোথাও পূর্বতন কোন পিতৃভূমি সম্বন্ধে সংকেত পর্যন্ত নেই। হিমালয় ভিন্ন অন্য কোন অঞ্চলের সঙ্গে পূর্বপুরুষের পুণ্যস্মৃতি জড়িত হয়ে নেই।

ভারতে আর্য জাতি

অবশ্য দ্রাবিড়দের সম্বন্ধে যেমন বেশ জোর করে বলা যায় যে এদেশ তাদের আদিভূমি মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, আর্যদের সম্বন্ধে তা বলা চলে না। ইরানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে যে আর্যদের আমরা সেই সুদূর অতীতে দেখতে পাই, তারা যে এদেশে আগন্তুক, তা তাদেরই কথা এবং অন্যান্য প্রমাণ থেকে জানতে পারা যায়। প্রথমে পঞ্জাবের দিকে আর তার পর আরও পূর্বে তারা এগিয়ে আসতে থাকে। যে শত্রুদের তারা সম্মুখীন হয়, তাদের 'দাস', 'দস্যু', 'দানব', 'দৈত্য', 'পিশাচ', 'রাক্ষস', 'নাগ' প্রভৃতি আখ্যা তারা দিয়েছিল। গ্রীকরা যেমন অপর সকলকে বলত 'বর্বর', আর্যদেরও মনোভাব এদেশের আর্যেতর বা অনার্য প্রাচীন অধিবাসীদের সম্পর্কে তেমনই ছিল। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে শত্রুর শতস্তম্ভবিশিষ্ট দুর্গের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে; রথে চড়ে আর্য যোদ্ধারা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে; যুদ্ধজয়ের জন্য 'পুরন্দর', ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সহায়তা প্রার্থনা করা হচ্ছে; অসি, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র প্রচলিত থাকলেও ধনুর্বাণের উপরই তাদের নির্ভর বেশী। নিজেদের গৌরবর্ণ সম্পর্কে তাদের অহঙ্কার; এদেশে যাদের পরাজিত করে তারা বসবাসের ব্যবস্থা করেছিল, তারা কৃষ্ণাঙ্গ (কৃষ্ণত্বচ্) বলে আর্যদের ছিল অবজ্ঞা। নিজেদের উন্নত নাসিকা বলে এদেশবাসীকে তারা "অনাসা" নাম দিয়েছিল। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক যুগের প্রথম পাদে যে দেবগণ পূজিত হত, তাদের মানতে শত্রুরা রাজী নয়, যজ্ঞে তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে, সুতরাং শত্রুদমন হল আর্যদের পক্ষে শুধু প্রয়োজন নয়, ধর্মগত কর্তব্যও বটে—এই সব ধারণা নিশ্চয়ই তখন ছিল। ইন্দ্র-উপাসক আর্যদের মধ্যে ভেদাভেদ অল্প ছিল না; ভরত, পুরু প্রভৃতি কুলের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল প্রচণ্ড, এদেশের বাসিন্দাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা মাঝে মাঝে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ চালাত। কিন্তু তখনকার প্রধান ঘটনা হল 'দাস' বা 'দস্যুদের' বিরুদ্ধে আর্যদের অভিযান; পুরুবংশের যে রাজা প্রতিদ্বন্দ্বী ভরত বংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁর নামই ছিল ত্রাসদস্যু।

আর্যগণ ভারতে আগন্তুক

পঞ্জাবে প্রথম বসতি

আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব

দেশের পূর্বতন অধিবাসী সম্পর্কে আর্য-মনোভাব

প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আর্যদের প্রধান অভিযান 'দস্যু'-বিরোধী

ঋগ্বেদের এক জায়গায় যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে হরিযূপীয়া বলে নদী বা নগরের নাম উল্লিখিত হয়েছে; সেখানে বৃচীবৎ বলে এক যজ্ঞপাত্র ভঙ্গকারী জাতিরও কথা আছে। এই হরিযূপীয়া হড়প্পার সম্পর্কিত বলে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন। অনুমান যদি সিদ্ধ হয় তো ঐ যুগ

বেদোক্ত "হরিযূপীয়া" কি হড়প্পার নামান্তর?

সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। অসম্ভব নয় যে হরিয়ূপীয়াতে বর্মাবৃত, অশ্বারূঢ় আর্য যোদ্ধারা সিন্ধু সভ্যতার প্রতিনিধিদের সঙ্গে লড়েছিল ; আর লৌহ এবং অশ্বের ব্যবহার সম্ভবত জানত না বলে সিন্ধু সভ্যতাকে আর্য আক্রমণের সামনে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

আর্যদের আগমনকাল

আর্যেরা কখন আদি বাসভূমি পরিত্যাগ করে দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হতে আরম্ভ করল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কখন যে আর্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম দেখা দিল, তাও জোর করে বলা সম্ভব নয়। তাদের প্রাচীনতম রচনা বেদের বয়স সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মতভেদ রয়েছে। ম্যাক্সমূলর স্থির করেছিলেন যে হয়তো বেদ রচনা হয়েছিল খ্রীষ্টজন্মের এক হাজার থেকে বারো শত বৎসর পূর্বে। বালগঙ্গাধর তিলক এবং জার্মান অধ্যাপক য়াকবি গ্রহনক্ষত্রের তদানীন্তন অবস্থিতি সম্বন্ধে বেদে উল্লিখিত তথ্য থেকে গণিত জ্যোতিষের পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই তারিখকে অনেকটা পিছিয়ে দেন। য়াকবি বলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৮০ নাগাদ বৈদিক যুগের প্রারম্ভ ; তিলকের মতে তা হল খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০ থেকে ২৫০০ সনের মধ্যে। অবশ্য আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থিতি সম্বন্ধে সাহিত্যে কোন উল্লেখ থেকে একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ সংগ্রহ করা যে সম্ভব নয় তা স্বয়ং তিলক স্বীকার করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে ম্যাক্সমূলর যে তারিখ স্থির করেছিলেন তা গ্রহ্য নয়। বৈদিক সভ্যতার সুদীর্ঘ বিবর্তন এবং ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা যা জানি, ঐ তারিখ মেনে নিলে তার কোন সঙ্গতি থাকবে না, পরম্পরার সূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। খ্রীষ্টজন্মের দুই থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হয়তো ঘটেছিল, এর বেশী জোর করে কিছু বলা এখনও সম্ভব নয়।

(পার্শ্বটীকা: বেদের কাল-নির্ণয়; ম্যাক্সমূলর; তিলক ও য়াকবি; ম্যাক্সমূলরের মত-খণ্ডন)

আর্যদের বসতি-বিস্তার

আর্যেরা ক্রমশ উত্তর ভারতে যে ছড়িয়ে পড়ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের সাহিত্যে ভৌগোলিক উল্লেখ দেখে। কুভা (কাবুল) আর সিন্ধু নদ থেকে ক্রমে বিতস্তা (ঝিলম), অসিক্নি (চেনাব), পরুষ্ণি (রাবি), বিপাশা (বিয়াস্), শতদ্রু, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, যমুনা, গঙ্গা ও সরযূ নদীর কথা বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ "সপ্তসিন্ধু" নামে পরিচিত হয়েছিল। সপ্তসিন্ধু থেকে ব্রহ্মাবর্ত (পঞ্জাবের পূর্ব অঞ্চল), আর সেখান থেকে ক্রমশ পূর্ব ভারতের দিকে আর্যেরা অগ্রসর হয়।

(পার্শ্বটীকা: বেদে আর্য উপনিবেশের ভৌগোলিক পরিচয়)

কুরু-পঞ্চাল (দিল্লী ও মীরটের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা), কোশল (অযোধ্যা), কাশী (বারাণসী), বিদেহ (উত্তর বিহার) প্রভৃতি স্থানে আর্যশক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। বাংলা দেশে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল বৈদিক যুগের শেষভাগে কিংবা তার অব্যবহিত পরে। ধর্মসূত্র বেদেরই অঙ্গ, তা থেকে মনে হয় যে বাংলা দেশ আর্যাবর্তের বহির্ভূত। এর পরে মনুর ধর্মশাস্ত্রে বলেছে যে পুণ্ড্র জাতি পতিত ক্ষত্রিয় এবং তাদের বাসভূমি (উত্তরবঙ্গ) আর্যাবর্তের অন্তর্গত। মহাভারতে পুণ্ড্র ও বঙ্গ এই উভয় জাতিকে ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পাণিনি সূত্রে গৌড়পুর এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়িক স্বর্ণের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু গৌড় বলতে তখন কোন্ স্থান ঠিক বুঝাত তা জানা নেই।

বঙ্গদেশে আর্য সভ্যতার প্রসার

দাক্ষিণাত্যেও ক্রমশ আর্য বসতি স্থাপিত হচ্ছিল। অগস্ত্য ঋষির দক্ষিণ যাত্রার কাহিনী কোন্ এক অনির্ধারিত অতীতে আর্যদের দাক্ষিণাত্য অভিযানের কথা মনে করিয়ে দেয়। বৈদিক যুগের শেষ দিকে বিদর্ভে সাত্বত বংশের রাজ্য, নাসিকের কাছে দণ্ডক রাজ্য, গোদাবরী-তীরে মূলক ও অশ্মক রাজ্য আর্যশক্তি বিস্তারের পরিচয় দেয়। উত্তরাপথ এবং দাক্ষিণাত্যে সর্বত্রই যে আর্যরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, তা নয়। 'দাস' জাতির কর্তৃত্বে রাজ্য যে ছিল বার বার তার সংবাদ মেলে। তা ছাড়া যেখানে ছিল বিপুল অরণ্যানী, সেখানে পুলিন্দ, নিষাদ, শবর, কলিঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি নামে অভিহিত অনার্য জাতিরা বাস করত। দাক্ষিণাত্যে আর্যশক্তির অখণ্ড প্রতিপত্তি কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; এমন কি উত্তরেও আর্য ও অনার্য সভ্যতার সহ-অবস্থান ও পারস্পরিক প্রভাব খুবই লক্ষ্য করার বস্তু। যে অনার্যদের সম্বন্ধে আর্যমনে ছিল ভীতি আর ঘৃণা, যাদের ধ্বংস সাধনের জন্য ইন্দ্র আর সূর্য আর অগ্নি আর বরুণের কত বন্দনা, সেই অনার্যেরই অপরিহার্য সান্নিধ্য ক্রমশ যেন এক অভাবিতপূর্ব সমন্বয় সাধনে সাহায্য করেছিল।

দাক্ষিণাত্যে আর্য-আধিপত্য

'দাস' জাতি প্রতিষ্ঠিত রাজ্য

ভারতে আর্যদের অখণ্ড প্রতিপত্তির অভাব

উভয় সভ্যতার সহ-অবস্থান

পূর্বেই দেখা গেছে যে সমস্ত আর্য জাতি একত্রিত হয়ে সর্বদা এগিয়ে চলে নি, বহু কুলে বিভক্ত নিজেদেরই মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ প্রায়ই দেখা যেত। ঋগ্বেদে দশ রাজার যে প্রসিদ্ধ যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা এখানে স্মরণীয়। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত হওয়ায় ভরত-গোষ্ঠীর রাজ্যে স্বভাবতই বহু অনার্যের বাস ছিল ; তুলনায় পঞ্জাব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন আর্য রাজ্যগুলিতে অনার্যদের স্থান ছিল অল্প। বশিষ্ঠের আশীর্বাদ নিয়ে ভরত-

আর্য জাতির অন্তর্দ্বন্দ্ব

'দশ রাজার যুদ্ধ'

রাজা সুদাস যুদ্ধে বিশ্বামিত্র ঋষির অনুরাগভাজন দশ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন ; একেই অনেকে আর্য ইতিবৃত্তের প্রথম গুরুতর ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে অনার্যেরাও যোগ দিয়েছিল। বিজয়ী সুদাসকে রাজাধিরাজ সম্রাট বলে অভিনন্দিত করা হয় ; এর পূর্বে সাম্রাজ্যের কোন পরিকল্পনা বৈদিক রচনায় নেই। আর্য এবং অনার্য একত্র মিলেছিল সুদাসের পক্ষেই বেশী, কারণ প্রাক্তন আর্য রাজ্যসমূহে অনার্যদের সংখ্যা ও প্রভাব ছিল নগণ্য। গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্যশক্তি প্রতিষ্ঠায় তাই আর্য এবং অনার্য উভয়েরই অবদান রয়েছে। বাস্তবিকই বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে যা ঘটেছিল তাকে শুধু আর্য জাতির বিজয় না বলে বিস্তৃতি ও প্রসার মনে করা ঠিক।

প্রথম 'সম্রাট' কথার উল্লেখ

আর্য জাতির বিজয়, না প্রসার ?

আর্য ও প্রাক্ আর্য সভ্যতার সমন্বয়

ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাপুঞ্জের মধ্যে ঋগ্বেদ যে প্রাচীনতম রচনা, তা নিঃসন্দিগ্ধ। ভারতবর্ষে হিন্দু সভ্যতার আদি গ্রন্থরূপে বেদের খ্যাতি। নিষ্ঠাবান হিন্দু ভক্তেরা বেদকে অপৌরুষেয় মনে করে থাকেন। বেদ যে ধর্মের মূল, সে ধর্ম হল সনাতন, অনাদিকাল থেকে প্রচলিত ; ঋষিরাও বেদ রচনা করেন নি, মন্ত্রদ্রষ্টা বলে স্বকীয় ধ্যান ও অনুভূতির জোরে তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যে মন্ত্র ওতপ্রোত করে রেখেছে তা শুনেছেন, তাই বেদ হল "শ্রুতি"—বিশ্বাসী হিন্দুর কাছে এই কথা আজও শোনা যাবে। এই ধরনের কথা অবশ্য ইতিহাস ও বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিরোধী ; বেদ যে মানুষেরই সৃষ্টি, অপৌরুষেয় নয়, তা যুক্তি দিয়ে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বেদের মহিমা বহু যুগ ধরে এদেশে এমনই কীর্তিত হয়ে এসেছে যে যারা প্রকৃতই বেদ-বিরোধী ধারার প্রতিভূ, তারাও অনেকে বেদের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছে। যাঁরা শাক্ত, যাঁদের বিশ্বাস ও আচারের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের সম্পর্ক নেই, বরং সম্পর্ক আছে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে, তাঁদেরও অনেকে চতুর্বেদের মধ্যেই বিশ্বাসের উৎস আবিষ্কার করেছেন! অবশ্য বৌদ্ধ এবং জৈন চিন্তা, আর চার্বাক প্রভৃতি লোকায়ত দার্শনিক ধারায় অসংকোচে বেদ-বিরোধী বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু বেদের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক রহিত বহু চিন্তাধারাকেও মূলত বেদ থেকে উদ্ভূত বলে প্রচার করার প্রয়াস ক্রমাগত এদেশে হয়েছে। উনিশ শতকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যখন আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখনও দেখা যায় বেদ সম্বন্ধে হিন্দু মনের এই

হিন্দুর বেদ-নিষ্ঠা

বেদ 'শ্রুতি' কেন ?

বেদের সর্বজনীন আবেদন

বৈদিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা

প্রগাঢ় আনুগত্যবোধ। বেদের মন্ত্র যাতে অবিকৃত থাকে, পুরুষানুক্রমে তার উচ্চারণেও যেন কোন তারতম্য এসে না পড়ে, সেজন্য প্রায় চার হাজার বৎসর ধরে যে চেষ্টা চলে এসেছে, তাও এখানে স্মরণীয়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল এই যে যদিও বৈদিক অনুষ্ঠান (হোম কুশণ্ডিকা প্রভৃতি) আজও প্রচলিত রয়েছে, যদিও গায়ত্রী মন্ত্র আজও ভারতবর্ষের সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে, বেদের যাঁরা দেবতা বহুকাল পূর্বেই তাঁদের অবলুপ্তি ঘটেছে। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ক চিন্তার যখন সূত্রপাত, তখন বৈদিক যুগের পরবর্তী অধ্যায় আরম্ভ হয়ে গেছে, তখন বরুণ, বায়ু, মিত্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার দর্শন তেমন মিলছে না, শিব আর বিষ্ণুর মতো পূর্বে আর্যদের অজ্ঞাত দেবতার কাছে ইন্দ্র তখন প্রায়ই বরপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, আর্য আর অনার্য "দস্যু"দের বাস্তব জীবনক্ষেত্রে মিলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আর বিস্ময়কর এক পৌরাণিক রূপকথার সৃষ্টি হচ্ছে। আত্মদর্শন ও অধ্যাত্মচিন্তা প্রকাশ পাচ্ছে উপনিষদ প্রভৃতি রচনার মধ্যে। *বৈদিক ধর্মের বিবর্তন*

যে বরুণ বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে প্রধান এক দেবতা ছিলেন ("ইন্দ্রাবরুণৌঃ") তাঁকে দেখা গেল মাত্র দিক্‌পালরূপে ; বরুণের অর্চনা আজ শুধু বোধ হয় বলিদ্বীপেই প্রচলিত, অন্যত্র নয়। বায়ুরও সমান অবস্থা ; ইন্দ্রের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এদেশের পূর্ব প্রচলিত মাতৃপূজার প্রভাব পড়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় যে কোন কোন বৈদিক ঋষির মাতৃপরিচয় দেওয়া হয়েছে। আর্য সমাজ-ব্যবস্থা যে ছিল পিতৃশাসিত ('patriarchal'), তাতে সন্দেহ নেই। পূর্বতন সমাজে মাতৃশাসিত (matriarchal) সমাজের যে লক্ষণ ছিল এবং যার চিহ্নাবশেষ আজও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে রয়েছে, তারই প্রভাব সম্ভবত বৈদিক আর্যদের উপর পড়েছিল। নানা দিক দিয়ে আর্য ও অনার্য ধারার মিলন বার বার আমাদের ইতিহাসে সূচিত হয়েছে। *বৈদিক দেবতার প্রাধান্য হ্রাস* *পিতৃশাসিত আর্য সমাজের উপর পূর্বতন মাতৃশাসিত সমাজের প্রভাব*

বেদ ও বৈদিক সাহিত্য

বেদ যে সংখ্যায় চার, এ কথা শিশুবয়সে প্রথম শিক্ষাতেই জানাবার রীতি আমাদের আছে। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব, এদের মধ্যে ঋগ্বেদই সবচেয়ে প্রাচীন। ঋগ্বেদে আছে এক হাজার সতেরোটি মন্ত্র ; আট ভাগে অষ্টকে কিংবা দশ ভাগে দশটি মণ্ডলে এগুলি বিভক্ত করা হয়। বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদের এই মন্ত্রের দ্রষ্টা বলা হয়েছে ; যুগ *বেদের সংখ্যা* *ঋগ্বেদ*

যুগ ধরে বিশেষ এক ভঙ্গীতে যারা 'হোতৃ', সেই পুরোহিতরা এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে শিখেছে।

সামবেদ
যজুর্বেদ
অথর্ববেদ

ঋগ্বেদেরই বহু মন্ত্র নিয়ে তাতে গানের স্বরলিপি দিয়ে সামবেদ রচিত হয়েছিল। যজুর্বেদে আছে প্রধানত যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মন্ত্র। আর সর্বশেষে রচিত অথর্ববেদে রয়েছে বিভিন্ন বিচিত্র বস্তু—সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে মন্ত্র রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আছে শত্রুদমনের প্রক্রিয়া, চিকিৎসার পদ্ধতি, জাদুবিদ্যার উল্লেখ।

সংহিতা ও
ব্রাহ্মণ

বেদের যে অংশ পদ্যে লেখা, তার নাম হল 'সংহিতা', আর যেখানে প্রধানত গদ্য রয়েছে, সেগুলিকে বলা হয় 'ব্রাহ্মণ'—যাগযজ্ঞের রীতিনীতি এবং নানা বিষয়ক গাথা ও মন্ত্র দুই ভাগে আছে।

উপনিষদ ও
আরণ্যক

বৈদিক যুগের পরবর্তী অধ্যায়ে 'উপনিষদ' ও 'আরণ্যক' রচিত হয়। এতে তদানীন্তন ধর্মজিজ্ঞাসা ও দর্শনতত্ত্বের যে পরিচয় মেলে তা মানবচিন্তার ইতিহাসে অনন্য হয়ে রয়েছে।

শ্রুতি ও
বেদাঙ্গ

উপরোক্ত রচনাগুলিকে "শ্রুতি" বলে পরিগণিত করে সবিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এদের মতো প্রামাণিক না হলেও সহায়করূপে রয়েছে "বেদাঙ্গ" বলে খ্যাত শিক্ষা (বেদের স্বরগ্রাম যাতে শুদ্ধ হয় সেজন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন), কল্প (অনুষ্ঠানপদ্ধতি), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বাক্য-বিন্যাস বিজ্ঞান), ছন্দ এবং জ্যোতিষ। কল্পবিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে

শ্রৌতসূত্র

রয়েছে শ্রৌতসূত্র যাতে যজ্ঞের রীতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গৃহ্যসূত্র

আরও রয়েছে গৃহ্যসূত্র, যা নিত্য কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করেছে, জন্মের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর পরে পর্যন্ত যে সমস্ত অনুষ্ঠান অবশ্যকরণীয়, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি সেখানে আছে।

গৃহ্যসূত্রের গুরুত্ব

এই গৃহ্যসূত্রের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে এই অনুষ্ঠানসমূহেই হিন্দুর একান্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাস হিন্দুর পক্ষে আবশ্যিক নয়; যে নিরীশ্বরবাদী, যে বৃক্ষপূজক, সে-ও নিজেকে হিন্দু বলতে পারে। কিন্তু হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূ্ক্ত হয়ে থাকতে হলে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য। গার্হস্থ্য শৃঙ্খলার নিয়ামক হল এই গৃহ্যসূত্র।

ধর্মশাস্ত্র

সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে ধর্মশাস্ত্রগুলির কথা, যেখানে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ প্রভৃতির নামে হিন্দুর সমাজবিধি নির্ধারিত হয়েছে।

শুল্বসূত্র

শ্রৌতসূত্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে শুল্বসূত্র যাতে যজ্ঞের বেদী, হোমাগ্নির আধার ইত্যাদির পরিমাপ সম্বন্ধে নির্দেশ আছে, ভারতবর্ষে জ্যামিতি সম্পর্কে যাকে আদি গ্রন্থ বলা চলে। এই উপলক্ষে

মনে রাখা উচিত যে বৈদিক যুগ যখন অনেকটা অগ্রসর তখন আয়ুর্বেদ, ধনুর্বিদ্যা, হস্তিশাস্ত্র, অশ্ববিদ্যা, সঙ্গীত, শিল্প ও নাট্যশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু রচনার সংবাদ মেলে। চিন্তা এবং কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানের যে অনুশীলন তখন ঘটে, তা খুবই উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগে অন্যান্য শাস্ত্র-কৃতি

বেদের ধর্ম

সংক্ষেপে বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা দুরূহ; তাই প্রধান কয়েকটি কথা মনে রাখার চেষ্টা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। প্রকৃতির বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রকাশকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করে বৈদিক আর্যেরা তাদের আরাধনা করত। মহাকাশের দেবতা দ্যৌঃ (গ্রীক দেবতা Zeus-এর অনুরূপ), ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বরুণ, মরুৎ বা বায়ু, বৃষ্টি ও বজ্রের নিয়ামক দেবরাজ ইন্দ্র, যম, অগ্নি, পৃথিবী, নাসত্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়), মিত্র (বা সূর্য, সবিতা, পূষন্, বিবস্বন্) প্রভৃতি দেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে ঋষিদের মনে উষার অপরূপ মহিমা যে রেখাপাত করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় অনবদ্য সুন্দর এক স্তবগানে। ধর্মচিন্তা যে উচ্চস্তরে উঠেছিল তার প্রমাণস্বরূপ জানা যায় যে যদিও দেবতার সংখ্যা হল প্রভূত, যদিও কবিরা অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন্ প্রভৃতির আবাহন করেছেন, যিনি জ্ঞানী তিনি সন্ধান পেয়েছেন বহু-র মধ্যে এক-এর, জেনেছেন পরমাত্মা বা ব্রহ্মণকে। যাই হোক, আর্যধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল যজ্ঞ-অনুষ্ঠান, প্রধান কর্তব্য ছিল শক্তিমান দেবতাদের তুষ্টিবিধানের জন্য স্তবপাঠ ও যজ্ঞক্রিয়া। আর্যেরা সরল বিশ্বাস নিয়ে দেবতাদের কাছে মনস্কামনা পূর্ণ করার প্রার্থনা জানাত, স্তবস্তুতি করত, কখনও এককভাবে কোন দেবতাকে, কখনও বা যুগ্ম কিংবা একত্রভাবে বহু দেবতাকে উদ্দেশ করত। বিশেষ বিধি অনুসারে বেদী নির্মিত হত; সমিধ দিয়ে সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হত; পুরোহিত সেই অগ্নিতে ঘৃত ইত্যাদি উৎসর্গ করে দেবতাদের আহ্বান জানাতেন; হোতা মন্ত্রোচ্চারণ করতেন, অধ্বর্যু দেখতেন যাতে যজ্ঞ-প্রণালী থেকে বিচ্যুতি না ঘটে, উদ্গাতা সামগান করতেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠান যাঁর পরিচালনায়, তাঁর আখ্যা ছিল ঋত্বিক; আর যাঁর কল্যাণ উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, তিনি হলেন যজমান। মাঝে মাঝে যজ্ঞে পশুবলিরও সংবাদ পাওয়া যায়; সম্ভবত যে অনার্যেরা পশুবলি দিয়ে পূজা করত তাদের

ঋগ্বেদের যুগের দেবতা

বহু-র মধ্যে এক-এর অনুভূতি

বৈদিক ধর্মের প্রধান অঙ্গ

যজ্ঞ

স্তবমন্ত্রের তাৎপর্য বিচার

প্রভাবে এ ব্যাপার ঘটেছিল। বৈদিক যজ্ঞক্রিয়া ও স্তবমন্ত্রে আছে একপ্রকার সারল্য ও সৌষ্ঠব, যা বাক্‌বাহুল্য ও পুনরুক্তি দোষকেও আচ্ছন্ন করে রাখে। সভ্যতার শৈশবে প্রকৃতির বিস্ময়কর রূপ দেখে মানুষের মনে যে কাব্যরস উদ্রিক্ত হয়ে থাকে, তার প্রসন্ন, নির্মল প্রকাশ এই মন্ত্রে রয়েছে। অজ্ঞানের তমিস্রা অতিক্রম করে সত্যের সন্ধানে মানুষের অনাবিল আবেগও সেখানে লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক যুগের শেষভাগে ধর্মের রূপান্তর

প্রধান দেবতা শিব ও বিষ্ণু

শক্তি-আরাধনার সূত্রপাত

আর্য-অনার্যধারার সংমিশ্রণ

বৈদিক যুগের শেষভাগে ধর্মক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। উপনিষদের ঋষিরা বেদের দেবতাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন নি ; তাঁদের চিন্তা উঠেছিল অন্য স্তরে। সিন্ধু সভ্যতার যুগে উপাস্য বলে অনুমিত দেবতা পশুপতিকে (শিব) বহুজন অর্চনা করতে লাগল, রুদ্র নামে বেদেও এঁর অল্প একটু স্থান পূর্বে ছিল। বরুণের স্থলে এলেন বিষ্ণু, যাঁর "পরমম্ পদম্" ছিল ঋষি ও সূরীদের লক্ষ্য, কিন্তু যাঁর আরাধনা পূর্বে প্রচলিত হয় নি। কিছুকাল পরে বাসুদেব, কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু যে এক তা বলা হল। হয়তো বৃষ্টির জন্য কোথাও ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে থাকল ; কিন্তু ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি প্রভৃতির পূজা ক্রমশ স্তিমিত ও স্তব্ধ হয়ে গেল। সিন্ধু সভ্যতার মাতৃপূজার অনুরূপ শক্তি-আরাধনার প্রারম্ভও ক্রমে লক্ষ্য করা গেল। আর্য অনার্য ধারার সংমিশ্রণ ধর্মক্ষেত্রেও দেখা দিয়ে এদেশের সুপ্রাচীন পরম্পরাকেই যেন তুলে ধরল। বর্তমান হিন্দুধর্ম ও আচারে তাই বৈদিক মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের রেশ যেমন দেখা যায়, তেমনই পূজাপদ্ধতি, প্রকরণ ও রীতিনীতিতে বহু অনার্য ধারার অস্তিত্ব বেশ স্পষ্ট।

বৈদিক যুগের অর্থনীতি

কৃষিপ্রধান সমাজ

গো-নির্দিষ্ট সম্পদ

ঋগ্বেদ থেকেই জানা যায় যে আর্যেরা ক্রমশ ভ্রাম্যমাণ ও পশুচারণের উপর নির্ভরশীল অবস্থা থেকে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করে কৃষিপ্রধান সমাজ গঠন করছে। প্রথম দিকে গো-পালন ছিল তাদের মুখ্য বৃত্তি ; সম্পত্তির পরিমাপ স্থির হত গরুর সংখ্যা দেখে। উত্তর ভারতের নদীমাতৃক সমভূমি অধিকার করে কৃষিকর্মের দিকে স্বভাবতই তাদের মন যায়। এই কৃষির উল্লেখ ঋগ্বেদে বহুবার পাওয়া যায় ; ছয়টি বলদ মিলে লাঙল টানছে এমন কথাও আছে। কূপ খনন ইত্যাদি জলসেচের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সংবাদ মেলে।

কৃষিপ্রধান সমাজের প্রয়োজন মিটাবার জন্য কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর চর্মকার প্রভৃতি বৃত্তি প্রচলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ ছাড়া বৈদিক সাহিত্যে তন্তুবায়, স্বর্ণকার, রথনির্মাতা ও অন্যান্য শ্রমজীবীর উল্লেখ রয়েছে। কাপড় বোনা, রঙ করা এবং তার উপর নকশা বসিয়ে দেওয়া আর্যদের জানা ছিল। সম্ভবত প্রথম দিকে ভূমিতে কারও ব্যক্তিগত স্বত্ব ছিল না, পরিবার এবং পল্লীস্থ সকলেরই অধিকার সাব্যস্ত ছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর পল্লীসমাজ বৈদিক যুগে লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যবস্থা আর্যদের বিশিষ্ট অবদান কি না, তা জোর করে বলা শক্ত। মহেঞ্জোদড়ো, হড়প্পা, লোথাল প্রভৃতি শহর চতুর্দিকে কৃষিকর্ম ও তদনুযায়ী গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নিশ্চয়ই নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু তদানীন্তন গ্রাম্য জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। এদেশের পল্লীসমাজ যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত টিকে থেকেছে তার প্রারম্ভ বৈদিক যুগে ঘটেছিল মনে করা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু পূর্বতন কালেই তার সূচনা হয়েছিল মনে করাও যুক্তিযুক্ত। যাই হোক, এই পল্লীসমাজই যুগে যুগে ভারতবর্ষের জীবনে যেন মেরুদণ্ডের মতো দেখা দিয়েছে ; এরই ভিত্তিতে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছে। ইংরাজ শাসককেও একে রাজস্ব-ব্যবস্থার বনিয়াদ হিসাবে নিতে হয়েছিল।

নানা বৃত্তির উদ্ভব

ভূমি-স্বত্ব

স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভর পল্লীসমাজ

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে অর্থের প্রচলন ছিল না মনে হয়। বিনিময় ব্যবস্থাই তখন ছিল। গরুর সংখ্যা দিয়ে ক্রমে দ্রব্যমূল্য স্থিরীকৃত হতে লাগল, আর তার পর অনিবার্যরূপে অর্থের প্রচলন দেখা দিল। 'বণিক' শব্দের উল্লেখ দেখে মনে হয় যে বৈদিক যুগে বাণিজ্যের স্থান যে ছিল না, তা নয়। অর্থনৈতিক জটিলতা যে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা নিঃসন্দেহ। গ্রামাঞ্চলে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার যে ধীরে ধীরে স্বীকৃত হয়েছিল তা দেখা যায় ; ধনীর অভ্যুদয় সম্বন্ধে বেদে যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। গো-ধন একদা বিনিময়ের মাধ্যম ছিল ; ক্রমশ মুদ্রার প্রচলনও হয়তো আরম্ভ হয়। 'নিষ্ক' নামে স্বর্ণখণ্ডের উল্লেখ থেকে তাই অনুমান হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ছিল অবশ্যম্ভাবী। পর্বতবাসী কিরাতদের কাছে ওষধির বিনিময়ে বস্ত্র, চর্ম ইত্যাদি বিক্রয় করা হত। সমুদ্রের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের পরিচয় ছিল কি না, এই নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। সম্ভবত প্রথম দিকে পরিচয় ছিল না, কিন্তু পরবর্তী যুগে অপার সমুদ্রের উল্লেখ দেখা যায়। বরুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে আকাশে পাখির পথ যেমন

বৈদিক যুগে অর্থনৈতিক পরিবর্তন

ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার ও মুদ্রার প্রচলন

সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয়

তিনি জানেন তেমনই জানেন গভীর সমুদ্রে অর্ণবপোতের গতি। এক স্থানে আছে যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমুদ্রে নিমজ্জমান রাজপুত্রকে "একশো দাঁড়ের নৌকা" নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। "শতপথ ব্রাহ্মণে" মহাপ্লাবনের যে কাহিনী আছে, তা থেকে মনে হয় যে সম্ভবত পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বৈদিক আর্যদের যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠীদেরও সাক্ষাৎ মেলে। আর যদিও পল্লীজীবন ছিল তখনকার রীতি, নাগরিক ব্যবস্থার কিছু কিছু সংকেত বৈদিক যুগের পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ

বৈদিক যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র

সমাজে নারীর মর্যাদা

আর্যেরা যখন এদেশে বিস্তৃত হয়ে বসবাস স্থাপনে ব্যস্ত তখন স্ত্রীপুরুষ সকলকেই সর্বদা অনেক কাজে লেগে থাকতে হত। তাই যদিও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের মতো বৈদিক আর্য পরিবার গৃহপতি অর্থাৎ সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষের নিয়ন্ত্রণে চলত, মেয়েরা অন্তঃপুরে থেকেও পর্দার আড়ালে বাস করতেন না, সমাজের নানা কাজে লিপ্ত থাকতেন। সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী তাঁরা ছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে বহির্জীবনেও যথেষ্ট স্বাধীনতা তাঁদের ছিল। পিতৃগৃহে শিক্ষার সুযোগ থেকে মেয়েদের বঞ্চিত রাখা হত না ; বিবাহের পর তাঁরা হতেন স্বামীর সহধর্মিণী, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে স্বামীর সহযোগিনী। শাস্ত্রচর্চায় বৈদিক যুগের নারীর অবদান স্বল্প নয় ; ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি মন্ত্র রচনা পর্যন্ত করেছিলেন। বৈদিক যুগের পরবর্তী অধ্যায়ে মেয়েদের অধিকার কিঞ্চিৎ সংকুচিত হয়েছিল ; বহুবিবাহ বোধ হয় তখন প্রচলিত হতে আরম্ভ হয়েছে, মেয়েরা রাজার সভায় যেতে পারতেন না। পুত্রের তুলনায় কন্যা যে দুঃখের কারণ, এমন কথাও শোনা গেছে। কিন্তু তখনও গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মতো মনস্বিনীর সাক্ষাৎ মেলে ; ব্রহ্মবাদিনী বলে যাঁরা বৈদিক সাহিত্যে কীর্তিত, তাঁদের তখনও দেখা গেছে। মোটের উপর বৈদিক সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল প্রভূত। গৃহকর্ম, বিদ্যালোচনা ভিন্ন শরীর চর্চার দিকেও তাঁদের লক্ষ্য ছিল, নৃত্য ও অস্ত্র ব্যবহারে তাঁরা অনেকেই ছিলেন পারদর্শী। বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল ; পুরুষ ও নারী সাধারণত পরস্পরকে মনোনীত করার পর বিবাহ হত, কন্যাপণ দিত পুরুষ। বিবাহে অনিচ্ছুক দুহিতা পিতৃগৃহে থেকে জ্ঞানচর্চা করেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। আচার্যা, আচার্যানী—এই দুই

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে নারীর অধিকার সংকোচ

নারীজীবনের সাধারণ চিত্র

শব্দ থেকে বুঝা যায় যে নারীরাও আচার্যপদে অধিষ্ঠিতা হতেন। সম্পত্তিতে, যজ্ঞানুষ্ঠানে, স্বামী নির্বাচনে অধিকার থাকায় নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত। পরবর্তীকালে সমাজে পুরুষপ্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নারীর পূর্বতন মর্যাদা খর্ব হতে থাকে। কিন্তু মোটের উপর বৈদিক যুগে নারীজীবন যে বিড়ম্বনামুক্ত ছিল তা নিঃসন্দেহ।

পরিবার ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র

সমাজ ও রাষ্ট্র পারিবারিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কয়েকটি গৃহপতি-শাসিত পরিবারকে নিয়ে গঠিত হত গ্রাম; গ্রামের প্রধান ব্যক্তির আখ্যা ছিল 'গ্রামণী'। কয়েকটি গ্রাম একত্রিত হয়ে 'বিশ' বা 'জন' সংগঠিত হত; 'বিশপতি' বা 'রাজন্'-এর হাতে তার কর্তৃত্বভার ন্যস্ত। পরিবারে যেমন সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন কর্তা, তেমনই 'বিশ'-এর অধিপতি হলেন রাজা। অবশ্য বৈদিক যুগ যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন রাজার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। পুরোহিত, সেনানী, গ্রামণী প্রভৃতি পদস্থ নেতা এবং প্রবীণ নায়কদের উপদেশে রাজ্য শাসন চলত; রাজা শপথ নিতেন সুচারু-ভাবে রাজ্য শাসন করবেন বলে। এ ছাড়া উল্লেখ দেখা যায় 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুই প্রতিষ্ঠানের। সঠিকভাবে এদের সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, কিন্তু মনে হয় যে সমিতিতে সকলে উপস্থিত হতেন, আর সভায় সম্ভবত বর্ষীয়ান বা অর্থবান ব্যক্তিদেরই সমাগম হত (মেয়েদের এই সভায় যোগদান পরে নিষিদ্ধ হয়েছিল)। ইক্ষ্বাকু, সুদাস প্রভৃতি খ্যাতনামা রাজার নাম বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়; দশ রাজার যে যুদ্ধের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তার পর থেকে "বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা," এই ধারণা বিস্তৃত হতে থাকে, যে রাজশক্তির পরিধি পূর্বে ছিল সংকীর্ণ, তার ব্যাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই বৈদিক যুগের শেষভাগে রাজশক্তির বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়; পূর্বে হয়তো রাজবংশের কোন একজনকে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল, এখন পুরুষানুক্রমিক রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। পূর্বে কোথাও কোথাও গণতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া গেছে; এখন তা হল বিরল। জনপদ সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একজন রাজা অন্য রাজগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে আগ্রহান্বিত হওয়ায় দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেল। অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞের প্রচলন থেকে জানা যায় যে বহু বিস্তৃত রাজ্যে স্বরাট, বিরাট, ভোজ, সম্রাট ইত্যাদি উপাধি গ্রহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাজাদের প্ররোচিত করছে। 'সম্রাট' শব্দটি ব্যবহৃত হত পূর্ব ভারতে বেশী—কেউ কেউ বলেন যে সেখান থেকেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য-

রাষ্ট্রের সংগঠন: গ্রামণী, বিশ, বিশপতি বা রাজন্

রাজার ক্ষমতা

সভা ও সমিতি

রাজার ক্ষমতার প্রসার

গণতন্ত্র

রাজাদের মধ্যে সার্বভৌমত্ব-লাভের প্রয়াস

বেদোক্ত বিভিন্ন রাজপুরুষ

বাদের পত্তন ঘটেছে। পুরোহিত, সেনানী, গ্রামণী ভিন্ন সংগ্রহিতৃ (কোষাধ্যক্ষ), ভাগদুঘ (করসংগ্রাহক), সূত (রাজ-রথচালক), ক্ষত্রি (প্রকোষ্ঠ রক্ষার), অক্ষাবাপ (অক্ষক্রীড়ানিয়ামক), শতপতি (শতগ্রামের শাসক), অধ্যক্ষ (বিচারপতি) ইত্যাদি রাজপুরুষের নাম দেখা যায়; "সচিব" শব্দের প্রয়োগও উল্লেখযোগ্য। পূর্বে রাজা অত্যাচারী বলে প্রজারা তাঁকে পদচ্যুত করেছে এমন উদাহরণ পাওয়া গেছে। পরবর্তী যুগে সম্ভবত রাজশক্তিকে তেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু মনে হয় যে বৈদিক যুগে কখনও স্বৈরশাসন বা রাজার যথেচ্ছ অপকর্মের বিশেষ সুযোগ ঘটে নি। অভিষেককালে রাজার শপথ গ্রহণ, সভা ও সমিতিতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপস্থিতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা, পাপকর্মের পরিণাম সম্বন্ধে রাজার আশঙ্কা, বহুকাল ধরে স্বাধীন পরিবেশে বাস করার ফলে জনসাধারণের মনোবৃত্তি—সব মিলে যেন রাজশক্তিকে অনেকটা রাশ টেনে রাখতে পেরেছিল।

তৎকালীন রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিভেদের সূত্রপাত

সন্দেহ নেই যে বৈদিক আর্যেরাই ভারতবর্ষে বর্ণ সম্বন্ধে একপ্রকার বিশিষ্ট চেতনা এনেছিল; গৌরবর্ণ মানুষ যে শ্রেষ্ঠ, এই ধারণার বীজ তখন থেকে এদেশে বপন করা হয়েছে। বেদজ্ঞ ঋষিরা যা শ্রবণ করে (শ্রুতি) মন্ত্রের আকারে প্রচার করেছেন, তাই যে একমাত্র সত্য, আর যজ্ঞপ্রক্রিয়া ও ইন্দ্রজালের সাহায্যে আর্যেরাই যে শত্রুদমনে ও লক্ষ্যসাধনে সমর্থ, এ বিশ্বাস তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল। বর্ণ সম্বন্ধে চেতনা এবং অপরের কাছে যা গূহ্য, এমন জ্ঞানের অধিকার—এই দুই বস্তু মিলে আর্যে ও অনার্যে, দ্বিজ ও অ-দ্বিজে অনতিক্রম্য প্রভেদ আমাদের ইতিহাসে তাই দেখা দিল। গূঢ়ার্থবোধক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপনয়ন হবে, নবজন্ম নিয়ে দ্বিজ উপবীত গ্রহণ করবে, বেদচর্চা করবে, যজ্ঞের অধিকারী হবে—এই হল জাতিভেদের সূচনা, চাতুর্বর্ণ্যের প্রারম্ভ হল এখানে, আর বিবিধ ধর্মশাস্ত্রে এর ব্যাপক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু এদেশের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে আর্য আচারবিধির সহস্র আঘাত যে বিকল করে দিতে পারে নি, তার পরিচয় আমরা এর পরে বর্ণাশ্রম সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে কতকটা পাওয়ার চেষ্টা করব।

বৈদিক সমাজের লক্ষণ : সামগ্রিক কল্যাণ

সংক্ষেপে এখানে শুধু এই কথা বলা দরকার যে বৈদিক যুগে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে সমষ্টিগত জীবন সম্পর্কে সমাজের আগ্রহ ছিল বেশী, সামগ্রিক কল্যাণ সম্বন্ধে গুরুত্ববোধ ছিল বলে সম্পত্তি চেতনা প্রবল ছিল

না, কয়েকটি বিশ্বাস ও আচার সমাজকে গ্রথিত করে রেখেছিল, পরম্পরা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ছিল, চিন্তার মধ্যে শিশুর সারল্য ও মনীষীর গভীরতা তখন আমরা লক্ষ্য করি। বিধিনিষেধ যে কঠোর ছিল তা মনে হয় না; পুরুষপ্রধান, পিতৃশাসিত সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত ছিল। জীবনকে উপভোগ করার প্রবৃত্তিকে দমন করতে তখনকার আর্যেরা ব্যস্ত ছিল না; যজ্ঞে অশঙ্ক চিত্তে সমস্ত কামনা প্রকাশ করতে তারা সংকোচ বোধ করে নি। নাচ, গান, শিকার, রথ নিয়ে পাল্লা দিয়ে দৌড়, পাশা খেলা ইত্যাদি নিয়ে তারা মেতে থাকত। বাজি রেখে পাশা খেলতে গিয়ে দুর্গতি সম্বন্ধে বেশ মজার গল্প বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে। খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে তাদের ঔদাসিন্য ছিল না; পরবর্তী যুগে নিরামিষ ভোজন প্রচলিত হলেও প্রথম দিকে আমিষ সম্বন্ধে কোন বিরাগ তাদের ছিল না, গোমাংসেও অরুচি দেখা দেয় নি। সোমরস ও সুরাপান নিন্দনীয় ছিল না; বিশেষত সোমরস পান তো যজ্ঞানুষ্ঠানেরই অঙ্গস্বরূপ বলে পরিগণিত হত। বেশভূষায়, স্বর্ণালঙ্কার ও পুষ্পভূষণ ব্যবহারে আর্য নারীরা পশ্চাৎপদ থাকতেন না। সমাজব্যবস্থা ক্রমশ জটিল হতে থাকে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে—বাস্তব পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়, সমাজে তার প্রতিফলন পড়ে। বৈদিক যুগ এই যে এই বিধির ব্যতিক্রম, তা নয়। কিন্তু বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের জীবনপ্রভাতের যে স্বচ্ছ, সুস্থ, সৌষ্ঠবময় আলেখ্য আমরা দেখি, তা নিয়ে গর্ব করার উপাদান আছে প্রভূত।

সমাজবন্ধন

সমাজের স্বচ্ছ, সুস্থ ও প্রাণোচ্ছল চিত্র

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

আর্য সভ্যতার বিবর্তন ঃ মহাবীর ও বুদ্ধ

প্রাচীন আর্যসমাজে বর্ণবিভাগ ও জাতিভেদ

সনাতন হিন্দুসমাজ ও তাহার স্থায়িত্বের কারণ :

হিন্দু সমাজব্যবস্থা যে নিজেকে সনাতন বলে বর্ণনা করার স্পর্ধা বোধ করেছে, তার কারণ হল এই যে সুদূর অতীত হতে তার এক নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা আছে। এই পরম্পরা এমনই সুদীর্ঘ যে তাকে শাশ্বত বলে একটা ধারণা সৃষ্টি খুব বেশী অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আর এই স্থায়িত্বের কারণ খুঁজতে গেলে মনে হয় যে সম্ভবত আর্য সভ্যতার বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির মধ্যেই তা রয়েছে। বর্ণ সম্বন্ধে একান্ত চেতনা এবং নিজেদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অনমনীয় অহঙ্কার সত্ত্বেও এ দেশেরই প্রচলিত

আর্য-অনার্য-ধারার সমন্বয় ও সহ-অবস্থিতি

অনার্য ধারার সঙ্গে আর্য ধারার পূর্ণ সংমিশ্রণ না হলেও একপ্রকার সমন্বয় ঘটেছিল, স্বাতন্ত্র্য এবং মিলন উভয়েরই সাক্ষাৎ তাই মেলে। হিন্দু সমাজের প্রসারিত আয়তনে তাই বহু বিভিন্ন ও বিপরীত উপাদানের সহ-অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক যুগ থেকেই এদেশের ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্ত'-বর্ণিত 'বর্ণের' উৎপত্তি

বৈদিক সমাজে বিভিন্ন কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল বর্ণ ও সাজাত্যের (বা আত্মীয়তা) ভিত্তির উপর। প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে প্রথম এই বর্ণভেদ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়; সেখানে বলা হয়েছে যে প্রথম পুরুষকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল—মুখ থেকে নিঃসৃত হল ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে রাজন্য (বা ক্ষত্রিয়), উরু থেকে বৈশ্য, এবং পা থেকে শূদ্র। তখনও একে ঠিক জাতিভেদ

জাতিভেদের অবিদ্যমানতা

বলা চলত না; তখনও এ বিষয়ে কোন রীতি কঠোরভাবে মেনে চলা হত না। শূদ্রের স্পর্শে যে খাদ্যবস্তু অপবিত্র হয়ে যায়, এ ধারণা তখন দেখা দেয় নি। বিবাহ ব্যাপারে জাতির ভিত্তিতে বিধিনিষেধের প্রচলন

বৃত্তি গ্রহণের অবাধ অধিকার

তখনও ঘটে নি। বৃত্তির দিক থেকেও কোন বাঁধা নিয়ম দেখা দেয় নি; একটি মন্ত্রে আছে—"আমি কবি, আমার বাপ চিকিৎসক, আর আমার মা গম ভাঙেন, আমাদের মতামত আলাদা, আর আমরা গরুদেরই মতো

দৌড়ে যাই, কিছু লাভের লোভে।" বৃত্তি, বিবাহ, আত্মীয়তাস্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে নিয়মের কড়াকড়ি ঘটার কারণ সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে আর্যদের আগমনের অনেক আগে থেকে এদেশের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে অপরিচিতদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক এবং আহারাদি না করার যে রেওয়াজ ছিল, তারই সঙ্গে বর্ণ এবং জাতিগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে আর্যদের ধারণা মিশে গিয়ে জাতিভেদ প্রথা বেশ কঠোর হয়ে উঠল। জাতিভেদ প্রথার অনুমিত কারণ

মনে করে রাখা উচিত যে বর্ণভেদ সম্বন্ধে আর্যেরা খুবই সচেতন থাকলেও আর্য সভ্যতাকে গৌরাঙ্গ বর্ণশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় নি। স্বয়ং বাদরায়ণ বেদব্যাস (যিনি বেদকে সুবিন্যস্ত করেছিলেন বলে খ্যাত) ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ; আর্য ঋষির ঔরসে এক জেলেনীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। যারা দ্বিজ নয়, তারা অপকৃষ্ট, একথা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় যে রাজা সুদাস অনার্য মিত্রদের সহায়তা নিতে সংকুচিত নন। অনার্যদের সঙ্গে রাজা ও ঋষিদের বিবাহ সংবাদ একেবারেই বিরল নয়। জাতিভেদ প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই আর্য ও অনার্য রক্তের সংমিশ্রণ যে প্রভূত পরিমাণে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে বলানো হয়েছে : "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"—বর্ণের কথা এখানে নেই, আছে গুণ ও কর্মের কথা। বহু বিচিত্র উপাদান একত্রিত হয়ে জাতিভেদ গঠিত হয়ে উঠছিল; যুগে যুগে বহু পরিবর্তন এই প্রথার মধ্যে ঘটে এসেছে। পরিবর্তনের পথ খুলে রেখে, বিভিন্ন ধারার মধ্যে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনার দিকে নজর রাখা হয়েছিল বলে জাতিভেদ প্রথা এত দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছে।

বাস্তবক্ষেত্রে বর্ণগত বাধার অপহ্নব :

অনার্যদের সঙ্গে রাজা সুদাসের মিত্রতা

আর্য-অনার্য-বিবাহ-সংযোগ

গীতায় বর্ণের অনুল্লেখ

জাতিভেদের স্থায়িত্বের কারণ

বংশানুক্রমিক হয়ে যখন জাতিভেদ প্রথম স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল, তখন বলা হত যে ব্রাহ্মণের কর্তব্য হল যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপন; ক্ষত্রিয় হল যোদ্ধা, সমাজের রক্ষক; বৈশ্য বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত; আর শূদ্র হল মেহনতী মানুষ, জমি চাষ করা ইত্যাদি কাজের ভার হল তার। এই চার বর্ণের বাইরে ছিল যারা 'অবর্ণ' বা 'পঞ্চম'—এরা সমাজবহির্ভূত, নোংরা কাজের ভার চাপিয়ে তাদেরও নোংরা বলে অবজ্ঞা করা হত। জাতিভেদের প্রথম রূপ

অবশ্য চার ভাগে ভাগ করলেই যে কাজের ক্ষেত্রে সেই ভাবে সমাজ চলত, তা বলা যায় না। সামবেদে আছে যে যারা ব্রাত্য, যারা আর্য নয়, তাদেরও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া চলবে। জনক আর বিশ্বামিত্রের

সমাজে বর্ণ-বিভাগের রীতির ব্যত্যয়

রাজর্ষি জনক ও বিশ্বামিত্র

কথা স্মরণীয়। জনক ছিলেন বিদেহের রাজা, জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু রাজর্ষি বলে ব্রাহ্মণেরাও তাঁর পাদপ্রান্তে বসে শিক্ষা নিয়েছে। বিশ্বামিত্র এক অপূর্ব চরিত্র; ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মেছিলেন এই ঋষি, বৈদিক মন্ত্র ইনি রচনা করেছেন। পুরোহিতকুলের প্রাধান্য এবং জাতিভেদের কঠোরতাকে অগ্রাহ্য করে যজ্ঞ করেছেন যারা 'অবর্ণ' তাদের কল্যাণার্থে।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ

পরবর্তী বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহু পরিচয় রয়েছে। যারা যোদ্ধা (তাদের মধ্যে অনেকেই অনার্য) তারা বহুদিন ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতে থাকে। সম্ভবত পরে কোন এক সময় প্রাচীন গ্রন্থ নূতন করে লিখে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা প্রচারিত হয়েছিল। ভৃগুবংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করে অধ্যাপক সুখ্‌তঙ্কর দেখিয়েছেন যে খুব সম্ভব ক্ষত্রিয় বীর্যের এক কাহিনীকে ব্রাহ্মণের উৎকর্ষের প্রমাণমূলক এক বিবরণে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যাই হোক, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে বারবার ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা রয়েছে; যখন রামায়ণ-মহাভারত এই দুই মহাকাব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, তখন থেকে অবশ্য ব্রাহ্মণকেই ক্ষত্রিয়ের উপরে স্থান দিয়ে জনমানসে সেই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। স্থির, অচঞ্চল, সনাতন কোন ব্যবস্থা যে ছিল না, থাকতে পারে না, তারই প্রমাণ এ থেকে মিলছে।

আর্যেতর সমাজে জাতিভেদের পত্তন : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

আর্য গণ্ডীর বহির্ভূত যারা, তাদেরও জাতিভেদের কাঠামোয় স্থান করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে বর্ণাশ্রম সমাজের স্থায়িত্ব সাধন সম্ভব হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। বহু পরবর্তী যুগে দেখি যে সমুদ্র পার হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যখন হিন্দু সংস্কৃতি উপস্থিত হল, তখন সেখানকার রাজারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে বর্মণ উপাধি নিল, ক্ষত্রিয় সমাজে স্থান পেল।

বলিদ্বীপ

আজও বলিদ্বীপে চাতুর্বর্ণ্যের অস্তিত্ব রয়েছে। ভারতবর্ষেরই দক্ষিণ অঞ্চলে অনুরূপ ঘটনা দেখা গেছে;

মালাবার

মালাবার এলাকায় মাতৃশাসিত (matriarchal) যে সমাজে আর্যত্বের কণামাত্র দাবি করত না, তারই কর্তৃপক্ষীয়দের ক্ষত্রিয় বলে বরণ করা হল।

এই উপলক্ষে পাণিক্কর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে কয়েকটি শক্তিশালী গোষ্ঠীকে কিছুতেই

চাতুর্বর্ণ্যের ব্যতিক্রম

জাতিব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। আন্ধ্রদেশের 'রেড্ডি', কেরালার 'নায়ার', তামিলনাদের 'মারাভা' আর দাক্ষিণাত্যের 'মারাঠা'—এরা হিন্দু-ধর্মকে মেনে নিলেও চাতুর্বর্ণ্যের পরিধিতে স্থান নিতে অস্বীকৃত হয়েছিল

(মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে 'মারাঠা' বললে অপমান করা হয়)। এরা কেউই দ্বিজ নয় কিন্তু মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণকে মানলেও অন্য কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এরা মানে নি। কিন্তু নিজের নিজের এলাকায় এদের প্রভূত প্রভাব ও প্রতিপত্তিছিল। জাতিভেদ প্রথার যে মূল তত্ত্ব, তার প্রয়োগে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন অঞ্চলে কত প্রভেদ ও বৈচিত্র্য দেখা গেছে, তাই এখানে আমরা স্মরণ করব।

বর্ণাশ্রম

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন জাতি হল উপনয়নের অধিকারী, উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় জন্ম ঘটছে কল্পনা করে তাদের আখ্যা হল 'দ্বিজ'। এই তিন জাতির সকলের জীবনকে 'চতুরাশ্রমে' বিভক্ত করা হত। অল্প বয়সে উপনয়নের পর 'ব্রহ্মচারী' জীবন যাপন করা ছিল কর্তব্য ; তখন গুরুগৃহে বাস, অধ্যয়ন, গুরুসেবা, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশ মানতে হত। দ্বিতীয় আশ্রম হল 'গার্হস্থ্য'—তখন বিবাহ করে গৃহস্থের জীবন যাপন ও সাংসারিক দায়িত্ব পালন হল কর্তব্য। জীবনের তৃতীয় স্তরে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে অরণ্যে গিয়ে 'বানপ্রস্থ' অবলম্বন, এবং চতুর্থ ও শেষ স্তরে 'সন্ন্যাসী' বা 'যতি' হয়ে একেবারে সংসার ত্যাগ করে মোক্ষ-লাভের প্রযত্ন সকল দ্বিজের করণীয়। বলা বাহুল্য যে সকলের ক্ষেত্রে এই চতুরাশ্রমের নীতি পালিত হত না ; কিন্তু তখনকার কর্মবিভাগ ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে কিছু ধারণা এ থেকে আমরা পাই। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য যে বৈদিক সাহিত্যে চতুরাশ্রম নিয়ে কৌতুক করারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্র শিক্ষা বিষয়ে বলা হয়েছে—"আচার্য শাস্ত্র পাঠ করছেন আর শিষ্যেরা তার পুনরাবৃত্তি করছে, ঠিক যেন একের পর এক ব্যাঙ ডেকে যাচ্ছে !"

ব্রহ্মচর্য

গার্হস্থ্য

বানপ্রস্থ

যতি

চতুরাশ্রম নীতির শিথিলতা

মহাকাব্যের যুগ : রামায়ণ ও মহাভারত

বৈদিক যুগের শেষ পর্বে রচিত হয়েছিল রামায়ণ-মহাভারত এই দুই মহাকাব্য। গাথা আর আখ্যান আছে বৈদিক সাহিত্যে ; সেখানে দেখা যায় যে ক্ষত্রিয় 'বীণা-গাথিন্' সঙ্গীত সহযোগে যজমান বীরের বিজয়-কাহিনী শোনাচ্ছে, ইক্ষ্বাকু রাজা হরিশচন্দ্রের কীর্তিকথা রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানেরই অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে, পরিক্ষিৎ ও জনমেজয়ের মতো কুরু

মহাকাব্যদ্বয়ের মূল উৎস

ব্যাস ও বাল্মীকি, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রথম উল্লেখ

রাজের কথা বর্ণিত হচ্ছে। বাল্মীকি ও ব্যাসের নামোল্লেখ পরবর্তী বৈদিক রচনায় রয়েছে। কিন্তু রামায়ণ-কাব্য সম্বন্ধে প্রথম স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকের বিবিধ বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে। মহাভারতের উল্লেখ আরও আগে পাওয়া যায়—অশ্বলায়ন-কৃত গৃহ্যসূত্রে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে। কিন্তু গুপ্তযুগের পূর্বে, অর্থাৎ চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে এই দুই মহাকাব্য পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি। রামায়ণ সম্বন্ধে

মূল রামায়ন ও মহাভারত

প্রথম উল্লেখে দেখা যায় যে তার দৈর্ঘ্য হল ১২,০০০ শ্লোক, অথচ যে সংস্করণ আমরা জানি তাতে আছে প্রায় ২৫,০০০ শ্লোক। তেমনই যে মহাভারতে আছে লক্ষাধিক শ্লোক পাণিনির সময় তাতে পঁচিশ হাজারের বেশী শ্লোক ছিল না বলেই জানা ছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে উভয় মহাকাব্যেই বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সম্মার্জন হয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারতের পূর্বাপরতা

ষষ্ঠ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সুদূর কম্বোজ দেশ পর্যন্ত রামায়ণ-মহাভারতের বিপুল খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল। মহাভারতের যে সংস্করণ আমরা পেয়েছি, তাতে রামায়ণের নামোল্লেখ আছে ; জনমানসেও রামায়ণ হল মহাভারতের পূর্ববর্তী। কিন্তু রচনারীতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে উভয় কাব্যে অনেক পরিবর্তন প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, এবং কোন্ লেখা যে কখনকার, তা জোর করে বলা শক্ত।

রামায়ণে অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে আর্য-সভ্যতার বিস্তার

রামায়ণ কাহিনীর প্রারম্ভে দেখা যায় যে তদানীন্তন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা। অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে আর্য সভ্যতার বিস্তার বৃত্তান্ত যেন এই কাব্যে রয়েছে। পরিচিত দেশ অতিক্রম করে রামচন্দ্র যেখানে উপস্থিত হলেন সেখানে আর্য ঋষিরা কোন কোন স্থানে বহু বিপদের মধ্যে তপশ্চর্যা করছেন, নিবিড় অরণ্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কিষ্কিন্ধ্যায় (মহীশূরের বেলারী এলাকা) উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাম কোথাও প্রকৃত বসতি ও সংগঠিত সমাজ-জীবন লক্ষ্য করেন নি। এর

মহাভারতে গোটা ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার ব্যাপ্তি

তুলনায় মহাভারত থেকে আমরা যেন পাই গোটা ভারতবর্ষের ছবি ; হিমালয় থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের কথা সেখানে রয়েছে এবং সর্বত্রই সমাজ যেন সুগঠিত। পশ্চিমের একান্তে অবস্থিত দ্বারকা নগরী হল কৃষ্ণের রাজধানী ; অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুন গেলেন একেবারে দেশের পূর্ব প্রান্তে, চিত্রাঙ্গদার দেশ মণিপুরে। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান বর্ণনা উপলক্ষে হিমালয়ের উত্তর ভাগের উল্লেখ রয়েছে ; মানস সরোবর ও কৈলাস তখন সুপরিচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের রাজগণ যোগ

দিয়েছেন। হয়তো বললে ভুল হবে না যে রামায়ণের যুগে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা কল্পনাবহির্ভূত ছিল, কিন্তু মহাভারতে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে—অসমুদ্রহিমাচল এই দেশের সমগ্রতা যেন ঐ মহাকাব্যে রূপায়িত হয়েছে। "যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে", এই প্রবাদবাক্যের মধ্যে দেশ ও কাব্যের অঙ্গাঙ্গিত্ব যেন আজও স্বীকৃত হয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক-দেশবোধ

মহাকাব্যের যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

মহাভারত ও রামায়ণে যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে বৈদিক যুগে যে সামাজিক রীতিনীতি ছিল তা আরও স্থিতিশীল হয়েছে, পূর্বের তুলনায় সমাজের বিধিনিষেধ আরও নির্দিষ্ট হয়েছে, রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় হয়েছে। এই সম্বন্ধে পাণিকর কয়েকটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রামায়ণে আছে যে এক শূদ্র তপশ্চর্যা করে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিচারে অপরাধী বলে রামচন্দ্র অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাকে হত্যা করে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালন করেছিলেন। তখনও সম্ভবত আর্য চেতনায় শূদ্রের এবংবিধ স্পর্ধা একেবারে অসহনীয় মনে হয়েছিল। মহাভারতে কিন্তু ছবি যেন একেবারে পালটে যায়। দাসীপুত্র বিদুর হলেন কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বন্ধু; ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই যে প্রকৃতপক্ষে ধীবরীর সন্তান বেদব্যাসের পুত্র, প্রকাশ্য সভায় একথা জানাতে কৃষ্ণ পরাঙ্মুখ হন নি; পাণ্ডবদের মাতুল মদ্ররাজ শল্য যে অনার্য, তা কর্ণ অসংকোচে ঘোষণা করলেন; পাণ্ডবদের ঔরসে আদিবাসী নারীর গর্ভজাত সন্তান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিচ্ছেন। জাতিভেদ প্রথা যে তখন একেবারে স্থিরীকৃত নয়, তার বহু প্রমাণ রয়েছে। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীর যোদ্ধা হলেন ব্রাহ্মণ; কুম্ভকারের গৃহে ব্রাহ্মণ বাস করছে; ক্ষত্রিয় রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থনা করছেন অধম জাতীয় যোদ্ধারা।

সামাজিক রীতি-নীতির স্থিতিশীলতা

রাজশক্তির দৃঢ়তা

রামায়ণে বর্ণাশ্রমের কঠোরতা

মহাভারতে সামাজিক রীতিনীতির আপেক্ষিক নমনীয়তা

রামায়ণ-কাহিনীর যুগ এবং কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধকালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষীয় সমাজ ও সভ্যতা যে সুগঠিত হয়ে উঠেছিল; তা নিঃসন্দেহ। বৈদিক সভ্যতার ঐতিহ্য পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে রূপায়িত হয়ে যেন এই দুই মহাগ্রন্থের কাব্যাকারে ধরা পড়েছে। আজও দেশের সর্বত্র আবালবৃদ্ধ-বণিতা রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত, নিরক্ষরতাও সেখানে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি, ভারতবর্ষের জনমানসে মহাকাব্যদ্বয়ের স্থান আধুনিক যন্ত্রযুগের জটিলতাও কাড়তে পারে নি। প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজচিন্তা

ভারতীয় জনমানসে মহাকাব্যের প্রভাব

ও ধর্মবিশ্বাস, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কার, রাজাপ্রজার সম্পর্ক ও দায়িত্ব, শৌর্য-বীর্যের মহিমা, পারিবারিক রীতিনীতি ও আদর্শ—সবই এই দুই বিশাল রচনায় চিত্রিত হয়েছে। আজও রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বন করে লেখা তুলসীদাস-কৃত "রামচরিত মানস" উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। বাংলায় কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত এখনও ঘরে ঘরে জাতিবর্ণনির্বিশেষে পঠিত হয়। মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় উভয় মহাকাব্যে, এবং বিশেষত মহাভারতে, বার বার পাওয়া যায়। পুরুষোত্তম বলে বর্ণিত যে শ্রীকৃষ্ণ নিজের বিশ্বরূপদর্শন করাতেও সংকোচ বোধ করেন নি, তাঁর বহু কর্মে ও পরামর্শেই সুনীতি ও সত্যকথনের কর্তব্য থেকে স্খলনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্রেও দৌর্বল্যের প্রকাশ দেখা যায়; সব্যসাচী অর্জুন ও মহাবীর কর্ণের ব্যবহারে ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচ্যুতির লক্ষণ বিরল নয়; বিদুর ও গান্ধারীর মতো দু-একটি অকলঙ্ক চরিত্র বিনা সর্বত্রই দেখানো হয়েছে যে অনাবিল পাপ বা পুণ্য বলে বস্তু মানবজীবনে নেই, সংঘাতের মধ্য দিয়েই পরিবর্তমান মানুষের কর্ম ও চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। নীতিকথার সার বলে খ্যাত, যুগ যুগ ধরে নন্দিত, মহাকাব্যের এই সততা থেকে তখনকার সংস্কৃতির ঔদার্য ও আত্মবিশ্বাসেরই প্রমাণ মেলে।

মহাভারতের মানুষের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি

মহাভারতের ঐশ্বর্য

উভয় মহাকাব্যে আছে আখ্যায়িকার প্রাচুর্য। বিশেষ করে মহাভারতের ঐশ্বর্য এত বেশী যে তাকে পুরাণ-সংহিতা, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, শকুন্তলা-দুষ্মন্ত ইত্যাদির অনবদ্য কাহিনী মহাভারতের মাধুর্য বৃদ্ধি করেছে। মহাভারতেরই অন্তর্ভুক্ত হল ভগবদ্‌গীতা, আর শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের উপদেশ। তাই বৃথাই বলা হয় নি যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীবনের এই 'চতুর্বর্গ' বিষয়ে পূর্ণ পরিচয় রয়েছে মহাভারতে—

> ধর্মশাস্ত্রমিদম্ পুণ্যম্ অর্থশাস্ত্রমিদম্ পরম্।
> মোক্ষশাস্ত্রমিদম্ প্রোক্তম্ ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥
> ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতবর্ষভ।
> যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥

মহাকাব্যযুগের শেষ পর্যায়ে ভারতের অবস্থা

মহাকাব্যের যুগ যখন অবসান হয়ে আসছে, তখন সারা দেশে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে যে গাঙ্গেয় উপত্যকা ছিল তদানীন্তন সভ্যতার মর্মস্থল,

তারই কাছাকাছি বহু সংখ্যক গণরাজ্যের (republic) সন্ধান মিলছে, যেখানে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য-বর্ণিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন সামঞ্জস্য নেই এবং সামাজিক সংগঠনেও তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রয়েছে। বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি জাতি প্রথম থেকেই রাজতান্ত্রিক শাসন মেনে নেয় নি। লিচ্ছবি, মল্ল প্রভৃতি বিখ্যাত জাতির উল্লেখ তখন পাওয়া যাচ্ছে ; এরাও নিজস্ব গণরাজ্য পরিচালনা করছিল। অবশ্য সমগ্র দেশের কথা ভাবলে দেখা যাবে যে রাজশক্তির প্রসার ঘটছে, পূর্বতন কৃষিনির্ভর সভ্যতা ক্রমশ বাণিজ্য ও সম্পদের পথে অগ্রসর হচ্ছে, নগরের গুরুত্ব বাড়ছে, অর্থের প্রচলন বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে, বৈশ্যদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক বন্ধনও পূর্বের তুলনায় সুদৃঢ় হয়েছিল, গৃহ্যসূত্রের নিয়মাবলী নিত্যকর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করছিল।

বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের সূত্রপাত

দুঃখের বিষয় যে বৈদিক যুগের প্রারম্ভ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও একান্ত আংশিক। বিভিন্ন রচনা এবং তার মধ্যে ঘটনার উল্লেখ বা সংকেত থেকে ইতিবৃত্তের সন্ধান করতে হয়, আর বহু রচনাই লিপিবদ্ধ হয়েছিল অনেক পরে, হয়তো বহু পরিবর্তনও তার মধ্যে সন্নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আমাদের ইতিহাস আর পূর্বের মতো তমসাচ্ছন্ন নয়। জৈন ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের মধ্যে অসঙ্গতি কিছু পরিমাণে থাকলেও তাদের সাহায্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে কয়েকজন রাজাকে আমরা তখন দেখতে পাই।

তৎকালীন প্রধান প্রধান রাজ্য ও রাজন্যগণ

মগধরাজ বিম্বিসার, কৌশাম্বীরাজ উদয়ন, কোশলরাজ প্রসেনজিত, অবন্তীরাজ প্রদ্যোত প্রভৃতির কথা আমরা জানি। এঁদেরই সমসাময়িক ছিলেন বুদ্ধদেব; সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দে বুদ্ধের আবির্ভাব, ৪৮৭ অব্দে তাঁর মহাপরিনির্বাণ বা তিরোভাব। জৈন ধর্মের দিকপাল মহাবীর বর্ধমান হলেন বুদ্ধের চেয়ে কয়েক বৎসরের জ্যেষ্ঠ। বিবিধ পুরাণে যে রাজবংশ তালিকা আছে, তাতেও উপরোক্ত রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী এক বিশেষ গৌরবে মণ্ডিত হয়ে রয়েছে ; তখনকার ইতিহাস যে আমরা কতকটা নিশ্চিতভাবে জানি, এ হল সৌভাগ্যের বিষয়।

অবন্তীরাজ প্রদ্যোত, কৌশাম্বীরাজ উদয়ন ও কোশলরাজ প্রসেনজিত

প্রদ্যোত বা প্রচণ্ড সেন ছিলেন অবন্তীর রাজা; উজ্জয়িনী তাঁর রাজধানী। এঁরই জামাতা কৌশাম্বীরাজ উদয়ন ভারত কথায় বিখ্যাত; মহাকবি কালিদাস, নাট্যকার ভাস এঁর উল্লেখ করেছেন; গুণাঢ্য, সোমদেব প্রভৃতি তাঁকে বহু কাহিনীর নায়ক করেছেন। কোশলরাজ প্রসেনজিত সম্বন্ধে জানা যায় যে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। প্রসেনজিতের বুদ্ধদেবসন্দর্শনে গমন-বিষয়ক অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা হল রাজার সবচেয়ে মূল্যবান স্মারক।

মগধরাজ বিম্বিসার

মহাভারতের কাল থেকে মগধ ছিল এক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র, আর বুদ্ধদেবের জীবনকালে সেখানে রাজত্ব করছিলেন বিম্বিসার। বোধিপ্রাপ্তির পূর্বেই গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে বিম্বিসারের যোগাযোগ ঘটেছিল; পরে তিনি বুদ্ধদেবের ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তখন মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ, আর তখনই মগধ রাজ্যের সঙ্গে লিচ্ছবিদের বহুবিশ্রুত গণরাজ্যের যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়েছিল তা প্রায় এক হাজার বৎসর ধরে চলেছিল।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পটভূমি : স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গ্লানি

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এই পরিবেশে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর বর্ধমানের আবির্ভাব ঘটে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং পুরোহিত-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এমন অবস্থা হয়েছিল যে মানুষের অন্তরের বুভুক্ষা অপূর্ণ থেকে যেত।

জনমানসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আবেদনের অভাব

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে বৈদিক দেবতারা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, যজ্ঞ-অনুষ্ঠান যে ধর্মের প্রধান অঙ্গ তাও আর সকলের মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি।

উপনিষদের চিন্তাধারা, তপশ্চর্যা, প্রভৃতি গ্রহণে সাধারণ মানুষের অক্ষমতা

ব্রহ্মণ্, আত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে উপনিষদে যে গভীর অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাধারার সূত্রপাত ও ব্যাখ্যা আছে তার আবেদন প্রধানত বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। স্বকীয় সাধনায় সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার প্রয়াস অরণ্যবাস করে সর্ববিধ সাংসারিক মায়ার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে একান্তে গভীর মনন বিনা ব্যর্থ হতে বাধ্য, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে সংসার ত্যাগ করলেন; আর্য ঋষিরা তো 'আরণ্যক' নামে বর্ণিত হয়েছিলেন। প্রাক্-আর্য যুগের ধারা অনুসরণ করে অনেকে শরীর নিগ্রহ করে যোগাভ্যাস ও তপশ্চর্যার দিকে মনোযোগ দিলেন; অনেকের হয়তো মনে পড়বে যে মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত প্রস্তর-মূর্তিতে যোগাসনস্থ সাধুকে দেখানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের মনে ধর্ম সম্বন্ধে যে আকুলতা

ছিল, সংসারত্যাগী সাধক আর যোগীরা তাকে শান্ত করতে পারলেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মও হয়ে উঠেছিল অনুষ্ঠানসর্বস্ব ; ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত-প্রাধান্য ও আচারপদ্ধতির কাঠিন্য লক্ষ্য করা গেল। বিধি-নিষেধ, মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান যতই জটিল হয়ে উঠল, বাহ্যিক সমারোহ যতই বৃদ্ধি পেল, ততই যেন ধর্মকর্ম নিষ্প্রাণ মনে হতে লাগল, ভক্তমনের তৃষ্ণা মিটল না। তখনকার স্থিতিশীল সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা মানুষকে আঘাত করতে থাকল ; যে পশু-বলিদান অনার্য ধারা থেকে আর্যব্যবস্থায় সংক্রমিত হয়ে পূজা ও যজ্ঞের অঙ্গীভূত হয়েছিল, তা সমীচীন কি না, এ প্রশ্ন বহুজনের মনে জাগতে লাগল। আড়ম্বর আর অনুষ্ঠান বাহুল্য যে ধর্মের সার বস্তু নয়, প্রাণিহত্যায় ইহকাল ও পরকালে কোন কল্যাণ ঘটতে পারে কি না, বৈদিক ধর্ম বলে যা আখ্যাত তা পূর্ণ আস্থার যোগ্য কি না, এই সমস্ত প্রশ্ন ও সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ল। এই যুগে মানুষের মন যেন বাস্তবিকই বিচলিত হয়ে উঠেছিল ; জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত ধর্মবিশ্বাস এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আচারপদ্ধতির যেন আর সামঞ্জস্য ছিল না বলেই এই ব্যাকুলতা এত স্পষ্ট ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারলে মনশ্চক্ষু উন্মীলিত হবে এই ভরসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা সত্যের সন্ধানে প্রয়াসী হলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন দুজন মহাপুরুষ। একজন হলেন জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর, আর অপর জন বিশ্ব-বিশ্রুত কীর্তি গৌতম বুদ্ধ।

অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরসর্বস্ব ধর্ম সম্পর্কে বিতৃষ্ণা

মানুষের মনে সন্দেহ ও ধর্ম-জিজ্ঞাসা

এই দুই মহাজনের কথা আলোচনা করার আগে মনে রাখা উচিত যে তদানীন্তন কালে ধর্ম ও আচারের প্রাচীর লঙ্ঘন করে মুক্ত চিন্তার প্রচেষ্টায় নেমেছিলেন অসংখ্য ব্যক্তি যাঁদের নাম আর কাজ সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সব কিছুই এখনও অজানা। কোন বিশেষ শিষ্যদল গড়বার দিকে নজর না দিয়ে অনেকেই তখন গতানুগতিক ধর্মচিন্তার বিরুদ্ধে প্রচার করে ক্রমাগত স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য থেকে জানতে পারা যায় বহু সন্ন্যাসীর দল তত্ত্ব ও কর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ তখন প্রচার করতেন। মক্‌খলি গোসাল ছিলেন আজীবিকদের প্রধান গুরু। যতদূর জানা যায়, আজীবিকেরা ছিলেন শূদ্র সন্ন্যাসী, বেদ-বিরোধী অনেক অভিমত এঁরা পোষণ করতেন, কর্মফল সম্বন্ধে যে বিশ্বাস হিন্দুদের মধ্যে সর্বজনীন বলে মনে হয় তাকেই তাঁরা অগ্রাহ্য করতেন।

প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ

গোসাল

অজিত কেশকম্বল

আর একজন বিখ্যাত মনীষী ছিলেন অজিত কেশকম্বল; লোকায়ত দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূদের মধ্যে তিনি অন্যতম। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায়, তার আত্মা বলে কোন কিছু যে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে না, এমন কথা অসমসাহসে তিনি বলেছিলেন—শূন্যবাদ, বস্তুবাদ প্রভৃতি ধারার তিনি একজন পুরোধা। পাপ পুণ্য সম্বন্ধে প্রচলিত

কাশ্যপ

ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন পুরাণ কাশ্যপের মতো প্রচারক। এঁদের সম্বন্ধে সংবাদ যা পাওয়া যায় তা অত্যন্ত অল্প, এবং প্রায় সব সংবাদই আসে শত্রুপক্ষের সমালোচনা থেকে। তাই নিঃসংকোচে বলা যায় যে এঁদের মতামত ও চিন্তাধারা এখনও সুবিচার পায় নি। নিঃসংকোচে আরও বলা যায় যে তখনকার পরিবর্তমান সমাজে বাস্তব জীবনের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাজগতে যে আলোড়ন এসে নির্ভীকভাবে গতানুগতিকতার

বুদ্ধ ও মহাবীর

বিরোধিতা করছিল বুদ্ধ ও মহাবীর তারই প্রধান প্রতিভূ ছিলেন।

মহাবীর

জৈনধর্ম

সাধারণত মহাবীরকে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহাবীর হলেন জৈনদের শেষ 'তীর্থঙ্কর'; চব্বিশজন 'তীর্থঙ্কর' বা সত্যদ্রষ্টার শিক্ষা মিলিয়ে জৈনধর্মের ঐতিহ্য সৃষ্ট হয়েছে। তাঁর

পার্শ্বনাথ

অব্যবহিত পূর্বে যিনি তীর্থঙ্কর ছিলেন, তাঁর নাম পার্শ্বনাথ; খুব সম্ভব ইনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আজও জৈন ভক্তেরা এঁর পূজা করে

নিগ্রন্থ সম্প্রদায়

থাকে। "নিগ্রন্থ" (বা বন্ধনহীন) বলে যাদের কথা বুদ্ধের সময়ে এক প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায় নামে বর্ণিত হয়েছে, তারাই পরে জৈন বলে পরিচিত হয়। সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তত কয়েক শত বৎসর পূর্ব থেকেই এই "নিগ্রন্থ" সম্প্রদায়কে দেখা গেছে। মহাবীর এই নির্গন্থদের নেতা বলে পরিচিত ছিলেন; ত্রিশ বৎসর ধর্মপ্রচারের পর দক্ষিণ বিহারে পাভা নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাবীরের বংশ-পরিচয়

গৌতম বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক হলেও বয়সে তাঁর চেয়ে বর্ধমান মহাবীর কিছু বড় ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্ষত্রিয় বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; পিতা ছিলেন বৈশালীর একজন অভিজাত, মাতৃকুলের সম্পর্ক ছিল মগধ রাজবংশ এবং লিচ্ছবিপ্রধানদের সঙ্গে।

সংসার ত্যাগ ও নির্বাণলাভ

ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি স্ত্রী যশোদা এবং সংসার ত্যাগ করে দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপশ্চর্যায় লিপ্ত থাকেন। শোনা যায় যে শরীর সম্বন্ধে চেতনা

এবং সর্বপ্রকার আসক্তি বর্জনের প্রতীক স্বরূপ তখন তিনি বস্ত্র পরিধান পরিত্যাগ করেন এবং তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উলঙ্গ অবস্থাতেই বিচরণ করতেন। বারো বৎসর তপস্যার পর তাঁর নির্বাণ লাভ ঘটেছিল। বহুকাল ধরে তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে তাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল 'জিন' অর্থাৎ বিজয়ী। এই 'জিন' থেকে জৈন শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে।

মহাবীরের প্রচারিত ধর্ম

পার্শ্বনাথ সত্য, অহিংসা, অচৌর্য ও অপ্রতিগ্রহ এই যে 'চতুর্যাম' বা চার মূল নীতি প্রচার করেছিলেন, তার সঙ্গে মহাবীর যোগ করে দিলেন ব্রহ্মচর্য। ইন্দ্রিয়ের বন্ধন ও সকল রকম আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়ে "সিদ্ধ শীল" অবস্থায় উপনীত হওয়া প্রত্যেক জৈনের লক্ষ্য, একথা তিনি প্রচার করলেন। অহিংসা নীতি সর্বথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ঘোষিত হল; শুধু পশুপক্ষী ইত্যাদি প্রাণী নয়, উদ্ভিদ, জল, ধাতুদ্রব্য সম্বন্ধেও অহিংসা পালনীয় বলা হল। মহাবীরের মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু সাধারণত মনে করা হয় যে তাঁর মৃত্যু ঘটে ৫২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

জৈনগুরু ভদ্রবাহু

আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ বিহারে এক দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে একদল জৈন সাধু দক্ষিণ ভারত যাত্রা করেন, বর্তমান মহীশূর রাজ্যে তাঁরা বসবাস স্থাপন করে জৈনধর্ম প্রচার করতে থাকেন। প্রায় এক হাজার বৎসর পরে মহীশূরস্থ শ্রাবণ বেলগোলা নামক স্থানে গোমতেশ্বরের যে বিরাট প্রস্তর মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, জৈন স্থাপত্যের সেই আশ্চর্য নিদর্শন এখানে স্মরণীয়। ভদ্রবাহুর শিষ্যেরা উত্তর ভারতে ফিরে এসে দেখেন যে ইতিমধ্যে জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিকে দ্বাদশ "অঙ্গে" সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। এই গ্রন্থ-সম্পাদনা নিয়ে বিতর্ক বেধে যায়।

গোমতেশ্বরের মূর্তি

গুজরাটের ধর্মসভা

পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুজরাটে অনুষ্ঠিত এক ধর্মসভায় আবার জৈন ধর্মগ্রন্থসমূহকে অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূলসূত্র প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করে সাজানো হয়। জৈনদের মধ্যে কিন্তু বিরোধের ফলে স্বতন্ত্র দুই ধারা তখন প্রচলিত হয়েছে। বর্ধমান মহাবীরের শিক্ষা যারা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়েছিল, তারা নিজেদের বলত "দিগম্বর"—মহাবীরের মতো উলঙ্গ হয়ে জৈন সাধুরা বিচরণ করবে, আকাশ হবে তাদের পরিচ্ছদ, এই হল ধারণা। অপর দলের নামকরণ হল "শ্বেতাম্বর"—মহাবীরের নির্দেশকে একেবারে আক্ষরিক ভাবে না মেনে তারা শ্বেত বস্ত্রখণ্ড পরিধান করত।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়

জৈনদের মধ্যে এই বিভেদ যে কতদিনের, তা জোর করে বলা কঠিন, কিন্তু খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকেই এর চিহ্ন ইতিহাস লক্ষ্য করে।

জৈনধর্ম ও ধর্মাবলম্বী

বর্তমানে সারা ভারতে জৈনদের সংখ্যা পনেরো লক্ষের বেশী নয়; প্রধানত এদের নিবাস রাজস্থান ও গুজরাটে। অনেকটা ইহুদীদের মতো গৃহী জৈনেরা সংখ্যাল্প হলেও দেশের সর্বত্র তাদের ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তৃত করে প্রচুর বিত্তশালী এক সম্প্রদায় বলে পরিগণিত হয়েছে। ব্যবসায়ীদের কাছে অহিংসা ও নিরাসক্তির বাণী নিয়ে জৈনধর্ম যে কি ভাবে, কেন এবং কেমন অবস্থায় একটা বিপুল আবেদন নিয়ে এসেছিল, তা আমাদের ইতিহাসের এমন একটি সমস্যা যা আলোচনা ও সমাধানের অপেক্ষা করে আছে।

গৌতম বুদ্ধ

জৈনধর্মের প্রচার ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, কিন্তু গৌতম বুদ্ধ যে ধর্মের পত্তন করেছিলেন তার বিজয় বৈজয়ন্তী দেশদেশান্তরে উড্ডীন হয়েছিল। "একদা জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে তাঁর", বলে বুদ্ধদেবের নাম নিয়ে এদেশ গর্ব করে থাকে। খুব সম্ভব ৫৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলবাস্তু নামে একটি ছোট রাজ্যে ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, নামকরণ হয় সিদ্ধার্থ। পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন সেই রাজ্যের নায়ক; রাজা বললে হয়তো ভুল হবে, কারণ সম্ভবত শাক্যবংশ থেকে কোন একজনকে অন্যান্য অভিজাতেরা নায়ক-পদে নির্বাচন করত। পুত্রের শৈশবেই মাতা মায়া দেবীর মৃত্যু হয়; সিদ্ধার্থকে তখন পালন করেন মাতৃস্বসা গৌতমী। বৌদ্ধ কাহিনীতে কপিলবাস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে, তা কিছুকাল আগে সেই স্থানে অশোকের এক প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য জন্মের পূর্বে বার বার বহু বোধিসত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হওয়া এবং আরও যে অনেক আশ্চর্য কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল, তা যে কবি-কল্পনা ভিন্ন কিছু নয় তা না বললেও চলে। মহাপুরুষ সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তী প্রায় সর্ব দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বহু বিচিত্র কাহিনী ভারতবর্ষের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ক্ষেত্রে যে অসংখ্য শিল্পীকে যুগ যুগ ধরে কত প্রেরণা দিয়েছে, তা এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসবে।

গৌতমবুদ্ধের পরিচয় :
জন্মস্থান : কপিলবাস্তু
পিতা : শুদ্ধোদন
মাতা : মায়া দেবী
বুদ্ধ সম্পর্কে কিংবদন্তী

সিদ্ধার্থকে অভিজাত বংশীয়ের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দিতে পিতা শুদ্ধোদনের একান্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু বাল্যকাল থেকে সিদ্ধার্থের মন ছিল ভাবুক—সাধারণ যে সমস্ত ব্যাপারে সমবয়স্কেরা উৎসাহিত, সে বিষয়ে সিদ্ধার্থের ঔদাসীন্য পরিবারস্থ সকলকে চিন্তিত করে তুলেছিল। সাংসারিক ব্যাপারে মন বসাবার জন্য গোপা (কিংবা যশোধারা) নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হল; সিদ্ধার্থের বয়স যখন উনত্রিশ, তখন তাঁর এক পুত্র জন্মেছিল। কিন্তু সংসারে বাস করেও তাঁর মন সর্বদাই যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকত। কেমন করে মানুষ দুঃখের কবল থেকে নিস্তার পেতে পারে, এই হল অহোরাত্রব্যাপী তাঁর চিন্তা। গল্প আছে যে পুত্র সংসার ত্যাগ করতে পারে একথা জ্যোতিষীরা বলার ফলে শুদ্ধোদন প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে সংসার সম্পর্কে বিরাগ তাঁর মনে না জাগে। কিন্তু কোন বাধাই খাটল না, একদিন সিদ্ধার্থ দেখলেন জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধকে, দেখলেন এক মৃতদেহ, আর দেখলেন এক সৌম্য, প্রশান্ত সন্ন্যাসীর মূর্তি। জরা, মৃত্যু, গ্লানি দেখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন দেখলেন যে সর্ববিধ জাগতিক দুঃখ বেদনা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেয়েছেন শুধু সন্ন্যাসী। একদিন গভীর রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করলেন; পুত্র রাহুলের জন্ম তাঁকে সংসারের মায়াজালে আরও জোরে বাঁধতে পারে আশঙ্কা করে আর কালবিলম্ব করলেন না। তাঁর সেই গৃহত্যাগ-কাহিনী বহু রচনায় বর্ণিত হয়েছে; এখানে তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়।

সংসার-বিমুখিতা

বিবাহ

বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগ

বিশ্বজগতের রহস্য মনশ্চক্ষুর সামনে উদ্‌ঘাটন করে দেবে, এমন গুরুর সন্ধান তিনি বহুদিন ধরে করেছিলেন। ব্রাহ্মণ ও যোগীদের কাছে উপদেশ নিলেন; অলর, উদ্রক প্রভৃতি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কাছে প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন অভ্যাস করতে তিনি নিবৃত্ত ছিলেন না। "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং"—এই আসনে বসেই আমার শরীর শুকিয়ে যাক কিন্তু তপস্যা করে যাব, এই পণ নিয়ে গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামক স্থানে তিনি তপস্যা করতে থাকলেন; ছয় বৎসর ধরে চলল সেই তপশ্চর্যা। কিন্তু তাঁর সৎসাহস ছিল অভূতপূর্ব; যখন তিনি বুঝলেন যে শুধু শরীরকে নিগ্রহ করে কৃচ্ছ্রসাধন সত্যসন্ধানের পথ নয়, যখন উপলব্ধি করলেন যে জ্ঞানই হল মুক্তির পথ আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করলেই মননশক্তির বৃদ্ধি যে ঘটবে তা নয়। তখন যোগাসন ছেড়ে উঠলেন, নিকটস্থ গ্রামে গিয়ে আহার্য ভিক্ষা করে আনলেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ তপস্যাকালে তাঁর সেবা

সত্য-সন্ধান

কৃচ্ছ্রসাধন

কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ত্যাগ ও বোধিলাভ

করেছিল, তারা বিদ্রূপ করল; তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নৈরঞ্জন নদীতে স্নান করে সুজাতার হাতে পায়সান্ন গ্রহণ করার কাহিনী বহু বিখ্যাত। তারপর গয়ার কাছে বোধিবৃক্ষতলে তিনি ধ্যান করতে লাগলেন। বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে সহসা পরম সত্য তাঁর কাছে স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিল, জন্মমৃত্যুর রহস্যভেদ যেন তিনি করতে পারলেন, উপলব্ধির আলোকে তাঁর মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, দিব্যজ্ঞান তাঁর আয়ত্ত হল, বোধিপ্রাপ্ত হয়ে তিনি হলেন "বুদ্ধ"।

বুদ্ধের প্রথম বাণী-প্রচার

শুধু নিজের মুক্তি এই মহামানবকে তৃপ্ত করল না, যে অমৃতের আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন তা সর্বজনের কাছে পরিবেশণের জন্য তখন তিনি ব্যগ্র। প্রথমে ছুটে গেলেন সন্ন্যাসজীবনের গুরুদের জানাতে, কিন্তু তখন তাঁরা গত হয়েছেন। তিনি তপস্যা ভঙ্গ করায় যে পাঁচ ব্রাহ্মণ বিদ্রূপ করেছিল কিন্তু যাদের কাছে পূর্বে তিনি সেবা পেয়েছিলেন, তারা ছিল কাশীর কাছে সারনাথের মৃগদাব বনে। সেখানে তিনি গেলেন, "ধর্মচক্র-প্রবর্তনায়"—ধর্মচক্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে, তাঁর প্রথম অমৃতস্যন্দ বাণী তখন প্রচারিত হল। পরে এই সারনাথে একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। বিশ্ববাসীর কাছে সারনাথ এক মহাতীর্থ।

সারনাথ

বুদ্ধদেবের বাণী-সঙ্কলন

প্রায় চল্লিশ বৎসর নানা স্থান পরিভ্রমণ করে বুদ্ধদেব যে উপদেশ দিয়েছিলেন, কথোপকথনের মধ্যে তাঁর যে শিক্ষা নিবদ্ধ রয়েছে, তা পালি ধর্মগ্রন্থরাজিতে সঙ্কলিত আছে। সাতাশটি গ্রন্থে ৮৪,০০০ অধ্যায় নিয়ে এই সঙ্কলন; শোনা যায় যে তার মধ্যে ৮২,০০০ অধ্যায় হল স্বয়ং বুদ্ধদেবের বাণী, বাকি শিষ্যদের টীকা। একবার তিনি একমুঠো পাতা নিয়ে শিষ্যদের বলেছিলেন যে বনের গাছে যেমন ঢের বেশী পাতা আছে, তেমনই তিনিও যা জানেন তার অত্যন্ত অল্প একটা অংশই তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। আর এর কারণ হল যে পূত জীবন এবং নির্বাণলাভের পথ যে সমস্ত কথা থেকে জানা যায় না তা তিনি বলেন নি। এখানে একেবারে সংক্ষেপে বুদ্ধদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যে জটিলতা দেখা দিয়েছিল, সে তুলনায় এই শিক্ষা আশ্চর্য সহজ ও হৃদয়গ্রাহী। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি, হয়তো বলা প্রয়োজন মনে করেন নি। জাতিভেদ প্রথাকে তিনি মানতে পারেন নি, যাগযজ্ঞ আর শরীরকে নিগ্রহ করে তপশ্চর্যায় তাঁর আস্থা ছিল না। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি মনে করতেন যে কর্মফল

বুদ্ধদেবের শিক্ষা

নির্বাণ

অনুযায়ী প্রত্যেক জীব সংসারে এসে জন্মজন্মান্তর ধরে দুঃখ ভোগ করে থাকে। জন্ম, মৃত্যু, রোগ ইত্যাদির যে বেদনা, তার মূলগত কারণ হল তৃষ্ণা, যে তৃষ্ণা বা বাসনার বিরতি ঘটাতে পারলে দুঃখ বেদনাকে জয় করে নিষ্কৃতিলাভ সম্ভব। সকল কামনার বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পেয়ে মানুষ অনুভূতির যে স্তরে ওঠে, তার নাম হল নির্বাণ—জন্মান্তরের চক্র থেকে তখন সে নিস্তার পায়, যে দুঃখ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ তার ঊর্ধ্বে তখন তার বিচরণ। এই নির্বাণ লাভ করতে হলে সম্যক্ দৃষ্টি, সৎকর্ম, সদ্বাক্য, সৎসংকল্প, সৎচেষ্টা, সৎজীবন, সৎস্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি, এই সদষ্টাঙ্গ মার্গ (অষ্ট মার্গ) অনুসরণ করতে হবে। সর্ব জীবের প্রতি মমতা এবং অহিংসা যে পরম ধর্ম এই শিক্ষা, বুদ্ধদেবের বাণীর সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। করুণার সিঞ্চনে যেন ধর্মক্ষেত্রে এক নূতন মাধুর্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছিল বাস্তববোধ, বিলাসব্যসন এবং পুণ্যলোভে কৃচ্ছ্রসাধন, এই উভয় ব্যাপার যে বর্জনীয়, তা তিনি প্রচার করেন। তিনি চেয়েছিলেন "মঝ্ঝিম পথ" বা মধ্যপন্থা ; আতিশয্য বর্জন করে সৎপথে বিচরণ করার কথা তিনি বলে গেছেন। যে "পঞ্চশীল" আজকের জগতে বিখ্যাত, সেই পঞ্চশীল পালনের উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন, অসত্য, অন্যায়, অসদাচরণ, চৌর্য, জীব-হিংসা পরিহার করলে তবেই মানুষ হবে সুশীল একথা বলেছিলেন।

সদষ্টাঙ্গ মার্গ

'মঝ্ঝিম পথ'

'পঞ্চশীল'

আমরা বলতে পারি যে কোন নূতন ধর্মমত তিনি উপস্থাপিত করেন নি, শুধু যেন সত্যকে উপলব্ধি করে তাকেই এক নূতন, মোহনীয় পরিচ্ছদে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। প্রায় আশী বৎসর বয়স পর্যন্ত চলেছিল তাঁর অক্লান্ত পরিক্রমা ; বর্ষার কয়েকমাস বিশ্রাম ভিন্ন সর্বদাই তিনি পর্যটন ও প্রচারে ব্যস্ত থাকতেন। তখন আরও অনেক ধর্মশিক্ষক ভারতবর্ষে ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ হলেন একেবারে অনন্য। সাধারণের কথ্য ভাষায়, সহজ যুক্তি ও উপমা দিয়ে, তিনি নিজের উপলব্ধি সম্বন্ধে বলতেন। আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটে গিয়ে তাঁর কথা শুনত ; আসত রাজা, আর বণিক, আর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী পণ্ডিত, সবচেয়ে বেশী আসত সাধারণ মানুষ, যারা তাঁর সহজ, সুন্দর ব্যাখ্যার মধ্যে যেন জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে মনে করত। মনীষা ও করুণার অপূর্ব সমন্বয় তাঁর প্রতিভাকে যে দ্যুতি দিয়েছিল, তা আজও ইতিহাসকে আলোকিত করে রেখেছে। বিম্বিসার প্রসেনজিত, অজাতশত্রু (কিছুকাল বৌদ্ধদের পরম শত্রু হওয়া সত্ত্বেও)

বুদ্ধের উপদেশের সর্বজনীন আবেদন

প্রভৃতি রাজা তাঁর কাছে নতি জানিয়েছিল ; গর্বিত শাক্য বংশ তাঁকে গুরু বলে মেনেছিল ; পিতা শুদ্ধোধন, ভার্যা যশোধারা এবং পুত্র রাহুলকে তিনি দীক্ষিত করেছিলেন ; আর অগণিত মানুষ তাঁর বাণীর মধ্যে যেন মানবজীবনকে সার্থক করে তোলার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল।

বুদ্ধের উপদেশ সম্পর্কে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীদের বিশেষ আকর্ষণ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুষ্টির সঙ্গে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আভাস দেখতে পাওয়া যায়, বুদ্ধের শিক্ষা যে তাদের বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছিল, তা কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে জেতবন, পূর্বারাম প্রভৃতি উদ্যান-নিকেতন ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য সুদত্ত, বিসুখ-প্রমুখ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। (আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাস কাল বর্ষার জন্য ভিক্ষুদের পক্ষে পর্যটন অসম্ভব ছিল বলে কোথাও তখন স্থায়িভাবে থাকার দরকার হত)। মহাধনী অনাথপিণ্ডদ রাজগৃহে বুদ্ধের ব্যাখ্যা শুনে যে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা সুপরিজ্ঞাত।

বুদ্ধের উপদেশের সমাজের উপর প্রতিক্রিয়া

সাধারণ মানুষের কাছে বুদ্ধের শিক্ষা ধর্মজগতে যেন নূতন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল ; মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞের বাহুল্য নেই, উপনিষদের গুহায় নিহিত তত্ত্বের দুরূহতা নেই, যে ভাষায় সে কথা বলে তারই মাধ্যমে চরম সত্যের সন্ধান সে যেন পেল, জাতিবর্ণের বাধা সেখানে নেই, যে চণ্ডাল সে-ও মধ্যপথ অনুসরণ করে নির্বাণ লাভে সমর্থ। তাই বলা হয়েছে যে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম প্রচার করে ধর্মের চেয়ে সামাজিক ব্যাপারেই যেন একটা বিপ্লব এনে দিলেন।

মেয়েদের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার

প্রথমে আপত্তি করলেও পরে যখন তিনি ভিক্ষুদের মতো ভিক্ষুণীদেরও মঠে প্রবেশ করার অধিকার দিলেন, তখনও ঘটল একটা সমাজ-বিপ্লব। তখনকার পরিস্থিতিতে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আর যখন মঠ পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলো নীতির নির্দেশ তিনি দিলেন, তাঁর শিষ্যেরা সংসার ত্যাগ করার পরও, যখন বৎসরের অন্তত কিছুকাল একত্র মঠে বাস করতে বাধ্য তখন সেই মঠের ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব সাধনের জন্য নিয়ম স্থির করে দিলেন, তখনও যেন সমাজে বড় দরের পরিবর্তন দেখা দিল।

সঙ্ঘ-প্রবেশার্থীর ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞা

"বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি, ধম্মম্, শরণম্ গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি"—এই ত্রিবিধ প্রতিজ্ঞা নিতে হত প্রত্যেক ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে। জীবদ্দশাতেই বুদ্ধদেব এই সঙ্ঘের নিয়মাবলী নির্ধারণ করে দেন। সম্ভবত তদানীন্তন যে সব গণরাজ্য ছিল—বৃজি, লিচ্ছবি, শাক্য

মঠ পরিচালনার গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রভৃতি—তাদের সংগঠন ব্যবস্থা থেকে কিছু শিক্ষা বুদ্ধদেব নিয়েছিলেন। গণরাজ্যগুলিতে প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না, অভিজাতবংশীয়দের ক্ষমতা ছিল বেশী; কিন্তু সেখানে শাসনবিষয়ে সিদ্ধান্তের পূর্বে নিয়মিত আলোচনা হত, আর তাই আলোচনারীতি স্থিরীকৃত হয়েছিল। বুদ্ধদেব তাঁর মঠ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রবর্তন করেন, তাতে বহু গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভিক্ষুদের সভা হওয়ার আগে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর হাতে ভার ছিল কে কোথায় বসবে তা স্থির করে রাখা; সাধারণত অন্তত দশজন ভিক্ষু উপস্থিত না হলে সভার কাজ চলত না (আধুনিক যুগের "কোরম্", quorum, এর সঙ্গে তুলনীয়); যারা সদ্য দীক্ষা নিয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাদের এবং ভিক্ষুণীদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না; যে প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন, যথাযথভাবে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে তার অবতারণা সম্বন্ধে নির্দেশ ছিল; ভোট দেওয়ার পদ্ধতি, এমন কি জয়স্ওয়ালের মতো পণ্ডিতের মতে গোপন 'ব্যালট'-এরও ব্যবস্থা ছিল; নিয়মানুবর্তিতায় কোন ত্রুটি ঘটে থাকলে সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য হয়ে যেত। জৈন মঠ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকটা অনুরূপ আয়োজন ছিল; কিন্তু বৌদ্ধ মঠ-শাসন বিষয়েই আমরা প্রভূত তথ্য জানতে পেরেছি।

আসনের নির্দিষ্টীকরণ

কোরম

ভোটাধিকার

গোপন 'ব্যালট'

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ

আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ ঘটে, তিনি দেহত্যাগ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমাই নাকি এই মহাত্মার জন্ম, বোধিপ্রাপ্তি এবং মহাপরিনির্বাণের তিথি। সিংহলী গ্রন্থ অনুসারে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয় ৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, কিন্তু আমরা এখানে অধিকাংশ পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যে মত অবলম্বন করেছি তার অনুযায়ী ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দই ঐ ঘটনার তারিখ। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীতে অশোক নির্মিত শিলাস্তম্ভ রয়েছে; হয়তো কুশীনগরেও অনুরূপ কোন স্মারক ছিল, কিন্তু তা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কুশীনগর ছিল মল্ল জাতির গণরাজ্যে অবস্থিত; মগধরাজ অজাতশত্রু এবং লিচ্ছবি, শাক্য প্রভৃতি জাতির পক্ষ থেকে যখন বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ চেয়ে দাবি এসেছিল, তখন মল্লেরা প্রথমে নাকি অস্বীকৃত হয়, কিন্তু পরে বুঝি এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে সেই দেহাবশেষকে আট ভাগে বিভক্ত করে বিতরণ করা হয়। পরবর্তী যুগে অশোক এবং কণিষ্ক বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপরে সমাধিস্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ

বুদ্ধের শেষ বাণী

বুদ্ধদেবের মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন প্রিয় শিষ্য আনন্দকে কাঁদতে দেখে তিনি বলেছিলেন ঃ "আনন্দ, আমি কি তোমাদের বলি নি যে যা কিছু জন্মেছে, যারই অস্তিত্ব রয়েছে, যা হল পঞ্চভূতে গড়া, তার ক্ষয়ও অবশ্যম্ভাবী ?" পরে সব শিষ্যকে ডেকে বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকল পদার্থেরই নিঃশেষ অনিবার্য। তোমরা সবাই অপ্রমাদের পথে থেকে মুক্তির জন্য কাজ করে যাও।" নিজেকে দেবতার আসনে বসিয়ে রাখার মতো ক্ষুদ্রতা বুদ্ধদেবের কখনও ছিল না, শিষ্যদের সর্বদা বলতেন ঃ "আমি শুধু বলছি বলে একথা মেনো না ; নিজের মন দিয়ে বিচার করে নিও।" "মনঃ পূর্বংগমাধর্ম্মা মনঃ শ্রেষ্ঠা মনোময়াঃ", এ ভাবের কথা তাই আমরা পেয়েছি। মানবিকতার শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে আজ তিনি যে বিশ্বের বন্দনা পেয়েছেন, তা যথার্থ। পঞ্চশীল অনুসরণ করে, অপ্রমত্ত মনে, যাগযজ্ঞ, পূজা-অর্চনার পরিবর্তে সমাধি অর্থাৎ চিন্তায় মগ্ন থেকে, প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারলে তবেই সম্বোধি ও নির্বাণ লাভ সম্ভব—এই যে শিক্ষা, তা হল যেন মানুষের স্বকীয় মহিমার উপর একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত। সারিপুত্ত এবং মোগ্‌গলান-প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের কথা আমরা জানি ; কিছুকাল আগে এঁদের পূতাস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে। আর আমরা জানি যে বিম্বিসারের মতো রাজা, অনাথপিণ্ডদের মতো ঐশ্বর্যবান শ্রেষ্ঠী, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও উপালির মতো দরিদ্র সাধারণ ব্যক্তি তাঁর কৃপা লাভ করেছিলেন। বিশ্বের ইতিবৃত্তে এমন মহামহিম মানুষের দর্শন যে কত দুর্লভ তা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়। বুদ্ধের জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের কথা তাই যুগে যুগে আমরা স্মরণ করে এসেছি। আর পৃথিবী যখন হিংসায় উন্মত্ত, "ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ" যখন সভ্যতার শ্বাস রোধের উপক্রম করে, তখন বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায়—

বুদ্ধের উপদেশে বিচারের প্রাধান্য

বুদ্ধের শিক্ষা মানুষের স্বকীয় মহিমার উপর প্রতিষ্ঠিত

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধের মূল্যায়ন

লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জ্বল হোক্ জ্ঞান-সূর্য-উদয়-সমারোহ,—
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥

প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি

বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর রাজগৃহে এক সঙ্গীতি(বা মহাসম্মেলন)-র অধিবেশন হয় ; ধর্ম ও বিনয় (মঠ-ব্যবস্থা) সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষাকে সুব্যবস্থিত

করার এই হল প্রথম প্রচেষ্টা। তারপর কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে মতভেদের ফলে প্রায় একশত বৎসর পরে বৈশালীতে বসে দ্বিতীয় মহাসম্মেলন। অশোকের রাজ্যকালে পাটলিপুত্রে আহূত হয় তৃতীয় সম্মেলন; এখানে বোধ হয় বৌদ্ধদের মধ্যে কোন কোন ধারার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল না। চতুর্থ সম্মেলন বসে কণিষ্কের সময়; সম্ভবত এখানেও শুধু উত্তর ভারতের হীনযান বৌদ্ধেরা উপস্থিত ছিল। খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম শতকে পালি বলে অভিহিত ভাষায় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাবলী সুত্ত (সূত্র), বিনয়, অভিধম্ম (অভিধর্ম), এই ত্রি-পিটকে (অর্থাৎ তিনটি ঝুড়ি) সঙ্কলিত হয়েছিল; মনে রাখা উচিত যে বুদ্ধ মগধের কথ্য ভাষায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সূত্রপিটকে আছে 'থেরা ও থেরি-গাথা', সুনীতি-বিষয়ে অনবদ্য গ্রন্থ 'ধম্মপদ', আর আছে বিভিন্ন জাতক, অর্থাৎ বুদ্ধের পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব-জীবনের বহু বিস্ময়কর কাহিনী, যার মধ্য দিয়ে তাঁকে অতিমানুষ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। ভরহুত, সাঞ্চী প্রভৃতি স্থানে অগণিত ভাস্কর্যে এই জাতক কাহিনী আজও খোদিত হয়ে রয়েছে। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের যেসব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত এবং অমান্য করলে প্রায়শ্চিত্তের যে ব্যবস্থা পালন করতে হত 'বিনয়'পিটকে তা বিবৃত হয়েছে। আর অভিধর্মে আছে ধর্মের তত্ত্বমূলক আলোচনা, যদিও সে আলোচনায় গভীর ও মৌলিক চিন্তার অভাবই পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় সম্মেলন

তৃতীয় সম্মেলন

চতুর্থ সম্মেলন

ত্রিপিটক

বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম বেদের অপৌরুষেয় মহিমা অস্বীকার করেছিল, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্যও মানে নি। কিন্তু একেবারে নূতন এক ধর্মমত যে প্রচারিত হচ্ছে, এ দাবি কখনও করা হয় নি। বেদের সময় (কিংবা তার পূর্ব) থেকে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টাও হয় নি। পরে দেখা গেছে যে বৌদ্ধ ও জৈন কাহিনীতে ব্রহ্মা, শক্র (ইন্দ্র) ও অন্যান্য দেবতারও উল্লেখ রয়েছে। মহাযান নামে পরিচিত পরবর্তী বৌদ্ধমতের উপর হিন্দুর দেবতা, ধর্মচিন্তা, মূর্তিগঠন, আচার ও সংস্কার প্রভৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। পার্থক্য সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈন ধারাকে আর্য ধর্মেরই শাখা, এবং ম্রিয়মাণ বৈদিক ধর্মের এক বিরাট পরিবর্তিত রূপ বললে খুব অন্যায় হয় না।

বেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ বা জৈনধর্মের অবিচ্ছিন্নতা

উপনিষদের যে বাণী তার সঙ্গে মৌলিক দৃষ্টিতে দেখলে বুদ্ধ ও মহাবীরের শিক্ষার প্রভূত সৌসাদৃশ্য আছে। অবশ্য বেদকে অভ্রান্ত বলতে তাঁরা চান নি, জগৎস্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাঁরা বাক্‌বিস্তারে বিরত

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্যে সৌসাদৃশ্য

ছিলেন। জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু যে জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাস নানাস্তরের হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের গ্রন্থি নির্মাণ করেছে, জৈন ও বৌদ্ধেরা তাকে মানতেন। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন যাপন সম্বন্ধে হিন্দুচিন্তাধারাকে তারা গ্রহণ করেছিলেন। পবিত্রতা ও সদাচার সম্পর্কে জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু চিন্তার পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর ; অহিংসা বিষয়ে উপনিষদেই উল্লেখ আছে। অবশ্য অহিংসা নীতির প্রয়োগে জৈনেরা একেবারে চরমপন্থী, আর উপনিষদে অহিংসা মন্ত্রের সূচনা মাত্র আছে, কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধদের কাছে এর গুরুত্ব অনেক বেশী।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে পার্থক্য

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য অনেক আছে, কিন্তু পার্থক্যও প্রকৃতপক্ষে কম নয়। ইন্দ্রিয় জয় দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের মধ্যে প্রভেদ নেই, কিন্তু সম্বোধি ও নির্বাণের মধ্য দিয়ে মনের ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের উপর বৌদ্ধধর্ম জোর দেয়, অথচ জৈন মতে শুধু জিতেন্দ্রিয়তা ও নিরাসক্তির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ সম্ভব। তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনে জৈনদের বিশ্বাস কঠোর ও অনমনীয় ; সে স্থলে বৌদ্ধ শিক্ষায় মধ্যপথ অবলম্বনের গরিমা ঘোষিত হয়েছে।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাধ প্রসার

বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের ফলে সমাজ-জীবনে যে বিপ্লব সূচিত হয়েছিল, তার কথা পূর্বে বলা গেছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে আঘাত করলেও মূলগতভাবে তা আর্যধর্মেরই এক নূতন সংস্করণ মনে করার জন্যই বোধ হয় ব্রাহ্মণদের (এবং তাদের সমর্থকদের) পক্ষ থেকে বৌদ্ধবিরোধ দেখা দিতে বিলম্ব ঘটেছিল। বুদ্ধ যখন প্রচার আরম্ভ করেন তখন বহু বেদবিরোধী ধারা দেখা গিয়েছিল ; হয়তো বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে গভীর ও ব্যাপক হতে পারে তা অনেকেরই কল্পনায় আসে নি। তার পরে প্রসেনজিত ও বিম্বিসার-প্রমুখের আনুকূল্যে বৌদ্ধ প্রভাবের প্রসার অকাট্য হয়ে উঠল। প্রসঙ্গক্রমে মনে আসে যে সামাজিক সাম্যের উপর জোর দিলেও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পর মগধে রাজতন্ত্র সুদৃঢ় হয়ে সাম্রাজ্যের রূপ যে কেমন করে নিতে পারল তা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। যাই হোক, নিজের মধ্যে অপরকে গ্রহণ করার যে শক্তি হিন্দু সংস্কৃতিতে ছিল, তার জোরে পার্শ্বনাথ ও মহাবীরকে প্রায় দেবতার স্থান দেওয়া, এবং বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলে পূজা করার মতো ঘটনা আমরা দেখেছি।

জৈন তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধের দেবতা-রূপে স্বীকৃতি

ভারতবর্ষে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে যারা বৌদ্ধ, তাদের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু বুদ্ধের জীবনকথা ও শিক্ষা এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ভাবধারার গরিমা

বৌদ্ধ ও ভারতী সংস্কৃতির একাত্মতা

নিয়ে ভারতবর্ষের গর্ব হল অপরিসীম। বৌদ্ধধর্ম এদেশ থেকে ক্রমশ অবলুপ্ত হয়েছে; প্রাচ্যের অন্যান্য বহু দেশে বৌদ্ধধর্ম এখান থেকে গিয়ে নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্য ভারতবর্ষের মর্মস্থলে স্থান পেয়ে এসেছে। স্বতন্ত্র বৌদ্ধযুগ বলে কিছু তাই আমাদের ইতিহাসে নেই; হিন্দু ইতিহাসেরই তা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদেশের বৌদ্ধ শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি সৃষ্টিকর্ম একান্তভাবে ভারতবর্ষীয়। ইলোরার মতো স্থানে তাই হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধারার ভাস্বর, অথচ সহজ ও স্বাভাবিক সহ-অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সুঙ্গ বা গুপ্তযুগে হিন্দু শাসকের সময় বৌদ্ধধর্ম নিগৃহীত হওয়া দূরে থাক, সম্মান পেয়েছে, বৌদ্ধ শিল্পের বিশিষ্ট উৎকর্ষ ঘটেছে। হর্ষবর্ধন একই সময় বুদ্ধ, বিষ্ণু ও শিবের অর্চনা করেছেন। মাঝে মাঝে, যেমন শশাঙ্কের শাসনকালে বৌদ্ধ নিগ্রহের সংবাদ আসে, কিন্তু তা হল প্রকৃতই অবান্তর ব্যতিক্রম মাত্র। খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতকে কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির বৌদ্ধ-বিরোধী প্রচারের কথা শোনা যায়, কিন্তু সম্ভবত তখন এদেশের বৌদ্ধধর্ম তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধারার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের বহুসমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেরই অভিনব প্রকাশ ঘটেছে।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

মগধের স্বর্ণযুগ ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন

ভারতের ষোড়শ মহাজনপদ

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেকার ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা ও অনিশ্চিতি

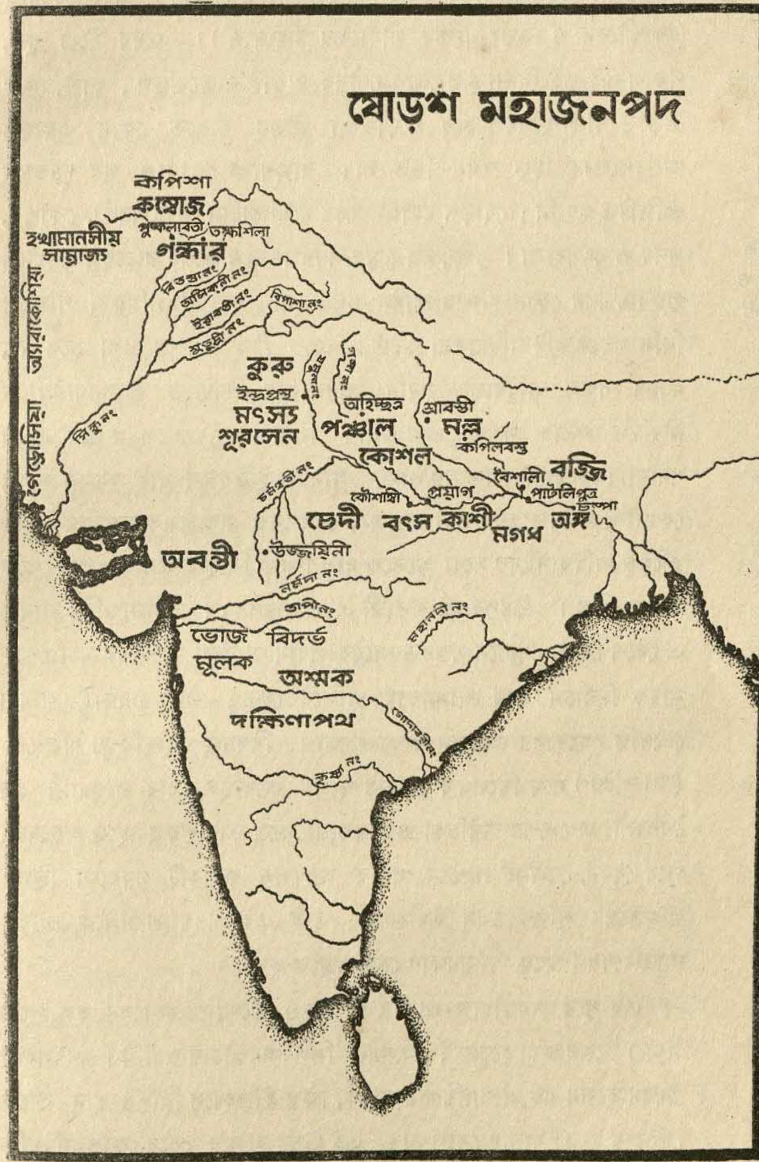
পুরাণ,—অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে এদেশের রাজকাহিনী বিবৃত করার প্রচেষ্টা পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে হয়েছে। পার্জিটর, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি বিদ্বানের এ বিষয়ে গবেষণা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেকার যে সংবাদ আমরা পাই, তাই অসম্পূর্ণ ও অনেকটা অনিশ্চিত। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে সম্পূর্ণ না হলেও কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিত তথ্য মিলতে থাকে। আর চতুর্থ শতাব্দীতে পৌঁছে যেন মনে হয় যে পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। গ্রীকদের লিখিত বিবরণে উল্লেখ রয়েছে মৌর্যশক্তির স্থাপয়িতা চন্দ্রগুপ্তের ; চন্দ্রগুপ্তই এদেশের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি যার জীবনকাল সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হওয়া যায়। যাই হোক, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতক আমাদের ইতিবৃত্তে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তখন ক্রমশ ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান আরও বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য মনে হতে থাকে, রাষ্ট্রিক বিবর্তন বিবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রায় সর্বভারতব্যাপী মৌর্য সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে, বিভিন্ন ধর্মমত, দার্শনিক তত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের পরিচয় মেলে, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অগ্রগতির ক্রমবর্ধমান লক্ষণ চোখে পড়ে।

তথ্যনির্ভর ইতিহাসের আরম্ভ

ভারত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

ষোড়শ মহাজনপদ

এক প্রাচীন বৌদ্ধ রচনা থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে "ষোড়শ মহাজনপদ", অর্থাৎ ষোলটি শক্তিশালী রাষ্ট্র সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া যায়। এই মহাজনপদগুলি হল ঃ অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), কাশী, কোশল (অযোধ্যা), বৃজি (উত্তর বিহার), মল্ল (উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর অঞ্চল), চেদী (যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী), বৎস (এলাহাবাদ অঞ্চল), কুরু (দিল্লী, মীরট, থানেশ্বর), পঞ্চাল (উত্তর প্রদেশের বরেলী, বুদাওন, ফরক্কাবাদ জেলা), মৎস্য (রাজস্থানের জয়পুর), শূরসেন (মথুরা), অশ্মক (গোদাবরীতট), অবন্তী (মধ্যপ্রদেশের মালব অঞ্চল), গন্ধার


ষোড়শ মহাজনপদ
কপিশা
কম্বোজ
পুষ্কলাবতী
তক্ষশিলা
হখামানসীয় সাম্রাজ্য
গান্ধার
আরাকোশিয়া
গেড্রোসিয়া
সিন্ধু নং
কুরু
ইন্দ্রপ্রস্থ
মৎস্য
শূরসেন
অহিচ্ছত্র
শ্রাবস্তী
মল্ল
পঞ্চাল
কোশল
কপিলবস্তু
বৈশালী
বজ্জি
পাটলিপুত্র
চম্পা
অঙ্গ
মগধ
কাশী
বৎস
চেদী
কৌশাম্বী
প্রয়াগ
উজ্জয়িনী
অবন্তী
নর্মদা নং
তাপী নং
মহানদী নং
ভোজ
বিদর্ভ
মূলক
অশ্মক
দক্ষিণাপথ
কৃষ্ণা নং

(উত্তর-পশ্চিমে পেশাওয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলা) এবং কম্বোজ (কাশ্মীরের ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিয়দংশ)। এদের মধ্যে কুরু, পঞ্চাল এই দুই বিখ্যাত রাজ্যের গৌরব অন্তর্হিত হয়েছিল; কাশী, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য হীনবল হয়ে পড়েছিল। উত্তর ভারতে কোন একচ্ছত্র আধিপত্যের চিহ্ন তখন ছিল না; রাজশক্তি কোথাও খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি; ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে প্রধান ছিল অবন্তী, কোশল, মগধ ও বৎসরাজ্য। বৃজি, মল্ল-প্রমুখ গণরাজ্যেরও উল্লেখ রয়েছে; সেখানে পুরুষানুক্রমে কোন রাজার শাসন চলত না, মুখ্য নাগরিকরা পরিষদে মিলিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করত। একে ঠিক গণতন্ত্র বলা চলে না, কারণ সকল অধিবাসী সমান অধিকারের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা রাখত না। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে সমানাধিকারমূলক গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ আমরা ইতিহাসে পাই অনেক পরে; যে গ্রীসকে গণতন্ত্রের জননী বলা হয়, সেখানেও সবচেয়ে গণতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্রেও অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে দাস কিংবা বিদেশী বলে অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী এবং তারপর যে গণরাজ্যগুলি আমরা এ দেশে দেখি, সেখানে সম্ভবত রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্য থেকে নায়ক নির্বাচন করে শাসনকার্য চালিয়ে যেত; এমন ব্যবস্থাই আমরা দেখেছি বুদ্ধদেবের জন্মস্থান শাক্য রাজ্যে। বিখ্যাত লিচ্ছবি-রা বৃজি-দের (বা বজ্জি) সঙ্গে মিলে যে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করেছিল, যার রাজধানী হল বৈশালী, এ দেশের রাষ্ট্রচিন্তা ও ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব সহজে অনুমেয়। পূর্বে যেমন, তেমনই পশ্চিমে পঞ্জাব অঞ্চলেও কয়েকটি গণরাজ্য ছিল। রাজতন্ত্রের শক্তি তখন উদীয়মান; তাই এই গণরাজ্যগুলিকে প্রায়ই আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হত।

সমসাময়িক গণরাজ্য ও তাহার রূপ · *গণরাজ্যের নায়ক* · *গণ-যুক্তরাষ্ট্র*

এর পূর্বে অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের (চণ্ড প্রদ্যোত মহাসেন হল পুরো নাম) উল্লেখ করা হয়েছে; উজ্জয়িনী ছিল অবন্তীর রাজধানী। বৎসরাজ উদয়ন হলেন বহু আখ্যায়িকার নায়ক, কিন্তু ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান তাঁকে দেওয়ার মতো সংবাদ মেলে না। এই উভয় রাজার চেয়ে কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের কথা বৌদ্ধ-কাহিনীর কল্যাণে আমরা অনেক বেশী জানি। কোশলরাজ্য ছিল পুরাণ-কথায় বিশ্রুতকীর্তি ইক্ষ্বাকু বংশের অধিকারে; বৈদিক সাহিত্যে, রামায়ণ-মহাভারতে এর উল্লেখ রয়েছে। এই বংশের এক শাখা শ্রাবস্তী নগরে অধিষ্ঠিত হয়ে শক্তি বিস্তার করতে থাকে; শোনা

প্রদ্যোত · *উদয়ন* · *প্রসেনজিত*

যায় যে কোশল শাক্যদের বশীভূত এবং কাশীরাজ্য অধিকার করেছিল। বুদ্ধদেবের সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের সাক্ষাৎকার বিষয়ক ভাস্কর্য সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। যাই হোক, ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধরাজ বিম্বিসারের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল সবচেয়ে বেশী; কোশল তুলনায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

বিম্বিসার

মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

পুরাণে আছে যে শিশুনাগ-প্রতিষ্ঠিত শিশুনাগ-বংশ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ বিবরণ থেকে এবং অন্যান্য সাক্ষ্য আলোচনা করে মনে হয় যে শিশুনাগ নামক রাজা ছিলেন আরও পরে। গৌতম বুদ্ধের কালে মগধে রাজত্ব করছিলেন হর্যঙ্ক-বংশজ বিম্বিসার (অপর নাম শ্রেণিক)। তাঁর রাজধানী রাজগৃহের সমীপস্থ গিরিব্রজ ছিল প্রস্তর-প্রাচীর-বেষ্টিত এক অতি সুরক্ষিত স্থান। আজ যে নদীকে বলা হয় শোণ, তার নাম ছিল হিরণ্যগর্ভ; চতুর্দিকস্থ অঞ্চল এমন সুজলা, সুফলা ছিল যে বাস্তবিকই সে নদীকে স্বর্ণপ্রসূ মনে করা অসঙ্গত ছিল না। চীনা বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে রাজগৃহে (বর্তমান রাজগির) এক নূতন নগর তিনি নির্মাণ করেন। শাসনব্যবস্থা সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি তখন ঘটেছিল; গঙ্গা নদীতে অসংখ্য পণ্যবাহী নৌকা তখন চলাচল করত। যুদ্ধে বিম্বিসার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেন; হস্তি-বাহিনী ছিল তাঁর সমরশক্তির এক স্তম্ভ। অঙ্গ রাজ্য জয় করে তিনি তাকে মগধের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। প্রসেনজিতের ভগ্নীকে বিবাহ করে যৌতুকস্বরূপ কাশীরাজ্যের একাংশ তাঁর দখলে আসে। বৈশালীর বৃজি-লিচ্ছবিদের সঙ্গেও বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করে ভবিষ্যতে মগধ রাজ্যের উত্তরাভিমুখে বিস্তারের পথ তিনি পরিষ্কার করে দেন। তাঁর রাজ্যকালে মহাবীর এবং বুদ্ধ উভয় মহাপুরুষই মগধে ধর্মপ্রচার করেন। বুদ্ধদেবের তিনি একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন, শোনা যায় যে রাজগৃহে কারণ্ড-বেণুবন নামে একটি উদ্যান তিনি বুদ্ধদেব এবং তাঁর শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করে দেন। বুদ্ধদেব রাজগৃহে কিছুকাল ছিলেন, বুদ্ধের তিরোভাবের পর তাঁর এক প্রধান শিষ্য মহাকশ্যপের আহ্বানে রাজগৃহের কাছেই বৌদ্ধধর্ম-বিশারদদের প্রথম সঙ্গীতি (মহাসম্মেলন) বসেছিল; আজও তাই রাজগৃহ বৌদ্ধদের এক পুণ্য তীর্থ।

বিম্বিসার

রাজধানী

রাজ্যের সমৃদ্ধি

সামরিক শক্তি

রাজ্যের বৃদ্ধি-সাধন

বুদ্ধের আনুগত্য

প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি

অজাতশত্রু

বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে যে পিতাকে বধ করে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলে তাঁর যে কুখ্যাতি, তা কোন কোন পণ্ডিতের মতে অতিরঞ্জিত ও বহুলাংশে অসত্য, কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলা কঠিন। কথিত আছে যে পতিশোকে প্রসেনজিতের ভগ্নী প্রাণত্যাগ করায় প্রসেনজিত পিতৃহন্তা অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বৃজি, মল্ল প্রভৃতি গণরাজ্য প্রসেনজিতের পক্ষে যোগ দেয়। কূটবুদ্ধি, নিপুণ মন্ত্রীদের পরামর্শ ও অবিচল একাগ্রতার জোরে অজাতশত্রু সকল বাধা উত্তীর্ণ হয়ে গণরাজ্যগুলিকে বশীভূত করেন, কোশলরাজ কন্যাদান করে এবং কাশী প্রত্যর্পণ করে সন্ধি প্রার্থনায় বাধ্য হন। এ ভাবে গঙ্গা যে অঞ্চলে প্রবহমান, সেখানে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা ঘটল। গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিগ্রামে অজাতশত্রু দুর্গ নির্মাণ করেন, পরে সেখানেই ইতিহাসকীর্তিত পাটলিপুত্র নগর গড়ে ওঠে। কৌশাম্বীর এক রাজদুহিতাকে বিবাহ করে তিনি নিজের ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করে তোলেন। মহাবীর এবং বুদ্ধের তিরোভাব অজাতশত্রুর শাসনকালেই ঘটেছিল। শোনা যায় যে তিনি কিছুকাল বৌদ্ধদের পরম বৈরী হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত তথাগতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পূর্বে প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। তাঁরই প্রভাব অজাতশত্রুর উপর পড়েছিল শোনা যায়। পরে অজাতশত্রু জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় আন্দোলনেরই সহায় হয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের সঙ্গে যুদ্ধ

পাটলিপুত্রের সূত্রপাত

মহাবীর ও বুদ্ধের তিরোভাব

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

তদানীন্তন ইতিহাসের তথ্য এখনও অনির্দিষ্ট বলে পণ্ডিতদের মধ্যে অজাতশত্রুর পরবর্তী রাজাদের কালানুক্রমিকতা বিষয়ে বাদানুবাদ রয়েছে। সম্ভবত পৌরাণিক বৃত্তান্তের চেয়ে মোটের উপর বৌদ্ধ-কাহিনী নির্ভুল না হলেও এ ব্যাপারে বেশী নির্ভরযোগ্য। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়িভদ্র যখন মগধের রাজা, তখন পাটলিপুত্র নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরে নাকি আসেন অনিরুদ্ধ, মুণ্ড এবং নাগদাসক—এঁরা সকলেই পিতৃহন্তা, আর সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় প্রজারা বুঝি নাগদাসককে নির্বাসনে পাঠিয়ে শিশুনাগ নামে মন্ত্রীকে রাজাসনে বসায়। পুরাণে শিশুনাগকে বিম্বিসার প্রভৃতির পূর্বগামী বলা হয়েছে; কোন কোন ঐতিহাসিক তাই বিম্বিসার-অজাতশত্রুকে শৈশুনাগ-বংশীয় আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত শিশুনাগকে পরবর্তী বলেই মনে করেন। শিশুনাগের পর রাজত্ব করেন কালাশোক (বা কাকবর্ণিন); তিনি সম্ভবত গিরিব্রজ

অজাতশত্রুর পরবর্তী বংশধরগণ

মন্ত্রী শিশুনাগের রাজত্ব লাভ

কালাশোক

থেকে স্থায়ী ভাবে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এঁরই রাজ্যকালে বৌদ্ধদের দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির অধিবেশন বৈশালী নগরে অনুষ্ঠিত হয়। কিংবদন্তী বলে যে আততায়ীর হাতে এঁর মৃত্যু ঘটে, আর সম্ভবত পুত্রেরা তখন অল্পবয়স্ক বলে তাদের সিংহাসনের অধিকারচ্যুত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি

এবার মগধের অধিপতি হলেন নন্দ-কুলজাত এক শূদ্র বীর মহাপদ্ম (বৌদ্ধ মতে নাম হল উগ্রসেন)। এই নন্দ রাজবংশের পরম্পরা এবং রাজ্যকাল সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জৈন বৃত্তান্ত অনুসারে এদের রাজত্ব চলেছিল ১৫৫ বৎসর ধরে ; মনে হয় এই হিসাব অতিরিক্ত দীর্ঘ বলে ভ্রান্ত। পুরাণে আছে যে মহাপদ্ম নন্দ ৮৮ বৎসর (কোন কোন পুরাণে রয়েছে ২৮ বৎসর) আর তাঁর আট পুত্র একত্র ১২ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন ; এখানেও মনে হয় যে মহাপদ্মের পক্ষে একাদিক্রমে ৮৮ বৎসর রাজ্য চালানো অবিশ্বাস্য ঘটনা। বৌদ্ধ-বিবরণ মানলে নন্দবংশের মোট রাজ্যকাল হল মাত্র ২২ বৎসর। এই সংখ্যা ক্ষুদ্র হলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যাই হোক, মহাপদ্ম নন্দ যে প্রকৃতই একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। শূদ্র, ধর্মদ্বেষী ইত্যাদি আখ্যায় নিন্দিত হলেও পুরাণে তিনি 'একরাট' বলে বর্ণিত হয়েছেন। পুরাণ বৃত্তান্তে আছে যে শৈশুনাগবংশের শেষ রাজার ঔরসে এক শূদ্রানীর গর্ভে মহাপদ্মের জন্ম হয়। জৈন কাহিনীতে মহাপদ্মকে এক নাপিতের পুত্র বলা হয়েছে ; গ্রীক রচনা থেকেও এই কিংবদন্তীর কতকটা সমর্থন মেলে। শূদ্র বলে পরিগণিত যে তিনি ছিলেন তা নিশ্চিত ; আর সেজন্যই মগধ সিংহাসনে তাঁর আরোহণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পূর্ব ভারতে 'গঙ্গরিডই' (গঙ্গারাঢ়) 'প্রাসিয়য়' (প্রাচ্য) নামে আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক যে পরাক্রান্ত জাতির কথা গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের বিবরণে আছে, আর্য সভ্যতার বহির্ভূত বাংলা দেশে যাদের বসবাস বলে শূদ্র বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা যাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট, তাদের সঙ্গে নন্দ রাজবংশের সম্পর্ক থাকা হয়তো অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে পরে বাংলার ইতিহাস আলোচনাকালে উল্লেখ করা যাবে। মগধে নন্দবংশের রাজত্বকাল নন্দবংশ সম্পর্কে বিভিন্ন বৃত্তান্ত বৌদ্ধ-বিবরণ পুরাণ জৈন কাহিনী ও গ্রীক রচনা

মহাপদ্ম নন্দ সম্বন্ধে পুরাণ এবং গ্রীক রচনা থেকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—তাঁর জন্মকথা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলেও তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস নিশ্চিত। পুরাণে আছে যে ক্ষত্রিয় শাসনকে নির্মূল করে মহাপদ্ম নন্দের কৃতিত্ব

'একরাট' তিনি 'একরাট' বলে পরিগণিত হয়েছিলেন ; শূদ্ররাজের পক্ষে এমন সাফল্য প্রকৃতই গৌরবব্যঞ্জক। গ্রীকদের কাছ থেকে জানা যায়, যখন আলেকজাণ্ডার এদেশে উপস্থিত হন তখন পঞ্জাবের পূর্ব অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য পাটলিপুত্র থেকে শাসিত হত। শিলালেখ থেকে জানা গেছে যে কলিঙ্গ এবং সম্ভবত আরও কতকটা দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত মহাপদ্মের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মহাপদ্মের পর আটজন নন্দ রাজা হয় একত্র (পুরাণ অনুসারে) কিংবা একাদিক্রমে মগধের সিংহাসনে বসেন। এঁদের মধ্যে সর্বশেষ রাজার নাম ধন-নন্দ। আলেকজাণ্ডার এঁরই রাজ্যকালে ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে হাজির হন। ধন-নন্দের বিপুল সৈন্যবাহিনী, হস্তি-অশ্ব-রথচয়ে সেই বাহিনী ছিল সমৃদ্ধ। সম্ভবত করভার-প্রপীড়িত প্রজাদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে ; শূদ্র বলে রাজবংশ সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রচার করে শত্রুপক্ষ তার মর্যাদাহানি সহজে ঘটাতে পারল। নিশ্চিত এ বিষয়ে কিছু বলা শক্ত, কিন্তু নন্দ সাম্রাজ্যে যে বিপুল অসন্তোষ ছড়িয়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই, আর সম্ভবত সেই অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে (এবং কিংবদন্তী অনুসারে চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলাবাসী এক ব্রাহ্মণের সহায়তায়) চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করে প্রথিতযশা মৌর্য বংশকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিদেশী আক্রমণকারীর উপস্থিতি তখন এমন সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়েছে যে মহাপদ্মের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের সিংহাসনচ্যুত করার দায়িত্ব ঐতিহাসিক প্রয়োজনরূপেই দেখা দিয়েছিল। শক্তি এবং মর্যাদা হারিয়ে নন্দবংশের স্বল্পস্থায়ী সাফল্যের অবসান ঘটল। কিন্তু তাই নিয়ে খেদের কোন কারণ রইল না। মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন ও প্রদীপ্ত অধ্যায়ের সূচনা হল।

গ্রীক-বিবরণ

শিলালেখ

মহাপদ্মের পরবর্তী বংশধর : শেষ সম্রাট ধন-নন্দ

রাজ্যে ধূমায়িত অসন্তোষ

চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক নন্দবংশ ধ্বংস

নন্দবংশ ধ্বংসের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা

ভারতে বিদেশী আক্রমণ—মহামতি আলেকজাণ্ডার

ইতিপূর্বে কয়েকবার ভারতে বিদেশী আক্রমণের কথা উল্লিখিত হয়েছে ; সে বিষয়ে কিছু আলোচনা এখন প্রয়োজন। সিদ্ধার্থ গৌতমের দ্যুতিময় আবির্ভাব যখন ঘটেছে, অথচ তা এ দেশের জীবনে তেমন লক্ষিত হয় নি, তখনই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দেশের অপর প্রান্তে বিদেশীর আগমন ঘটেছিল। পারস্যের সাম্রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে তখন ভারত-সীমান্ত স্পর্শ করেছিল। প্রবলপরাক্রান্ত পারস্য-নরপতি কাইরাস (কুরুষ) পশ্চিমে

পারস্য সম্রাট কাইরাস

পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তার

পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত সমৃদ্ধ ভারতীয় অঞ্চল

গ্রীক স্কাইলাক্স্

বহু গ্রীক-অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে পূর্বে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তা আয়তনের দিক থেকে ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব। সিন্ধুনদ পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন কিনা বলা দুরূহ, কিন্তু বিখ্যাত সম্রাট দরায়ুস্ এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রাখলেন না ; গান্ধার, তক্ষশিলা এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে কুড়িটি প্রদেশের অন্যতম বলে পরিগণিত হল। এই অঞ্চল ছিল এত সমৃদ্ধিশালী যে সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ এখান থেকে সংগৃহীত হতে থাকল, ভারতের স্বর্ণরেণু কর হিসাবে পারস্যের রাজকোষকে পুষ্ট করল। স্কাইলাক্স্ নামে গ্রীকের তত্ত্বাবধানে এক অভিযান তখন প্রেরিত হয়েছিল, সিন্ধুনদ বেয়ে ভারত সাগরে নেমে এসে আবার আরব দেশ প্রদক্ষিণ করে লোহিত সাগর দিয়ে আজ যেখানে সুয়েজ খাল তার কাছে আড়াই বৎসর পর পৌঁছেছিল। স্কাইলাক্স্ একটা বিবরণে লেখেন ; সেটা হারিয়ে গেছে, কিন্তু তা থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি পাওয়া গেছে আর এই হল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদের প্রথম রচনা।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি

ভারতবর্ষে পারস্য সাম্রাজ্যের এই প্রদেশের কেন্দ্র ছিল তক্ষশিলা। এখানে বহুকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, সুদূর কাশী থেকে ছাত্র সেখানে যেত, স্বয়ং কোশলরাজ প্রসেনজিত সেখানে শিক্ষা পেয়েছিলেন শোনা যায়। বেদ, চিকিৎসা-শাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদির অধ্যাপনা সম্বন্ধে তক্ষশিলার যশ চারদিকে বিস্তৃত হয়েছিল। বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে।

পারসীক শাসনের ফলাফল

যোগাযোগ, যাতায়াত ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের প্রসার

সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল ভারতবর্ষের এই অংশ। স্বর্ণরেণুতে যে কর প্রেরিত হত, তার মূল্য নাকি ছিল বৎসরে দেড় কোটি টাকা। কাইরাসের সাম্রাজ্য আলেকজাণ্ডারের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়, আলেকজাণ্ডার যখন এদেশে আসেন তখন ভারত সীমান্তে পারসীক শাসনের সব চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পূর্বে প্রায় দেড়শো বৎসর ধরে সুসভ্য পারস্যের সান্নিধ্য একেবারে নিরর্থক হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্যই বলা যায় যে এর ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ, যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। সম্রাট দরায়ুস্ এবং জরাক্সস্ যখন গ্রীসদেশ জয় করার জন্য অভিযান প্রেরণ করেন, তখন সেই বাহিনীতে কার্পাসবস্ত্র-পরিহিত অনেক ভারতীয়

পারসীক বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য

তীরন্দাজ ছিল; কাহিনীকার হেরোডটস্ বলেন যে হাতী এবং ঘোড়া কিংবা গাধায়-টানা রথও ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল। এদেশে প্রস্তর-স্থাপত্যের উল্লেখ পূর্বতন সাহিত্যে অবশ্য আছে, কিন্তু বহু পণ্ডিত মনে করেন যে ভারতবর্ষে প্রস্তর-শিল্প, স্তম্ভ-নির্মাণ, শিলালিপি খোদন-রীতি এবং 'খরোষ্ঠি' নামে অভিহিত, ডান দিক থেকে বামে লেখা, অক্ষর ব্যবহার ইত্যাদি পারসীক প্রভাবেরই ফল।

শিল্পে পারসীক প্রভাব

গ্রীস এবং ভারতবর্ষ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল পারস্যের মধ্যস্থতায়; পারস্য সাম্রাজ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে হেরোডটস্ ভারতবর্ষের কথা বলেছিলেন। অবশ্য দুই দেশের সাক্ষাৎ পরিচয় হল যখন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মহাবীর আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের শক্তি চূর্ণ করলেন এবং ভারতবর্ষের সীমান্তে সসৈন্যে উপস্থিত হলেন৷ যখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ, তখন দেশ থেকে বেরিয়ে চার বৎসরের মধ্যে এশিয়া মাইনর, সীরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর প্রভৃতি দেশ জয় করে বিপুল পারস্য সাম্রাজ্যেরও তিনি পতন সংঘটন করেছিলেন। তার পর হিন্দুকুশ পার হয়ে ভারতবর্ষের যে অংশ পারস্য সাম্রাজ্যের অংশীভূত হয়েছিল সেখানে তাঁর আক্রমণ আরম্ভ হল। এই অঞ্চলে কোথাও ছিল রাজতন্ত্র, কোথাও বা শিবি, মালব, ক্ষুদ্রক প্রভৃতি জাতির গণরাজ্য, সিন্ধুনদ-তটে পট্টল নামক স্থানে গ্রীসেরই স্পার্টার মতো দ্বৈরাজ্য (দুই রাজার একসঙ্গে মিলে রাজত্ব) লক্ষ্য করল গ্রীক পর্যবেক্ষকরা। ৩২৭-২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দারুণ যুদ্ধ হতে লাগল; আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিরা পুষ্কলাবতী নগরী অধিকার করে পেশাওয়ারের উত্তর-পূর্বে ঘাঁটির সুবিধা পেল। পার্বত্য রাজ্য অশ্মকের সৈন্যদল তুমুল যুদ্ধের পর পরাস্ত হল। এই অঞ্চলে কঠোর প্রতিরোধে সমর্থ কোন বৃহৎ শক্তি ছিল না; ছোট ছোট রাজ্য এবং স্বল্পশক্তি গণরাজ্য যেগুলি ছিল, তাদের অনেকের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। আবার বিদেশীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসের দৃষ্টান্তও মেলে। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি সম্ভবত প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে বিদ্বেষ-প্রণোদিত হয়ে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন, নিজের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলেন।

গ্রীক-ভারতীয় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ

পারস্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন ও ভারত আক্রমণ

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা

রাজা অম্ভি

সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চল নিজের কবলে এনে আলেকজাণ্ডার বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী পুরুরাজ্য আক্রমণ করলেন। বিতস্তা-তটে (ঝিলম) পুরু ও আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলে যে যুদ্ধ হয়, তা

পুরুর রাজ্য আক্রমণ

ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক সৈন্য নিয়ে পুরুর চতুরঙ্গ বাহিনী সহজে পরাস্ত হয় নি। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের জন্মভূমি ম্যাসিডনে অশ্বারোহী সৈন্যের যুদ্ধকৌশল অপূর্ব বিকাশ লাভ করেছিল, তাই যে হাতী দেখে বিদেশীরা প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাদেরই ঝটিতি আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করতে তারা পেরেছিল, নদীতটের নরম মাটিতে রথগুলিও বিশেষ কাজ দিতে পারে নি। ভীষণ সঙ্ঘর্ষের পর হিন্দু সৈন্য-দলের পরাজয় ঘটল, হস্তিপৃষ্ঠারূঢ় পুরুরাজ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে শত্রুহস্তে বন্দী হলেন। "আমার কাছে আপনি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন?" বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের এই প্রশ্নের উত্তরে পুরু বলেন দৃপ্তস্বরে, "রাজার প্রতি রাজা যেমন ব্যবহার করে, আমিও তাই আশা করি।" পূর্বেই পুরুর অনমনীয় তেজ আলেকজাণ্ডারের অজানা ছিল না; যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর অসমসাহসও তিনি দেখেছিলেন। বন্দী অবস্থাতেও মনোবল এত অটুট দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে পুরুকে রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং নানা উপঢৌকন দিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এই গল্পে শুধু পুরুর সাহস আর আলেকজাণ্ডারের মহানুভবতা নয়, দিগ্বিজয়ী গ্রীক-বীরের চরিত্রে যে কি নিপুণ বিচক্ষণতা ছিল তাও দেখা যায়। আলেক-জাণ্ডারের বিজয় অভিযানে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করতে এবং ভারতবর্ষীয়দের পরাস্ত করতে পূর্বের চেয়ে ঢের বেশী বেগ পেতে হয়েছিল। পুরুকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে দলে টেনে নেওয়া কূটনীতির দিক থেকে তাঁর পক্ষে অপরিহার্য ছিল।

ভারতীয় সৈন্যের বিপর্যয়

পুরুর পরাজয় ও বন্দিত্ব

পুরুর তেজস্বিতা

আলেক-জাণ্ডারের মহত্ত্ব ও বিচক্ষণতা

এর পর আলেকজাণ্ডার আরও কিছু পূর্বে বিপাশা (বিয়াস্) নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি শুনেছিলেন মগধের কথা, গঙ্গা নদীর কথা, পাটলিপুত্রের কথা; ভারতের পূর্ব প্রান্তে যে বিরাট শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে খর্ব করার অভিলাষ তাঁর ছিল, পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার কামনা তিনি পোষণ করলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল তখন যুদ্ধক্লান্ত; ভারতবর্ষে যুদ্ধজয় যে সহজ নয় তা তারা বুঝেছিল, পাটলিপুত্রে ধন-নন্দ আড়াই লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে প্রস্তুত শুনে তারা বেঁকে বসল, অনেক লোভ দেখানো সত্ত্বেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রাজী হল না। তখন আলেক-জাণ্ডার প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলেন। দক্ষিণ দিকে এগিয়ে সিন্ধুনদের মোহনার কাছে পৌঁছাবার আগে মালব জাতির সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন; তাদের পরাজিত করে দ্বৈরাজ্য পট্টল নগরে প্রবেশ

আলেক-জাণ্ডারের প্রত্যাবর্তন

করলেন। এই দিগ্বিজয়ীর মনে কল্পনা ও জ্ঞানপিপাসার অন্ত ছিল না; নিজে স্থলপথে বেলুচিস্তানের মরুভূমি পার হয়ে পারস্যে ফিরে গেলেন, কিন্তু নৌবাহিনীকে হুকুম দিলেন নিয়ার্কস্-এর নেতৃত্বে সমুদ্রপথে প্রাক্তন নৌসেনাপতি স্কাইলাক্সের মতো ফিরে যেতে। এর প্রায় দুই বৎসর পরে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়, ইতিহাসে এক বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক যেন নির্বাপিত হয়ে যায় (৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। ভারতজয়ের পরিকল্পনা তাঁর ব্যর্থ হয়েছিল; স্বদেশ থেকে বহু দূরে রণক্লান্ত সৈন্যদল নিয়ে ভারতবর্ষের মতো দেশ জয় সহজ তো নয়ই, সম্ভব ছিল না; অনৈক্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তাঁকে জীবনের সবচেয়ে জোরালো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। তাই অল্পকাল ভারতবর্ষে অতিবাহিত করে এই মহাবীরকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল; ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিঞ্চিৎ চমক সৃষ্টি করেই তাঁকে ফিরতে হল, এদেশে তেমন দাগ কেটে যেতে তিনি পারলেন না।

সমুদ্রপথে নৌবাহিনীর প্রত্যাবর্তন

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু

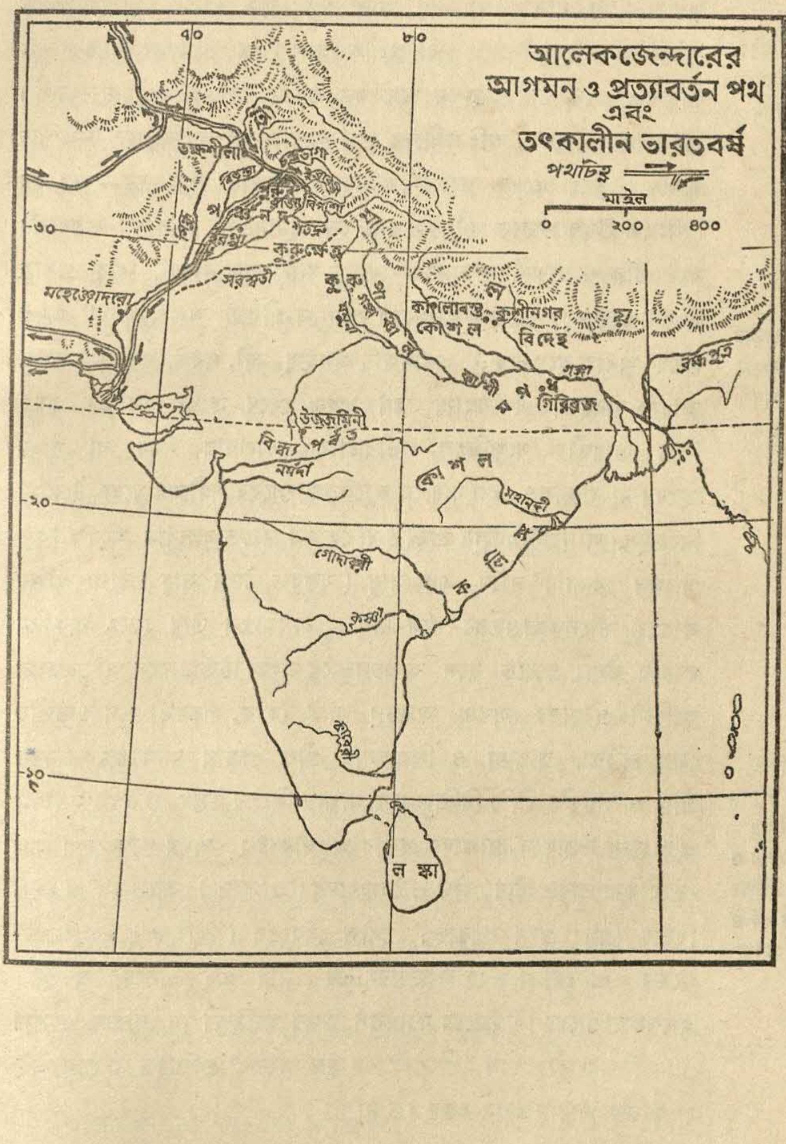
ভারতজয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা

ভারতবর্ষের যে অঞ্চল তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন, সেখানে গ্রীক শাসন যাতে স্থায়ী হয় সে ইচ্ছা আলেকজাণ্ডারের খুবই ছিল। তাই কয়েকটি প্রদেশ তিনি গঠন করে যান, আর তার শাসনভার কতকটা দেন তক্ষশিলার রাজা অম্ভির মতো ব্যক্তির হাতে; পুরুরাজ্যের মতো যাদের তিনি মিত্রতার আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেখানেও গ্রীকশক্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু পঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে গ্রীক অধিকারের সমস্ত চিহ্ন অচিরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাতে অবলুপ্ত হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের আকাশে জ্বলন্ত ধূমকেতুর মতো আলেকজাণ্ডারের আবির্ভাব হয়েছিল; গ্রীকদের কাছে যা বিরাট এক ঘটনা, তা এদেশে যেন মনে হয়েছিল অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর। ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও তাঁর কোনও উল্লেখ নেই; শুধুমাত্র খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে সিংহলে লিখিত মহাবংশে আছে যে ১৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অনুরাধাপুরের বিখ্যাত স্তূপ যখন উৎসর্গীকৃত হয় তখন বহু ভিক্ষু আসে "যবন-নগরী অলসন্দ" থেকে—তিনি যে সতেরোটি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন করেন, হয়তো আফগানিস্তান বা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে তারই মধ্যে একটা হল এই "অলসন্দ"।

গ্রীক অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা

ভরতের ইতিহাসে গ্রীক-বিজয়ের অকিঞ্চিৎকরতা

কিন্তু দরায়ুস এবং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ যে কোনও প্রভাবই রেখে যায় নি মনে করা হবে নিতান্ত ভুল। প্রত্যক্ষ ফল খুব বেশী লক্ষ্য না করলেও পরোক্ষ ফল বড় কম হয় নি। পারস্য আক্রমণের পর থেকে


আলেকজেন্দারের
আগমন ও প্রত্যাবর্তন পথ
এবং
তৎকালীন ভারতবর্ষ
পথচিহ্ন
মাইল
০ ২০০ ৪০০
৭০
৮০
৩০
২০
১০
তক্ষশীলা
শতদ্রু
কুরুক্ষেত্র
সরস্বতী
মহেঞ্জোদারো
কপিলাবস্তু
কুশীনগর
কোশল
বিদেহ
গঙ্গা
ব্রহ্মপুত্র
গিরিব্রজ
উজ্জয়িনী
নর্মদা
কোশল
গোদাবরী

পারস্যের মাধ্যমে প্রথম যোগাযোগ

প্রতীচ্য জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ; যে দেশ সম্বন্ধে কিংবদন্তী শুনে শুনে একটা মোহ জন্মেছিল, সেই ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগ স্থাপন হল তখন থেকে। পাশ্চাত্য দেশ ও ভারত-বর্ষের মধ্যে যাতায়াতের পথ ক্রমশ সুগম হতে থাকল, বাণিজ্যসম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হল। ব্যাক্‌ট্রিয়াতে (বা বহ্লীক দেশে) এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গ্রীকদের বসতি স্থাপন আলেকজাণ্ডারের অভিযানেরই ফলস্বরূপ। এই যবন ("যোন") অধিবাসীদের কথা অশোকের শিলালিপিতে উল্লিখিত রয়েছে, এবং এদের ভারত ইতিহাসে অবদান একেবারে নগণ্য নয় (আজও উত্তর ভারতে গ্রীসকে বলা হয় "য়ুনান")। পরস্পর সংস্পর্শের ফলে গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যে আদানপ্রদান ঘটে, তার প্রভাব ও মূল্য প্রভূত। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যে গ্রীকরা আসে, তারা এদেশ দেখে অবাক হয়ে যায় ; এখানকার জলবায়ু, নদী, পর্বত, জন্তু-জানোয়ার, আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস, অর্থ সম্পদ দেখে তারা বিস্মিত হয়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিকে গভীরভাবে বোঝবার সময় বা সাধ্য তাদের না থাকলেও দেখা যায় যে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গীদের মধ্যে টলেমি, নিয়ার্ক্‌স, অ্যারিস্টবিউল্‌স প্রভৃতি যা লেখেন তাতে মূল্যবান অনেক কিছু আছে। কল্যাণ নামে এক সাধু (সম্ভবত জৈন সাধু) রাজা অম্ভির আগ্রহে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যান ; ব্যাবিলনে তাঁর হঠাৎ একদিন মরবার ইচ্ছা হয়েছে বলে অবিচলভাবে জ্বলন্ত চিতায় বসে আত্মহত্যার কাহিনী গ্রীকদের লেখায় আছে! যাই হোক, পরবর্তী যুগে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য ও শিল্পকলায় গ্রীক প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নয়। গ্রীক ও ভারতীয় রীতি মিশ্রিত হয়ে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব ঘটে। মুদ্রাঙ্কন ও অনুরূপ শিল্পকর্মে গ্রীকদের প্রভাব অনস্বীকার্য। অপর পক্ষে দেখা যায় যে গ্রীকরা ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের (ভাগবত) কাছে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে; বৌদ্ধ মেনাণ্ডর (মিলিন্দ) এবং গরুড়-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠাতা হেলিওডোরস্‌-এর নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের ফলস্বরূপ উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া থেকে সিন্ধুনদতীর পর্যন্ত "গ্রীসেরই বহু হ্রস্ব সংস্করণ" প্রতিষ্ঠিত না হলে এই সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান সম্ভব হত না।

গ্রীকদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসতি স্থাপন

গ্রীক ও ভারতীয় — উভয় সভ্যতার পারস্পরিক আদানপ্রদান

জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য ও শিল্প-কলার উপর গ্রীক প্রভাব ও গ্রীকদের উপর ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব

মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ইতিহাসে পরোক্ষ হলেও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলের উল্লেখ করতেই হয়। গ্রীক অভিযানের পর দেখা গেল যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পঞ্জাবের ছোট ছোট রাজ্যগুলির শক্তি একেবারেই দৃঢ় নয়, আর জানা গেল যে সামরিক ও সাংগঠনিক কৃতিত্বের জোরে তাদের আয়ত্তে আনা সম্ভব। পাটলিপুত্রের রাজসভা থেকে বিতাড়িত হয়ে তক্ষশিলায় থাকার সময় চন্দ্রগুপ্ত নামে এক যুবা তাই সারা দেশে বিপুল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই চন্দ্রগুপ্তের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের দিকে এবার আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। তার পূর্বে স্মরণ রাখব যে বিশ্ব-ইতিবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গুরুত্ব হল প্রকৃতই প্রভূত। সারা গ্রীস ম্যাসিডন রাজ্যের অধিকারে যাওয়ার পর, এবং তদানীন্তন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের (পারসীক) পতন হওয়ার ফলে দেখা গেল যে ক্রমশ ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী ইতালী দেশের রোম নগরের উদ্যোগে এক বিরাট শক্তির উদ্ভব হচ্ছে, আর ভারতবর্ষে মৌর্য সাম্রাজ্য রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করছে। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হতে না হতে দেখা গেল যে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রোমের সাম্রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াতে আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারীরা গ্রীক ঐতিহ্যকে নূতন পরিস্থিতিতে নূতন রূপ দিচ্ছে, আর ভারতবর্ষে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের উদ্যোগিতার ফলে আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা অবয়ব গ্রহণ করছে। মাঝে মাঝে বিস্মৃত হতে থাকলেও ঐ পরিকল্পনা কখনও আর ভারত-মানস থেকে বিলুপ্ত হয় নি। মৌর্য সাম্রাজ্য শুধু যে আয়তনে সুবিশাল বলে স্মরণীয় হয়ে আছে তা নয়: দেশ শাসনে, অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন ও বিধিব্যবস্থায়, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে তখন যেন এক নবসৃষ্টির শুভক্ষণ এ দেশের ইতিহাসে উপস্থিত হয়েছিল।

বিশ্ব ইতিহাসে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের গুরুত্ব

ভারতের ইতিহাসে নব সৃষ্টির লক্ষণ

আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বেই পঞ্জাবে ও সিন্ধু অঞ্চলে স্থানীয় ভিত্তিতে বিদ্রোহ ঘটেছিল; তক্ষশিলাবাসী ব্রাহ্মণ চাণক্যের মনে তখনই নাকি বিদেশী শক্তিকে উচ্ছেদ করার সঙ্কল্প জন্ম নিয়েছিল। নন্দ

চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক গ্রীক-বিতাড়ন

বংশের পতনের ফলে মগধে যে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটে, সম্ভবত তার পরেই চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের বিদূরিত করার কাজে নামেন; কিন্তু ঘটনার কালানুক্রমিকতা সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত হওয়া কঠিন। পুরাণে বলা হয়েছে যে চন্দ্রগুপ্ত মুরানাম্নী এক নীচজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; কারও কারও মতে তিনি নন্দবংশেরই এক শাখার সন্তান; বৌদ্ধ কাহিনীতে, এবং পরবর্তী তাম্রলেখে, মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত যে শূদ্র ছিলেন, তা বলা যায় না; কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে ধর্মবিষয়ে তাঁর গোঁড়ামি ছিল না, গ্রীক সেলিউকস্-এর কন্যাকে বিবাহ করতে কিংবা শেষজীবনে জৈন সম্প্রদায়কে সমর্থন জানাতে তিনি সঙ্কুচিত হন নি।

চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন মত

চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে গ্রীক লেখকগণ

গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে জানা যায় যে এক সময় চন্দ্রগুপ্ত ("Sandro Kottos") আলেকজাণ্ডারের শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বিরাগভাজন হয়ে পলায়ন করেন, এবং কিছুকাল পরে গ্রীকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সমবেত করে বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন। ভারতবর্ষ থেকে গ্রীকদের বিতাড়ন এবং মগধের রাজশক্তি অধিকার, এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনার কৃতিত্ব প্রধানত চন্দ্রগুপ্তের প্রাপ্য।

চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে কিংবদন্তী

কথিত আছে যে চন্দ্রগুপ্তের বাল্যকাল কেটেছিল ব্যাধ, পশুপালক প্রভৃতির সঙ্গে। আলেকজাণ্ডারের শিবির থেকে পলায়নের সময় নাকি তাঁর সঙ্গে বিন্ধ্য পর্বতের অরণ্য অঞ্চলে চাণক্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল; চাণক্য তক্ষশিলা থেকে পাটলিপুত্রে গিয়ে নন্দরাজ কর্তৃক অপমানিত হয়ে তখন প্রতিহিংসার কথা চিন্তা করছিলেন। মাটির নীচে লুকানো অর্থের সন্ধান পেয়ে চাণক্য নাকি তাই দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের জন্য এক সৈন্যবাহিনী সংগ্রহে সাহায্য করেন এবং সর্বতোভাবে পরামর্শ দিতে থাকেন। চাণক্য (বা কৌটিল্য) নামের খ্যাতি ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে চলে আসছে; চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার কথা এ দেশের মানুষের মনে এমন সুদৃঢ় স্থান নিয়ে আছে যে চাণক্যের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা অসম্ভব না হলেও সঙ্গত ও সমীচীন নয় বলা অন্যায় হবে না।

চাণক্য কি ঐতিহাসিক পুরুষ?

চাণক্যের মন্ত্রণায় নন্দবংশের ধ্বংসসাধন করে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসন আরোহণ করেন। তার পর এশিয়াতে আলেকজাণ্ডারের ক্ষমতার উত্তরাধিকারী সেনাপতি সেলিউকস্ ভারতে গ্রীক আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার

ভারতে গ্রীক আক্রমণ

প্রচেষ্টায় যুদ্ধ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের কাছে তাঁকে পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হতে হয়। গ্রীক লেখকেরা খুব স্পষ্টভাবে এই পরাজয়ের কথা লেখে নি, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতবর্ষে গ্রীক আধিপত্যের দাবি ছেড়ে দিয়ে সেলিউকস্‌কে যেভাবে সন্ধি করতে হয় এবং কান্দাহার, কাবুল ও হিরাট, এই তিনটি প্রদেশ যেভাবে তিনি চন্দ্রগুপ্তের হাতে অর্পণ করেন, তা থেকে মনে হয় যে যুদ্ধে পরাস্ত না হলে এমন ঘটনা সম্ভব ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ থেকে সেলিউকস্‌কে পাঁচশত হস্তী উপহার দেওয়া হয়। উভয় শক্তির মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকস্-এর কন্যাকে বিবাহ করেন; মেগাস্থিনীস পরে গ্রীক রাজদূত হয়ে পাটলিপুত্রের রাজসভায় যোগ দেন এবং এদেশে তাঁর পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান এক গ্রন্থ রচনা করেন।

সেলিউকস্-এর পরাজয়

চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি

সেলিউকস্-চন্দ্রগুপ্ত মৈত্রী

মেগাস্থিনীস

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য সম্বন্ধে "মুদ্রারাক্ষস" নাটকে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ম্যাসিডনের যোদ্ধারা একদা সব দেশে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পেরেছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে তাদের প্রতিহত হতে হয়, চন্দ্রগুপ্তের হাতে তো তারা পরাস্তই হয়েছিল। উত্তর পশ্চিমে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি খুবই লক্ষ্য করার মতো; পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে পুষ্যগুপ্ত নামে চন্দ্রগুপ্তের এক রাজ্যপাল গির্নার নামক স্থানে যে সুদর্শন হ্রদ নির্মাণ করেন তা বহু শতাব্দী ধরে পূর্তকর্মের এক অপূর্ব নিদর্শন বলে কীর্তিত হয়েছিল। পশ্চিম সীমা থেকে মগধের পূর্ব-প্রান্ত পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য প্রসারিত ছিল; দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, তবে আরও সুদূর দক্ষিণে রাজ্যপ্রসারের যে সংবাদ পাওয়া যায় তা নির্ভরযোগ্য নয়। জনশ্রুতি আছে যে শেষজীবনে চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্মে দীক্ষিত হন, এবং মহীশূরস্থ শ্রাবণ বেলগোলায় তাঁর দেহান্ত ঘটে, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। যাই হোক, প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করে আনুমানিক ৩০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়, তখন তাঁর উত্তরাধিকারস্বরূপ রইল এমন এক সাম্রাজ্য যা আয়তনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অজ্ঞাতপূর্ব। এ দেশের কাব্যে, নাটকে, কাহিনীতে যে তাঁর বিপুল কৃতিত্ব কীর্তিত হয়ে এসেছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মৌর্য সাম্রাজ্যের সংগঠন ও তদানীন্তন সভ্যতার কথা পরে যখন আলোচনা করা যাবে, তখন আমরা বুঝব যে বাস্তবিকই সেই কীর্তির মূল্য কত।

ভারতীয় সামরিক শক্তির উৎকর্ষ

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু (খ্রীঃ পূঃ ৩০১)

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

সম্রাট বিন্দুসার

বিন্দুসারের রাজত্বকাল

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার (অপর নাম 'অমিত্রঘাত' অর্থাৎ শত্রুহন্তা) পিতার মৃত্যুর পর মগধের সিংহাসন আরোহণ করে সম্ভবত পঁচিশ বৎসর রাজ্য করেছিলেন। তাঁর রাজ্যকালের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প। তবে মনে হয় যে পিতা যে গুরুভার তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মর্যাদা বিন্দুসারের হাতে অক্ষুণ্ণ ছিল, সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি অটুট ছিল।

তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন

শোনা যায় যে তক্ষশিলা অঞ্চলে এক বিদ্রোহ ঘটলে তিনি কঠোর হস্তে তা দমন করেন। কারও কারও মতে দাক্ষিণাত্যকে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করার কাজে চন্দ্রগুপ্তের চেয়ে তাঁর অবদান হল অধিক, কিন্তু এর স্বপক্ষে তেমন যুক্তি বা প্রমাণ নেই।

গ্রীক রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা

বিন্দুসারের রাজত্বে প্রধান অকাট্য তথ্য হল এই যে পিতার নীতি অনুসারে গ্রীক রাজাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুতা বজায় রেখেছিলেন।

সিরিয়ার রাজা এণ্টিয়োকস্

সেলিউকস-এর পুত্র এণ্টিয়োকস্ সিরিয়ার রাজা হিসাবে বহু যশ লাভ করেছিলেন ; তিনি বিন্দুসারের রাজসভায় ডিমাকস্ নামে দূত পাঠান, উভয় রাজার মধ্যে যে পত্র ব্যবহার হতে থাকে, তা থেকে মাঝে মাঝে বেশ মজার খবর পাওয়া গিয়েছে।

মিশরের রাজা টলেমি

মিশরের বিখ্যাত গ্রীক রাজা টলেমি বিন্দুসারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। প্রতীচ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সম্পর্ক যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব দাবি করতে পারে।

সম্রাট অশোক

সিংহাসন অধিকার

সম্ভবত ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হলে পুত্র অশোক মগধ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। অশোকের রাজ্যাভিষেক হয় চার বৎসর পরে ; এই বিলম্ব নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করেছেন। শোনা যায় যে পিতার জীবদ্দশায় অশোক তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য পরিচালনায় লিপ্ত ছিলেন। পিতা মৃত্যুশয্যায় জানতে পেরে উজ্জয়িনী থেকে তিনি পাটলিপুত্রে উপস্থিত হন এবং পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।

ভ্রাতৃহত্যা সম্পর্কীয় কিংবদন্তী বিচার

ভাইবোন অশোকের ছিল অনেক ; কিন্তু মনে হয় যে কোনও কোনও কাহিনীতে নিরানব্বইজন ভাইকে অশোক হত্যা করেছিলেন বলে যে রটনা আছে তা কাল্পনিক। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর চরিত্রে যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছিল, চণ্ডাশোক কেমন করে

ধর্মাশোকে পরিণত হলেন, একথা প্রমাণ করার জন্য ঐ ধরনের উদ্ভাবন ও অতিরঞ্জন কাহিনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে হয়তো একথা সত্য যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষ্যে অশোকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ঘটে; পরে শিলালিপিতে, আত্মীয়স্বজনের প্রতি দুর্ব্যবহারের রেওয়াজ কিছুকাল ধরে বাড়ছে—একথা যে অশোক বলেছিলেন, তার হয়তো বিশেষ একটা তাৎপর্য রয়েছে।

'দেবানাম্ পিয় পিয়দসি'

অশোকের শিলালিপিতে সাধারণত তাঁকে বলা হয়েছে—"দেবানাম্ পিয় পিয়দসি" (দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী): পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের নাকি এই "প্রিয়দর্শী" উপাধি প্রচলিত ছিল। "দেবানাম্ প্রিয়" এই আখ্যারও গুরুত্ব রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের কোনও স্বকীয় দেবতা ছিল না; তাই দেবগণ বলতে হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী প্রচলিত দেবতার কথাই ভাবতে হবে। কোনও কোনও পণ্ডিত অশোকের সঙ্গে তুলনা করেছেন রোমান সম্রাট কন্‌স্টান্টাইন-এর; কিন্তু কন্‌স্টান্টাইন যেভাবে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাকে সাম্রাজ্যের ধর্ম বলে ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষে তার অনুরূপ কিছু ঘটে নি। গৌতম বুদ্ধের মতোই তাঁর এই সম্রাট-ভক্ত হিন্দু ভারতের ঐতিহ্য থেকে চ্যুত হন নি; তাই "দেবগণের প্রিয়" উপাধি গ্রহণে কোনও সঙ্কোচ অশোকের মনে উদয় হয় নি, তাই ব্রাহ্মণ, শ্রমণ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীকে সমভাবে দান করার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি তিনি দেখেন নি।

সম্রাট কন্‌-স্টান্টাইন ও সম্রাট অশোক

শিলালেখগুলি তথ্যসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক উপাদান

ধারাবাহিকভাবে, কালক্রম বজায় রেখে, অশোকের রাজ্যকালের বিবরণ আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর কলিঙ্গ বিজয়, সাম্রাজ্য সীমা, বৈদেশিক সম্পর্ক, শাসনব্যবস্থা, ধর্মপ্রচার কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে বহু সংবাদ আমরা রাখার সুযোগ পেয়েছি। পর্বতগাত্রে, গুহাভ্যন্তরে, শিলা ফলকে এবং স্তম্ভোৎকীর্ণ অবস্থায় যে শিলালেখ বহু বিদ্বানের একান্ত নিষ্ঠায় আবিষ্কৃত ও অধীত হয়েছে, যার পাঠোদ্ধার বিনা মানব-সভ্যতার এক প্রোজ্জ্বল অধ্যায় অজ্ঞাত থেকে যেত, সেই লেখমালা থেকে আমরা বহু তথ্যের সন্ধান পেয়েছি এমন একজন ব্যক্তি (ও তাঁর যুগের) সম্বন্ধে যিনি শুধু রাজকুলে নয়, সর্বদেশ ও সর্বকালের মহাপুরুষদের মধ্যে এক সমুন্নত স্থান নিয়ে আছেন।

অশোকের কলিঙ্গ বিজয়

সিংহাসন আরোহণ করে অশোক প্রথমে গতানুগতিকভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। অভিষেকের পর থেকে অষ্টম বর্ষে তিনি কলিঙ্গ বিজয়ে উদ্যোগী হন। এই যুদ্ধকালীন যে ভয়াবহ ব্যাপার তাঁর

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এবং ধর্মবিজয়-নীতি ঘোষণা

দৃষ্টিগোচর হয় তাতে তাঁর মর্ম মথিত হয়ে ওঠে, নিদারুণ যন্ত্রণা ও অজস্র লোকক্ষয় তাঁর হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে। পরম অনুশোচনায় তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কখনও এ ভাবে যুদ্ধ জয়ের চেষ্টায় অসহনীয় বেদনা ও প্রাণনাশ ঘটাবেন না। কলিঙ্গ যুদ্ধের স্মারকরূপে ত্রয়োদশশিলা-লিপিতে অশোকের এই হৃদয়-পরিবর্তনের উল্লেখ আছে। তখন থেকে অহিংসাকে পরমধর্ম বলে মেনে তিনি যুদ্ধজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের নীতি ঘোষণা করেছিলেন। এমন ঘটনা শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের ইতিহাসে একেবারে অনন্য।

ধর্মপ্রচার ও প্রচারিত 'ধম্ম'

রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ

কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে অশোক শিবের ভক্ত ছিলেন বলা হয়েছে; রাজতরঙ্গিণী বহু পরে রচিত, ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের দিক থেকেও সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু অশোকের দেবদ্বিজে ভক্তি থাকা অবিশ্বাস্য নয়; বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পরও ব্রাহ্মণ, এমন কি আজীবিক প্রভৃতির প্রতি তাঁর বদান্যতা কমে নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। যাই হোক, কথিত আছে যে কলিঙ্গ বিজয়ের পর সন্ন্যাসী উপগুপ্ত তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। কারও কারও মতে তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দিয়ে স্বয়ং ভিক্ষু হয়েছিলেন। অবশ্য রাজাসন তিনি পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু পূর্বাভ্যস্ত "বিহার-যাত্রা" অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে বিলাসিতার পূর্ণ উপকরণ নিয়ে পরিভ্রমণ, পরিহার করে "ধর্মযাত্রা" অর্থাৎ তীর্থ-পরিক্রমা এবং বুদ্ধের শিক্ষা সর্বত্র প্রচারের কাজে নেমেছিলেন। জনসাধারণের সর্বস্তরে ধর্মের বাণী বিতরণ করে যে আনন্দ তিনি পেতেন, তার বিবরণও পাওয়া গেছে। শাক্য-মুনির জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে তিনি গেলেন, আর সর্বত্র ধর্মের ও সদাচারের ব্যাখ্যা করলেন। সন্মার্গ যে সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত, সেজন্য যে সমাজে উচ্চ স্থান কিংবা বিশিষ্ট শিক্ষাদীক্ষার কোনও প্রয়োজন ছিল না, একথা তিনি দেশময় ছড়িয়ে দিলেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, পর্বতগাত্রে ও প্রস্তর স্তম্ভে "ধম্ম লিপি" খোদিত করে দিলেন, সহজ প্রাকৃত ভাষায় তা সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়ে রইল। "রাজুক", "প্রাদেশিক", "যুক্ত" প্রভৃতি নামধেয় যে কর্মচারীর দল বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিযুক্ত ছিল, তাদেরও ধর্ম প্রচারের কাজে অশোক আহ্বান করলেন। শুধু তাই নয়, "ধর্মমহামাত্র" নামে একদল নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করে

ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

অশোকের ধর্মযাত্রা

'ধম্ম লিপি'

রাজপুরুষদের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার

ধর্মমহামাত্র

তাদের ধর্মের মূল নীতিগুলি প্রচারের আদেশ দিলেন। সকল রাজপুরুষকে নির্দেশ দেওয়া হল যাতে আলস্য ও অবহেলা পরিহার করে সর্বদা প্রজা-সাধারণের কল্যাণ চেষ্টায় তারা নিযুক্ত থাকে। *রাজপুরুষদিগকে নির্দেশ*

বার বার অশোকের শিলালিপিতে "ধম্ম" শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সুত্তপিটকের অংশীভূত বিখ্যাত নীতিসঞ্চয়ন "ধম্মপদ" থেকে বহু বাণীর উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু মাত্র বৌদ্ধধর্ম নয়, প্রাচীন ভারতের ধর্মশিক্ষা থেকেও আহরণ করে অশোক সেই নীতি ও উপদেশ প্রচার করেন। তাই ধর্মাচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মাতাপিতা ও স্থবির বৃদ্ধের শুশ্রূষা, হিংসা ও প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা, আত্মীয়-বন্ধু ও ব্রাহ্মণ-শ্রমণদের প্রতি সম্যক্ ব্যবহার, দাস-ভৃত্য প্রভৃতির প্রতি সমুচিত আচরণ, অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা বা বিরূপ সমালোচনা বর্জন প্রভৃতি কাজেই ধর্মের প্রকাশ ঘটে। দয়া, দান, দাক্ষিণ্য, সত্য, শুচি ও নম্রতার নীতিকে শিরোধার্য করে ক্রোধ, চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি পরিহার করে চলতে পারলেই প্রকৃত ধর্মাচরণ করা হবে। সকলের সঙ্গে মিলে থেকে ("সমবায়"), চিত্তচাঞ্চল্যকে প্রশমিত করে ("সংযম"), মনকে বিশুদ্ধ রাখতে পারলে ("ভাবশুদ্ধি") যথার্থই ধর্মজীবন পালন করা হবে। ধর্মের সারবস্তু সংগ্রহ করে, মানুষের পরস্পর-সংশ্লিষ্ট জীবনে "শীল"-এর উপর জোর দিয়ে, সহজ ভাষায় ও ভাবে অশোকের শিক্ষা প্রচারিত হয়েছিল। এখানে কোথাও সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নেই—সুনীতি, সদাচার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি সর্বগ্রাহ্য বিষয়ই অশোকের "ধম্ম"-এ রয়েছে। সর্বজন যাতে সুখী হয়, সর্বজনের হিতার্থে যাতে মানুষ নিজের শক্তি নিয়োজিত করে, সততার পরিবেশ যাতে সমাজ-জীবনকে স্নিগ্ধ ও শান্ত করে রাখে, এই ছিল অশোকের একান্ত কামনা। *'ধম্ম'-এর স্বরূপ* *'ধম্ম'-এর তাৎপর্য*

রাজা অশোক

রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে অশোকের যে ধারণা ছিল, তারও মহিমা কম নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে আলস্য ও অবহেলা ত্যাগ করে জনকল্যাণে লিপ্ত থাকার নির্দেশ সমস্ত রাজপুরুষকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নিজেকেও কর্তব্য পালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ রাখতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। প্রজারা যে কোনও সময় তাঁর কাছে অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে পারত ; রাজা অন্তঃপুরে বা যেখানেই থাকুন না কেন, প্রজাদের ফিরিয়ে *রাজপুরুষদের জনকল্যাণে লিপ্ত থাকার নির্দেশ* *প্রজা সম্পর্কে অবারিতদ্বার*

'রাজুক'দের উপর নির্দেশ

দেওয়া হত না। "রাজুক" (বা রজ্জুক) নামধেয় যে কর্মচারীরা সম্ভবত বিভিন্ন জেলায় বিচার এবং ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের সম্বন্ধে অশোকের এক স্তম্ভলিপিতে খোদিত আছে: "সন্তানকে যেমন সুনিপুণ ধাত্রীর হাতে দিয়ে লোকে আশ্বস্ত হয়, ঠিক সেইরকম 'রজ্জুক'-দের নিযুক্ত করেছি, যাতে দেশবাসীর মঙ্গল ও সুখের জন্য একাগ্র চিত্তে ('অবিমনা') তাঁরা কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন।"

ধৌলির শিলালিপিতে অবিস্মরণীয় ঘোষণা

ধৌলির বিখ্যাত শিলালিপিতে আছে অশোকের অবিস্মরণীয় ঘোষণা: "সকল মানুষ আমার সন্তান ('সবে মুনিসে পজা মমা')। নিজের সন্তান সম্বন্ধে আমি যেমন চাই যে তাদের হিত ও সুখ হোক, সকল মানুষ সম্বন্ধেও আমার তাই ইচ্ছা।"

রাজধর্মের আদর্শ

কেবল শাসন নয়, রাজ্যের কল্যাণ, প্রজাদের হিতবিধান ও দুঃখ নিবারণ, সকলকে ধর্মের মর্মবস্তু শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের নিয়ত আয়োজন—এই ছিল অশোকের আদর্শ। দেশশাসনকল্পে দেশবাসীর মধ্যে প্রচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অশোকের পূর্বে কোনও শাসকের মনে এমনভাবে কখনও অনুভূত হয় নি।

ধর্মবিজয়

অস্ত্রবল প্রয়োগ পরিত্যাগ

দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের বাণী ঘোষণা করে অশোক চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন; 'ভেরীঘোষ'-এর স্থানে 'ধম্মঘোষ', রণদামামার পরিবর্তে শান্তি ও শীল ছিল তাঁর কাম্য। দুর্দান্ত প্রতিবেশী ও অবাধ্য অরণ্যবাসী উপজাতিসমূহকে অস্ত্রবলে দমন করার কার্যক্রম পরিত্যক্ত হল;

দক্ষিণ ভারতে ধর্মবিজয়

অশোক বললেন যে "ধম্মবিজয়"-এর পথে গিয়ে তিনি সুদূর দক্ষিণ ভারতে তামিল রাজ্য, সিংহল এবং পশ্চিম এশিয়ায় ও দক্ষিণ ইয়োরোপের গ্রীকদের স্বপক্ষে আনতে পেরেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরল, এই চার রাজ্যের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীবন্ধন অটুট হয়েছিল। বিদেশে ধর্ম প্রচারে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল।

ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মদেশে তিনি প্রেরণ করেন শোণ ও উত্তর নামে দুই প্রচারক; তাম্রপর্ণী অথবা সিংহল দেশে নিজ ভ্রাতা (কিংবা মতান্তরে পুত্র) মহেন্দ্রকে এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে পাঠানোর কথা সর্বজনবিদিত।

সিংহল

সিংহলের রাজা 'দেবানাম্ পিয় তিস্স' বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় সিংহল ভারত সভ্যতারই প্রায় অঙ্গীভূত হয়ে গেল।

সুমাত্রা

সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সুমাত্রা অঞ্চলেও অশোক ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য-বিনিময় নয়, সঙ্গে

সঙ্গে ধর্মবিজয়ের পুণ্য উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি বহুদূর অবস্থিত দেশে রাজদূতের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ-সংখ্যক শিলালিপিতে নাম আছে সিরিয়ার 'অন্তিয়োক ('এন্টিওকস্ থিয়স্'), মিশরের 'তুরমায়' (দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেল্ফস্), ম্যাসিডনের 'অন্তেকিন' (এন্টিগোনস্), উত্তর আফ্রিকাস্থিত কাইরিনি-র 'মগা' ('মেগস্') এবং খাস গ্রীস দেশের অন্তর্গত এপাইরস্-এর (কিংবা অন্যমতে কোরিন্থ) 'অলিকসুদর' (আলেকজাণ্ডার), এই পাঁচজন গ্রীক রাজার। এদের সকলের কাছে অশোক দূত প্রেরণ করেছিলেন। কতটা বৌদ্ধধর্ম বা এ দেশের নীতির প্রচার সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটেছিল জানা নেই, কিন্তু অশোকের লক্ষ্য ছিল একান্ত স্পষ্ট। অবশ্য তখন বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই যোগাযোগ অনিবার্য হয়ে উঠছিল, কিন্তু ধর্ম, সংস্কৃতি ও সদাচারের দৃষ্টিকোণ থেকে অশোকের এই উদ্যোগিতার মূল্য তাতে হ্রাস পায় না।

সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, উত্তর আফ্রিকা, এপাইরস্,

অশোকের যে শিলালিপি ভারতময় ছড়িয়ে রয়েছে, তাতে যেন একটা গোটা সাহিত্যের সন্ধান মেলে—তাতে ছিল অনুশাসন, ধর্মশিক্ষা, রাজপুরুষদের প্রতি নির্দেশ, রাজার স্বকীয় চিন্তা ও আদর্শের প্রচার। এই শিলালিপি থেকে আবার অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং দূরাবস্থিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। বিদেশী বিদ্বান প্রিন্সেপ খ্রীষ্টাব্দের উনিশ শতকে অশোক-শিলালেখের অর্থোদ্‌ঘাটন করে বিশ্বের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। মৌর্য শাসন সম্বন্ধে আলোচনা পরে হবে; এখানে বলে রাখা দরকার যে অশোকের কালে মগধ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল সম্ভবত পাটলিপুত্র থেকেই শাসিত হত, কিন্তু দূর প্রদেশে রাজার প্রতিনিধির উপর শাসনভার অর্পিত হত। এই প্রদেশগুলি ছিল উত্তরাপথ (তক্ষশিলা এর রাজধানী)। অবন্তী (রাজধানী উজ্জয়িনী), কলিঙ্গ (রাজধানী তোসলি), মধ্যদেশ (রাজধানী সুবর্ণগিরি), ইত্যাদি। রাজ্যসীমান্তে সম্ভবত অশোককে সম্রাট বলে মানত এমন রাজাদেরও দেখা যেত।

শিলালিপির বিষয়বস্তু

প্রিন্সেপ

প্রত্যক্ষশাসিত অঞ্চল এবং প্রতিনিধি-শাসিত অঞ্চল

অনন্যচরিত্র অশোক

কথিত আছে যে গার্হস্থ্য গণ্ডগোলের ফলে বৃদ্ধ বয়সে অশোককে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছিল। তিষ্যরক্ষিতা নাম্নী মহিষীর মিথ্যা প্ররোচনায় তিনি নাকি পুত্র কুণালের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিলেন; পরে বুঝি

অশোকের শেষ জীবন

প্রকৃত সংবাদ জানতে পেরে আবার কুণালের উপর প্রসন্ন হন। তাঁর মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য ক্রমশ যেন তার মহত্ব হারাতে থাকে, একশো বৎসর বাদে তার অবসান ঘটে। অশোকের কীর্তি স্থায়ী হতে পারে নি; আদর্শের বাস্তবে রূপায়ণ সামাজিক পরিস্থিতি ও বিকাশ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, কেবল ইচ্ছা শক্তির জোরে তা সম্ভব হয় না। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় কবির ভাষায়—"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান্"। অশোকের যুগ থেকে নিরবধি কাল অনেক এগিয়ে এসেছে, দেশদেশান্তরে কত পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু তাঁর পুণ্যস্মৃতি আজও পৃথিবী ভোলে নি, ভবিষ্যতেও ভুলবে না।

অশোক ও তাঁর কীর্তি

অশোকের মহত্ব

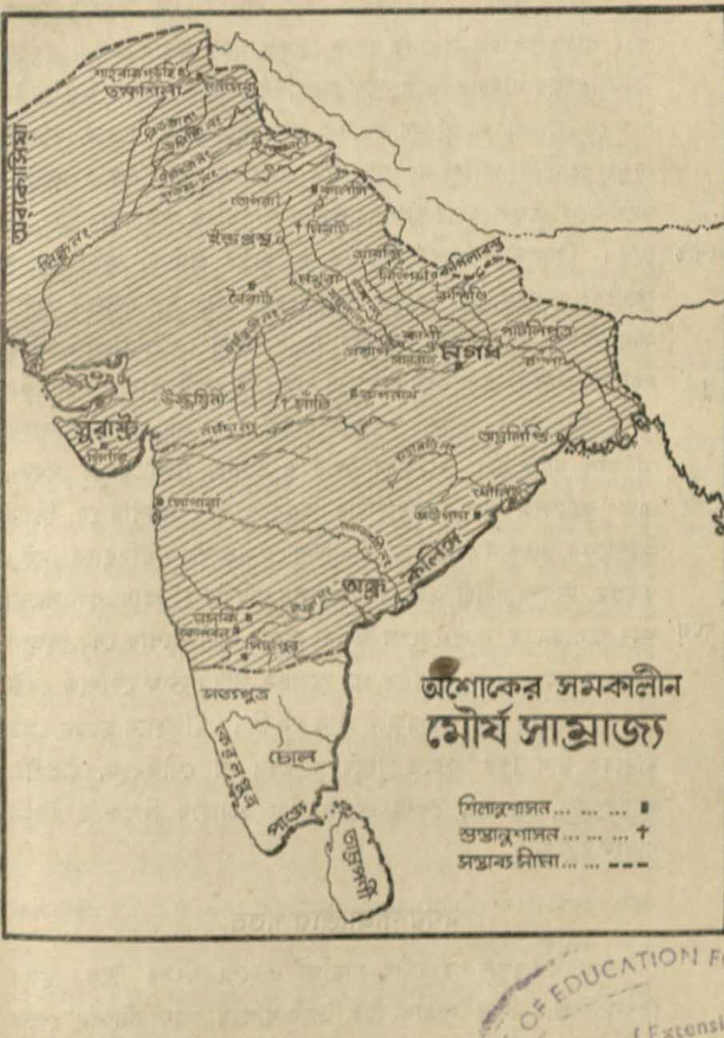
অশোকের মতো রাজা জগতের ইতিহাসে যে একান্ত দুর্লভ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কলিঙ্গ জয়ের মুহূর্তে, সাফল্য-মদিরার উন্মাদনাকে উপেক্ষা করে, বিবেকের দংশন অনুভব করার মতো সংবেদনশীলতা যে রাজার, তিনি সহজ ব্যক্তি নন। বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েও ক্ষমতার লোভ বর্জন করে, রাজ্যলিপ্সা পরিহার করে, ধর্ম-ঘোষণাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করা মহৎ ব্যক্তি ভিন্ন কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দেশে বিদেশে সর্বপ্রাণীর হিত কামনা এই রাজতপস্বীর মনকে যেভাবে উদ্বেল করেছিল, তার তুলনা ইতিহাসে কোথাও নেই। দেশে এবং বিদেশে শান্তি ও শীলের বাণী বিকীরণে তিনি অক্লান্তকর্মী; আত্মপ্রসাদের লক্ষণ তাঁর কাজের মধ্যে কখনও দেখা যায় নি। বৃক্ষরোপণ, কূপখনন, ওষধির বিস্তার, মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষাগার স্থাপন, দীর্ঘবিস্তারী রাজপথপার্শ্বে অতিথিশালা, বিশ্রামগৃহ ইত্যাদির ব্যবস্থা, এমন একটি মনের পরিচয় দেয় যা প্রকৃত গৌরবের অধিকারী। ইতিহাসে তিনি যে অমর হয়ে থাকবেন, তাতে বিস্ময়ের বিন্দুমাত্র কারণ নেই।

কল্যাণকর্ম

চরিত্র-বিচার

শিলালেখ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে অশোকের চরিত্রের কিছু পরিচয় মেলে। প্রথম জীবনে উচ্চাভিলাষ হয়তো তাকে ক্ষমতালিপ্সার পথে ঠেলে দিয়েছিল; ভ্রাতৃহত্যার যে বিবরণ রয়েছে তা সত্য না হলেও একেবারে অর্থহীন না-ও হতে পারে। শেষ জীবনে কুণাল সম্পর্কে তাঁর ব্যবহারের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাও নির্ভুল না হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু হয়তো বলা যায় যে চতুর্থ শিলানুশাসনে পুত্র-পৌত্রাদিকে ধর্মে ও শীলে 'স্থিত' হয়ে থাকার যে উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন, তা থেকে নিজেই কখনও কখনও স্খলিত হয়ে পড়তেন। অহংবোধের সম্পূর্ণ

চরিত্রের ত্রুটি


আরকোসিয়া
সুরাষ্ট্র
মগধ
পাটলিপুত্র
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
চোল
পাণ্ড্য
তাম্রপর্ণী
অশোকের সমকালীন
মৌর্য সাম্রাজ্য
শিলানুশাসন ... ...
স্তম্ভানুশাসন ... ...
সম্ভাব্য সীমা ... ... ---

উর্ধ্বে উঠতে তিনি পারেন নি; সম্ভবত তাঁর চরিত্রে কিছু আতিশয্য দোষ ছিল, যা প্রকাশ পেয়েছিল প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মধ্যে। কিন্তু একেবারে দোষমুক্ত চরিত্র দেবতার ক্ষেত্রে কল্পনীয়, মানুষের বেলায় নয়। আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং কর্তব্য সম্বন্ধে চেতনা অশোকের যে কি পরিমাণে ছিল, তাঁর কৃতকর্ম হল তার সাক্ষ্য। ধর্ম, সদাচার সম্বন্ধে পরম আগ্রহশীল এই নরপতির বাস্তব বোধও লক্ষ্য করার বস্তু। যুদ্ধকে নীতি হিসাবে পরিহার তিনি করেছিলেন, কিন্তু সমাজ রক্ষার জন্য দুষ্টের দমন যে প্রয়োজন তা স্বীকার করতেন, অপরাধীকে ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যে নীতিবিগর্হিত নয় তা মনে করতেন বলে প্রমাণ আছে। অশোককে একেবারে সর্ব ব্যাপারে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ মনে করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর বহুগুণান্বিত চরিত্র ও ভাস্বর প্রতিভা অতি কঠোর বিচারেও জগৎকে মুগ্ধ করবে। তাই দেখা যায় যে, রোমান সম্রাট কন্‌স্টান্টাইন, ইয়োরোপে মধ্যযুগীয় সম্রাট চার্লস্ (Charlemagne), মহামতি আকবর প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজাদের সঙ্গে কেউ কেউ মহামতি অশোকের তুলনা করেছেন। তুলনায় অবশ্য অশোকই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে নি। মনের যে ঔদার্য ও প্রসার, সর্বজীবে যে মমতা, এবং কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধের চরণারবিন্দ অনুসরণ করে করুণার যে সিঞ্চন অশোকের কৃতকর্মে দেখা যায়, তার তুল্য কোনও দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। এজন্যই ইংরাজ মনীষী এইচ. জি. ওয়েল্‌স পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলেছেন যে নানা দেশের অসংখ্য রাজার মধ্যে অশোক যেন সমুজ্জ্বল তারকার মতো একা উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছেন, তাঁর সমকক্ষ কোথাও কেউ নেই। ওয়েল্‌স শুধু একথা বলে ক্ষান্ত হন নি; ইতিহাসে ছয়জন শ্রেষ্ঠ মানবের নাম স্থির করতে গিয়ে বলেছেন যে গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, অ্যারিস্টটল, অশোক, রজার বেকন এবং এব্রাহাম লিঙ্কন-কে তিনি বাছাই করবেন।

চারিত্রিক মহত্ত্ব

বাস্তববোধ

সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি

এইচ. জি. ওয়েল্‌সের মন্তব্য

মগধ সাম্রাজ্যের পতন

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য একশো বৎসর টিকে ছিল। বিশাল-বিস্তার মৌর্য সাম্রাজ্য ছিল উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত, অপর দিকে আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত। হয়তো বিপুল-আয়তন এই মৌর্য সাম্রাজ্য খুব বেশীদিন

মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতা

একচ্ছত্র আধিপত্যে রাখতে হলে পুরুষানুক্রমে রাজা এবং তার পরামর্শদাতা ও কর্মচারীদের মধ্যে এত বেশী নৈপুণ্য ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন যে তা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সমসাময়িক জগতের মাপকাঠিতে যথেষ্ট ভালো হলেও আধুনিক কালের তুলনায় ছিল অকিঞ্চিৎকর। জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়ে রাষ্ট্রে তা রূপায়িত হতে তখন অনেক বিলম্ব ছিল। স্বয়ং অশোকেরই রাজ্যকাল শেষ হয়ে আসার সময় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিন্দুসার এবং অশোক উভয় সম্রাটই দূরে অবস্থিত প্রদেশগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে বেগ পেয়েছিলেন। জলৌক, কুণাল, বন্ধুপালিত, সম্প্রতি (বা সম্পদি), দশরথ ইত্যাদি অশোকের উত্তরাধিকারীর নাম জানা রয়েছে, কিন্তু খুঁটিনাটি খবর যা আছে তা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। কোন কোন মতে অশোকের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য তাঁর ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, আনুমানিক ১৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে পুষ্যমিত্র নামে তাঁর এক ব্রাহ্মণ সেনাপতি হত্যা করে সুঙ্গ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

অশোকের বংশধরগণ

শুঙ্গ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে সনাতন হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করায় অশোক প্রাচীনপন্থীদের শত্রুতা উদ্রেক করেছিলেন, আর ব্রাহ্মণ্যধর্মের মুখপাত্র হয়ে এসে পুষ্যমিত্র সুঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন। এক সময় খুব প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এই মত গ্রাহ্য নয়। অশোকের বিভিন্ন শিলালিপির পাঠোদ্ধার থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে অশোক ধর্ম ব্যাপারে একেবারে অসহিষ্ণু ছিলেন না, শ্রমণদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদেরও (এমন কি আজীবিকদেরও) মর্যাদা দানে কুণ্ঠিত থাকেন নি। যে সুনীতি প্রচারে তিনি শতমুখ হয়েছিলেন, তা শুধু বৌদ্ধ শিক্ষা নয়, ভারতবর্ষের সকল ধর্মচিন্তাধারার নির্যাস তাকে বলা চলে। হয়তো ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা প্রখর বৌদ্ধবিদ্বেষী, তারা অশোকের বহু কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা ও শক্তি এত বেশী হওয়া সম্ভব নয় যার ফলে সাম্রাজ্যের পতন সাধনে তারা সমর্থ হতে পারে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের এক গৌণ কারণ হতে পারে বৌদ্ধবিরোধীদের অসন্তোষ, কিন্তু সেটা কিছুতেই মুখ্য ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারে না।

মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পূর্বে বলা হয়েছে যে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তনে শাসনব্যবস্থাকে অটুট রাখা সম্ভব ছিল না ; এই বিশালত্ব সাম্রাজ্যের পতনের একটি হেতু

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণঃ

সাম্রাজ্যের বিশালত্ব

বলে অবশ্য আমরা মনে করতে পারি। দূরে অবস্থিত প্রদেশে সম্রাটের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা যে কত কঠিন ছিল তা আগে বলা হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে মগধ সাম্রাজ্যের সঙ্কোচনের উল্লেখ

কহ্লণের "রাজতরঙ্গিণী" থেকে মনে হয় যে কাশ্মীর সাম্রাজ্য থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছিল ; মহাকবি কালিদাস-কৃত "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" নাটকে দেখা যায় যে বিদর্ভ প্রদেশও সাম্রাজ্যের বন্ধন ছিন্ন করছে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের

গ্রীক-বিবরণ

শেষ পাদে গ্রীক-বিবরণ থেকে জানা যায় যে তক্ষশিলাকে কেন্দ্র করে সুভাগসেন নামে একজন "ভারতবর্ষীয়দের রাজা" আখ্যা নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লেখা গার্গী সংহিতাতে এমন কথাও আছে যে এক গ্রীক সৈন্যবাহিনী পাটলিপুত্র পর্যন্ত এসেছিল। এই সব সংবাদের সত্যতা যাই হোক, অশোকের উত্তরাধিকারীদের আমলে সাম্রাজ্য যে পূর্বগৌরব রক্ষা

বিরাট ব্যক্তিত্বের অভাব

করে চলতে পারে নি, তা নিশ্চিত। বিন্দুসার ও অশোকের রাজ্যকালেই তক্ষশিলা প্রভৃতি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল, অশোককে তাই নিয়মিতভাবে দূরবর্তী অঞ্চলে "মহামাত্র" প্রেরণ করে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব যখন রাজসিংহাসন থেকে অপসৃত হল, তখন অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে নেমে

অশোকের পরবর্তীদের মধ্যে সংহতির অভাব

যাওয়া খুবই সম্ভব। মৌর্য রাজবংশে সংহতি তখন ছিল না ; সম্রাট-বংশীয়েরাই পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, শাসন ব্যাপারে অবহেলা করে চলছিল এবং কোথাও কোথাও স্বতন্ত্র রাজ্য পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর ফল হল অবশ্যম্ভাবী ; মৌর্য সাম্রাজ্যের গৌরবরবি একেবারে অস্তমিত হল পুষ্যমিত্র সুঙ্গের আঘাতে।

ধর্মবিজয় নীতি বনাম সামরিক শক্তি

আরও এক কারণ ছিল এই যে সম্ভবত ধর্মপ্রচারে অতিরিক্ত মনোনিবেশের ফলে অশোকের পক্ষে সাম্রাজ্যরক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর জীবদ্দশায় অবশ্য সীমান্তবর্তী কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি, ধর্মবিজয়ের নীতির মধ্যে যে রাষ্ট্রিক দুর্বলতার সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে তা বুঝা যায় নি। কিন্তু অহিংসার প্রচারক হওয়ার পর সামরিক শক্তি অটুট রাখার দিকে স্বভাবতই অশোকের আগ্রহ হ্রাস পেয়েছিল। প্রায় উনত্রিশ বৎসর যুদ্ধ-ভেরী শোনা যায় নি, শোনা গিয়েছিল 'ধর্মঘোষ' ; খাপে-পোরা তলোয়ারে যেন জং ধরে গেল। রাজা যে শীকারে বেরুতেন তাও বন্ধ করে দেওয়া হল! বাণভট্টের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে তাঁর সৈন্যের

বৃহদ্রথের হত্যাসাধন

উপস্থিতিতেই পুষ্যমিত্র অবলীলাক্রমে হত্যা করেছিলেন। যোদ্ধাদের

মনোবল যে বহুদিন হতেই ভেঙে যাচ্ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের যে বহুবিধ কারণ ছিল তা আমরা মনে রাখব, আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করব যে মগধকে কেন্দ্র করে চন্দ্রগুপ্ত সুবিপুল সাম্রাজ্য স্থাপনা করার পূর্বে যেমন এদেশে বিদেশী আক্রমণকারীরা ঢুকে পড়ার লোভে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছিল, তেমনই মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর বিদেশীরা আবার এখানে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসে নামছে।

মৌর্যযুগে রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতা

মৌর্যযুগের ঐতিহাসিক উপাদান :

মৌর্য শাসনকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত থেকে দক্ষিণে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি। চন্দ্রগুপ্তের মতো প্রতিভাবান আর অশোকের মতো মহানুভব ব্যক্তি রাজকুলে একান্ত বিরল বলে মৌর্য শাসনের যেন এক স্বকীয় গরিমা রয়েছে। সুখের বিষয় এই যে চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনীস লিখিত বৃত্তান্তের যে কিয়দংশ পাওয়া গেছে, তা অমূল্য। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মৌর্য যুগেই রচিত হয়েছিল ; যাঁদের মতে রচনা আরও পরবর্তীকালের, তাঁরাও স্বীকার করেন যে পূর্বতন বহু তথ্যের ব্যবহার ঐ গ্রন্থে করা হয়েছে। বাস্তবিকই মৌর্যযুগের রাষ্ট্রনীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সন্ধান দেয়। অশোকের শিলালিপি থেকেও তদানীন্তন জীবন ও সমাজ বিষয়ে বহু তথ্য মেলে। মনু এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র সে যুগের অনেক ব্যাপারেই আলোকপাত করে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের মতো গ্রন্থ নগরজীবনের আলেখ্য দর্শনে প্রচুর সহায়তা করে। সবকিছু মৌর্য সাম্রাজ্যের সমসাময়িক না হলেও বিভিন্ন উৎস থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাকে একেবারেই সামান্য বলা চলে না।

মেগাস্থিনীস লিখিত বৃত্তান্ত

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

অশোকের শিলালিপি

ধর্মশাস্ত্র

বাৎস্যায়নের কামসূত্র

মেগাস্থিনীসের বিবরণ

মেগাস্থিনীসের মূল বই লুপ্ত, পরবর্তী ঐতিহাসিকদের লেখায় অংশ-বিশেষের উল্লেখ

মেগাস্থিনীস "ইণ্ডিকা" নামে যে বইয়ে এদেশের শাসনপ্রণালী, আচার-ব্যবহার আর জীবনযাত্রার বর্ণনা লিখেছিলেন, তা বহুদিন আগেই হারিয়ে গেছে, কিন্তু স্ট্রাবো, আরিয়ান, ডায়োডোরস্ প্রভৃতির লেখাতে মেগাস্থিনীসের রচনার যে উদ্ধৃতিগুলি আছে, তা থেকেই আমরা একটা চমৎকার ছবি পেয়ে থাকি। পুরো বই যে কত ভালো ছিল, তা শুধু আমরা আজ অনুমান মাত্র করতে পারি।

মগধ ভারতের বৃহত্তম রাজ্য

মেগাস্থিনীস বলেন যে এদেশে অনেক রাজ্য ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে মগধ ছিল সবচেয়ে বড়। সম্ভবত চন্দ্রগুপ্তের আমলে সম্রাটকে মানলেও কোনও কোনও অঞ্চলে স্থানীয় রাজা কিংবা স্বায়ত্তশাসিত নগর বা গোষ্ঠীর

অস্তিত্ব বিলীন হয় নি ; কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকেও একথা মনে হয়। মগধের শক্তি সম্বন্ধে মেগাস্থিনীস খুব সচেতন ছিলেন ; তিনি বলেছেন যে মগধরাজের একলক্ষ পদাতিক, ত্রিশহাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা, পাঁচহাজার হাতী, এবং বহুসংখ্যক যুদ্ধ-রথ ও নৌ-যান ছিল। সচরাচর এই ছিল সৈন্যবাহিনীর চেহারা ; যুদ্ধ বাধলে নিশ্চয়ই তার সংখ্যা ও শক্তি অনেক বাড়ানো হত। রাজধানী ছিল গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র (বা পালিম্‌বোথ্‌র্‌স্‌) নগরে ; দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমা থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ ছিল। এগারো মাইল লম্বা আর দুই মাইল চওড়া এই শহরের চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে : এর চারদিকে ছিল সম্ভবত কাঠের তৈরী উঁচু পাঁচিল, আর মাঝে মাঝে ছিল চৌষট্টিটি বিরাট দরজা ; প্রায় পাঁচশো গম্বুজের মতো কেল্লায় সৈন্যদল সর্বদা প্রস্তুত থেকে পাহারা দিত। রাজধানীর শোভা ছিল অপূর্ব ; তার চারদিকে ছিল প্রস্থে দুইশত গজ আর গভীরতায় বিশ গজ এক পরিখা। কাঠের তৈরী রাজপ্রাসাদ কারুকার্যে সাজানো, প্রকৃতই দেখবার মতো ছিল ; মেগাস্থিনীসের মতে পারস্যের নামজাদা প্রাসাদের চেয়ে ঢের বেশী চমৎকার। সাড়ে ছয়শো বৎসর পরে এরই ভগ্নাবশেষ দেখে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন বলেন যে এমন কারুকর্ম মানুষের হাতে সম্ভব নয়, বোধ হয় দানবেরা একে বানিয়েছিল ! প্রত্নতাত্ত্বিক স্পুনর কিছুকাল আগে পাটনার কাছে কুম্‌রাহর নামে জায়গায় মাটির নীচে এই প্রাসাদ আর প্রাচীরের কিছু ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন।

সামরিক শক্তি

রাজধানী

রাজপ্রাসাদ

ফা-হিয়েন-এর মন্তব্য

গ্রীক পর্যবেক্ষক লক্ষ্য করেছিলেন যে রাজার ক্ষমতা ছিল প্রভূত। রাজকার্যে রাজা যথেষ্ট সময় দিতেন ; যুদ্ধকালে স্বয়ং সেনাপতির ভার তিনি নিতেন, নিজে বিচারও করতেন—বিচারপ্রার্থী কাউকে যাতে ফিরে যেতে বা অতিরিক্ত সময় অপেক্ষা করতে না হয় সেদিকে রাজার নজর থাকত। চন্দ্রগুপ্ত দিবানিদ্রা যেতেন না এবং দারুণ পরিশ্রম করতেন, এ হল গ্রীক দূতেরই কথা। মন্ত্রীদের মতামত গ্রহণে রাজা বাধ্য ছিলেন না কিন্তু মন্ত্রিসভার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল ; অর্থশাস্ত্রেও একথার সমর্থন রয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত একদল দীর্ঘাকৃতি বিদেশিনী সর্বদা রাজার প্রহরায় নিযুক্ত থাকত। রাজার জীবনে কাজের তাগিদ প্রচণ্ড থাকলেও বিলাসব্যসনের আয়োজনে কোনও ঘাটতি ছিল না। গ্রীকদূত আশ্চর্য হয়েছিলেন সোনা, রূপা আর তামার বিরাট সব পাত্র দেখে ; মাঝে মাঝে সেগুলো হত মণিমাণিক্য খচিত।

রাজার ক্ষমতা ও কার্য

রাজরক্ষী

বিলাসব্যসন

ভারতবাসীর চরিত্র

তদানীন্তন ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে এই বিদেশী দূত যে প্রশংসা করে গেছেন তা সুবিদিত। মেগাস্থিনীস বলেছেন যে ভারতবাসীর প্রকৃতি সরল, ব্যবহার সৎ, বুদ্ধির মধ্যে কুটিলতা নেই, মিথ্যাকথন তাদের স্বভাবে ছিল না। তিনি লিখে গেছেন যে চন্দ্রগুপ্তের বিরাট শিবিরে প্রায় চার লক্ষ লোক বসবাস করছিল, কিন্তু রোজ যে চুরির খবর আসত তা অতি নগণ্য। ইংরাজ আমলে এদেশের লোক মামলাবাজ বলে দুর্নাম পেয়েছে, কিন্তু মেগাস্থিনীস লক্ষ্য করেন যে আইন-আদালত নিয়ে মাতামাতি তারা করে না, সম্পত্তি নিয়ে নালিশ মকদ্দমা হয় খুব কম। পরস্পর সম্পর্কে তাদের এমনই নাকি বিশ্বাস ছিল যে সাক্ষীসাবুদ না রেখে আর শীলমোহর, ইত্যাদি হাঙ্গামা বাদ দিয়েই ভারতবাসী ধনসম্পত্তি অপরের কাছে গচ্ছিত রাখতে অভ্যস্ত ছিল। বাড়িঘরদোরে তালাচাবি দেওয়া আর টাকাকড়ি সাবধানে লুকিয়ে রাখার তেমন রেওয়াজ তাই ছিল না।

আচার-ব্যবহার

আহার-বিহার, আচার-ব্যবহারে ভারতবাসীরা সংযত ও মিতাচারী বলে মেগাস্থিনীস মত প্রকাশ করেছেন। বহুলোক একত্র জমায়েত হওয়া কিংবা এক সঙ্গে বাস করা তাদের পছন্দসই ছিল না; গণ্ডগোল এড়িয়ে শান্তি আর শৃঙ্খলায় থাকতে তারা ভালোবাসত। বিশেষ যজ্ঞ বা উৎসবের অনুষ্ঠানকালে মদ্যপানের রীতি ছিল, কিন্তু সাধারণত সুরার ব্যবহার প্রায় ঘটত না।

খাদ্য, বেশভূষা ও রূপচর্চা

এক ধরনের পায়সান্ন ছিল তাদের প্রধান ভোজ্য। কিন্তু খাদ্য-বিষয়ে সাদাসিধে হলেও বেশভূষা সম্পর্কে ভারতীয়েরা আড়ম্বরপ্রিয়। খুব মিহি মসলিনের পোশাক আর সোনা ও পাথর-বসানো গহনার তারা ভক্ত ছিল। রাস্তায় বার হলে তাদের পিছনে চলত ছত্রধারী। দৈহিক সৌষ্ঠব আর রূপচর্চার দিকে তাদের খুব মনোযোগ ছিল। দেশে খাদ্যের অভাব নেই, তাই সেখানকার মানুষ দীর্ঘাকৃতি ও সুস্থ সবল।

মেগাস্থিনীসের বক্তব্য বিশ্লেষণ

এসব কথা এতকাল বাদেও শুনতে আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় যে কিছু অতিরঞ্জন আছে, তাতে সন্দেহ নেই।

বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সত্যকে সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ

হয়তো কখনও কখনও কোনও বিশেষ শ্রেণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে কথাটা সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে চালিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে এমন কথাও লিখেছেন, যা ঠিক নয়। যেমন দেখানো যায় যে তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে সবাই স্বাধীন, দাসপ্রথা সেখানে নেই, কাউকে গোলাম বলে বেচাকেনা চলে না। হয়তো এদেশের দাসপ্রথার কঠোরতা গ্রীসের

তুলনায় এত কম ছিল যে তিনি দাসপ্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্যই করেন নি। কিন্তু প্রাচীন বিবরণে (এবং ভারতের পরবর্তী ইতিহাসে) ক্রীতদাস প্রথার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতবাসী কখনও মিথ্যা বলে না, মেগাস্থিনীসের এই কথা শুনে আমাদের বুক দশ হাত হয়, কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে যে তহবিল তছরুপ করার চল্লিশ রকম কায়দা জানা ছিল। অর্থশাস্ত্রে আবার কৌতুক করে বলা হয়েছে যে সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ কি না স্থির করা তেমনই কঠিন, যেমন হল বলা যে নদীর মাছ জল খাচ্ছে কি না! ভারতবাসীর সততা ও সারল্য সম্বন্ধে মেগাস্থিনীস নিশ্চিত, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে নোংরা গোয়েন্দাগিরির দাম কম ছিল না, সরকারের চোখে সৈন্যবাহিনীর পরেই ছিল গোয়েন্দাদের স্থান। এদের সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে বিস্তৃত আলোচনা আছে। পুরো একটা পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে নানা রকম বিষের কথা, শত্রুকে মারবার জন্য বিষপ্রয়োগ প্রয়োজন বলে! এদেশের লোক সবাই সচ্চরিত্র ও সাধু ছিল, মনে করার তাই কোনও কারণ নেই। মেগাস্থিনীস নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন যে চোর-ডাকাতির উপদ্রব বিশেষ ছিল না, কিন্তু বিশেষ ধরনের অপরাধে সাজা ছিল অঙ্গচ্ছেদ। শহরে প্রায় সব বাড়ি কাঠের তৈরী বলে আগুন লাগার ভয় ছিল খুব বেশী; তাই আইন ছিল যে কোথাও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অপরাধে শাস্তি হল নিজের হাতে লাগানো আগুনের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেওয়া! এতে আঁতকে ওঠা খুবই ভুল হবে; দুনিয়ার কোনও দেশেই উনিশ শতাব্দীর আগে অপরাধীর শাস্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য রকম নৃশংস বন্দোবস্ত বন্ধ হয় নি।

মেগাস্থিনীসের বক্তব্যের বৈপরীত্যে দাসপ্রথার অস্তিত্ব

সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি

গোয়েন্দাগিরি

বিষ ও বিষ-প্রয়োগের কথা

অপরাধ ও অপরাধের শাস্তি

মেগাস্থিনীস লিখে গেছেন যে ভারতীয় সমাজ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; তাদের প্রত্যেকেরই কর্মক্ষেত্র ছিল আলাদা। প্রথম শ্রেণীতে ছিল দার্শনিকরা (হয়তো গ্রীসের "Sophist"-দের কথা ভেবে একথা বলা হয়), যাদের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা। সংখ্যায় কম এই শ্রেণী ছিল মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষের মতো মেহনত এদের করতে হত না। যজ্ঞ অনুষ্ঠান ইত্যাদি এদের বাদ দিয়ে সম্ভব ছিল না। এরা ছিল দৈবজ্ঞ; গণনা করে শুভদিন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদি সম্বন্ধে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে রাজ্যের মঙ্গলসাধন ছিল এদের কাজ। দ্বিতীয় শ্রেণী হল কৃষক সম্প্রদায়, সংখ্যায় যারা সবচেয়ে বেশী; তাদের পরিশ্রম বিনা জীবন অচল বলে যুদ্ধ কিংবা অন্যান্য

সমাজে শ্রেণী-বিভাগ :

১। দার্শনিক

২। কৃষক

কৃষকের স্থবিধা-স্থযোগ

ব্যাপারে সমাজে সকলের দায়িত্ব থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হত। তখন নাকি এমন রীতি ছিল যে যুদ্ধকালে শত্রুসৈন্যও কৃষকদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাত না। এই কৃষকরা স্বভাবতই থাকত শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে; জমির জন্য রাজাকে তারা খাজনা দিত। একজন গ্রীক লেখক বলেছেন যে ফসলের সিকিভাগ কর বলে ধার্য ছিল, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে জমির জন্য একটা খাজনাও দিতে হত। আর একজন বলেছেন যে চাষীরা রাজার কাছ থেকে মজুরি হিসাবে ফসলের এক-চতুর্থাংশ পেত। আর একজন খাজনার হার সম্বন্ধে কিছু না বলে শুধু লিখে গেছেন যে খাজনা দেওয়া হত রাজাকে কিংবা স্বায়ত্তশাসিত নগরকে।

খাজনা

৩। শিকারী ও পশুপালক

সমাজে তৃতীয় শ্রেণী হিসাবে মেগাস্থিনীস উল্লেখ করেছেন শিকারী ও পশুপালকদের। এরা ছিল যাযাবর, নির্দিষ্ট কোনও নিবাস ছিল না, গ্রামে তারা থাকত না, তাঁবু খাটিয়ে বাস করত, সহজে এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যেত। তাদের কাজ ছিল যে পশুপক্ষীর উৎপাতে সমাজের ক্ষতি হয়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা। রাজাকে এরা নাকি কর দিত গো-ধনে; অর্থ বা শস্য দেবার সঙ্গতি তাদের ছিল না। চতুর্থ শ্রেণী বলে মেগাস্থিনীস নাম করেছেন কারুশিল্পী বা কারিগরদের। এরা সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ বস্তু নির্মাণে দক্ষ বলে করদানের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেত; বরঞ্চ তাদের নাকি রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্য জুটত। যুদ্ধের জন্য যারা অস্ত্র নির্মাণ করত কিংবা নৌ-বিভাগে কাজ করত, তাদের প্রতিপালন-ভার নাকি পুরোপুরি ছিল সরকারের। এর পর পঞ্চম শ্রেণীতে ছিল যোদ্ধারা; শান্তির সময় তাদের কাজ নেই, শুধু অস্ত্রশস্ত্রে স্থসজ্জিত হয়ে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া, কিন্তু যুদ্ধের সময় তাদের প্রাণ বিপন্ন করে অকথ্য যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত থাকতে হত। বলা বাহুল্য এদের প্রতিপালন-ভার ছিল পরিপূর্ণ ভাবে রাজার। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উল্লিখিত হয়েছে পরিদর্শকের দল; এদের কাজ ছিল নানা জায়গা থেকে খবর জোগাড় করে কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া। সপ্তম শ্রেণীতে ছিল অমাত্যেরা; এরা সবচেয়ে সংখ্যাল্প, কিন্তু রাজপুরুষ হিসাবে এদের প্রভাব, প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী; এদেরই মধ্য থেকে রাজার প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি বাছাই করা হত।

৪। কারুশিল্পী

৫। যোদ্ধা

৬। পরিদর্শক

৭। অমাত্য

মেগাস্থিনীস বলেছেন যে এই সাত শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল; সকলে স্বশ্রেণীতেই থাকত, বৃত্তি পরিবর্তন করে

অপর শ্রেণীর জীবিকা অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা শক্ত। চাতুর্বর্ণ্যের যে নীতি, তার সঙ্গে মেগাস্থিনীসের এই বৃত্তিভেদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। জাতিভেদ যে ক্রমশ কর্মবিভাগের রূপ গ্রহণ করছিল, তা হয়তো বলা যায়। কিন্তু সাতটি ঐরূপ শ্রেণী ছিল বিশ্বাস করা কঠিন। ভরসা করে শুধু এইটুকু বলা যায় যে পরিবর্তমান সমাজে চাতুর্বর্ণ্যের বিশুদ্ধি রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না বলে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশই জটিল ও বিচিত্র রূপ নিতে থাকছিল।

জাতিভেদের রূপান্তর কর্মভিত্তিক শ্রেণীভেদ

পাটলিপুত্রের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে মেগাস্থিনীসের বিবরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সম্ভবত অন্য বৃহৎ শহরেও অনুরূপ বন্দোবস্ত ছিল। রাজকর্মচারীদের মধ্যে এক শ্রেণীর কাজ ছিল দোকানপাট, বাজার-হাট তদারক করা; দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতে শহরের শাসনভার দেওয়া ছিল; তৃতীয় শ্রেণীর কর্তব্য হল সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধান। শহরের ভার যাদের হাতে ছিল, তাদের আবার ছয়টি বোর্ড বা সমিতিতে ভাগ করা হয়েছিল; প্রত্যেক বোর্ডে পাঁচজন করে সদস্য থাকত, (হয়তো বা এটা হল এদেশের প্রাচীন পঞ্চায়েত প্রথারই এক প্রকার প্রতীক)। শিল্প, বিদেশীদের তত্ত্বাবধান, জন্মমৃত্যুর হিসাবরক্ষা, কারিগরী ও ব্যবসায়, পণ্যদ্রব্য ও বাণিজ্য, এবং বিক্রীত দ্রব্যের উপর শুল্ক (sales tax) আদায় ছিল এই ছয়টি সমিতির দায়িত্ব। সমাজের সংগঠন কত উচ্চ স্তরে উঠলে এমন সুষ্ঠুভাবে নগর শাসনব্যবস্থার কল্পনা সম্ভব, তা সহজেই বুঝা যাবে।

পাটলিপুত্র নগরের শাসন-ব্যবস্থা

নগর-শাসন বোর্ড

মেগাস্থিনীস এদেশে তারিফ করার মতো অনেক জিনিসই দেখেছিলেন। ভারতবর্ষ তাঁর চোখে ছিল এক অতি সমৃদ্ধ দেশ; দুর্ভিক্ষ সেখানে অজানিত ঘটনা। এদেশের ভূমি উর্বর; গ্রীসের উষর ক্ষেত্রের তুলনায় তা প্রকৃতই সুফলা, শস্য-শ্যামলা। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হত; শীতকালে জল হলে গম, যব, ডাল প্রভৃতি শস্য বপন করা হত, আর গ্রীষ্মের সময় বৃষ্টির ফলে ধান, তিল প্রভৃতি ফলানোর ব্যবস্থা হত। প্রবহমান নদী নিকটে থাকায় নরম, ভিজা মাটিতে ফসল হত প্রচুর; প্রায় প্রতি বৎসরই ফসল উঠত দুইবার। আবহাওয়াতে উত্তাপ এমনই যে ফলমূল পাকতে দেরি হয় না আর উৎপাদন হয় খুব। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সম্বন্ধে মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি হয়তো আছে, কিন্তু তা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দেশের সমৃদ্ধি ও জমির উর্বরতা

ভারতের খনিজ সম্পদ

সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন প্রভৃতি ধাতু এদেশের খনিজ সম্পদ বলে মেগাস্থিনীস উল্লেখ করেছেন। এই ধাতুগুলি থেকে গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অলঙ্কারাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হত। গ্রীসে নদী নেই; তাই হয়তো মেগাস্থিনীসকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল এদেশের নদীমাতৃক রূপ।

নদনদী

বিরাট, গভীর নদী, যাতে সারা বৎসর জল থাকে, নৌকা চলাচল সম্ভব, দেশের অর্থব্যবস্থায় যে স্থান নিয়ে আছে, তা সহজে বুঝা যায়। মেগাস্থিনীস শুধু বৃষ্টিপাত আর নদীজলে প্রকৃতির দানেরই গুণগান করেন নি, সুখ্যাতি করেছিলেন মৌর্য শাসনের জলসেচ ব্যবস্থা ও পূর্তকর্মের।

জলসেচ ব্যবস্থা

প্রকৃতই মৌর্য শাসনের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, তা সাক্ষ্য দেয় তদানীন্তন ভারতবর্ষের বিস্ময়কর প্রগতির। কিছু অত্যুক্তি ও ভ্রান্তি থাকলেও মেগাস্থিনীসের বিবরণ হল মহামূল্য।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

গ্রন্থ-পরিচয়

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র কূটবুদ্ধি চাণক্যের রচনা বলে কিংবদন্তী আছে, কিন্তু খুব সম্ভব কোন এক ব্যক্তি এর লেখক নন। রচনাকাল সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইতিহাসের চেয়ে রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় অর্থশাস্ত্রের মূল্য সমধিক বলে পরিগণিত হবে, কিন্তু মৌর্য যুগের চিত্রাঙ্কনে এর সহায়তা একেবারেই নগণ্য নয়।

রাজার ক্ষমতা ও রাজধর্ম

রাজার ক্ষমতা অপ্রতিহত বলা সত্ত্বেও অর্থশাস্ত্রে স্বৈরতন্ত্রের সমর্থন আছে মনে করা ভুল। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও রাজা যথেচ্ছাচারী যাতে না হন, সেদিকে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের যথেষ্ট আগ্রহ। প্রজাদের কল্যাণে নিয়ত নিযুক্ত হয়ে না থাকলে রাজধর্মপালনে ব্যত্যয় ঘটে। আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর বাস্তববোধ অর্থশাস্ত্রে প্রকট।

রাজা ও রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

রাজপুত্রদের ক্ষমতালিপ্সা যাতে বিপজ্জনক রূপ না নেয়, তাই বলা হয়েছে তাদের রাজধানী থেকে দূরে শাসনভার দেওয়া উচিত। শত্রু যদি বিষপ্রয়োগ বা অন্য উপায়ে রাজার হানি ঘটাবার চেষ্টা করে সেজন্য সর্বদা সতর্ক ও সুরক্ষিত অবস্থায় থাকা সম্বন্ধে বিবিধ বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে। অপরাধীর কাছ থেকে চাপ দিয়ে দোষ স্বীকারোক্তি আদায় করা সম্বন্ধে নির্দেশ আছে।

মন্ত্রিমণ্ডলী ও শাসনব্যবস্থা

মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করায় কোন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও মন্ত্রিমণ্ডলীর গুরুত্ব অর্থশাস্ত্রেই বর্ণিত হয়েছে; মন্ত্রিপরিষদে প্রধান ছিল মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ ও সেনাপতি। শাসন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগ এবং

তার সংগঠন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ সেখানে রয়েছে। কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ভার ছিল অধ্যক্ষের উপর ; আবার এই অধ্যক্ষেরা ছিল মন্ত্রীর কাছে উত্তরদায়ী ; রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার ভার ছিল মন্ত্রিমণ্ডলীর (বা মন্ত্রিপরিষদ)। সর্বোচ্চ রাজকার্যে যবনদেরও নিযুক্ত করতে কোন বাধা ছিল না। "বলাধক্ষ্য" (সৈন্যবিভাগের নায়ক), "নগরক" (রাজধানীর শাসক), "সমাহর্তা" (রাজস্ববিভাগের পরিচালক), "সন্নিধাতা" (হিসাব-বিভাগের কর্তা) ইত্যাদি আটাশ জন "অধ্যক্ষ"-এর নাম অর্থশাস্ত্রে পাওয়া গেছে। সম্ভবত স্বৈরাচার রোধের জন্য অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে অধ্যক্ষেরা যেন প্রতি বিভাগের "বহু মুখ্য", অর্থাৎ একাধিক প্রধান কর্মচারীর সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে। প্রজাদের কল্যাণার্থে কৃষিকর্মকে সাহায্য করা, জল-সরবরাহ ও সেচের ব্যবস্থা করা, দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা ঘটলে তদনুযায়ী আয়োজন করা, প্রতি বৎসর খাদ্যশস্য রাজ-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রেখে দুর্দিনে বিতরণ করা, লোকশিক্ষা, দরিদ্র-দুঃস্থদের সঙ্কট থেকে ত্রাণ করা, ইত্যাদি বিষয়ে রাজার যে দায়িত্ব ছিল, তার পরিচয় মেলে। অর্থশাস্ত্রে প্রধানত রাজতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও লিচ্ছবিদের মতো স্বায়ত্তশাসিত গণরাজ্যেরও উল্লেখ আছে ; গ্রীক লেখকদের রচনাতেও তা রয়েছে। মৌর্য সাম্রাজ্য-শাসনের রথচক্র যে এদের সত্তাকে একেবারে বিলীন করে দেয় নি, তা নিঃসন্দেহ।

অধ্যক্ষ

শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রণ

প্রজাদের কল্যাণার্থ রাজার দায়িত্ব

সমসাময়িক গণরাজ্য

মেগাস্থিনীস যে বর্ণনা রেখে গেছেন, অর্থশাস্ত্রে তার কতকটা সমর্থন পাওয়া গেছে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ও পরিধি হল ভিন্ন। কোন এক বিশেষ যুগ সম্বন্ধেই শুধু এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয় নি ; রাষ্ট্র সম্পর্কে বহু বক্তব্যই সেখানে আছে। সার্বভৌম শক্তির অন্বেষণে রাষ্ট্রকে যে নীতিশিক্ষা উপেক্ষা করেও নিজের ক্ষমতাকে চরম ও ব্যাপক করার দিকে যেতে হয়, এই একান্ত বাস্তবমুখী কথা সেখানে পাওয়া যায়। ছলে বলে কৌশলে শক্তিবৃদ্ধি যে রাষ্ট্রের এক প্রধান লক্ষ্য, একথা স্বীকার করতে অস্বস্তি বোধ হলেও ইতিহাসে ক্রমাগত তার সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে। রাষ্ট্রব্যাপারে নীতিবোধ বর্জনের প্রয়োজন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অকুণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, অবস্থাভেদে এই চার নীতি অনুসরণের কথা সেখানে আছে। ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বার করে এনে, সংসারের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে, রাষ্ট্রকে সার্বভৌম শক্তির আধাররূপে দেখা অর্থশাস্ত্রের যুগে ভারতীয় চিন্তার অংশীভূত হয়ে পড়েছিল।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অর্থশাস্ত্র

চার-নীতি

মৌর্য শাসনব্যবস্থা

মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক বিভাগ

পূর্বে বলা হয়েছে যে সম্ভবত মৌর্য সাম্রাজ্য তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোসালি ও সুবর্ণগিরি এই চার কেন্দ্র থেকে শাসিত প্রদেশে বিভক্ত ছিল; প্রত্যেক প্রদেশে রাজপ্রতিনিধিরূপে সাধারণত রাজবংশেরই কর্তাকে নিযুক্ত করা হত। প্রদেশগুলি ভাগ করা হত জেলায়, আর সেগুলি থাকত 'স্থানিক'-এর শাসনে। সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রাম; সেখানে 'গ্রামণী' ছিল ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। মনে হয় যে পল্লী অঞ্চলে গ্রামের অধিবাসীরাই শাসনকার্যের বিভিন্ন ব্যাপার পরিচালনা করত; শুধু তাদের কাজ সম্বন্ধে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল 'গোপ' অভিহিত রাজ কর্মচারীর হাতে। মাঝে মাঝে নাকি এদের কাজ হত নিজেদের অঞ্চলে লোকগণনা এবং প্রজাদের জীবিকা সংস্থান সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করা। রাষ্ট্রজীবন কতদূর সুপরিণত হলে এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয় তা সহজে অনুমেয়।

স্থানিক, গ্রামণী, গোপ

লোকগণনা ও জীবিকা সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ

অশোকের সময়ে শাসনব্যবস্থায় নূতন সংযোজন

অশোক রাষ্ট্রশাসন বিধির বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করেন নি। তবে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্ম-মহামাত্র, স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্র প্রভৃতি পদ সৃষ্টির প্রয়োজন তখন হয়েছিল। বিচারব্যবস্থায় যে কঠোরতা দেখা দিয়েছিল তার লাঘব উদ্দেশ্যে তিনি এবং প্রদেশে তাঁর প্রতিনিধিরা কয়েক বৎসর অন্তর তত্ত্বাবধায়ক পাঠিয়ে দিতেন। রজ্জুক, প্রাদেশিক, মহামাত্র প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ এবং যুত, লিপিকর, প্রতিবেদক (সংবাদদাতা) প্রভৃতি অপেক্ষকৃত নিম্নস্তরের কর্মচারীর উল্লেখ অশোকের শিলালেখে পাওয়া যায়। শাসন, ধর্মনিয়ম ইত্যাদি প্রকাশ করে রাজার অধিকার ছিল রাষ্ট্রের বিধানকে নির্দিষ্ট করা, প্রয়োজন হলে পরিবর্তিত করা। এ থেকে মনে হতে পারে যে রাজার ক্ষমতা ও অধিকার ছিল একেবারে নিরঙ্কুশ, ভিন্‌সেন্ট স্মিথের মতো তখন ভাবা যেতে পারে যে রাজার "সীমাহীন স্বেচ্ছাতন্ত্র" তখন প্রচলিত ছিল। অবশ্য রাজার অপ্রতিহত অধিকার শুধু এদেশে ও মৌর্যযুগে নয়, সর্বদেশে ও ইতিহাসের বহু অধ্যায়েই, সীমা ও নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে বলে পরিগণিত হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাপুঞ্জকে ("প্রকৃতি") মনে করা হত রাষ্ট্রের মূল উপাদান, তাদের কল্যাণ সম্পর্কে রাজার দায়িত্ব ছিল অপরিহার্য, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের মতো যে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হল রাজতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব ও অমোঘ শক্তি, সেখানেও প্রজাহিতৈষণার একান্ত গুরুত্ব কথিত হয়েছে।

রাজার নিরঙ্কুশ অধিকার : 'সীমাহীন স্বেচ্ছাতন্ত্র'

ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য : প্রজাহিতৈষণা

মৌর্য ভারতে স্বায়ত্তশাসিত বহু অঞ্চল যে ছিল, তা সুনিশ্চিত ; নগর-শাসন সম্পর্কিত ব্যবস্থা থেকেও বুঝা যায় যে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব স্থানীয় উদ্যোগিতাকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলে নি ; পল্লী অঞ্চল বিষয়ে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকেও বিকেন্দ্রীকরণের কিছু উদাহরণ মিলবে। সাঞ্চী-স্তূপ; জুন্নার এবং নাসিক গুহা প্রভৃতি স্থানে শিলালিপি থেকে স্বর্ণকার, তন্তুবায়, শস্যের ব্যাপারী প্রভৃতির নিজস্ব সঙ্ঘের অস্তিত্ব ও ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন কারুকর্মে যারা নিযুক্ত ছিল তাদেরও বহু সঙ্ঘের সংবাদ মেলে ; পাটলিপুত্রের কাছে মাটি খুঁড়ে অনেক সঙ্ঘের নিজস্ব "শীল"মোহর খুঁজে পাওয়া গেছে। একজন পণ্ডিত বলেছেন যে পাটলিপুত্রে যেন একটা আধুনিক যুগেরই অনুরূপ বণিক সমিতি ('চেম্বার অফ কমার্স') ছিল! রাষ্ট্র বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার রেখেও যে দেশবাসীর নিজস্ব উদ্যোগিতাকে বিনষ্ট করে নি, তা সেদিনকার বহুমুখী সংস্কৃতি, ও সভ্যতার বিকাশেই প্রমাণ হচ্ছে।

বিকেন্দ্রীভূত স্বায়ত্তশাসন-মূলক ব্যবস্থা

শিল্পীসঙ্ঘ ও বণিক সমিতি

যুদ্ধবিভাগের ব্যবস্থা দেখে মৌর্যযুগে রাষ্ট্রের বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট হয়। চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং দেশরক্ষা সম্বন্ধে যে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন তা স্বাভাবিক। তাঁর আমলে মেগাস্থিনীস বলেন যে ছয় শাখায় যুদ্ধবিভাগ বিভক্ত ছিল ; আর এক-একটি শাখায় পরিচালনাভার ছিল পাঁচজনের এক কমিটির উপর। পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ, হস্তী, স্থল ও নৌ-সৈন্যের পরস্পর যোগাযোগ, এবং সৈন্যবাহিনীর যাতায়াত, রসদ ও অন্যান্য ব্যবস্থার দায়িত্ব এই কমিটিগুলির উপর ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধের সময় আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার যে আয়োজন ছিল, তা তদানীন্তন জগতের পক্ষে বিস্ময়কর। যাই হোক, এ হেন পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের ব্যয়-নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন খুবই ছিল। কর-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে, কিন্তু কৃষিকর্মে রত সাধারণ মেহনতী মানুষের উপর যে অতিরিক্ত চাপ পড়ত না, তা প্রায় সকল পণ্ডিত স্বীকার করেন। যারা চাষ করে, যাদের পরিশ্রম বিনা সমাজ অচল, যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই তাদের কাজের বিশেষ কদর ছিল, সৈন্যদলে যোগ দেওয়ায় বাধ্যবাধকতা থেকে তারা নিস্তার পেত। মৌর্যোত্তর যুগেও সাতবাহন, শক, পহ্লভ প্রভৃতি শাসকদের বিবরণ থেকে মনে হয় যে কৃষকসম্প্রদায়ের কল্যাণ সম্বন্ধে সমাজ যথেষ্ট অবহিত ছিল।

সামরিক বিভাগ

যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা

কৃষিরত মানুষ সম্পর্কে কল্যাণ-মূলক ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মৌর্যযুগে অর্থনৈতিক অবস্থা

মৌর্যযুগে অর্থনৈতিক অবস্থা যে প্রভূত উন্নতির স্তরে উঠেছিল, তা সর্ববাদিসম্মত; অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় না হলে রাষ্ট্র ও সমাজের তখনকার যে রূপ দেখা যায় তা সম্ভব হত না। পাটলিপুত্র নগরশাসন বিষয়ে দেখা গেছে যে একটি সমিতি ('বোর্ড') শিল্পব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত হয়ে ছিল; এ থেকে তদানীন্তন শিল্পের গুরুত্ব অনুমান করা যায়। গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে জানা যায় যে শুধু যুদ্ধ ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও যন্ত্র নয়, ছোটখাট জাহাজ ও নৌকা নির্মাণ তখন হত। অশোকের কালে কলিঙ্গ জয়ের পর থেকে সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় ও সমুদ্র পথে নৌযাত্রার প্রচলন বেড়েছিল। অশোকের ভগ্নী সঙ্ঘমিত্রা সমুদ্রপথে সিংহল গেছলেন; পথ অজানা এবং সমুদ্রযাত্রার কৌশল অনায়ত্ত না থাকলে এ ঘটনা সম্ভব হত না। তাছাড়া কলিঙ্গ অঞ্চল বহুদিন হতে নৌযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল; কলিঙ্গ যখন মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হল, তখন তখনকার ব্যবসাবাণিজ্য নিশ্চয়ই আরও দ্রুত অগ্রগতির সুযোগ পেয়েছিল। বণিকশ্রেণী সেযুগে খুবই সমৃদ্ধিশালী; বৌদ্ধ ও জৈন কাহিনীতে এর বহু সাক্ষ্য রয়েছে; সাঞ্চীস্তূপ ও অন্যত্র ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীদের নামধাম এবং বদান্যতার অনেক উল্লেখ দেখা যায়। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে পূর্ববাংলা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার বস্ত্রশিল্প প্রশংসিত হয়েছে; তখনই বাংলার মসলিন যেত পশ্চিম দেশে; এদেশে বহু অর্থ আসত বিদেশ থেকে।

শিল্পে গুরুত্ব আরোপ

সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার

বণিকশ্রেণীর সমৃদ্ধি

গাঙ্গেয় উপত্যকায় বস্ত্রশিল্প

যাতায়াতের ব্যবস্থা তখন যেভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তা থেকে তখনকার অর্থনৈতিক অগ্রগতির আরও প্রমাণ মেলে। তক্ষশিলা থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত ১২০০ মাইল দীর্ঘ এক রাজপথ ছিল; এই রাস্তা ছিল চৌষট্টি ফুট চওড়া, প্রতি ১½ মাইলে রাস্তার পাশে দূরত্বজ্ঞাপক স্তম্ভ থাকত, দুই ধারে ছিল গাছ, মাঝে মাঝে পাতকুয়া, পুলিসের ফাঁড়ি, পথিকদের জন্য সরাইখানা। রাষ্ট্রের এক বিশেষ বিভাগ এই রাজপথের তত্ত্বাবধান করত। অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে বাণিজ্য সংবর্ধন এবং দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থাকে সুগঠিত করার জন্য আলাদা নিয়মকানুন মেনে চলা হত। পূর্ত কার্যের কথা তো বারবার শোনা যায়। হাতীগুম্ফা শিলালেখ থেকে জানা যায় যে পূর্বে নির্মিত একটি খাল রাজা খারবেল আবার কেটে বাড়িয়েছিলেন; এ ধরনের কাজের গুরুত্ব তখন সর্বজনস্বীকৃত বলেই এমন উল্লেখ আমরা দেখতে পাই।

যাতায়াত ব্যবস্থা

তক্ষশীলা-পাটলিপুত্র রাস্তা

রাজপথের তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা

পূর্তকর্ম

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প

শিক্ষাদীক্ষায় মৌর্যযুগের ইতিহাস সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তক্ষশিলার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সুবিদিত; বারাণসী হল ভারতবর্ষের অমর নগরী, শুধু ধর্ম নয়, যুগ যুগ ধরে জ্ঞানচর্চার এক প্রধান কেন্দ্র। বৈশালী ছিল পাটলিপুত্রের চেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী; সেখানকার চৈত্য, মন্দির ও উদ্যানের বহু বর্ণনা বৌদ্ধ ও জৈন রচনায় রয়েছে। উজ্জয়িনী ছিল তার বিবিধ বিদ্যায়তনের জন্য খ্যাত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কল্যাণে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে; ব্যাকরণ, অর্থ, বার্তা প্রভৃতি ছিল শিক্ষার বিষয়। মহাভারত পুরাণের কাহিনী তখনই প্রচলিত ছিল; লোকশিক্ষার তাই ছিল ভিত্তি। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু জানা নেই, কিন্তু সম্ভবত ভিক্ষুনীরা প্রায়ই শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করতেন। বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরদের যে সঙ্ঘ ('গিল্ড') ছিল, তার মাধ্যমে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত বিকাশ ঘটেছিল; প্রাচীনকাল থেকে এর চর্চা ছিল, মৌর্যযুগে বহু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ফলে তার আরও অগ্রগতি অবশ্যই হয়েছিল।

মৌর্যযুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা: তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় বারাণসী বৈশালী উজ্জয়িনী শিক্ষার বিষয় লোকশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা শিল্পশিক্ষা চিকিৎসা-বিদ্যা

বাৎস্যায়নের কামসূত্র থেকে নগরজীবনের ছবি মেলে, 'নাগরক' কি ভাবে চৌষট্টি কলার চর্চায় মগ্ন থাকত, শরীরের যত্ন, মনের বিকাশ, শিল্প বিষয়ে আগ্রহ ও পটুত্ব, পরস্পর ব্যবহারে সৌজন্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু বিচিত্র তথ্য পাওয়া যায়। তখন যে এক শ্রেণীর যুবক যথেষ্ট অবসর পেয়ে জীবনকে বিবিধ উপায়ে উপভোগের সুযোগ পেত, তা কামশাস্ত্রে স্পষ্ট। বহু শতাব্দী ধরে সভ্যতার অগ্রগতি না ঘটলে এরূপ ব্যাপার সম্ভব ছিল না। পাশা খেলা, কন্দুক ক্রীড়া (প্রধানত মেয়েদের খেলা), শীকার, সঙ্গীত, নৃত্য—বিভিন্ন ঋতুর উৎসব, যেমন বসন্তোৎসব, দীপাবলী ইত্যাদি সম্বন্ধে সংবাদ তখন মেলে। নিঃশঙ্ক নিরাপত্তা অনুভূত না হলে সমাজ সম্বন্ধে এমন চিত্র অঙ্কিত হতে পারত না।

মৌর্যযুগে নগর-জীবনের চিত্র বিভিন্ন ক্রীড়া ও লোকোৎসব

শিল্পকলার বিকাশ ব্যাপারে মৌর্যযুগের অবদান খুবই স্মরণীয়। গ্রীকদের বিবরণ থেকে পাটলিপুত্র নগরীর শোভা, এবং বিশেষ করে সম্রাটের প্রাসাদ সম্বন্ধে অনেক কিছু সংবাদ পাওয়া গেছে। তখন বোধ হয় শহরের অধিকাংশ বাড়ি ছিল কাষ্ঠনির্মিত; ইটের ব্যবহার অবশ্য অজানা ছিল না। কাষ্ঠনির্মিত ভবনের স্থাপত্য যে খুব উচ্চ স্তরের ছিল,

মৌর্যযুগে শিল্প-কলার বিকাশ

গ্রীকদের প্রশংসার মূল্য

তাতে কোন সন্দেহ নেই ; গ্রীকরা নিজেদের দেশে স্থাপত্যের উৎকর্ষের সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিল বলে তাদের প্রশংসার খুব মূল্য আছে। স্পুনর প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকের চেষ্টায় পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ যা পাওয়া গেছে, মনে হয় যে মৌর্য রাজপ্রাসাদের অল্প একটু অংশ তার মধ্যে আছে। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে যথার্থ বিচার করা সম্ভব নয় ; কিন্তু প্রাসাদ সম্বন্ধে গ্রীকরা যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছে, তার সঙ্গে মনে রাখতে হয় কয়েকশত বৎসর পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশস্তি। হয়তো বিন্দুসার ও অশোকের রাজ্যকালে এই প্রাসাদে কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। স্তম্ভশোভিত একটি কক্ষের অবশেষ লক্ষ্য করে পণ্ডিতেরা তার নির্মাণ পদ্ধতিতে অশোকের যুগের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন।

ফা-হিয়েনের প্রশস্তি

মৌর্যযুগের প্রস্তরস্থাপত্য

অশোক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের বহু স্থানে পর্বতগাত্রে এবং প্রস্তর স্তম্ভের উপর যে শিলালিপি খোদিত করেছিলেন, তার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রস্তরস্থাপত্যের প্রকৃত রসোত্তীর্ণ উল্লেখযোগ্য যে নিদর্শন এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা আমরা অশোকের যুগ থেকে দেখতে পাই। পূর্বে প্রস্তরস্থাপত্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু তার তেমন কোন বাস্তব নিদর্শন পাওয়া যায় নি ; কিছু পাথরের মূর্তি আছে, কিন্তু তার শিল্পমূল্য নগণ্য। অশোকের রাজ্যকালে যেন অকস্মাৎ এদেশে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক বিস্ময়কর স্ফুরণ ঘটেছিল। গয়ার কাছে আজীবিক গুহা থেকে সাঞ্চীর ধৌলি প্রভৃতি এর প্রমাণ। অনেকে বলেন যে পারসীক ও গ্রীকদের প্রভাব বিনা এহেন ব্যাপার সম্ভব হয় নি। কিন্তু হয়তো জোর করেই বলা যায় যে স্থাপত্যে এদেশেরই নিজস্ব ঐতিহ্য না থাকলে বিদেশের প্রভাবকে এমন চমৎকারভাবে আত্মস্থ করাও তো সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে কাষ্ঠ, গজদন্ত, পোড়ামাটি প্রভৃতি নিয়ে স্থাপত্য এদেশে খুবই সমুন্নত স্তরের ছিল ; স্থপতি ও ভাস্করেরা তার বদলে পাথর নিয়ে কাজ করেও তাঁদের বিপুল নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন। যাই হোক, পারস্য ও গ্রীসের প্রভাব তখন অনুভূত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ করে মনে হয় সিংহ, বৃষ প্রভৃতি পশুর জীবন্ত মূর্তি গঠন, স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষের কারুকার্য, স্তম্ভগাত্রের অপরূপ মসৃণতা (যার কৌশল আজও শিল্পীর অনায়ত্ত) প্রভৃতি শিল্প-সাফল্যের জন্য অশোকের রাজ্যকালের ভারতীয় স্থাপত্য পারসীকদের

অশোকের সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিস্ময়কর স্ফুরণ ও তাহার কারণ বিশ্লেষণ

কাছে, এবং অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে, গ্রীকদের কাছে ঋণী। হয়তো বিদেশী শিল্পীরাও মাঝে মাঝে নিযুক্ত হতেন, কিন্তু এপর্যন্ত সে বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি।

মৌর্যযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকৃতি

মৌর্যযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভারতবর্ষে শিল্পের ইতিহাসে এক নূতন ও মহান যুগের অবতারণা করল। প্রাচীন জগতের কোথাও সারনাথের স্তম্ভশীর্ষের সিংহমূর্তির মতো নিখুঁত পশু-স্থাপত্যের উদাহরণ নেই; আজ যা হল ভারতের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক, সারনাথ থেকে আহৃত সেই স্থাপত্যের দিকে একবার তাকালেই একথার তাৎপর্য বুঝা যাবে। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য তখন যে কতদূর উন্নত হয়েছিল, তা জানা যাবে সাঞ্চীস্তূপের দিকে লক্ষ্য করলে। কথিত আছে যে অশোক ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন; তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হল ভরহুত ও সাঞ্চী, যার গৌরব আজও আমরা চাক্ষুষ করতে পারি। উড়িষ্যায় ধৌলি-তে প্রস্তরখোদিত যে বিরাট হস্তিমূর্তি আছে, অশোকের রাজ্যকালে যা নির্মিত হয়েছিল, তা শিল্পের বিচারে ও ভাবের মহিমায় একান্ত স্মরণীয়। বিপুলকায় প্রস্তর স্তম্ভগুলিকে স্থান থেকে স্থানান্তরে প্রেরণ, সেগুলিকে যথাস্থানে স্থাপন ইত্যাদি কর্মে যে যন্ত্রকৌশল অপরিহার্য, তা সেই সুদূর অতীতে কেমন করে আয়ত্ত হয়েছিল ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অশোকের যুগের প্রায় ১৬০০ বৎসর পরে সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের আমলে জানা যায় যে অশোকের একটি স্তম্ভ মাত্র দেড়শো মাইল টেনে নিয়ে গিয়ে দিল্লীতে বসিয়ে দিতে বিরাট আয়োজন করতে হয়েছিল। স্তম্ভটিকে পুরু কাপড় আর চামড়ায় ঢেকে ৪২-চাকা গাড়ির উপর রেখে ৮৪০০ জন লোক (প্রতি চাকায় ২০০ জন), তাকে ঠেলে নিয়ে যমুনা নদীতে অনেকগুলি নৌকাকে একত্রিত করে তার উপর রেখেছিল; তারপর দিল্লী পৌঁছে সেখানে আবার কয়েক হাজার লোক টেনে নিয়ে গিয়ে কুতবমিনারের কাছে স্তম্ভটিকে বসিয়েছিল! অশোকের স্তম্ভগুলি শুধু যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত, তা নয়; মাঝে মাঝে, যেমন সাঞ্চী স্তূপে, পাহাড়ের উপর তুলে একেবারে তার শীর্ষে স্তম্ভকে বসিয়ে দেওয়া হত। আধুনিক যুগের যন্ত্রাদি বিনা তখনকার শ্রমিকরা যে কেমন করে এই কার্য করত, তা সত্যই আশ্চর্য হওয়ার মতো ব্যাপার। আধুনিক যুগের যন্ত্র তখন নির্মিত না হলেও এ বিষয়ে মূলনীতি কিছু জানা না থাকলে কখনও এমন কৃতিত্ব সম্ভব হত না।

সারনাথ

সাঞ্চী স্তূপ

ধৌলি

প্রস্তর অপসারণে যন্ত্র-কৌশলের অপরিহার্যতা এবং তৎ-সম্পর্কীয় আলোচনা

মৌর্যযুগের সাহিত্য

মৌর্য রাজ্যকালে সাহিত্য সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা কঠিন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, জৈন সাধু ভদ্রবাহু-কৃত কল্পসূত্র, এবং বৌদ্ধ কথাবস্তু ('কথা-বত্থু') এই সময়কার রচনা হতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মহাভারত-রামায়ণের কোন কোন অংশ এই যুগে লিখিত হয়ে মূল রচনায় প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। বৈয়াকরণ

পতঞ্জলি

পতঞ্জলি ছিলেন সুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ; তিনি তাঁর বিখ্যাত মহাভাষ্যে যে বহুসংখ্যক রচনার উল্লেখ করেছেন, তার কিয়দংশ মৌর্যযুগে লিখিত হয়েছিল মনে করা অসঙ্গত নয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ১৫০ অব্দের মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণ অনুসরণ করে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির যে

সংস্কৃত ভাষার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ

ভাষ্য লিখিত হয়েছিল, তা থেকে মনে হয় যে তখনই সংস্কৃত ভাষা সেই রূপ পরিগ্রহ করেছিল যা আজও আমরা দেখতে পাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ আজও ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অপূর্ব ; ব্যাকরণ হিসাবে এর তুলনা নেই। কিন্তু সম্ভবত বিধি-নিষেধের বাঁধনে দেবভাষাকে সতত-পরিবর্তমান মানব

সর্ববিষয়ে প্রগতি সাহিত্য ক্ষেত্রেও উন্নতির সূচক

জীবন থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। যাই হোক, কোন কোন পণ্ডিতের মতে মহাকবি কালিদাস সুঙ্গ অগ্নিমিত্রের রাজ্যকালে বাস করতেন। সর্বগ্রাহ্য না হলেও যদি এই মত কেউ অনুসরণ করেন তো পূর্বতন আর এক মহাকবি ভাস মৌর্যযুগে "স্বপ্নবাসবদত্তা" রচনা করেছিলেন বলতে হবে। মৌর্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে তাই খুব নিশ্চিত ভাবে বেশী কিছু বলতে আমরা পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তখন যে বিপুল প্রগতি ও প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়, অবশ্যই সাহিত্যক্ষেত্রে তার ছাপ পড়েছিল। সভ্যতার তখন যে প্রোজ্জ্বল প্রকাশ আমরা দেখি, তা নিশ্চয়ই তদানীন্তন ভারতবর্ষকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশগুলির অন্যতম বলে পরিগণিত করেছিল।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

মৌর্যোত্তর কাল ঃ বিদেশী প্রাদুর্ভাব ও ভারতবর্ষ

মৌর্যোত্তর যুগে মগধ সাম্রাজ্য

মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনে যে বিরাট রাষ্ট্রসংগঠন সৃষ্টি হয়েছিল, তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগঠনও বিলুপ্ত হয়ে গেল। শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে সেনাপতি পুষ্যমিত্র সৈন্যবাহিনীর সমক্ষে নাকি হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন বলে পরবর্তীকালে বাণভট্ট-কৃত "হর্ষচরিত"-এ বর্ণনা আছে। সৈন্যদলে বিক্ষোভ আর রাজা সম্পর্কে প্রজাদের শ্রদ্ধা বিলোপ ভিন্ন এমন ঘটনা সম্ভব ছিল না। মনে হয় যে সৈন্যবাহিনীর উপর নিজের প্রভাব সম্বন্ধে পুষ্যমিত্রের অহঙ্কার ছিল বলে রাজাসনে বসে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেও তিনি নিজে "সেনাপতি" আখ্যা ব্যবহার করতেন। পুষ্যমিত্রের বংশপরিচয় নিয়ে কিছু বাদানুবাদ থাকলেও সাধারণত তাঁকে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলে বর্ণনা করা হয়। ব্রাহ্মণ সেনাপতি-পদে বৃত হয়েছেন, যারা 'ব্রাত্য', ব্রাহ্মণ্য সমাজের একেবারে বহির্ভূত, তাদের ক্ষত্রিয় বলে পরিগণিত করা হচ্ছে, এই সমস্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে চাতুর্বর্ণ্য বিষয়ক নিয়ম কঠোরভাবে কখনও অনুসৃত হতে পারে নি। যাই হোক, পুষ্যমিত্র হলেন শুঙ্গ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তর-পশ্চিমে জলন্ধর ও শিয়ালকোট এবং দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত শুঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলে শোনা যায়; রাজধানী পাটলিপুত্রেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু প্রায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল বিদিশা (বর্তমানে বেস্‌নগর, মালব অঞ্চলের পূর্বে), পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র "মহারাজ" উপাধি নিয়ে সেখান থেকে পিতৃপ্রতিনিধি হয়ে শাসন চালাতেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব অবশ্য অক্ষুণ্ণ ছিল না; কলিঙ্গে খারবেল এক নূতন শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন, দক্ষিণেও মৌর্য শাসন শিথিল হতে হতে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হচ্ছিল। তবুও শুঙ্গ রাজ্যের পরিধিকে বিশাল বললে অত্যুক্তি হয় না।

সেনাপতি পুষ্যমিত্রের মগধ সিংহাসন অধিকার

বংশপরিচয়

চাতুর্বর্ণ্যের ব্যতিক্রম

শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা

শুঙ্গ রাজ্যের বিস্তার

সুঙ্গবংশ ও কাণ্ববংশ

পুষ্যমিত্রের রাজত্বকাল ও প্রধান ঘটনা

পুষ্যমিত্রের রাজত্ব চলেছিল প্রায় ছত্রিশ বৎসর। এর মধ্যে একটা প্রধান ঘটনা হল যুবরাজ অগ্নিমিত্রের হাতে বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনের পরাজয় ও সুঙ্গবংশের আনুগত্য স্বীকার। উত্তর-পশ্চিম থেকে গ্রীকদের বার বার এগিয়ে আসার চেষ্টাকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

গ্রীক-অনুপ্রবেশ

এন্টিওকস্

মৌর্য শাসনের অবসান ঘটবার পূর্বে শোনা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে সিরিয়ার গ্রীক রাজা এন্টিওকস্ কাবুল নদীর অন্তর্গত অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে ভারতীয় রাজা সুভাগসেনকে (যিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের করদ ছিলেন কিংবা ঐ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য গঠন করেছিলেন) অনেকগুলি হাতী (উপহার কিংবা বশ্যতার প্রতীকরূপে) দিতে বাধ্য করেছিলেন।

ডিমীট্রিয়স্

এন্টিওকসের জামাতা, ব্যাক্‌ট্রিয়ার শাসক ডিমীট্রিয়স্ আরও এগিয়ে পঞ্জাব ও সিন্ধু নদীর উপত্যকার নিম্নভাগে কিয়দংশ অঞ্চল অধিকার করেন।

মেনাণ্ডার

সাময়িক সাহিত্যে বৈদেশিক অগ্রগতির উল্লেখ

এরও পরে গ্রীক রাজা মেনাণ্ডার যে সাফল্য অর্জন করেন, তার বিবরণ আমরা পেয়েছি। পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র, গার্গীসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে এই বিদেশীরা অগ্রসর হয়ে এসে রাজস্থান, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে যুদ্ধ করে, একেবারে ভারতবর্ষের শীর্ষ নগরী পাটলিপুত্রকে পর্যন্ত বিপন্ন করে তোলে। পুষ্যমিত্রের জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরও এই গ্রীক আক্রমণ মাঝে মাঝে চলতে থাকে।

বসুমিত্রের হস্তে গ্রীকদের পরাজয়

যাই হোক, অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র সিন্ধু নদের তটে (কোন কোন মতে মধ্য ভারতের এক নদীতীরে) যুদ্ধে শত্রুকে বিধ্বস্ত করেন। দুর্ধর্ষ যবনদের বিরুদ্ধে এই বিপুল সাফল্যকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে পুষ্যমিত্র

অশ্বমেধ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান

দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন—সম্ভবত, একবার উপলক্ষ্য হল সুঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা, আর অন্যবার হল পৌত্র বসুমিত্রের যবন-বিজয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের গরিমা পুনরুদ্ধার করতে না পারলেও কিছুকাল এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের কৃতিত্ব তদানীন্তন ইতিহাসকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

খারবেল কর্তৃক মগধ আক্রমণ

সম্ভবত পুষ্যমিত্রের রাজ্যকালেই কলিঙ্গরাজ খারবেল যেন সহসা ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে দাক্ষিণাত্য জয় করেন, আর কিছু পরে মগধ আক্রমণ করে পাটলিপুত্রকে পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনার তারিখ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে খারবেল যখন পাটলিপুত্র দখল করেন তখন মনে হয় যে অগ্নি-মিত্রের পুত্র বৃহস্পতিমিত্র সেখানকার শাসনভার নিয়ে ছিলেন। পুষ্যমিত্রের

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'

পুত্র অগ্নিমিত্র কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" নাটকের কল্যাণে অমর হয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর রাজ্যকালের বিশদ বৃত্তান্ত জানা নেই। বিদিশা নগরীর খ্যাতি কালিদাসের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে ; সীমান্তবর্তী গ্রীক ("আয়োনিয়ন = য়ুননী = যবন") রাজ্যগুলির সঙ্গে বিদিশার কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা জানা যায়। যাই হোক, শুঙ্গবংশের গরিমা অচিরে ম্লান হয়ে এল ; অল্পকালের মধ্যে সুজ্যেষ্ঠ, বসুমিত্র প্রভৃতি সাত আট জন রাজার নাম শোনা যায়। ক্রমশ মন্ত্রীর হাতে রাজা হয়ে পড়লেন ক্রীড়নকমাত্র ; দশম রাজা দেবভূতিকে আনুমানিক ৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মন্ত্রী বসুদেব এক দাসীর সাহায্যে হত্যা করে সিংহাসন আরোহণ করলেন। এভাবে ব্রাহ্মণ কাণ্ব বংশ শুঙ্গ রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রায় ৪৫ বৎসর শাসন চালিয়ে গেল ; বসুদেবকে নিয়ে চারজন রাজার নাম জানা আছে, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য নেই। আনুমানিক ৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দাক্ষিণাত্যের উদীয়মান সাতবাহন রাজবংশের হাতে কাণ্ব বংশের শক্তি বিলুপ্ত হল।

শুঙ্গবংশের অবনতি ও পরবর্তী রাজগণ

শুঙ্গবংশের পতন ও কাণ্ব বংশ

শুঙ্গবংশের রাজ্যকালে ব্রাহ্মণ কর্তৃক সিংহাসন অধিকার এবং দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান থেকে মনে হয় যে হিন্দুধারার যে পুনরুজ্জীবন গুপ্তযুগে প্রকট হয়ে উঠেছিল তার সূচনা পূর্ব থেকেই দেখা দিয়েছিল। অবশ্য শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজ্যের অবসান ঘটার পর পূর্ব ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। যাই হোক, পরাক্রান্ত গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে বসুমিত্রের বিজয় অবশ্যই স্মরণীয়। মহাভাষ্যের রচয়িতা বৈয়াকরণ পতঞ্জলি সম্ভবত পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন ; তাঁর উপস্থিতি ঐ যুগকে স্মরণীয় করে রাখতে সাহায্য করেছে। স্থাপত্যকর্মের উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ তখন মেলে ; সাঁচী ও ভরহুত স্তূপের তোরণ এবং ভাস্কর্যে ভূষিত রেলিং ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে প্রকৃষ্ট স্থান নিয়ে আছে।

শুঙ্গ শাসনকালে হিন্দুধারার পুনরুজ্জীবনের সূচনা

স্মরণযোগ্য ঘটনা

স্থাপত্য

কলিঙ্গ সম্রাট খারবেল

গ্রীক, শক, পহ্লব, কুশাণ প্রভৃতি বিদেশাগত শক্তির এদেশের সুপরিব্যাপ্ত অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং ক্রমশ ভারতবর্ষের "বিপুল নীড়ে" নিজস্ব স্থান করে নেওয়ার কাহিনী বলার আগে কলিঙ্গরাজ খারবেল এবং দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশ সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা ভালো। খারবেল সম্বন্ধে উল্লেখ পূর্বে প্রায়ই করা হয়েছে ; সন্দেহ নেই যে তিনি

কলিঙ্গরাজ খারবেল-এর আকস্মিক অভ্যুদয়

এক বিখ্যাত ও পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। কিন্তু ধূমকেতুর মতো যেন তিনি ভারতবর্ষের আকাশে দেখা দিয়েছিলেন, আর কিছুকাল চারদিক উজ্জ্বল করে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই কলিঙ্গ মৌর্য শাসন থেকে বেরিয়ে যায়; সম্ভবত চেত বংশের উদ্যোগে এই ঘটনা ঘটে, আর চেত বংশের মুখোজ্জ্বলকারী খারবেলকেই আমরা জানি। ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে হাতীগুম্ফা শিলালেখ থেকে এই নরপতির বিজয়বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়েছে। চব্বিশ বৎসর বয়সে খারবেল কলিঙ্গের সিংহাসনে বসেছিলেন; প্রথমে দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান করে সাতবাহন বংশের প্রথম শাতকর্ণিকে পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যের বহুলাংশ অধিকার করেন। গোদাবরীর দক্ষিণেও নাকি তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, তামিল দেশে গিয়ে পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি রাজ্য থেকে অনেক প্রবাল নিয়ে এসেছিলেন। মগধ আক্রমণ করে শুঙ্গ বৃহস্পতিমিত্রের রাজ্যকালে পাটলিপুত্র জয়ের দাবিও এই শিলালেখে করা হয়েছে। কথিত আছে যে খারবেল জৈনধর্মের অনুরাগী ছিলেন। যাই যোক, তাঁর মৃত্যুর পর বিশাল সাম্রাজ্যেরও অবসান ঘটল, কিন্তু তার খুঁটিনাটি খবর আমাদের জানা নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসমঞ্চে খারবেলের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তিরোধানও ঠিক যেন তেমনই ভাবে ঘটেছিল। খুব সম্ভব সাতবাহনদের হাতে খারবেলের ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়েছিল।

কলিঙ্গের স্বাতন্ত্র্য অর্জন

দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার

পাটলীপুত্র অধিকার

সাতবাহনদের দ্বারা কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন

সাতবাহন সাম্রাজ্য

এই সাতবাহন রাজবংশ বাস্তবিকই এদেশের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মর্যাদার স্থান নিয়ে আছে। ঠিক কোন্ সময়ে এদের শাসন আরম্ভ হয়, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাদানুবাদ চলেছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশো বৎসর ধরে সাতবাহনদের গৌরবকথা আমরা শুনতে পাই। এদের প্রায়ই 'আন্ধ্র' বা 'আন্ধ্র ভৃত্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে; গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল হল তেলুগুভাষী আন্ধ্রদের বাসস্থান। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিতের মত এই যে পরবর্তী যুগে সাতবাহন বংশ উত্তরে ও পশ্চিমে তাদের রাজ্য থেকে চ্যুত হওয়ার পর সম্ভবত তাদের সম্বন্ধে 'আন্ধ্র' নাম প্রযুক্ত হয়েছিল। উত্তর ভারতে শুঙ্গ ও কাণ্ব বংশের শাসন যে সাতবাহনেরা নিঃশেষ করে বিখ্যাত হয়েছিল,

সাতবাহন বংশের ইতিবৃত্ত

বাসস্থান

আন্ধ্র নামকরণ

তারাও ছিল জাতিতে ব্রাহ্মণ। ভারতবর্ষের বহু কাহিনীতে যে রাজা শালিবাহনের কথা আছে, তার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন-প্রমুখ রাজবংশের অনেক কীর্তির স্মৃতি যেন সংলগ্ন হয়ে রয়েছে।

রাজা কৃষ্ণ, সুমুখ বা শিমুক ও শাতকর্ণি

সাতবাহন বংশের সর্বপ্রথম যে রাজার কথা আমরা জানি, তাঁর নাম কৃষ্ণ; তার পর এলেন সুমুখ (বা শিমুক)। এঁরই উত্তরাধিকারী শাতকর্ণি বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে এবং দক্ষিণে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মনে হয়। সম্ভবত এঁর সঙ্গে কলিঙ্গরাজ খারভেলের সঙ্ঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু ঘটনাগুলি এমন জোট পাকিয়ে রয়েছে যে তাকে খুলে স্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারা শক্ত। গোদাবরীর কিছুদূর উত্তরে প্রতিষ্ঠান (বর্তমান পৈথান) ছিল সাতবাহনদের রাজধানী; শাতকর্ণির শাসনকালে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে এক প্রধান নগর ছিল। এর পর কিছু কাল সাতবাহনদের শক্তি হ্রাস পেয়েছিল মনে হয়; এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের উত্তরাংশ বিদেশাগত শকজাতির এক শাখা 'ক্ষহরত'-রা হস্তগত করে নেয়। আবার গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি সাতবাহন গৌরবকে উজ্জীবিত করেন; শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতিকে বিধ্বস্ত করে উত্তরে মালব অঞ্চল থেকে দক্ষিণে বর্তমান মহীশূর পর্যন্ত সাম্রাজ্য তিনি শাসন করতে থাকেন। 'ক্ষহরত'দের শ্রেষ্ঠ রাজা নহপানকে তিনি পরাজিত করেছিলেন; খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে এই সমস্ত ঘটনা হয়, একেবারে তারিখ নির্ধারণ করা কঠিন। মোটামুটি হয়তো বলা যায় যে আনুমানিক ৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অন্তত তিনশত বৎসর সাতবাহন শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুঙ্গ রাজ্যের পতন এবং পরাক্রান্ত বাকাটক বংশের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তীকালে যখন বিদেশী আক্রমণে দেশের বহু অঞ্চল বিপন্ন, তখন ভারতবর্ষের মাঝখানে একটা বিস্তৃত এলাকায় সাতবাহন বংশের শাসন শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রেখেছিল। দক্ষিণ ভারতের পরবর্তী ইতিহাসের বিকাশে, সর্বভারতীয় ঐতিহ্যকে দক্ষিণ ভারতের জীবনে একান্তভাবে মিশিয়ে দেওয়ার কাজে, এই রাজবংশের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

রাজধানী —প্রতিষ্ঠান

শক্তি হ্রাস ও শক-অনুপ্রবেশ

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি ও সাতবাহন

সাতবাহন বংশের অবদান

সাতবাহন রাজাদের নাম মাতৃ-শাসিত সমাজের ঐতিহ্যবাহী

সতবাহনদের সম্পর্কে একটি ব্যাপার বেশ কৌতূহলের উদ্রেক করে। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি, বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি, বাশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ি, গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি, ইত্যাদি নাম থেকে মনে হয় মাতৃশাসিত সমাজের প্রায়-বিস্মৃত রেশ যেন এর মধ্যে রয়েছে। বৃহত্তর ভারতের

কোন কোন স্থানে, দূর প্রাচ্যে স্থাপিত হিন্দু উপনিবেশেও এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার ঐক্যসাধনে সাতবাহন বংশের ভূমিকা

প্রতিষ্ঠান নগরকে কেন্দ্র করে যে সাতবাহন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, তার ভৌগোলিক অবস্থিতি উল্লেখযোগ্য। উত্তরে আর্য সংস্কৃতির প্রাধান্য বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; দক্ষিণে সুপ্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার ধারা প্রচলিত; মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত সাতবাহন রাজশক্তি এই দুই ধারাকে ঐক্যবদ্ধ করার ভূমিকায় যেন অবতীর্ণ হয়েছিল। মৌর্যযুগে ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণকে একসূত্রে বাঁধার প্রচেষ্টা অগ্রসর হয়েছিল বটে; কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্যের দিন ফুরিয়ে আসায় উত্তর ও দক্ষিণের সংস্কৃতি-সমন্বয় ব্যাহত হয়েছিল। সাতবাহন রাজবংশ হয়তো দাবি করতে পারে যে তারা মধ্যস্থ না থাকলে কাঞ্চীতে পল্লবরাজ্য হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে দেখা দিতে পারত না, সুদূর পাণ্ড্য ও কেরল অঞ্চল হিন্দু সংস্কৃতির পরিধিভুক্ত হত না।

সভ্যতার কেন্দ্র 'প্রতিষ্ঠান-নগর'

সে যুগে প্রতিষ্ঠান-নগর ভারত সভ্যতার এক প্রধান কেন্দ্র বলে পরিগণিত ছিল। "বৃহৎ কথা" কাহিনী সংগ্রহের রচয়িতা গুণাঢ্য প্রতিষ্ঠান-নগরের অধিবাসী ছিলেন। সংস্কৃত (দেবভাষা) এবং পৈশাচী (বর্বর বিদেশীদের ভাষা), এই উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে বৃহৎ কথার অনেক গল্প রয়েছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহনরূপে সংস্কৃত ভাষার তদানীন্তন ভূমিকা যেন এইভাবে সূচিত হয়েছে। গ্রীক লেখক টলেমি প্রতিষ্ঠান-নগরের উল্লেখ করেছেন শ্রীপুলমায়ির রাজধানী বলে। পূর্ব থেকে পশ্চিম, সমুদ্রের এক উপকূল থেকে অন্য উপকূল পর্যন্ত সাতবাহন সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল; সুদূর দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য, চের, এই ত্রৈরাজ্য ভিন্ন প্রায় সমস্ত অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। উড়িষ্যার ও মধ্যভারতের বৃহদংশ এর মধ্যে ছিল। সুদীর্ঘ উপকূল থাকায় ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল; কল্যাণ ছিল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। কহ্লেরি, জুন্নার প্রভৃতি স্থানে গুহায় খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে বহু ধনবান শ্রেষ্ঠী জনহিতকর উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। শোনা যায় যে বৈজয়ন্তী নগরীর (বর্তমান গোয়ার সন্নিকটে) একজন ধার্মিক শ্রেষ্ঠীর দানে কার্লির বিখ্যাত গুহা স্থাপত্যশোভিত হয়েছিল। আন্ধ্র অঞ্চলে গণ্টুর জেলায় অমরাবতী ছিল আর এক প্রসিদ্ধ নগরী। বাণিজ্যের বিকাশ, পথঘাটের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শিল্পের অগ্রগতি সাতবাহন শাসনে দেখা গিয়েছিল।

সাতবাহন সাম্রাজ্যের বিস্তার

বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি : কল্যাণ ও অমরাবতী

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে মনে হয়; ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য নিবারণে তিনি সচেষ্ট ছিলেন; বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ যাতে স্থাপিত না হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন। শক, যবন, পহ্লবদের দর্পচূর্ণ করেছেন বলে তিনি গর্ব করতেন। বাশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ি আন্ধ্র উপকূল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন, কিন্তু শক 'ক্ষত্রপ' (রাজপ্রতিনিধি) প্রথম রুদ্রদামনের হস্তে তাঁকে দুইবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল, কোঙ্কণের (মহারাষ্ট্রের একাংশ) উত্তর অঞ্চল শক আধিপত্যে চলে যায়। সম্ভবত তাঁর ভ্রাতা বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি রুদ্রদামনের এক কন্যাকে বিবাহ করেন; নিষ্ঠাবান পরিবারের পক্ষে এই সম্পর্ক স্থাপন রাজনৈতিক কারণে নিশ্চয়ই অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। সাতবাহন বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী নরপতি হলেন শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি; রুদ্রদামনের পরবর্তী ক্ষত্রপের কাছ থেকে পূর্বে হস্তান্তরিত অঞ্চল তিনি ফিরিয়ে নিতে পেরেছিলেন। সমুদ্রপথে বাণিজ্য যে তখন বেশ চলছিল, তাঁর সময়কার মুদ্রাতে সে বিষয়ে সাক্ষ্য রয়েছে। শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণির পর থেকে সাতবাহন বংশের অধোগতি আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্র, আন্ধ্র, কাঞ্চী, কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলে বাকাটক, ইক্ষ্বাকু, পল্লব, কদম্ব ইত্যাদি রাজবংশ সাতবাহন শক্তির উত্তরাধিকারী হয়ে বসতে থাকে।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি

বাশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ি

বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি

শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি

সাতবাহন মুদ্রা

সাতবাহন শক্তির পতন

সাতবাহন শাসনে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বৌদ্ধ ধারার বিকাশ তখন যে ভাবে হয়, তা খুবই স্মরণীয়। স্বয়ং গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি নিজেকে ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষক বলে বর্ণনা করলেও বৌদ্ধদের জন্য দানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। নাসিক শিলালেখ থেকে দেখা যায় যে উষভদত্ত নামে এক ধনী বৌদ্ধদের জন্য গুহা-মঠ নির্মাণ করে দিচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রতি বদান্যতার কথাও বলছেন। মন্দির, মঠ, ধর্মশালা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করছেন কখনও রাজা, কখনও বা ধনী ব্যবসায়ীরা। সাতবাহন যুগে গুহা-স্থাপত্যের যে নিদর্শন মেলে, তা থেকে বলা যায় যে এলোরা-অজন্তার অবিস্মরণীয় কীর্তির পূর্বাভাস যেন তখন দেখা যাচ্ছে। অমরাবতী, নাগার্জুনকোণ্ডা প্রভৃতি স্থানে স্তূপনির্মাণ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা দেখে মনে হয় যে সাঞ্চীর রীতি থেকে গুপ্ত যুগের সুপরিণত উৎকর্ষে সংক্রমণ ঘটেছিল সাতবাহন রাজ্যকালের শিল্পকীর্তির কল্যাণে। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কয়েক শতকে যখন উত্তর ভারত শুধু রাষ্ট্র নয়, শিল্পের ক্ষেত্রেও গ্রীক, সীদিয়ান্ প্রভৃতি বিদেশী ধারার

সাতবাহন যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ—যুগ্মধারার বিকাশ

গুহা-স্থাপত্য

শিল্পগত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য

প্রভাবে পড়েছিল, তখন সাতবাহন সাম্রাজ্যে এদেশের স্বকীয় রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য এবং শিল্পগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। উত্তর ভারতের তদানীন্তন ঐতিহ্যে মৌর্যযুগের যে স্থান, মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন শাসনের প্রায় যেন সেই ধরনের স্থান ও মর্যাদা লক্ষ্য করা যায়।

সাতবাহন শাসনের গুরুত্ব

ভারতে বিদেশী অনুপ্রবেশ

উত্তর ভারতে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ

এবার উত্তর ভারতের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। মৌর্য সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব হতেই প্রকৃত একচ্ছত্র শাসনের অবসান সূচিত হয়েছিল, আর তাই সুযোগ বুঝে বহু জাতির বিদেশী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে ছিল গ্রীক, যারা বাহ্লিক দেশে, অর্থাৎ আফগানিস্তানের উত্তর অঞ্চলে সেলিউকসের বংশধরদের শাসনে প্রথমে ছিল, ব্যাক্‌ট্রিয়ান্ গ্রীক বলে যাদের পরিচয়। আর ছিল আরও দূরে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে খোরাসান অঞ্চলের ('পার্থিয়া') পহ্লব-রা। আরও ছিল শক, ইউ-চি প্রভৃতি যারা ছিল মধ্য এশিয়ার যাযাবর, ক্রমশ বসতির সন্ধানে বেরিয়ে যারা ভারতবর্ষ দ্বারা প্রলুব্ধ হয়।

ব্যাকট্রিয়ান্ গ্রীক

পহ্লব ও মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি

ব্যাক্‌ট্রিয়ান্ গ্রীকন্

ব্যাক্‌ট্রিয়া বা বাহ্লিক দেশে সেলিউকসের বংশধরদের প্রতিনিধি হয়ে শাসন করতেন ডায়োডোটস্; তিনি পরে নিজকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। 'পার্থিয়া' বা খোরাসান অঞ্চলেও তখন স্বাধীন গ্রীক রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাক্‌ট্রিয়া ও পার্থিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ডায়োডোটস্ দুই রাজ্যের ভিতর সদ্ভাব স্থাপন করেন। এই ডায়োডোটস্‌কে ইউথিডিমস্ নামে একজন আত্মীয় সিংহাসনচ্যুত করে নিজে বেশ জেঁকে বসেন। যখন ইউথিডিমস্ রাজত্ব করছেন, তখন তৃতীয় এণ্টিয়োকস্ আবার ব্যাকট্রিয়া অধিকারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। তাঁকে তুষ্ট করার জন্য ইউথিডিমস্ নিজের ছেলে ডিমিট্রিয়স্‌কে এণ্টিয়োকসের শিবিরে দূত হিসাবে পাঠিয়ে দেন। ডিমিট্রিয়সের চেহারা আর তার ব্যবহার দেখে এণ্টিয়োকস্ নাকি এত খুশী হয়ে ওঠেন যে তিনি নিজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেন আর তাকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে ব্যাক্‌ট্রিয়াকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেন। এই ডিমিট্রিয়স্ আফগানিস্তানের প্রায় সবটা নিজের কবলে এনে পঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তারে সাফল্য লাভ করেন। শোনা যায়, ইনি নাকি একেবারে

ডায়োডোটস্

ইউথিডিমস্

ডিমিট্রিয়স্

পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সুঙ্গবংশীয় এক রাজাকে পরাস্ত করেন। এদিকে ভারতবর্ষে ব্যস্ত থাকার দরুন তখন ব্যাক্‌ট্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে, আর সুযোগ পেয়ে ১৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইউক্রেটাই-ডিস্ ব্যাক্‌টিয়ার সিংহাসন দখল করে বসেন। এর বৎসর ছয়েক পরে ডিমিট্রিয়সের মৃত্যু হয়; তখন সম্ভবত ইউক্রেটাইডিস্ ভারতবর্ষেও ক্ষমতা বিস্তার করতে পেরেছিলেন। কোন কোন গ্রীক লেখকের মতে তিনি ভারত জয় করেন; এটা নিছক অত্যুক্তি, তবে বোধ হয় ডিমিট্রিয়সের জায়গা অনেকটা তিনি নিতে পেরেছিলেন। এর কিছুকাল পরে দেখা গেল যে একদিকে পার্থিয়ান বা পহ্লবদের আক্রমণ আর অপর দিকে উত্তর থেকে কয়েকটা যাযাবর জাতির শত্রুতায় ব্যাক্‌ট্রিয়ার একাংশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তখন এই বাহ্লিক বা ব্যাক্‌টিয়ান্ গ্রীকদের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে কিয়দংশ। ক্রমশ এই বাহ্লিক গ্রীকরা প্রায় ভারতীয় বলেই পরিগণিত হয়ে পড়ল।

ইউক্রেটাইডিস্

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গ্রীক জাতি

এই ভারতীয় বনে-যাওয়া গ্রীকরাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন মেনাণ্ডার। ডিমিট্রিয়সের পরিবারেই এঁর জন্ম হয়। মেনাণ্ডারের রাজধানী ছিল সাকল-নগরী (বর্তমান সিয়ালকোট)। তাঁর অনেক মুদ্রা কাবুল, সিন্ধু নদের উপত্যকা, আর আজকালকার উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে পাওয়া গেছে; ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে বাজাওর অঞ্চলে শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে মেনাণ্ডারের রাজ্যসীমা সম্বন্ধে একটা ধারণা সম্ভব; বিপাশা ('বিয়াস') নদী অতিক্রম করে নাকি তিনি রাজ্য বিস্তার করেন। ভারতীয় কাহিনীতে মেনাণ্ডারের মতো যশ অল্প ব্যক্তিরই ভাগ্যে মিলেছে; বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি যে একান্ত অনুরাগ পোষণ করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'মিলিন্দ-পন্‌হো' নামে নাগসেন-কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থে মিলিন্দের প্রশ্ন এবং তার উত্তর সন্নিবদ্ধ রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বহু গভীর প্রশ্ন যে মিলিন্দ করেছিলেন, তিনিই যে গ্রীক মেনাণ্ডার, তা নিশ্চিত। সুশাসক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল; গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে জানা যায় যে মৃত্যুর পর মেনাণ্ডারের দেহাবশেষ নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন শহরের মধ্যে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। এদেশের ইতিহাসে মেনাণ্ডার বাস্তবিকই এক বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছেন, সন্দেহ নেই।

গ্রীকরাজ মেনাণ্ডার :

মুদ্রা

শিলালিপি-

ভারত-ইতিহাসে তাঁহার স্থান

মেনাণ্ডার যেমন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন, তেমনই একজন গ্রীক বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ আমরা পাই; তাঁর নাম হল হেলিয়োডোরস্।

গ্রীক-বৈষ্ণব হেলিয়োডোরস্

এণ্টাল্‌কিডাস্ নামে এক গ্রীক রাজার দূত হয়ে এই হেলিয়োডোরস্ বিদিশার রাজা ভাগভদ্রের সভায় প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তক্ষশিলার অধিবাসী। ভাগবত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি বিদিশায় (বর্তমান বেসনগর) একটি গরুড়ধ্বজ, অর্থাৎ শীর্ষে গরুড়মূর্তি সংবলিত এক স্তম্ভ নির্মাণ করে দেন। এই স্তম্ভ এবং তার উপর উৎকীর্ণ লিপি আজও তাঁর বিষ্ণুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান।

ভারতে গ্রীক-অধিকারের বিলুপ্তি

গ্রীক রাজাদের অনেক চমৎকার মুদ্রা ভারত সীমান্তের উভয় পার্শ্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে প্রায় ত্রিশজন ব্যাক্‌ট্রিয়ান রাজার নাম পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে গ্রীকদের অধিকার কিন্তু একেবারেই স্থায়ী হতে পারে নি। নিজেদের মধ্যে বিবাদের ফলেও গ্রীকরা প্রকৃত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। শক, পহ্লব, ইউ-চি প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতির আক্রমণে তাদের শক্তি আরও হ্রাস পেয়ে শেষ পর্যন্ত একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

শক জাতি

শক-পরিচয়

শকেরা ছিল মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি ; কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এবং অর্থনৈতিক চাপে পড়ে তাদের বসতি অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্ভবত মধ্য এশিয়া থেকে ইউ-চি নামে আর এক জাতি তাদের আক্রমণ করায় তারা দেশ ছেড়ে আসে। দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে তারা কাবুল নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বসবাসের চেষ্টা করে। এখন 'সিস্তান্' বলে অভিহিত যে জায়গা রয়েছে, তার আদি নাম হল 'শক-স্থান' ; সম্ভবত ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীকদের কাছে তাড়া খেয়ে তারা সিস্তান্ অঞ্চলে হাজির হয়েছিল। যাই হোক, গ্রীক লেখকরা শকদের বলেন 'সীদিয়ান্', আর তাদের বাসভূমির নাম দেন 'সীদিয়া'। ক্রমশ এই শকেরা গ্রীকদের হটিয়ে সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে এবং পশ্চিম ভারতে এগিয়ে আসতে থাকে।

শকদের নূতন বসতি স্থাপন

'সীদিয়ান্' ও 'সীদিয়া'

প্রথম শক রাজা মাউয়েস্ বা মোগ

প্রথম যে শক রাজার নামোল্লেখ আমরা পাই, তিনি হলেন মাউয়েস্ বা মোগ ; মহারাজ, রাজাধিরাজ ইত্যাদি ভারতীয় উপাধি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, গান্ধার দখল করে কাবুল আর পঞ্জাবে যে গ্রীকরা ছিল তাদের পরস্পর যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। এর পর সিংহাসনে বসেন আজেস্ বা প্রথম অয়। গ্রীকদের অনুকরণে তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রচার করেন। শকদের মধ্যে একই সঙ্গে দুইজন রাজার রাজত্ব ('দ্বৈরাজ্য' —গ্রীসে কোন কোন রাজ্যের অনুরূপ) লক্ষ্য করা যায় ; একজন থাকতেন

আজেস্ বা প্রথম অয়

শক 'দ্বৈরাজ্য'

উপরাজ, প্রধান রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসতেন। অয়-এর উপরাজ ছিলেন আজিলিস্ বা দ্বিতীয় অয়; এঁর রাজ্যকালে পহ্লবরাজ গণ্ডোফর্নিস্ ভারত সীমান্তের কাছে শকদের অধিকৃত এলাকাগুলি দখল করে নেন।

শকেরা বোধ হয় দুই ভিন্ন দলে এদেশে আসে; একদল উত্তরে আর একদল দক্ষিণে রাজ্য স্থাপন করে। উত্তরে শকেরা মথুরা, তক্ষশিলা, কপিশা প্রভৃতি স্থানে বসতি প্রতিষ্ঠা করে। শক দলপতিরা 'ক্ষত্রপ', 'মহাক্ষত্রপ' প্রভৃতি উপাধি নিয়ে রাজত্ব করে। কালক্রমে এরা হিন্দু আচার গ্রহণ করে কার্যত ভারতীয়ে পরিণত হয়ে যায়। অনেকেই বৌদ্ধ বা হিন্দুধর্ম অবলম্বন করে, অনেকে ভারতীয় নামও গ্রহণ করে। গুজরাট ও পশ্চিম ভারতে 'ক্ষহরত' নামে তারা বেশ প্রবল হয়ে উঠে। সৌরাষ্ট্রের শকক্ষত্রপ ছিলেন ভূমক; তবে ক্ষহরতদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ক্ষত্রপ ছিলেন নহপান। তিনি সম্ভবত ১১৯ থেকে ১২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন; আমরা পূর্বেই দেখেছি যে পরাক্রান্ত সাতবাহনদের কাছ থেকে তিনি মহারাষ্ট্রের এক অংশ জয় করেন, উত্তর কোঙ্কণের উপকূল থেকে কাথিয়াওয়াড় (সৌরাষ্ট্র) ও আজমীর, মালব পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। নহপানের রাজ্য অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি নহপানকে পরাভূত করে আবার সাতবাহন গৌরব উদ্ধার করেন।

ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা

'ক্ষত্রপ' বা 'মহাক্ষত্রপ'

'ক্ষহরত'

শকক্ষত্রপ নহপান

সাতবাহন বংশের কাছে পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যে ও উজ্জয়িনীতে একটি নূতন শক রাজ্য স্থাপিত হয়; একে 'পশ্চিম ভারতের শকবংশ' অভিহিত করা হয়েছে। উজ্জয়িনীর নামোল্লেখে মনে পড়ে যে ভারতবাসীর স্মৃতিতে আজও বেঁচে আছেন 'বিক্রম সম্বৎ'-এর প্রতিষ্ঠাতা, মালবরাজ যশোধর্মন্, যিনি ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উজ্জয়িনীকে শক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে 'বিক্রমাদিত্য' ও 'শকারি' উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করেছিলেন। ইতিহাসে কিন্তু এঁর সম্বন্ধে তেমন নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। যাই হোক, খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে শক জাতির কার্দমক শাখার ক্ষত্রপেরা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন। এই ক্ষত্রপদের মধ্যে চষ্টন্-এর নাম আমরা প্রথম জানতে পারি; হয়তো ইনি কুশাণ রাজাদের প্রতিনিধিরূপে উজ্জয়িনীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একটি শিলালিপি থেকে মনে হয় যে তিনি এবং তাঁর পৌত্র রুদ্রদামন যুগ্মভাবে রাজত্ব করতেন। এই রুদ্রদামন হলেন শক ক্ষত্রপদের মধ্যে সবচেয়ে

পশ্চিম ভারতের শকবংশ

শকারি যশোধর্মন্

উজ্জয়িনীতে শক রাজত্ব

চষ্টন্

শকক্ষত্রপ রুদ্রদামন

খ্যাতিমান। জুনাগড়ে প্রসিদ্ধ শিলালিপি থেকে, তাঁর শাসন ও পূর্তকর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বহু তথ্য মেলে। মহাক্ষত্রপ আখ্যা নিয়ে রুদ্রদামন কোঙ্কণের উত্তরাংশ থেকে মারওয়াড় ও মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি কিংবা সাতবাহন বংশের তৎপরবর্তী রাজার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি প্রভূত সাফল্য লাভ করেন। তখন দ্বিতীয় শতাব্দী অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেছে; মহাযশস্বী কুশাণ সম্রাট কণিষ্কের অযোগ্য বংশধরদের কাছ থেকে এবং আয়ুধেয় ইত্যাদি প্রতাপশালী জাতির কাছ থেকে উত্তরে কোন কোন এলাকা রুদ্রদামন অধিকার করেন। সম্ভবত মৌর্যযুগে যে সুদর্শন হ্রদ খনন করা হয়, তারই এক নূতন বাঁধ রুদ্রদামনের পহ্লব বংশীয় অমাত্য সুবিশাখের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়; প্রজাহিতকর এই কাজের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে কোন বিশেষ কর বা শ্রম-সাহায্য আদায় করা হয় নি। যুদ্ধে পারদর্শী, ধর্মভীরু, প্রজাহিতৈষী, সুশাসক এবং সুপণ্ডিত বলে রুদ্রদামনের খ্যাতি ছিল; সমর সাফল্য সত্ত্বেও অকারণ রক্তক্ষয়ের তিনি বিরোধী ছিলেন। ব্যাকরণ, সঙ্গীত, ন্যায়শাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। রুদ্রদামনের প্রশস্তিতে অতিরঞ্জন থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তিনি যে প্রকৃত শক্তিধর ব্যক্তি ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। সাতবাহন সাম্রাজ্যের আঘাতেও শক আধিপত্য সঙ্কুচিত হতে থাকে। উত্তর-পশ্চিমে পারসীক প্রাধান্যের লক্ষণ দেখা যায়, শকদের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। কিছুকাল পরে রুদ্রসেন নামে এক শক রাজা চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে আবার পূর্বখ্যাতি উজ্জীবিত করেছিলেন, কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমুত্থানের পর শক শাসনের আয়ু সমাপ্ত হয়ে এল। সৌরাষ্ট্র, মালয়, মথুরা, সর্বত্রই শক আধিপত্যের অবশেষ নির্বাপিত হল।

রাজ্যবিস্তার

প্রজাহিতকর কার্য

রুদ্রদামন প্রশস্তি

শক-শক্তির বিলুপ্তি

পহ্লব বা পার্থিয়ান জাতি

পূর্বপরিচয়

উত্তর-পশ্চিম ভারত সীমান্তে পহ্লব বা পার্থিয়ানরাও তাদের অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত অঞ্চল তাদের আদি বাসভূমি; পারসীক ও পরে আলেকজাণ্ডারের গ্রীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা ছিল। আবার সেলিউকসের বংশধরদের আমলে ক্রমশ তারা প্রথম মিথিডেটিস নামে রাজার নেতৃত্বে সিন্ধু-উপত্যকা

স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা

পর্যন্ত প্রসারিত এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে (১৭১-১৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকে গন্ধারের একাংশ পহ্লবরা শকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল ; শোনা যায় যে আনুমানিক ৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তক্ষশিলায় এক পহ্লব রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল। পহ্লব রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন গণ্ডোফর্নিস্ ; পূর্ববর্তী পহ্লব-রাজ ফ্রাওটিস্-এর সঙ্গে তাঁর কোন আত্মীয়-সম্পর্ক ছিল কিনা জানা নেই। কাবুল, কান্দাহার তক্ষশিলা প্রভৃতি অধিকার করে তিনি নাকি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধে ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক এবং শকদের তিনি পরাজিত করেছিলেন বলেও কথিত আছে। কিংবদন্তী আছে যে তাঁর সময়ে সেণ্ট টমাস নামে যীশুখ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ শিষ্য এক খ্রীষ্টান সাধু ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারে আসেন ; গণ্ডোফর্নিস্ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলেও শোনা যায়। সেণ্ট টমাস সম্বন্ধে কিংবদন্তী পূর্ণ সত্য না হলেও একথা স্মরণীয় যে ইয়োরোপে খ্রীষ্টধর্ম যাওয়ার বহু পূর্বে আতিথেয়তা ও ধর্মবিষয়ে উদারতার জন্য খ্যাত ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মের আগমন হয়েছিল, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উগ্র অসহিষ্ণুতা নিয়ে কেউ বাধা সৃষ্টি করেছিলেন বলেও জানা নেই। যাই হোক, গণ্ডোফর্নিসের মৃত্যুর পর পহ্লবদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য তেমন আর কিছু পাওয়া যায় না। মুদ্রা, লিপি প্রভৃতি উপাদান থেকে স্থির হয়েছে যে কুশাণ-প্রাধান্য তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে পহ্লব শাসনকে ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে বিলীন করে দিয়েছিল।

তক্ষশীলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা

গণ্ডোফর্নিস্

সেণ্ট টমাস সম্পর্কীয় কিংবদন্তী

পহ্লব শাসনের অবসান

কুশাণ জাতি

পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে ইউ-চি নামে এক জাতির লোক মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষের অভিমুখে আসতে আরম্ভ করেছিল। যাযাবর জীবনে বহু দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাদের পথ স্থির হচ্ছিল। ইউ-চিদের একটি ছোট শাখা তিব্বতের দিকে গিয়েছিল মনে হয়, আর সংখ্যাগরিষ্ঠেরা অনুকূল অঞ্চলের অন্বেষণে শকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং সিরদরিয়া নদীর অববাহিকাতে কিছুকাল বসবাস করতে থাকে। পরে উ-সুন্ নামে এক জাতির শত্রুতার বেগ সামলাতে না পেরে তারা আমুদরিয়া (Oxus) নদী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সম্ভবত এই সময় তারা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে কৃষিকর্ম অবলম্বন করেছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে এই ভাবে অগ্রসর

বসতিসন্ধানে ইউ-চি জাতি

কুশাণ শাখার প্রাধান্য লাভ

হতে হতে ইউ-চিরা পাঁচ শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল মনে হয়; এই এই পাঁচ শাখার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে যারা, তাদের নাম হল কুশাণ। এই একদা অনুন্নত যাযাবর জাতি মাথা তুলে উঠে মধ্য এশিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, ভারতবর্ষে এসে এদেশের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে আমাদের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম কদফিসিস্

কুজুল কদফিস্ (Kadphises) নামে এক দলপতি বাকি চারটি ইউ-চি শাখার সকলকে পরাজিত করে নিজেকে 'ওয়াং' বা রাজা বলে ঘোষণা করেন; এঁকে আমরা প্রথম কদফিসিস্ বলে জানি। ইনি পহ্লবদের রাজ্য আক্রমণ করে কাবুল দখল করেন; সম্ভবত গন্ধার অঞ্চলও এঁর অধিকারে আসে, কিন্তু 'কিপিন্' বলে অভিহিত স্থান ঠিক গন্ধার কি না, তা নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। কারও কারও বিচারে প্রথম কদফিসিস্ বৌদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু এ খবরও অনিশ্চিত। পুত্র বীম কদফিস্ (দ্বিতীয় কদফিসিস্) সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য মেলে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেক অঞ্চল যে ইনি জয় করেন, তাতে সন্দেহ নেই; এমন কি, কথিত আছে যে পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। পঞ্জাব, সিন্ধু নদের উপত্যকা ইত্যাদি স্থানে যেসব ছোট ছোট পহ্লব রাজ্য ছিল, সেগুলিকে সহজে তিনি গ্রাস করতে পেরেছিলেন। চীন সাম্রাজ্য তখন প্রবল পরাক্রান্ত; রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা পর্যন্ত তার বিস্তার। শোনা যায় যে চীন সম্রাটের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের অভিলাষে দ্বিতীয় কদফিসিস্ চীনা সেনাপতির কাছে সম্রাট-কন্যার সঙ্গে বিবাহের এক প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কুশাণ রাজার পক্ষে এ-হেন প্রস্তাব চাঁদে হাত দেওয়ার মতো ব্যাপার মনে করে সেনাপতি পান-চাও দূতকে বন্দী করে চীনে পাঠিয়ে দেন। নিদারুণ অপমানের জ্বালা মিটাবার জন্য দ্বিতীয় কদফিসিস্ প্রকাণ্ড এক অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন। কাশগড় বা য়ারকন্দের কাছে লড়াই হল, আর সেখানে পরাজিত হয়ে কদফিসিস্কে চীন সম্রাটের কাছে বাৎসরিক কর প্রদানের শর্ত মেনে নিতে হল। দ্বিতীয় কদফিসিস্ অবশ্য সামান্য রাজা ছিলেন না; রোমান সম্রাট ট্রেজান্-এর সভায় তিনি দূত প্রেরণ করেছিলেন, রোমের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক তখন বেড়েছিল। গ্রীক এবং রোমান মুদ্রার অনুকরণে তখন যে কুশাণ মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল, তা কিছু কিছু পাওয়া গেছে। কোন

দ্বিতীয় কদফিসিস্

রাজ্যবিস্তার

চীন সম্রাটের সহিত সঙ্ঘর্ষ ও পরাজয়

দ্বিতীয় কদফিসিসের রাজকীয় গৌরব

কোন মুদ্রায় শিবমূর্তি অঙ্কিত আছে। রাজা নিজেকে 'মাহীশ্বর' বলে বর্ণনা করেছেন ; অনুমান করা যায় যে সম্ভবত দ্বিতীয় কদফিসিস্ মহেশ অর্থাৎ শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কুশান রাজ্যের অধিপতি হন ইতিহাস-বিশ্রুত কণিষ্ক। ধর্মবিশ্বাস

মহামতি কণিষ্ক

কদফিসিসের সঙ্গে কণিষ্কের কোন আত্মীয়সম্পর্ক ছিল কি না, তা জানা নেই। তাঁর রাজ্যকাল সম্বন্ধেও প্রচুর মতভেদ আছে। কোন্ বৎসর তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তাও পরিষ্কারভাবে আমরা জানি না। কারও কারও মতে তিনি বোধ হয় ১১৯ কিংবা ১২৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন, কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত স্থির করেছেন যে খুব সম্ভবত কণিষ্ক প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা হয়েছিলেন। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ গণনা আরম্ভ হয়েছে ; সমগ্র ভারতে সুপরিজ্ঞাত এই অব্দের স্থাপয়িতা বলে কণিষ্কের খ্যাতি রয়েছে ; এই খ্যাতিকে খণ্ডন করার মতো কোন যুক্তি বা তথ্য আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কণিষ্ক শকাব্দের প্রবর্তক ; শকাব্দ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে নয়, প্রথম শতাব্দীতেই তার সূচনা, একথা পরবর্তী কালের মনীষী অল্‌বেরুনি প্রভৃতির গ্রন্থাদি থেকে আমরা জানি ; সুতরাং প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণকাল

মতপার্থক্য ও সিদ্ধান্ত

মধ্য এশিয়ার খোটান, য়ারকন্দ্, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চল কণিষ্কের অধিকারে ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের প্রায় সকল এলাকা তিনি দখল করেন ; কাশ্মীর তাঁর কর্তৃত্বে এসেছিল। তদানীন্তন শিলা ও তাম্র লেখ এবং মুদ্রা, চীনা বিবরণ, অল্‌বেরুনির গ্রন্থ, কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি সূত্র থেকে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, তাতে মনে হয় যে বাস্তবিকই কিছু কাল কণিষ্কের অধিকারে এক বিপুল সাম্রাজ্য ছিল ; উত্তরে খোটান থেকে পশ্চিম সাগর উপকূলস্থ কোঙ্কনের উত্তরাংশ পর্যন্ত, পশ্চিমে খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত ঐ সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল। মথুরা ও অন্যত্র কণিষ্কের যে লিপি পাওয়া গেছে, এবং মধ্য ভারতে বিদিশা, সাঞ্চী প্রভৃতি স্থানে পরবর্তী কুশানরাজদের সম্বন্ধে যে সংবাদ মিলেছে, তা থেকে নিশ্চিত মনে হয় যে মালব, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান ইত্যাদি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। কাবুল যে কণিষ্কের দখলে ছিল তা কুশান লিপি এবং

সাম্রাজ্যের বিস্তার

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান-আহৃত তথ্য

অল্‌বেরুনির রচনা থেকে প্রমাণ করা হয়েছে। সাকেত (অযোধ্যা) এবং পাটলিপুত্র পর্যন্ত কণিষ্কের সফল অভিযান চলেছিল, এরূপ বৃত্তান্ত চীনা গ্রন্থে পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে হর্ষবর্ধনের রাজ্যকালে যশস্বী চৈনিক পর্যটক হিউয়েনসাং-এর কাছ থেকে জানা যায় যে গন্ধার জয় করে কণিষ্ক পুরুষপুর (বর্তমান পেশাওয়ার) শহরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। হিউয়েনসাং লিখেছেন যে কণিষ্কের রাজসভায় চীন দেশের এক রাজপুত্র ছিলেন ; হয়তো চীনের সঙ্গে কণিষ্কের যুদ্ধ হয়েছিল, এবং কোন প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকার স্বরূপ চীন রাজবংশের একজনকে পুরুষপুরে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে খুব ভরসা করে কিছু বলা কঠিন, কিন্তু দ্বিতীয় কদফিসিস্‌ যুদ্ধে বিপর্যস্ত ও অপমানিত হয়েছিলেন বলে কণিষ্কের পক্ষে চীনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক যুদ্ধযাত্রা অসম্ভব ছিল না ; পূর্ব তুর্কিস্তান অঞ্চলে কণিষ্ক চীন বাহিনীকে বিপন্ন করতে পেরেছিলেন বলে হিউয়েনসাং নিজে লিখে গেছেন। অবশ্য সুদূরস্থিত ও পরাক্রান্ত চীন সাম্রাজ্যের উপর কণিষ্ক তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। কিন্তু বহুধা বিস্তৃত অভিযানে তাঁর সাফল্য যে অসামান্য তা সর্বস্বীকৃত।

রাজধানী

কণিষ্ক-চীন-সম্রাট সম্পর্ক

কণিষ্কের খ্যাতি শুধু তাঁর যুদ্ধজয়ের উপর নির্ভরশীল নয় ; তাই যদি হত তো বহুপূর্বেই তা ম্লান হয়ে যেত। বৌদ্ধধর্মের একান্ত অনুরাগী ও সহায়ক বলে তাঁর যে খ্যাতি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বহু চৈত্য ও মঠ, বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। শোনা যায় যে জীবনের প্রথম দিকে তিনি কিছুকাল শিব ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর পূজা করতেন, কিন্তু শেষ বয়সে বৌদ্ধধর্মবিষয়ে তাঁয় প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তির উদ্রেক হয়েছিল। পুরুষপুরে যে বিশাল বৌদ্ধ মঠ তিনি নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে সযত্নে বুদ্ধের অস্থি রক্ষিত হয়েছিল, তার প্রশংসায় হিউয়েনসাং হয়েছিলেন শতমুখ ; বহুকাল ধরে পর্যটকেরা এই চৈত্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছে। সম্ভবত তদানীন্তন ভারতে পুরুষপুরের এই মঠ ছিল বৌদ্ধ ভাবধারা প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। বৌদ্ধ ইতিহাসে কণিষ্কের খ্যাতির এক মুখ্য কারণ হল এই যে অশোকের রাজ্যকালে যেমন ঘটেছিল, তেমনই তাঁরও শাসনকালে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি (মহাসম্মেলন) আহূত হয়েছিল ; কণিষ্কের ব্যক্তিগত উৎসাহ ও উদ্যোগ বিনা এ ঘটনা সম্ভব হত না। বসুমিত্র, অশ্বঘোষ প্রমুখ মনীষী এই কাজে লিপ্ত ছিলেন ; বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমতের বিশদ ব্যাখ্যা ও টীকা প্রস্তুত করার কাজে তাঁরা লেগেছিলেন। এই

কণিষ্কের বৌদ্ধধর্মানুরাগ

পুরুষপুরের বৌদ্ধ মঠ

তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি

সঙ্গীতির বিশেষ গুরুত্ব এই জন্য যে তখন থেকে বৌদ্ধ-বিশ্বাসীদের মধ্যে "মহাযান" ও "হীনযান" এই দুই মতাবলম্বীদের আমরা দেখেছি। বুদ্ধ স্বয়ং যখন ধর্মপ্রচার করেন, তখন তাঁর কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতি গড়ে তাকে পূজা করার রীতি একেবারে ছিল না; তথাগত পেতেন অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি, কিন্তু ব্যক্তিপূজায় তাঁর বিরাগ ছিল, নিজেকে দেবতা বলতে তিনি কাউকে দেন নি। কিন্তু ক্রমশ তাঁর জীবন-কথা, বোধিসত্ত্বরূপে তাঁর পূর্বজন্মের বিচিত্র কাহিনী, তাঁর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী এমনভাবে প্রচারিত হল যে তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে দেওয়া হল অনিবার্য ঘটনা। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কল্যাণকর্মে লিপ্ত থাকার যে শিক্ষা, তা অতি সূক্ষ্ম ও সাধারণের পক্ষে দুর্গম বলে অপর এক ধর্মধারার প্রয়োজন অনুভূত হল। স্বয়ং শাক্যমুনি যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে বলা হল "হীনযান"—ধর্মের পথ সেখানে সূক্ষ্ম ও ক্ষুরধার। আর বুদ্ধের মূর্তি গড়ে, তাঁকে দেবতা বলে পূজা করার যে পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, তাকে অভিহিত করা হল "মহাযান"—বহুজন সে পথে সহজে বিচরণ করতে পারবে বলে। সম্ভবত যে বিদেশীরা বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল, "হীনযান" যেন তাদের নাগালের বাইরে বলে "মহাযান" প্রবর্তনের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। যাই হোক, কণিষ্ক স্বয়ং মহাযান মতের সমর্থক ছিলেন মনে হয়; বুদ্ধের বহু প্রস্তরমূর্তি তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে ধর্মব্যাপারে উদারতার যে ধারা আছে, যেন তাকেই অনুসরণ করে কণিষ্ক তাঁর বিভিন্ন মুদ্রায় যে সমস্ত দেবদেবীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত করেছিলেন তাদের মধ্যে হিন্দু, গ্রীক, পারসীক সকলের দেবতাই রয়েছেন।

বৌদ্ধধর্ম : হীনযান বনাম মহাযান

মহাযান মতের কারণ বিশ্লেষণ

কণিষ্কের ধর্মমত ও ধর্মীয় উদারতা

শিল্প-সাহিত্য ব্যাপারে কণিষ্কের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজসভায় বসুমিত্র, নাগার্জুন, অশ্বঘোষ প্রভৃতি মনীষীর সমাগম হত। বসুমিত্র ছিলেন দার্শনিক; "মহাবিভাষা" নামে বিখ্যাত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। আচার্য নাগার্জুন "মহাযান" ধর্মমতের সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অশ্বঘোষের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভা ইতিহাসে অল্পই দেখা গেছে; বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র বিষয়ে তিনি এক বিশারদ তো ছিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, নৈয়ায়িক বলে তিনি প্রসিদ্ধ। "বুদ্ধচরিত", "সৌন্দরনন্দ কাব্য", "সূত্রালঙ্কার" ইত্যাদি তাঁর রচনা কখনও বিস্মৃত হবার নয়। শুধু বৌদ্ধ ইতিহাসে নয়, এদেশের ইতিবৃত্তে তিনি একজন

কণিষ্কের শিল্প-সাহিত্যানুরাগ

বসুমিত্র

নাগার্জুন

অশ্বঘোষ

অবিস্মরণীয় পুরুষ। অশ্বঘোষ ছাড়া আরও একজন কণিষ্কের রাজসভায় আসতেন, যাঁর নাম যুগ যুগ ধরে কীর্তিত হচ্ছে; তিনি হলেন চরক। কণিষ্কের চিকিৎসক বললে যেন তাঁর অপমান করা হয়, মহর্ষি চরক বলেই তিনি আয়ুর্বেদের কাহিনীতে অপরিম্লান খ্যাতি নিয়ে রয়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস স্মরণ করে সুশ্রুত-কে, যিনি শল্যবিদ্যার জনক বলে খ্যাত; সম্ভবত এই যুগেই তিনি জন্মেছিলেন।

চরক

সুশ্রুত

কণিষ্ক-আমলে স্থাপত্যে অগ্রগতি

স্থাপত্যশিল্প কণিষ্কের উৎসাহ ও বদান্যতায় তখন খুব অগ্রসর হয়েছিল। অসংখ্য স্তূপ তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন; পুরুষপুরের বিরাট চৈত্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর সময়ে মথুরা নগরী শোভায়, সমৃদ্ধিতে অপরূপ হয়ে উঠেছিল; আজ যে মথুরা প্রত্নশালাতে কণিষ্কের এক বিশাল প্রতিমূর্তি রয়েছে, তা যেন খুবই সঙ্গত। এই মূর্তির শিরোভাগ কাল হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু মস্তকহীন প্রতিকৃতিরই গাম্ভীর্য, তেজ ও শিল্পোৎকর্ষ এখনও বিস্ময়কর। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে গ্রীক পূর্তবিদ্বান ও স্থপতিকে কণিষ্ক মথুরায় এনেছিলেন; এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়, কিন্তু সে যুগে প্রধানত গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ রীতি মিশে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল। কণিষ্কের রাজ্যকালে গান্ধার শিল্পের পরিচয় বেশ মেলে, কিন্তু তাঁর পরবর্তী যুগেই এর বিকশিত রূপ আমরা দেখতে পাই। গ্রীক দেবতাদের প্রতিকৃতি গঠনের রীতি অনুসরণ করে বুদ্ধমূর্তি যখন গড়া হল, তখন ভঙ্গীতে নূতনত্ব এসেছিল, দেহকে অবিকলরূপে চিত্রিত করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল, মূর্তিতে স্বাভাবিকতার সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্প-বিচারে গান্ধার শিল্প এদেশের স্বকীয় শিল্পরীতির কাছে যে ম্লান হয়ে যায়, একথা কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের আপত্তি সত্ত্বেও আজ একেবারে সুসিদ্ধ। যাই হোক, কণিষ্কের বহুমুখী কীর্তি ইতিহাসে যে তাঁকে অমর করে রেখেছে, তাই এখানে আমরা স্মরণ করে রাখব।

মথুরার কণিষ্ক মূর্তি

গান্ধার শিল্প-রীতি

দেশীয় শিল্প-রীতির উৎকর্ষ

কুশান শক্তির বিলুপ্তি

কণিষ্কের রাজত্ব সম্ভবত তেইশ বৎসর চলেছিল। তারপর অল্পকাল রাজ্য করেন বাশিষ্ক; বাজিষ্ক এবং জুষ্ক বলে আরও দুই নাম পাওয়া যায়, সম্ভবত এই তিন নাম একই ব্যক্তিকে সূচিত করে। এর পর আসেন হুবিষ্ক; 'মহারাজাধিরাজ দেবপুত্র' উপাধি নিয়ে তিনি মথুরায় রাজধানী

বাশিষ্ক

হুবিষ্ক

স্থাপন করে রাজ্য শাসন করেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে রীতিমত ছাপ রেখে যাওয়া সত্ত্বেও কণিষ্কের শক্তির উৎস ছিল মধ্য এশিয়া; পুরুষপুর তাঁর পক্ষে রাজধানী হওয়া স্বাভাবিক। হুবিষ্ক মথুরাকে শাসনকেন্দ্র করলেন; কুশানদের ভারতীয়করণ যেন তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। আবার "দেবপুত্র" উপাধিতে বৈদেশিক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে; এই প্রভাব আরও স্পষ্ট দেখা যায় হুবিষ্কের পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় কণিষ্কের রোমান উপাধি "কাইজার" (Caesar—সম্রাট) গ্রহণে। মথুরায় হুবিষ্ক বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন; আবার কণিষ্কের মতোই তিনি মুদ্রাতে পারসীক, হিন্দু প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত করান। শোনা যায় হুবিষ্ক বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবতাদের প্রতি ভক্তি ও বৌদ্ধধর্মে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাঁর ছিল। যাই হোক, কুশান রাজবংশ যে ক্রমশ একান্তরূপে ভারতীয় বলে গৃহীত হল তার পরিচয় পাওয়া যায় শেষ কুশান রাজা বাসুদেবের নামকরণে। বাসুদেব নাম সত্ত্বেও তিনি শৈব ছিলেন মনে হয়। রাজশেখর-কৃত "কাব্যমীমাংসা" গ্রন্থে তাঁকে কবিতার পৃষ্ঠপোষক বলা হয়েছে। তাঁর সময়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলগুলির সঙ্গে কুশান রাজ্যের যোগাযোগ দুর্বল হতে হতে ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাসুদেবের পর কুশানদের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার নেই। মথুরায় নাগ বংশের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; পশ্চিম ভারতে শক ক্ষত্রপরা স্বাধীন হয়ে যায়; উত্তর-পশ্চিমে পারসীক সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয়ে কুশান-শক্তি বিধ্বস্ত হয়, তবে কোথাও কোথাও ছোটখাট আকারের কুশান শাসন কিছুকাল হয়তো চলেছিল।

কুশানদের ভারতীয়ে পরিণত হওয়ার পর্যায়

কুশান-শক্তির বিলুপ্তি

কুশান যুগে বহির্বিশ্বে ভারতীয় বাণিজ্য ও সংস্কৃতির প্রসার

মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়ে চীন, জাপান, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে; কথিত আছে যে কুশান যুগে কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে এক ভারতীয় ভিক্ষু চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচারক ছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে অপর দেশের যোগাযোগ এই সময়কার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই যোগাযোগেরই ফল হল গান্ধার শিল্প, যার বহু চমৎকার নমুনা পৃথিবীর অনেক প্রত্নশালায় রক্ষিত রয়েছে। এদেশেরই ভাববস্তু ও শিল্পনৈপুণ্য গ্রীক ও রোমান শিল্পপদ্ধতির সঙ্গে মিশে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নূতন অধ্যায় গঠন করে। বিদেশী প্রভাবের প্রত্যক্ষ নিদর্শন হল গান্ধার শিল্প;

যুগ-বৈশিষ্ট্য

গান্ধার শিল্পের উদ্ভব

কিন্তু বিদেশের সঙ্গে বহুবিধ আদান-প্রদানের ফলে চিত্তের যে প্রসার ঘটে, সম্ভবত তারই ছাপ দেখা যায় মথুরা, অমরাবতী ও নাগার্জুন-কোণ্ডায়, কিংবা ভরহুতের প্রস্তর বেষ্টনীতে, সাঞ্চীর তোরণে এবং বহু চৈত্য, বিহার ও গুহা-স্থাপত্যের শিল্পভূষণে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য

যে সময়কে কুশান যুগ বলে অভিহিত করা অসঙ্গত নয়, তখনই বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনীভূত হয়েছিল। পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার যেসব অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সেখানে ভারতবর্ষের অনেক জিনিস রপ্তানি হত। এদেশ থেকে মাল বোঝাই করে নিয়ে জাহাজ লোহিত সাগরের মুখ পর্যন্ত যেত। আনুমানিক ২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষ থেকে এক বড় রাজা রোমান সম্রাট অগস্টস্-এর সঙ্গে বন্ধুতাস্থাপনের উদ্দেশ্যে বহু বিচিত্র উপহার পাঠিয়েছিলেন বলে স্ট্রাবো-র লেখায় চিত্তগ্রাহী বর্ণনা আছে। ভৃগুকচ্ছ থেকে পারস্য উপসাগর এবং তারপর ইউফ্রেটিস্ নদী বেয়ে উপহার-বাহকেরা গিয়েছিল। তাদের মধ্যে নাকি ছিলেন একজন জৈন বা বৌদ্ধ ভিক্ষু, যিনি (পূর্বকথিত ভিক্ষু কল্যাণের মতো) গ্রীসের অ্যাথেন্স শহরে পৌছে স্বেচ্ছায় চিতায় বসে আত্মহত্যা করেন, সবাই অবাক হয়ে যায়। প্রায় চার বৎসর লেগেছিল রোমান সম্রাটের কাছে উপহারগুলি পৌছাতে। উপহারের মধ্যে ছিল বাঘ, সাপ, প্রকাণ্ড কচ্ছপ, হিমালয়ের হরিণ, আর একটা ছেলে যার হাত ছিল না অথচ পায়ের আঙুলের জোরে সে তীর ছুড়তে পারত! ১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমে এই ভারতবর্ষের বাঘ দেখানো হয়েছিল ; ইয়োরোপে বাঘের চেহারা তখন প্রথম দেখা গিয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য

রোমক সম্রাটের নিকট উপহার প্রেরণ

পেরিপ্লস্

আলেকজান্দ্রিয়ার এক অজ্ঞাত গ্রীক নাবিকের লেখা "পেরিপ্লস্" (Periplus of the Erythraean Sea) বলে বই থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূল ধরে জলপথে তিনি এদেশে আসেন। দাক্ষিণাত্যের অনেক বড় বড় বন্দর ও গঞ্জের নাম তাঁর কাছ থেকে জানা যায় ; অনুমান করা হয়েছে যে এই সমস্ত স্থানে গ্রীক-রোমান সওদাগরদের প্রতিনিধিরা আধুনিক যুগের 'এজেন্সি' ব্যবস্থার অনুরূপ বন্দোবস্ত করে বসবাস করত। এদেশ থেকে রপ্তানির সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিল ভৃগুকচ্ছ—এখন এর নাম হল ক্যাম্বে অঞ্চলে অবস্থিত ভরোচ (Broach)। দেশের ভিতরে উজ্জয়িনী ('Ozene') এক শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

দক্ষিণ-ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

ভৃগুকচ্ছ

উজ্জয়িনী

দক্ষিণাপথ ও তামিল দেশে "পেরিপ্লস্"-এর বৃত্তান্ত অনুসারে প্রধান বন্দর ছিল পশ্চিম উপকূলে কল্যাণ, ক্র্যাঙ্গানোর ('Muziris') ও নলগোণ্ডা এবং পূর্ব উপকূলে পণ্ডিচেরী ('Poduca') ও মসলিপত্তন ('Masalia')। তাম্রপর্ণী ('Taprobane') কিংবা সিংহলের কথাও সেখানে বর্ণিত আছে। পুরী, বারাণসী, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও কিছু খবর পেরিপ্লস্-এ আছে; তার প্রত্যক্ষ মূল্য বেশী না হলেও পরোক্ষ গুরুত্ব রয়েছে। নিশ্চয়ই পেরিপ্লসের রচনা সামনে রেখে দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও ভূগোলকার টলেমি পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র প্রণয়নে প্রয়াসী হন; বহু অনিবার্য ভ্রান্তি সত্ত্বেও এর প্রকাশ এক স্মরণীয় ঘটনা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে পরিচিতি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল, আর সেই পরিচিতিতে ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল।

তৎকালীন প্রধান বন্দর

পেরিপ্লসের গুরুত্ব

এদেশ থেকে রপ্তানির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সূক্ষ্ম মসলিন, সাধারণ সুতির কাপড়, হাতির দাঁতের জিনিস, মসলাপাতি, রেশম ইত্যাদি। আমদানি হত প্রধানত তামা, টিন, কাচের জিনিস, প্রবাল, রৌপ্যদ্রব্য ইত্যাদি; পেরিপ্লসে আরও আছে যে রাজবাড়ির অন্তঃপুরের জন্য বাছাই-করা মেয়ে আর ভালো গাইয়ে ছেলে বিদেশ থেকে আনা হত। এদেশে তৈরী বিলাসদ্রব্যের চাহিদা রোমে অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় সম্রাট টাইবিরিয়স্ আক্ষেপ করেন যে রোমের সোনা এত বেশী পরিমাণে ভারতবর্ষে চলে যাচ্ছে যে সাম্রাজ্য রক্ষার কাজ অর্থের অভাবে দুরূহ হয়ে পড়ছে। চীন দেশের যে রেশম রোমের ফ্যাশনদুরস্ত মহলে চড়া দামে খুব বিক্রয় হত, তার অনেকাংশ যেত ভারতবর্ষ থেকে। পাতলা রেশমের চাহিদা এত বেড়েছিল যে টাইবিরিয়স্ নাকি হুকুম দেন যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতলা রেশমের মধ্য দিয়ে দেখা যায় বলে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হল! রোমের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের লাভ ছিল অনেক বেশী; এখান থেকে যা রপ্তানি হত, তার দাম আমদানি পণ্যের দামের চেয়ে ঢের বেশী। পরে এই অবস্থা বদলাবার ব্যবস্থা রোমের কর্তৃপক্ষ করতে থাকে, কিন্তু শোনা যায় যে এদেশের মসলাপাতির কদর এমনই ছিল যে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে গথ্ (Goth) আক্রমণকারীদের নায়ক অ্যালারিক্ আশ্বাস দেন যে প্রায় আটত্রিশ মণ ভারতীয় মরিচ পেলে তিনি রোম শহরকে পুরো ধ্বংস থেকে অব্যাহতি দেবেন!

ভারতের রপ্তানি দ্রব্য

আমদানি দ্রব্য

রোমের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের লাভ

ভারতীয় মসলাপাতির কদর

স্থলপথে বহির্বাণিজ্যের রাস্তা ছিল চীন থেকে ভারতের উত্তরে

ব্যাক্ট্রিয়া, সেখান থেকে আবার রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তস্থিত পালমিরা (Palmyra) পর্যন্ত ; এরই নাম ছিল রেশমের রাস্তা (Silk-route)। তক্ষশিলা থেকে একটি রাস্তা উত্তর পশ্চিমে গিয়ে ব্যাক্ট্রিয়া বা বহ্লীক দেশে মিশেছিল। উত্তরাপথকে সংলগ্ন করার জন্য পূর্বে তাম্রলিপ্তি থেকে একটি রাস্তা মথুরা-দিল্লী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আবার সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত গিয়েছিল। মধ্যে ছিল উজ্জয়িনী, বিভিন্ন বাণিজ্যপথের সংযোগস্থল হিসাবে। অর্থনৈতিক জীবন যে তখন মন্দাক্রান্ত তালে চলে নি, তার বহু প্রমাণ রয়েছে।

রেশমের রাস্তা

রেশম-রাস্তার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা

শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই যুগের অবদান কতকটা আমরা পূর্বেই জেনেছি। সম্ভবত খ্রীষ্টজন্মের একশত বৎসর পূর্বে ভারতীয় গণিতজ্ঞেরা সংখ্যাগণনে শূন্য (Zero)-এর আবিষ্কার করেন এবং একের পর আর এক সংখ্যা সাজিয়ে তার মূল্য বৃদ্ধির তত্ত্বকে পূর্ণ আয়ত্ত করেন। ১ কিংবা ২-এর স্বতন্ত্র যে মূল্য, পাশাপাশি বসিয়ে দিলে যে তাদের মূল্য বদলে যায় তা ১২ আর ২১ সংখ্যা দুটি দেখলে আমরা বুঝি, কিন্তু এই সহজ কথাটি বুঝে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে ভারতীয় গণিতজ্ঞেরা ইতিহাসে এক বিপ্লব সংসাধিত করেন, যেমন করেন শূন্য-এর ব্যবহার সম্পর্কে নীতি স্থির করে। "Arabic numeral" বলে যার পরিচিতি তা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের অবদান বলে সর্বস্বীকৃত।

গণিতশাস্ত্রে ভারতের অবদান : শূন্য-এর আবিষ্কার ও সংখ্যা লিখন-পদ্ধতির উদ্ভাবন

এই যুগে নানাদেশে ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করে উপাসনার ('personal God') এক ধারা দেখা দিয়েছিল। তখন পশ্চিম এশিয়া, মিশর, গ্রীস, ইতালী প্রভৃতি দেশে ছোট ছোট দল বেঁধে খ্রীষ্টানরা যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানুষের পরিত্রাতা বলে পূজা করছিল। মহাযান ধারার উদ্ভব থেকে দেখা যায় যে বুদ্ধতথাগতকে পূজা করা হচ্ছে ; বোধিসত্ত্ব, লোকপাল, নাগ, যক্ষ প্রভৃতিদের নিয়ে এক নূতন ধর্মপুরাণের সৃষ্টি হচ্ছে। হিন্দুদের মধ্যে বিষ্ণুর উপাসনা তখন প্রচলিত হচ্ছিল ; শৈবদেরও সাক্ষাৎ মিলছে। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে পরমতসহিষ্ণুতা যে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য,তার গৌরবময় পরিচয় এ যুগে বারবার পাওয়া গেছে। মেনাণ্ডর-এর রাজধানী সাকল-নগরে বিভিন্ন ধর্মধারার শিক্ষকরা সমান অভ্যর্থনা পেতেন বলে কথিত হয়েছে। সেণ্ট টমাস্ এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের কিংদন্তী মালাবার থেকে মাদ্রাজ বহু জায়গাতেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু

বিভিন্ন দেশে ঈশ্বর উপাসনা-পদ্ধতির সৌসাদৃশ্য

ধর্মবিষয়ে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য

মেনাণ্ডর

সেণ্ট টমাস্

বলে। মাদ্রাজে কয়েকজন ব্রাহ্মণ নাকি তাঁকে হত্যা করে, কিন্তু বহুদিন ধরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে যে তিনি বাধা পান নি, তাও একেবারে স্পষ্ট বলা হয়ে থাকে। সেন্ট টমাস্ এদেশে এসে থাকুন বা না থাকুন, মালাবার অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভারতীয় খ্রীষ্টানরা বাস করে আসছে, ইয়োরোপে খ্রীষ্টধর্ম গৃহীত হওয়ার বহু পূর্ব থেকে। এ সমস্ত ঘটনার যে বিশেষ তাৎপর্য আছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের "ভারত-তীর্থ" কবিতায় আছে—

রবীন্দ্রনাথের 'ভারত বৈশিষ্ট্য' —বর্ণনা

রণধারা বাহি' জয়গান গাহি'
উন্মাদ কলরবে
ভেদি' মরুপথ গিরি-পর্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তা'র বিচিত্র সুর।

কুশান যুগ অবিস্মরণীয় গৌরবের যুগ

মৌর্যোত্তর এই যুগে কবি-বাক্যের পরিপোষক বহু তথ্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি। যবন, পহ্লব, শক প্রভৃতি বিদেশী এদেশে এসে ভারতীয় সভ্যতারই অঙ্গীভূত হয়ে যায়। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তখন আমাদের যোগসূত্র নির্দিষ্ট হয়; বিদেশীর সংস্পর্শে ভারতের সংস্কৃতি বিচিত্র ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। গান্ধার শিল্পে বিদেশাগত ধারা ভারতীয় শিল্পকর্মের সঙ্গে মিশে এক বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয়; গ্রীক ও রোমান শিল্পলক্ষণ তার মূলগত ভারতীয়ত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। কাবুলের পশ্চিমে বামিয়ান্ গুহাগাত্রে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুই বিশাল বুদ্ধমূর্তি খোদিত হয়ে পথচারীর বিস্ময় ও ভক্তি উদ্রেক করে এসেছে, একটির উচ্চতা ১৭০ ফুট, অপরটির ১১৫ ফুট। ভারতবর্ষ, ইরান, গ্রীস, মধ্য এশিয়া—শিল্পক্ষেত্রে সকলের একত্র সমাবেশের এই মূর্তি যেন প্রতীক। যখন এই মূর্তি খোদিত হয়েছিল, তখন একদিকে চীন, অপর দিকে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক, পূর্ব ও পশ্চিম সাগর কূলবর্তী বন্দর থেকে ভারতের বাণিজ্য বহুধা বিস্তৃত। বিদেশী আক্রমণে পর্যুদস্ত না হয়ে তাকে বরং নিজগুণে আত্মস্থ করে ভারতবর্ষ তখন ইতিহাসে এক অনন্য ভূমিকায় নেমেছিল। সে যুগের কথা আমরা বিস্মৃত হতে পারি না।

॥ নবম অধ্যায় ॥

মগধের পুনরভ্যুদয় ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্য

ভারশিব ও বাকাটক বংশের কীর্তিকথা

শুঙ্গোত্তর যুগেও ভারতের ভাস্বর রাষ্ট্রশক্তি

বিদেশী আক্রমণে অভিভূত না হয়ে ভারতবর্ষ যে তার নিজের বিশিষ্ট সত্তাকে রক্ষা করতে পেরেছিল, তার একটা প্রধান কারণ এই যে শুঙ্গ বংশের পতন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী কালেও এদেশের স্বকীয় রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রপ্রতিভা নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি। অবশ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের ন্যায় সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ তখন মেলে না; প্রকৃতপক্ষে, বহুকালপরবর্তী আলাউদ্দীন খল্‌জী কিংবা অওরংজেব বাদশাহের পূর্বে আয়তনের দিক থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনা দেখা যায় নি, আধুনিক যন্ত্রযুগের পূর্বে ঐরূপ সাম্রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্ব বোধ হয় সম্ভব ছিল না। কিন্তু শুঙ্গরাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীদের শাসনকে ভারতবর্ষ কোথাও ঠিক মানে নি। বিদেশীদের মধ্যে সভ্যতায় সব চেয়ে অগ্রসর ছিল গ্রীকরা। প্রকৃতপক্ষে তারা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সীমান্তপারে অবস্থিত হয়ে থেকে মৌর্যশক্তির পতনের পর সাময়িকভাবে ক্ষমতা বিস্তার করে, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করে, কোন কোন গ্রীক শাসক সেখানে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা পর্যন্ত করে। কিন্তু ভারতবর্ষের ভিতরে কোথাও গ্রীকদের বসবাস আরম্ভ হয় নি, কোথাও স্থায়িভাবে গ্রীক কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রকৃত আয়োজন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

গ্রীকদের ভারতাভ্যন্তরে স্থায়ী কর্তৃত্ব স্থাপনে অসামর্থ্য

কুশানদের রাজশক্তি কিছুকাল পূর্বে এলাহাবাদ ও বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ রাজা বাসুদেবের পর আর তাদের বিশিষ্ট কোন ভূমিকাতে আমরা দেখি না। রাজস্থানের পশ্চিমে আয়ুধেয়দের গণরাজ্যকে কুশানদের বিলোপ সংঘটনে সহায়তা করতে লক্ষ্য করা যায়। এই আয়ুধেয়দের শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে শত্রু হয়েও শক রুদ্রদামন শিলালেখে সাক্ষ্য রেখে গেছেন। এমনও হতে পারে যে মালব, অর্জুনায়ন প্রভৃতি গণরাজ্য আয়ুধেয়দের কাজে সাহায্য করেছিল। পঞ্জাবে আবিষ্কৃত

আয়ুধেয় গণ-রাজ্যের কুশান-প্রতিরোধ

শিলালেখে "আয়ুধেয় গণস্থ জয়" দেখে মনে হয় যে কুশানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে একটা সংগ্রাম সম্ভবত ঘটেছিল। কুশান রাজশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার সময়ে দেখা যায় যে বর্তমানে বুন্দেলখণ্ড বলে অভিহিত অঞ্চল থেকে ভারশিব রাজবংশ উত্তর ভারতে আবার যেন প্রায় এক সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছে। এরা নাগবংশ বলেও বর্ণিত হয়েছে; তবে সর্পপূজার সঙ্গে মহাদেবের প্রতি ভক্তির মধ্যে অসঙ্গতি নেই। 'ভারশিব' শব্দের অর্থ হল শিবের ভার যারা বহন করে চলেছে; হয়তো এই আখ্যা নিজেদের গুরুত্ব প্রকাশের জন্যই গৃহীত হয়েছিল। কথিত আছে যে ভারশিব বংশ দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে; সাম্রাজ্য ঘোষণার চিরাচরিত পদ্ধতি ছিল এই। বীরসেন বোধ হয় এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। পরে মথুরা ও বিদিশায় এই বংশের দুই শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনুমান করা হয়। শেষ উল্লেখযোগ্য ভারশিব বংশীয় রাজা ভবনাগ আরও এক পরাক্রমশালী এবং উদীয়মান বাকাটক বংশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়।

ভারশিব রাজবংশ

ভারশিব কথার তাৎপর্য

বীরসেন

ভবনাগ

বাকাটক বংশের স্থাপয়িতা হলেন বিন্ধ্যশক্তি; এটা ব্যক্তির নাম কি বংশের বিশেষণ, তা বলা কঠিন। কথিত আছে যে ইনি প্রথম জীবনে একজন সাধারণ ব্যক্তি মাত্র ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রবর সেন (প্রথম) আনুমানিক ২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট বলে নিজেকে ঘোষণা করেন, উত্তরাপথের বহু অঞ্চলে তাঁর রাজ্যবিস্তার লাভ করে। অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন বলে প্রবর সেনের খ্যাতি; পুরাণে এই বাকাটক বংশের কৃতিত্বের প্রশংসা আছে। প্রবর সেনের পুত্র সর্বসেনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত বাকাটক রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল; এর সত্যাসত্য নির্ধারণ করা কিংবা কতদিন এই বিজয়ফল স্থায়ী হয়েছিল জানা অসম্ভব হলেও বাকাটক রাজ্য যে সাত-বাহনদের খ্যাতির উত্তরাধিকারী হয়েছিল মনে করা ভুল হবে না। রাজধানী নন্দীবর্ধন থেকে একশত বৎসরেরও অধিককাল মধ্য ভারতে এবং বিন্ধ্যগিরির উত্তর ও দক্ষিণে বাকাটক শাসন সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুশান ও যবনদের আগমনে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় যে পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, সেই ঝোঁককে ঠেকিয়ে রেখে নিষ্ঠাবান হিন্দুর মনোমত সমাজরীতি নির্ধারণে বাকাটক বংশের অবদান আছে। প্রবর সেনের প্রপৌত্র পৃথিবীসেনের এক লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে গর্ব-

বাকাটক বংশের স্থাপয়িতা

সম্রাট প্রবর সেন (প্রথম)

সর্বসেন

বাকাটক বংশের অবদান

ভরে বাকাটক বংশ দাবি করে যে একশত বৎসর ধরে রাজ্যের অর্থ ও বিচারবিষয়ক শাসনব্যবস্থা নিখুঁত হয়ে উঠেছিল। এই পৃথিবীসেনের পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজ কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দিয়েছিলেন; বাকাটক বংশকে মিত্ররূপে পাওয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের মতো পরাক্রান্ত শক্তিরও প্রয়োজন ছিল।

গুপ্ত সম্রাটের বাকাটকবংশের সহিত মিত্রতা

পাণিক্কর বলেন যে ভারশিব ও বাকাটকদের বৃত্তান্তকে শুধু গুপ্তযুগের পূর্ব কাহিনী মনে করা অন্যায় হবে। সমুদ্রগুপ্ত এবং তাঁর প্রখ্যাত উত্তরাধিকারীদের কীর্তিকথা পূর্ববর্তীদের যশঃপ্রভাকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে ভারতভূমি থেকে বিদেশীয় রাষ্ট্রপ্রভাব অপসৃত করে, সাম্রাজ্য বিষয়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রধারাকে আবার সমুজ্জ্বল করে ধরে, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, সংস্কৃতচর্চা, হিন্দুসমাজ ও জীবনরীতি সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত থেকে, এই রাজবংশগুলি যে অবদান রেখে গেছে তা গুপ্তবংশের তুলনায় অল্প নয়, বরং বলা যায় যে তারা যে প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ করেছিল, তা বিনা গুপ্তবংশের গরিমা হয়তো সম্ভব হত না। বিশেষ করে বাকাটকদের সম্বন্ধে একথা খুবই প্রযোজ্য।

ভারশিব ও বাকাটকদের কৃতিত্ব সম্পর্কে পাণিক্করের মন্তব্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

গুপ্তবংশের পরিচয়

প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে আমরা গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে জানি; আনুমানিক ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁর পিতা ঘটোৎকচ গুপ্ত এবং পিতামহ মহারাজ গুপ্তের উল্লেখ তদানীন্তন লিপিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সম্ভবত তাঁরা ছিলেন সামন্ত, করদরাজা, সার্বভৌম শক্তির অধিকারী তাঁরা ছিলেন না। এরও পূর্বে, আনুমানিক ১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজার কথা চৈনিক পর্যটক ইৎসিং-এর বিবরণে আছে, কিন্তু শুধু সপ্তম শতাব্দীর এই রচনার উপর নির্ভর করে কোন প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। যাই হোক, চন্দ্রগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন রাজা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। বৈশালীর বিখ্যাত লিচ্ছবি বংশের কন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেই যে চন্দ্রগুপ্ত স্বকীয় রাজশক্তির ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত। জয়স্‌ওয়াল বলেছেন যে "কৌমুদী মহোৎসব" নাটক থেকে জানা যায় যে লিচ্ছবিদের সহায়তায় পাটলিপুত্র অধিকার করেই চন্দ্রগুপ্তের শক্তি স্থাপিত হয়েছিল। এই লিচ্ছবিদের কথা এক হাজার বৎসরেরও

প্রথম স্বাধীন রাজা চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্তের লিচ্ছবীবংশীয়া কন্যা বিবাহের গুরুত্ব

বেশী আমাদের ইতিহাসে শোনা গেছে, জগতের কোন গণরাজ্য কোথাও এতকাল স্থায়ী হয় নি। গ্রীসের অ্যাথেন্স ও অন্যান্য নগর-রাষ্ট্র, ইতালীর ভেনিস্ ও জেনোয়া, কোথাও এতদিন ধরে গণরাজ্যের অস্তিত্ব দেখা যায় না। মগধ অঞ্চলে সাম্রাজ্যের প্রাদুর্ভাবে মাঝে মাঝে লিচ্ছবি-শক্তি অবশ্যই ব্যাহত হয়েছিল, কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যাদের কথা শোনা যায়, আবার তাদেরই গরিমা কীর্তিত হচ্ছে খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতকে; সমুদ্রগুপ্তের মতো অহঙ্কারী সম্রাট নিজেকে "লিচ্ছবি-দৌহিত্র" বলে বর্ণনা করে গর্ববোধ করেছেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজের বিবাহ সম্বন্ধে যে গর্বিত ছিলেন, তা জানা যায় যখন তাঁর মুদ্রায় লক্ষ্য করি যে লক্ষ্মীর মূর্তি মুদ্রিত রয়েছে আর লেখা রয়েছে "লিচ্ছবয়ঃ"। পৌরাণিক সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে "অনুগঙ্গা প্রয়াগ", সাকেত (অযোধ্যা) এবং মগধ, এই তিন প্রধান জনপদ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ উপাধি নিয়ে সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তাব্দ প্রচলন করেছিলেন বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন; আবার পাটলিপুত্র হয় রাজধানী। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে রাজপদে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন; এই মনোনয়নের মধ্যেও চন্দ্রগুপ্তের সুবিবেচনা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় মেলে।

লিচ্ছবিদের কথা

লিচ্ছবিদের মর্যাদা

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের বিস্তৃতি

পাটলিপুত্রে রাজধানী প্রতিষ্ঠা

উত্তরাধিকারী-রূপে সমুদ্র-গুপ্তের মনোনয়ন

সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল আনুমানিক ৩৩০ থেকে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে তিনি এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তি। সর্ববিদ্যাপারংগম, প্রকৃত প্রতিভাধর নরপতি বলে তাঁর খ্যাতি কীর্তিত হয়ে এসেছে। শুধু রাজ্যবিস্তার ও রাজনীতিজ্ঞানে নয়, বহুবিধ বিষয়ে সমুদ্রগুপ্তের ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। ভিন্সেন্ট স্মিথ সমুদ্রগুপ্তকে "ভারতীয় নেপোলিয়ন" আখ্যা দিয়েছেন; নানাদিক থেকে বিচার করলে এ ধরনের তুলনা ঠিক সঙ্গত না হলেও শৌর্যবীর্য ও রাজনৈতিক প্রতিভায় উভয় খ্যাতিমানের মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। যাই হোক, সম্প্রতিকার কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সভাকবি হরিষেণ প্রভৃতির কল্যাণে আমরা অতিরঞ্জিতভাবে জেনেছি। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচনায় সমুদ্রগুপ্তের খ্যাতি হ্রাস পেলেও যে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে না, তা নিশ্চিত। মগধে বিরাট এক হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্য জয়ের

'ভারতীয় নেপোলিয়ন'

সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্বের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

সফল প্রয়াস, ধর্মবিষয়ে আগ্রহ, সংস্কৃতির চর্চা ও সংবর্ধন, এ সমস্ত ব্যাপারে গুপ্তযুগের যে কৃতিত্ব প্রাপ্য, তার একটা প্রকৃষ্ট অংশ সমুদ্রগুপ্তকে দিতে কুণ্ঠিত হওয়া সমুচিত নয়।

সমুদ্রগুপ্তের সময়ের ঐতিহাসিক উপাদান

এলাহাবাদ স্তম্ভের উপর খোদিত সভাকবি হরিষেণ-কৃত প্রশস্তি, বিভিন্ন মুদ্রা ও লেখ, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের স্মারক পদক প্রভৃতি উপাদান থেকে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। হরিষেণ প্রশস্তি রচনা করেছিলেন ; স্বভাবতই তাতে উচ্ছ্বাসবাহুল্য ও অতিকথন যে আছে, তা নিশ্চয়। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যে ঐতিহাসিক ঘটনা, সে বিষয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হরিষেণের প্রশস্তি থেকে তাঁর জয়যাত্রা বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। "সর্বরাজোচ্ছেত্তা",—আর্যাবর্তের সকল রাজার উচ্ছেদকারী বলে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে ; পরাজিত রাজগণের একটা দীর্ঘ তালিকাও রয়েছে। উত্তর ভারতে রুদ্রদেব, নাগদত্ত, মতিল, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুতনন্দী, বলবর্মা, চন্দ্রবর্মা ইত্যাদি রাজা "প্রচণ্ডশাসন" সমুদ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হয়ে নতি স্বীকারে বাধ্য হন বলা হয়েছে। সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ও তার সন্নিকটস্থ ভূভাগে সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য স্থাপিত হয়। মধ্যভারতে অরণ্যসঙ্কুল অটবী রাজ্য (জব্বলপুরের কাছে) তিনি জয় করেন। মোটের উপর মনে হয় যে হিমালয় থেকে নর্মদা আর ব্রহ্মপুত্র থেকে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তাঁর অধিকারে আসে। সর্বত্র যে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা নয়। বাকাটক রাজ্য আক্রমণ না করে তার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে তিনি তুষ্ট ছিলেন ; দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বাকাটক বংশের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা), কামরূপ (আসাম), নেপাল, ইত্যাদি সীমান্তবর্তী রাজ্য, এবং পঞ্জাব ও মালব অঞ্চলে অর্জুনায়ন, আযুধেয়, মদ্রক, মালব, আভীর প্রভৃতি গণরাজ্যের কর্তৃপক্ষ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ে শঙ্কিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও আনুগত্য ঘোষণা করে। এভাবে উত্তরাপথের বহুলাংশ যে তাঁর করায়ত্ত হয়, তা স্পষ্ট।

হরিষেণ লিখিত সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কথা

সাম্রাজ্যের বিস্তার

সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ ভারত সম্পর্কিত নীতি

এলাহাবাদ প্রশস্তিতে দক্ষিণ ভারতের বহু বিজিত রাজা ও রাজ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মনে হয় যে দাক্ষিণাত্যে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অসম্ভাব্যতা বুঝে সমুদ্রগুপ্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়ে স্থানীয় রাজাদের আনুগত্য ঘোষণা ও উপহার প্রদানেই তুষ্ট হয়েছিলেন।


কাশ্মীর
পুরুষপুর
মদ্রক
কর্তৃপুর
যৌধেয়
অর্জুনায়ন
কামরূপ
পুণ্ড্রবর্ধন
ডবাক
আভীর
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
মালব
সুরাষ্ট্র
সমতট
মহাকোশল
সুর্পারক
বাকাটক
কোট্টুর
কাঞ্চি
চোল
পাণ্ড্য
সিংহল
গুপ্ত সাম্রাজ্য
(৪র্থ খৃষ্টাব্দ)
সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ অভিযান
আনুমানিক সাম্রাজ্য সীমা
অনুগত রাষ্ট্র

হরিষেণ সম্রাটের উদারতার স্তুতি করেছেন, "অ-প্রাণহিংসারুচি" বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। চিত্তের ঔদার্যের চেয়ে বাস্তববোধ ও রাজনীতিজ্ঞানই সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য-নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল বলা হয় তো অন্যায় হবে না। দক্ষিণ ভারতে যেসব রাজাকে সমুদ্রগুপ্তের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মধ্য ভারতের পূর্বভাগস্থ কোশলের রাজা মহেন্দ্র, উড়িষ্যার অরণ্যভূমি মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, পিষ্টপুরের (বর্তমানে গোদাবরী জেলায় পিথাপুরম্) রাজা মহেন্দ্রগিরি, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বেঙ্গির রাজা হস্তিবর্মা, কাঞ্চীর পল্লভ-বংশীয় রাজা বিষ্ণুগোপ প্রভৃতি। সমর কৌশলের বিচারে দাক্ষিণাত্য অভিযান খুবই উচ্চ স্থান নিয়ে আছে, কিন্তু এতে যে কোন স্থায়ী ফল ঘটে নি, তা দেখে আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই। সমুদ্রগুপ্ত কোন্ পথ দিয়ে গিয়ে আবার কোন্ পথে ফিরেছিলেন, পূর্বদিক ধরে গিয়ে পশ্চিম দিক ঘুরে ফিরেছিলেন কি না, স্থল-সৈন্যের সঙ্গে তাঁর নৌবাহিনী পূর্ব উপকূল বেয়ে গিয়েছিল কি না ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে গবেষকরা লিপ্ত থেকেছেন, মতভেদ কাটে নি। যাই হোক, দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং সেই উপলক্ষে বিশেষাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়, তাতে "অশ্বমেধ পরাক্রম" উল্লিখিত হয়েছিল। সভাকবিকে প্রশস্তি রচনার আদেশ নিশ্চয়ই তিনি দিয়েছিলেন; সেই যুগের এক শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও কবি হরিষেণ-কৃত প্রশস্তি এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভগাত্রে এখনও প্রায় অক্ষতভাবে টিকে রয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের পরাজিত রাজগণ

দাক্ষিণাত্য অভিযানের নানাদিক

অশ্বমেধ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান

গন্ধার ও কাবুল অঞ্চলে তখনও যে কুশান রাজাদের দেখা যায় তাদের কয়েকটি মুদ্রা দেখে এবং পশ্চিম ভারতে মালব ও সৌরাষ্ট্রের 'শক-মুরুন্দ' রাজ্যে গুপ্ত মুদ্রার প্রচলন থেকে অনুমান করা হয়েছে যে সম্ভবত উত্তর পশ্চিমে "দৈবপুত্র-শাহী-শাহান্‌শাহী" উপাধিভূষিত কুশান রাজারা এবং পশ্চিম ভারতে শক রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্তের প্রতি বশ্যতা জ্ঞাপন করে উপহারাদি দিয়েছিল।

শক-কুশান রাজাদের আনুগত্য স্বীকার

চীন দেশের এক ইতিহাস থেকে সিংহলের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্কের কথা জানা যায়। সিংহলরাজ মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় সিংহল থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি বিহার নির্মাণের অনুমতি চেয়েছিলেন; সমুদ্রগুপ্ত অনুমতি দিতে দ্বিধা করেন নি। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং লিখে গেছেন যে বিহার নির্মাণের অনুমতি চেয়ে রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তকে বহু

বহির্ভারতে সমুদ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠা

মূল্যবান উপহার প্রেরণ করেছিলেন। হিউয়েনসাং যখন এই বিহারে যান তখন সেখানে এক হাজার মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন; অপূর্ব এক বুদ্ধমূর্তি সেই প্রশস্ত বিহারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপ থেকেও নাকি সমুদ্রগুপ্তের কাছে উপঢৌকন প্রেরিত হয়েছিল। দূরাবস্থিত রাজন্যবর্গ তাঁকে "প্রণামকরণ" ও "করদানে" প্রীত করছেন, এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। দেশে বিদেশে যে সমুদ্রগুপ্তের যশ বিস্তৃত হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহ।

সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল নিরূপণ

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ছিল ৩৩০ থেকে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ; কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন যে তাঁর পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে ৩৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি, সুতরাং ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরেও সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমুদ্রগুপ্তও নিজের পুত্রদের মধ্যে রানী দত্তা-দেবীর গর্ভজাত সন্তান চন্দ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন; হয়তো কিছুকাল যুবরাজরূপে শাসনব্যাপারে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও তাঁর সঞ্চিত হয়েছিল। যাই হোক, সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আমরা তাঁর বহু বিচিত্র কৃতিত্ব ও প্রতিভার কথা স্মরণ করব। তাঁর অসামান্য বীরবিক্রম ও রণ-নৈপুণ্যের স্মারক হিসাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন মুদ্রায় ধনুর্ধর, পরশুধারী ও ব্যাঘ্রহন্তা তাঁর এই ত্রিবিধ মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শুধু দিগ্বিজয়ী বীর তিনি ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বাস্তব বিবেচনাশক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন, কখন অস্ত্র সংবরণ করে শত্রুকে মিত্রে পরিণত করতে হয় তা তিনি জানতেন, নিজের শক্তি ও মর্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই বৈদেশিক রাজ্যের সঙ্গে কেমন ব্যবহার সমুচিত তা জানতেন। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন পরম হিন্দু, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে উজ্জীবন কিছুকাল থেকে আরম্ভ হয়েছিল তিনি তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু পরধর্ম সম্বন্ধে শুধু সহিষ্ণুতা নয়, শ্রদ্ধাও তাঁর ছিল। সিংহলরাজ মেঘবর্ণকে বুদ্ধগয়ায় বিহার নির্মাণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি নিজের মনের প্রসার ও ঔদার্য প্রকাশ করেছিলেন। শোনা যায় যে বৌদ্ধ মনীষী বসুবন্ধুকে তিনি নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁকে "কবিরাজ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে; সম্ভবত স্বয়ং কবিতা রচনা (প্রশস্তিতে আছে "স্ফুট বহু কবিতা") এবং

সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব বিচার:

বীরবিক্রমী রণনিপুণ ও বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন

পরম হিন্দু

পরধর্মসম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল

কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ

অপরকে কাব্য ব্যাপারে প্রোৎসাহন তাঁর কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভূত ছিল। তাঁর যে বীণাবাদনরত মূর্তি সমসাময়িক মুদ্রায় দেখা যায়, তা থেকে হরিষেণ কর্তৃক উল্লিখিত তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু একজন রণনিপুণ সুশাসক ও রাজনীতিজ্ঞ বলেই তিনি বিখ্যাত হয়ে থাকেন নি। স্মিথ যে তাঁকে "ভারতীয় নেপোলিয়ন" বলেছেন, তাতে ঠিক তাঁর পরিচয় মেলে না। বহুগুণমণ্ডিত এক বীর্যবান বুদ্ধিমান সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরূপেই তিনি ইতিহাসে অক্ষয় আসন অধিকার করে আছেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ

কোন কোন গবেষক পরবর্তীকালের নাটক বিশাখদত্ত-কৃত "দেবী চন্দ্রগুপ্ত" এবং বাণভট্টের "হর্ষচরিত" থেকে অনুমান করেন যে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর কিছুদিন সিংহাসনে বসেন রামগুপ্ত। তখন নাকি উত্তর-পশ্চিমে কিছু গোলযোগ ঘটে আর শক রাজাদের প্রসন্ন করতে গিয়ে রামগুপ্ত হীনতার পরিচয় দেওয়ায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন অধিকার করে গুপ্তবংশের মর্যাদা রক্ষা করেন। এ বিষয়ে সমসাময়িক কোন প্রমাণ না থাকায় বলা যায় যে রামগুপ্ত বিষয়ক এই সংবাদ অসিদ্ধ। যাই হোক, ৩৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আমরা বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি।

বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন রাষ্ট্রনীতি হিসাবে গ্রহণ

বৈবাহিক সম্বন্ধের সূত্রে রাষ্ট্রের শক্তি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা ইতিহাসে বহু রাজকুল করেছে বলে আমরা জানি। লিচ্ছবি-কন্যা কুমার-দেবীকে বিবাহ করে গুপ্ত শক্তির প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যে ধারার প্রবর্তন করেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে তা আরও অগ্রসর হল। সমুদ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে বহু সমসাময়িক রাজপরিবারের কন্যা প্রেরিত হয়েছিল। কথিত আছে যে নাগ, কদম্ব ও বাকাটক বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত স্থাপন করেছিলেন ; দাক্ষিণাত্যে কুন্তল রাজ্যের কদম্ব বংশের সঙ্গেও নাকি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা, রানী কুবেরনাগার গর্ভজাতা প্রভাবতীর সঙ্গে বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিবাহ এক স্মরণীয় ঘটনা ; কারও কারও মতে চন্দ্রগুপ্ত নিজেও এক বাকাটকবংশীয়াকে বিবাহ করেছিলেন। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যধারার

বাকাটকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব

পূর্বগামী প্রতিভূ বাকাটক রাজ্যের সঙ্গে গুপ্তবংশের এই মৈত্রী শুধু

প্রতীকরূপে নয়, কার্যক্ষেত্রেও প্রভূত ফলপ্রসূ হয়েছিল সন্দেহ নাই। দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে শক-ক্ষত্রপদের আক্রমণ থেকে মগধের নিরাপত্তা নিশ্চিত হল। ইয়োরোপে যেমন হাপ্‌স্‌বুর্গ, বুর্বঁ প্রভৃতি রাজবংশ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনকে রাজনীতির অঙ্গীভূত করেছিল, তাদের বৈদেশিক নীতি প্রায় যেমন বৈবাহিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল ছিল, গুপ্তযুগেও যেন তার অনুরূপ ঘটনা আমরা দেখি। ভারতবর্ষে পরবর্তী যুগে যেমন মুঘল বাদশাহদের অন্তঃপুরে রাজস্থানের রাজকন্যা স্থান পাওয়ায় মুঘল-রাজপুত মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হতে পেরেছিল, তেমনই ঘটনা গুপ্তযুগে, বিশেষত সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালে, ঘটেছিল বলা চলে।

ইউরোপীয়, মোগল ও গুপ্ত রাজনীতির সৌসাদৃশ্য

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার সামরিক খ্যাতির অমর্যাদা করেন নি। পশ্চিম ভারতে মালব ও সৌরাষ্ট্রের শক-ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে অভিযানে বিজয়ী হয়ে তিনি "শকারি" উপাধি গ্রহণ করেন; ভিলসার সমীপস্থ উদয়গিরি ও সাঞ্চীতে আবিষ্কৃত তিনটি লিপি থেকে জানা যায় যে মালব ও সৌরাষ্ট্র তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। বাণভট্টের "হর্ষচরিত" থেকে জানা যায় যে পশ্চিম ভারতে এই বিপুল বিজয় লাভের পর প্রথমে বিদিশা এবং পরে উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যেন এক বিকল্প রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যে শক-শক্তি বহুকাল ধরে পশ্চিম ভারতে ক্ষমতা বজায় রেখেছিল, যার সম্বন্ধে বাস্তবিক যেন বলা যায় "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!", সেই শক-শক্তিকে চূর্ণ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের গৌরব যেন শিখরে অধিষ্ঠান করেছিল। কারও কারও মতে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে বাহ্লীক দেশ এবং পূর্বে বঙ্গদেশ জয় তিনি করেছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। পশ্চিম ভারতে গুপ্ত সাফল্যের গুরুত্ব প্রভূত; সেখানকার বহু সমৃদ্ধ বন্দর গুপ্ত অধিকারে আসায় বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বর্ধিত হল। উত্তরাপথের প্রায় সর্বত্র গুপ্তশাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; রাষ্ট্রিক সংহতি ও সুসংগঠনের গুণে দেশের ভিতরে ও বাহিরে বাণিজ্যের প্রসার ঘটল। পাটলিপুত্র থেকে মথুরা, সেখান থেকে উজ্জয়িনী, সেখান থেকে পশ্চিম উপকূল, এই হল বহির্বাণিজ্যের প্রধান পথ। বাণিজ্যজাত সমৃদ্ধি বিনা, রাষ্ট্রিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত না হলে, গুপ্তযুগে শিল্পকলার যে বিস্ময়কর বিকাশ এবং জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটেছিল তা সম্ভব হত না।

শক-দমন ও 'শকারি' উপাধি গ্রহণ

উজ্জয়িনীতে বিকল্প রাজধানী স্থাপন

সামরিক গৌরব

পশ্চিম ভারতে গুপ্ত-সাফল্যের গুরুত্ব

বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্য পথ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের প্রচুর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের আমলে যে সব মুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল, তার বৈচিত্র্য মনোহারী ; তুলনায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা তেমন আকর্ষণীয় না হলেও তার সংখ্যা অন্তত উত্তর ভারতে আরও বেশী। শকবিজয়ের পর এক ধরনের রৌপ্যমুদ্রা আর নানা রকম তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত অশ্বারোহী, সিংহনিধনকারী, ধনুর্ধর, শঙ্খছত্রধারী মূর্তি খুব উল্লেখযোগ্য। "সিংহবিক্রম", "বিক্রমাদিত্য" প্রভৃতি উপাধি কোন কোন মুদ্রায় উল্লিখিত থাকায় পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই ভারতবর্ষের কিংবদন্তীবিশ্রুত বিক্রমাদিত্য। এই "বিক্রমাদিত্য" উপাধি পুরাকালের বহু নৃপতির কাছেই যে একান্ত প্রিয় ছিল, তা আমরা জানি। পরাক্রান্ত রাজাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি এই উপাধি ধারণ করেছেন। কিংবদন্তী অনুসারে "শকারি বিক্রমাদিত্য" ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে "বিক্রম সংবৎ" বলে এক অব্দের প্রবর্তন করেছিলেন ; কিন্তু গবেষকরা আজও ঐ সময়ে এই বিক্রমাদিত্যের স্পষ্ট সন্ধান পান নি। তাছাড়া "বিক্রম সংবৎ" এদেশে প্রচলিত, কিন্তু প্রবর্তক যে কোন বিক্রমাদিত্য তারও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। যাই হোক, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে কিংবদন্তীর শকারি বিক্রমাদিত্য ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে শক শাসনের বিলুপ্তি সাধন করেন, তা অবিসংবাদিত। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক তিনি ছিলেন ; কাহিনী-খ্যাত নবরত্ন (মহাকবি কালিদাস-প্রমুখ নয় জন প্রতিভাধর) যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন, একথাও তাই অনুমিত হয়েছে। কর্ণাট অঞ্চলে প্রাপ্ত লেখ থেকে বিক্রমাদিত্যের বর্ণনা হিসাবে দেখা গেছে "পাটলিপুরবর অধীশ্বর" এবং "উজ্জয়িনীপুরবর-অধীশ্বর"। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে অযোধ্যা অনেক সময় শাসনকেন্দ্র থাকলেও পাটলিপুত্রই রাজধানী বলে অভিহিত হত, আর উজ্জয়িনীতে তিনি পরে এক বিকল্প রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনী এই উভয় নগরীর "অধীশ্বর" অন্য কোন বিক্রমাদিত্য ছিলেন বলে জানা নেই। কিংবদন্তীর "শকারি বিক্রমাদিত্য" এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য যে একই ব্যক্তি ছিলেন, একথা একেবারে নিশ্চিতভাবে বলার ভরসা না থাকলেও তার সম্ভাবনা যথেষ্ট বলতে কোন দ্বিধা নেই।

কিংবদন্তীখ্যাত বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি

প্রথম যুক্তি

দ্বিতীয় যুক্তি

যাই হোক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ঐতিহাসিক মর্যাদা সম্বন্ধে মতভেদের কোন অবকাশ নেই। পরম ভাগবত বলে বর্ণিত এই রাজা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসার তাঁর শাসনকালে ঘটেছিল। তাঁর রাজসভা ছিল শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান-চর্চার এক মুখ্য কেন্দ্র। বৌদ্ধ ধর্মধারাকে পর্যন্ত আত্মস্থ করে হিন্দু সংস্কৃতির যে পুনর্জন্ম গুপ্তযুগে ঘটেছিল, তা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। সফল যোদ্ধা, নিপুণ শাসক, কূটনীতিতে পারদর্শী, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রোৎসাহনে আগ্রহবান এই নরপতির খ্যাতি সহজে ম্লান হতে পারবে না। প্রখ্যাত চীনা তীর্থ-পথিক ফা-হিয়েন চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে ভারতভ্রমণের যে বৃত্তান্ত রেখে গেছেন, তা থেকেও শাসন-ব্যবস্থার সৌকর্য, সমাজ-জীবনের শান্তি, সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির যে চিত্র মেলে, তা তদানীন্তন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সাফল্য ও গরিমার পরিচায়ক।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ধর্মবিশ্বাস

রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্য

গুণাবলী

গুপ্তশাসনের সাফল্য

কুমারগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত "মহেন্দ্রাদিত্য" সম্ভবত ৪১৪ থেকে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘ শাসনের প্রথম দিকে সাম্রাজ্যের শক্তি ও খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকে, শান্তির স্নিগ্ধ স্পর্শ যেন সাম্রাজ্যকে নূতন সৌম্য গৌরবে মণ্ডিত করেছিল। দুই পূর্বগামী সম্রাটের ঘটনাবহুল রাজ্যকালের তুলনায় ম্লান মনে হলেও কুমারগুপ্তের শাসনে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা ভুলে যাওয়ার নয়। যুদ্ধবিগ্রহে বিশেষ লিপ্ত না থেকেও তিনি পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল আন্তরিক। কিন্তু পরধর্ম বিষয়ে ঔদার্য ও সহিষ্ণুতার ভারতীয় পরম্পরা তাঁর ক্ষেত্রেও দেখা যায়; বুদ্ধ, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদির পূজা তখন বিনা প্রতিবন্ধকে অনুষ্ঠিত হত। কুমারগুপ্তের রৌপ্যমুদ্রায় গরুড়মূর্তি দেখে মনে হয় তিনি নিজে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তাঁর সময়কার যে বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় রাজার মূর্তি, দুই মহিষীর প্রতিকৃতি, ময়ূর-বাহন কার্তিকেয়-মূর্তি ইত্যাদি। সাম্রাজ্য শাসনের জন্য নিযুক্ত প্রদেশপালের মধ্যে যুবরাজ ঘটোৎকচগুপ্ত, বন্ধুবর্মা, চিত্তদত্ত (পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি অর্থাৎ বর্তমান উত্তর বঙ্গ) প্রভৃতির নাম উল্লিখিত রয়েছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে চল্লিশ বৎসরাধিক কাল কুমারগুপ্তের শাসনে সাহিত্য ও

রাজত্বকাল

রাজত্বের বৈশিষ্ট্য : রাজ্যব্যাপী শান্তি

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য

পরধর্ম বিষয়ে ঔদার্য

কুমারগুপ্তের মুদ্রা

সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়

শিল্পকলার প্রভূত চর্চা হয়েছিল। সম্ভবত গুপ্তযুগের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হল এই রাজ্যকাল।

স্কন্দগুপ্ত

পুষ্যমিত্র উপজাতির আক্রমণ

কুমারগুপ্তের জীবন যখন সমাপ্তপ্রায়, তখন যুদ্ধের উল্লেখ দেখি। মধ্য ভারত থেকে পুষ্যমিত্র-অভিহিত এক দুর্ধর্ষ উপজাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য সাময়িকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। সঙ্কটমুহূর্তে বীর যোদ্ধা যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত সাম্রাজ্যকে এই বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন। কুমারগুপ্তের পট্ট-মহিষীর নাম অনন্তদেবী; সম্ভবত স্কন্দগুপ্ত অপর মহিষী দৈবকীর গর্ভজাত সন্তান। পুত্রের পূর্ণ সাফল্য পিতা দেখে যেতে পারেন নি মনে হয়; যুবরাজকে যে যুদ্ধজয়ের পূর্বে বহু দুর্গতি সহ্য করতে হয়েছিল তাও জানা গেছে। যাই হোক, পিতার মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত হলেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি বলে তিনি খ্যাত; হূনদের মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদেশী শত্রুকে পরাস্ত করে তিনি অক্ষয় যশ অর্জন করেছেন। ৪৫৫ থেকে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যকাল ইতিহাসে খুবই বিশিষ্ট স্থান নিয়ে রয়েছে।

যুবরাজ স্কন্দ-গুপ্তের সফল প্রতিরোধ

স্কন্দগুপ্তের সিংহাসন লাভ ও রাজত্বকাল

সিংহাসন-প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা

গবেষকরা অনুমান করেন যে স্কন্দগুপ্তের মতো সুযোগ্য ব্যক্তিরও সিংহাসন-প্রাপ্তি নির্বিঘ্নে ঘটে নি। যখন তিনি শত্রুনিধনে নিতান্ত ব্যস্ত, তখনই কুমারগুপ্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত নাকি সিংহাসন দখল করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসে স্কন্দগুপ্ত তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন। স্কন্দগুপ্তের এক লিপিতে আছে যে রাজলক্ষ্মী অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসৃত করে তাঁকেই জয়মাল্য দিয়ে বরণ করেছিলেন। যাই হোক, স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে সাম্রাজ্যের বিপদ একেবারে কাটে নি। যুবরাজরূপে দুর্ধর্ষ পুষ্যমিত্রদের তিনি পর্যুদস্ত করেন; এখন রাজা হয়ে আরও ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন তাঁকে হতে হল। মধ্য এশিয়া থেকে যে দুর্দান্ত বর্বরের দল ইয়োরোপ আর এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে দেশের পর দেশকে ছারখার করছিল, সেই প্রকৃত ভয়ঙ্কর 'হূন' শত্রুদের পরাস্ত করা হল স্কন্দগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর জীবদ্দশায় হূনরা আর এদেশে মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করতে পারে নি। স্কন্দগুপ্তের এই সাফল্যের অপরিসীম গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা সাধারণত যথেষ্ট সচেতন নন বলে পাণিক্কর অনুযোগ করেছেন। মনে রাখতে হবে যে স্কন্দগুপ্ত যখন হূনদের

হূনদের পরাজয়

স্কন্দগুপ্তের জয়লাভের অপরিসীম গুরুত্ব

পরাভূত করেন, তখন হূন-শক্তি ছিল একেবারে তুঙ্গস্থলে। প্রথমে চীন সাম্রাজ্যকে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে না পেরে এবং তারপর ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সদলে প্রবেশে অসমর্থ হয়ে, হূনরা সর্বশক্তি নিয়ে পূর্ব ইয়োরোপ অভিমুখে এগিয়ে চলেছিল। চীন এবং ভারতকে দমন করতে না পেরে তারা রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করার কাজে নামল, সাফল্যও লাভ করল। এইভাবে দেখলে বুঝা যাবে যে বাস্তবিকই স্কন্দগুপ্ত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন; আবার প্রায় একশো বৎসর বাদে হূনরা যখন পঞ্জাবে ঢোকে, তোরমান আর মিহিরকুলের নায়কত্বে আবার আক্রমণের আঘাত এদেশকে পীড়িত করে, তখন কিন্তু তাদের পূর্বেকার শক্তি অনেকটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল; সামান্য তার ঢেউ লেগে এদেশের ইতিহাস বিকৃত হয়ে যায় নি। স্কন্দগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমরসঙ্গতি সুসংগঠিত করে দেশকে বাঁচিয়েছিলেন, ইতিহাসকীর্তিত রোম নগরী হূনদের হাতে যেভাবে ধ্বংস হয় পাটলিপুত্রকে তেমনই দুর্ভাগ্য থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। এমন কীর্তির খ্যাতি কখনও ম্লান হয় না, আর এমনই ঘটনা থেকে আমরা বুঝি যে ভারতবর্ষ সর্বদা বিদেশী আক্রমণকারীদের সহজ শিকার হয়ে এসেছে বলে যে কাহিনী প্রচলিত তা কত অসত্য।

পরাজিত হূনজাতি কর্তৃক রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস

পরবর্তী হূন অভিযান অপ্রধান ঘটনা মাত্র

ভারতের সামরিক দৌর্বল্যের অভিযোগের অসারতা

স্কন্দগুপ্তের বিক্রমাদিত্য উপাধিকে গতানুগতিক রাজগর্বের প্রকাশ মনে করা ভুল হবে। খুব বেশীদিন রাজত্ব তিনি করেন নি; গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু যুদ্ধের কথা ছেড়ে দিলেও রাজা হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব অল্প ছিল না। নিজে বিষ্ণুর উপাসক হয়েও বংশের ধারা রক্ষা করে সর্বধর্ম সম্পর্কে উদারতার নীতি তিনি অনুসরণ করতেন। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ তাঁর শাসনে অক্ষুণ্ণ ছিল। পর্ণদত্ত, ভীমবর্মা ইত্যাদি সুদক্ষ শাসকের সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন। জুনাগড়ে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমল থেকে স্কন্দগুপ্তের রাজত্ব পর্যন্ত সাতশো বৎসরের খবর পাওয়া যায়। গিরনার পাহাড়ের উপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর প্রদেশপাল পুষ্যগুপ্তের সহায়তায় সুদর্শন হ্রদ খনন করেন, পৌত্র অশোকের প্রদেশপাল পারসীক জাতীয় তুবাস্প এই হ্রদের সংস্কার করেন, বহু পরবর্তীকালে হ্রদের বাঁধ ভেঙে গেলে শক-ক্ষত্রপ রুদ্রদামন তার মেরামতের ব্যবস্থা করেন, আর স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের প্রথম বৎসরে অতিবৃষ্টির ফলে আবার বাঁধ ভেঙে

কৃতী সম্রাট

ধর্মীয় উদারতা

জুনাগড় শিলালিপি

সুদর্শন হ্রদের সংস্কার

পড়ায় সম্রাটের প্রদেশপাল পর্ণদত্ত এবং তৎপুত্র চক্রপালিত অবিলম্বে তার সংস্কারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। পূর্তকর্মের প্রতি পুরাকালে ভারতীয় শাসকদের লক্ষ্য কেমন ছিল, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলছে জুনাগড় শিলালিপিতে।

সাম্রাজ্যের পতন

পরবর্তী রাজগণ

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরতে থাকে। পরবর্তী গুপ্ত রাজগণের মধ্যে পুরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গুপ্তবংশের শেষ বড় রাজা হলেন বুধগুপ্ত। রাজবংশের আভ্যন্তরীণ বিবাদের অবসান ঘটিয়ে বুধগুপ্ত আবার বহুল পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ রাজ্য শাসন করতে পেরেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর পর বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে গুপ্তবংশীয়েরা রাজত্ব করেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে দেখা গেল যে হূনদল উত্তর ভারতে জোর করে ঢুকেছে, তাদের নায়ক তোরমানের শাসন মালবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ক্রমশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের আর তেমন কোন চিহ্ন রইল না। বাংলা, কনৌজ, মালব, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হল। তবে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত নামধারী কয়েকজন রাজার কথা শুনতে পাওয়া যায়। সর্বশেষ গুপ্তরাজের নাম নাকি ছিল দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত। একদিন যে সাম্রাজ্যের কীর্তিভাতি দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল, যে সাম্রাজ্যের জয়যাত্রায় সমগ্র দেশ নন্দিত হয়েছিল, যে সাম্রাজ্যের উদ্যোগে ও সহায়তায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নূতন অধ্যায় নির্মিত হয়েছিল, সকল নশ্বর বস্তুর ন্যায় সেই সাম্রাজ্যই বিলীন হয়ে গেল। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইতিহাসখ্যাত ভেনিস্-এর পতনে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন :

শেষ রাজা বুধগুপ্ত

হূন-অনুপ্রবেশ

আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব

গুপ্ত-গরিমার অবলুপ্তি

Men are we, and must grieve when even the shade
Of that which once was great, has passed away.

একদা যে গুপ্তরাজ্য গরিমার শিখরে উঠেছিল, তার অবলুপ্তি যে খেদের উদ্রেক করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তদানীন্তন যুগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের মতো বহুবিস্তৃত শাসন স্থায়ী হতে হলে যে সব উপাদানের একত্র উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন ছিল, তা প্রত্যাশা করাই যুক্তিসঙ্গত নয়। বিপুল রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনের কর্তৃত্বে

রাখা বড় সহজ কাজ ছিল না। রাজার ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা ও কল্পনাশক্তি, যাদের মন্ত্রণা বিনা রাজ্য চলে না তাদের কর্মপ্রতিভা ও সুবিবেচনা, দূরে অবস্থিত প্রদেশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনের যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য, বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ অসন্তোষের অনুকূল অবস্থার অপনোদন, বিস্তৃত রাজ্যের সর্বত্র সাম্রাজ্য সম্পর্কে অনুরাগ ও আনুগত্য প্রভৃতি বিনা গুপ্ত সাম্রাজ্যের মতো বিরাট এক সংগঠনের স্থায়িত্ব সম্ভব ছিল না। যন্ত্রযুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও সুন্দর হওয়ার পূর্বে, আধুনিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের শক্তি ও সংহতি বিষয়ে সবচেয়ে সহায়ক যে জাতিবোধ তার উদ্ভবের পূর্বে, মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের মতো বিপুল রাষ্ট্রসংস্থার সুদীর্ঘ জীবন আশা করা প্রায় অবাস্তব ব্যাপার। এই কথা মনে রেখে তবেই আমরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা গঠন করতে পারি।

বহু বিস্তৃত রাজ্যের স্থায়িত্বের উপাদান

স্থায়িত্বের আধুনিক যুগোপযোগী উপাদানের অভাব

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পর থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্রমশ অগ্রগামী শক্তি যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ গঙ্গা ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী যে অঞ্চল ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র, সেখানেই শাসন-ক্ষমতা অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক বিপদ এবং প্রতিবেশী উদীয়মান রাজ্যগুলির বিরোধিতা একত্রিত হয়ে গুপ্তরাজ্যকে হীনবল করতে লাগল, ষষ্ঠ শতক থেকে আর সন্দেহ রইল না যে গুপ্ত গৌরবের বিলুপ্তি ঘটতে আর বিলম্ব নেই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ

বহিরাক্রমণ ও প্রতিবেশী রাজ্যের বিরোধিতা

কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের রাজ্যকাল যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, তখনই মধ্যভারতের নর্মদা নদী সন্নিকটস্থ অঞ্চল থেকে পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরম বিপদ সঙ্কেত। স্কন্দগুপ্তের রণনৈপুণ্য সঙ্কট থেকে সাম্রাজ্যকে পরিত্রাণ দিল বটে, কিন্তু গুপ্তশক্তিকে সেই আঘাতের রেশ বহন করে চলতে হল। প্রায় অব্যবহিত পরে ঘটল দুর্দান্ত হূনদের আক্রমণ; একে প্রতিহত করার কৃতিত্বকে বহু বিশেষণে ভূষিত করলেও অন্যায় হয় না, কিন্তু তখনই বুঝা গেল যে স্কন্দগুপ্তের ন্যায় শক্তিমান শাসক না থাকলে সাম্রাজ্যের বিপদ কাটবে না, আবার ঘনিয়ে আসবে। স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকাল ছিল স্বল্প। অন্য উত্তরাধিকারীদের আমলে দেখা দিল সর্বাঙ্গীণ অবনতি। যেখানে রাজার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সাম্রাজ্যকে একসূত্রে বেঁধে দেওয়ার কাজে অপরিহার্য, সেখানে ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা-বঞ্চিত গুপ্তরাজগণের অবস্থা হল সঙিন। ক্রমশ গুপ্তশাসনের ভিত্তি দুর্বল হতে লাগল, স্খলিত হয়ে পড়ল। বিপুল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন

পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহ

হূন আক্রমণ

যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব

শাসনাধীন অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা

অংশে ভারপ্রাপ্ত শাসকরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণায় প্রলুব্ধ হতে থাকল। বল্লভীর মৈত্রক বংশ, কনৌজের মৌখরী বংশ, গৌড় রাজবংশ প্রভৃতির সমুত্থান তখন দেখা গেল, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সার্বভৌমতা একেবারে অস্বীকৃত হয়ে গেল। যে বাকাটক বংশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন একদা গুপ্তরাজ্যের সম্পদ ছিল, তাও ছিঁড়ে গেল।

বিদেশীর বিরুদ্ধে নূতন নেতৃত্ব

দেশের মারাত্মক শত্রু হূনরা যখন মধ্য ভারতের দিকে এগিয়ে এল, তখন তাদের প্রতিহত করতে গুপ্তরাজ্যের কোন অবদান রইল না, শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় নামলেন মধ্য ভারতের বিখ্যাত রাজা যশোধর্মন, যিনি এককালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

আত্মকলহ

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজগণের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ দেখে স্বার্থমগ্ন যুবরাজেরা যথাসম্ভব আত্মপক্ষ পুষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন, স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে সাম্রাজ্যের সামগ্রিক সংহতি নষ্ট করলেন, আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে নেমে গুপ্তরাজ্যের মর্যাদা ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হতে থাকল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত প্রভৃতি রাজা বৌদ্ধ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সম্ভবত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বিষয়ে অবহেলা দেখিয়েছিলেন, সংকটে যথাযথ-ব্যবস্থা তাঁদের কর্ম ছিল না। কিন্তু তার পূর্বেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন যে অনিবার্য, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল।

ক্রমাবলুপ্তি

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকেই দেখা গেল যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরবসূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। আর কৃষ্ণ-পক্ষে সূর্যাস্তের পর অন্ধকার যখন নামে, তখন তা অচিরেই গভীর অন্ধকারে পর্যবসিত হয়। গুপ্ত রাজ্যের গরিমা সেই ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

গুপ্তযুগের গরিমা

ফা-হিয়েন-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত

ভারতবর্ষে হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগের স্থান সর্বোচ্চে বলার মধ্যে অতিরঞ্জন নেই। সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প, বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বোধ হয় এর চেয়ে মহিমামণ্ডিত যুগ আর নেই। মৌর্য, শুঙ্গ, সাতবাহন, বাকাটক ইত্যাদি সাম্রাজ্যে শাসনের যে ধারা প্রবর্তিত হয়ে এসেছিল, তারই যুগোপযোগী প্রকাশ আমরা গুপ্ত শাসনকালে দেখতে পাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য যখন রাজত্ব করছেন, চীনা তীর্থযাত্রী ফা-হিয়েন এদেশের তখনকার যে বিবরণ লিখে গেছেন, তা থেকে মনে হয় যে জনসাধারণের জীবনে স্বস্তি এবং ব্যবহারে সৌজন্য ছিল। সরকারের আইনকানুন কঠোর ছিল না; বাস্তবিকই ভারতবর্ষ যে সুসভ্য ও সুশীল এক দেশ, ধর্মপ্রাণ বিদেশী পর্যটকের তাই ধারণা হয়েছিল। সমসাময়িক অনেক শিলালেখ বা মুদ্রার চেয়ে ফা-হিয়েনের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত ঢের বেশী মূল্যবান। (ভারতের মহিমামণ্ডিত যুগ) (ফা-হিয়েন-এর ভ্রমণবৃত্তান্তের মূল্যায়ন)

জগতের সকল বৌদ্ধের কাছে ভারতবর্ষ এক পুণ্য দেশ; এদেশে তীর্থ পরিক্রমা এবং "বিনয়পিটক" মূল গ্রন্থটি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ফা-হিয়েন চীনদেশ থেকে ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা করেন। সুদীর্ঘ পর্যটনের পর মধ্য এশিয়ার মরু ও পর্বত অঞ্চল অতিক্রম করে ভারতবর্ষে উপনীত হন। ভারতবর্ষে তিনি প্রায় দশ বৎসর বাস করেন, নানা মঠে যান, সকল তীর্থ দর্শন করেন। যে সূত্রাবলী স্বদেশে নিয়ে যেতে তিনি এসেছিলেন, সেগুলিকে নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করেন, বহু পবিত্র মূর্তির প্রতিকৃতিও অঙ্কন করেন। কথিত আছে যে পাঁচজন সাথীকে নিয়ে ফা-হিয়েনের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, তাদের মধ্যে দুজনের পথে মৃত্যু ঘটে, দুজন ফিরে যান, আর একজন ভারতবর্ষে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন। ধর্মপ্রাণ পর্যটকের অসমসাহসিকতা ও অদম্য সহিষ্ণুতায় মুগ্ধ হয়ে এক বন্ধু অনুরোধ করায় ফা-হিয়েন তাঁর পরিব্রাজক জীবনের (ফা-হিয়েন-এর ভারত আগমনের উদ্দেশ্য) (ভারত-বৃত্তান্ত লেখার প্রেরণা)

অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখতে রাজী হন। ইতিহাসের সৌভাগ্য যে এই গ্রন্থ লিখিত হয়ে গুপ্তযুগের প্রকৃত চিত্রবর্ণনে সাহায্য করেছে।

ফা-হিয়েন-এর আগমনকাল

ফা-হিয়েন তাঁর বইয়ের কোথাও রাজার নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তিনি যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে এদেশে ছিলেন, তা সাল-তারিখের হিসাবে নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। স্থলপথে ভারতে এসে ফেরার

প্রত্যাবর্তন-পথ

সময় তিনি পূর্ব উপকূলে বাংলার প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্তি থেকে যবদ্বীপ ইত্যাদি ঘুরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে)। মনে হয় যে

ভারতে অবস্থানকাল

তিনি প্রায় তিন বৎসর পাটলিপুত্রে ও দুই বৎসর তাম্রলিপ্তিতে অতিবাহিত করেছিলেন। ভারতবর্ষ পর্যবেক্ষণের প্রভূত সুযোগ এভাবে তিনি পেয়েছিলেন।

সমুন্নত শাসন-ব্যবস্থা

তদানীন্তন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ফা-হিয়েন অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথা থেকে মনে হয় যে তখন রাজ্যের অবস্থা খুব উন্নত ছিল। প্রজারা যে সুখে শান্তিতে বাস করত, তা শাসন শৃঙ্খলার উৎকর্ষ বিনা

রাজস্ব

সম্ভব হত না। জমির উৎপাদনের একাংশ রাজস্ব হিসাবে সরকার আদায় করত, কিন্তু সাধারণ প্রজার উপর খাজনার চাপ ছিল কম, খাসমহল থেকে রাজার আয় হত প্রচুর। জিনিসপত্র সস্তা হওয়ায় অভাবের

নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা

প্রকোপে সাধারণ লোক কষ্ট পেত না। আর তাই চুরি ডাকাতির উপদ্রব ছিল না। ঘরের দরজা খুলে রাখলেও চুরি হত না, পথে সোনা ফেলে রাখলেও পরে তা ফিরে পাওয়া যেত, এমন কথাও জানা যায়। আদালতে মামলা-মকদ্দমা করার দিকে তাই বিশেষ ঝোঁক দেখা দিত না, সম্পত্তি

উদার আইন-ব্যবস্থা

নিয়ে দুশ্চিন্তা আর হিংসাদ্বেষ ছিল কম। মৌর্যযুগে আইন ছিল কড়া। কিন্তু এখন তার কঠোরতা খুবই কমে গিয়েছিল। প্রাণদণ্ড প্রথা রহিত করা হয়েছিল। সাধারণত অপরাধী সাব্যস্ত হলে জরিমানা দিলেই নিষ্কৃতি মিলত। মৌর্যযুগে দণ্ড হিসাবে অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ফা-হিয়েন বলেছেন যে শুধু রাজদ্রোহের শাস্তি ছিল ডান হাত কেটে দেওয়া, অন্য কোন কারণে অঙ্গচ্ছেদের বিধি বরবাদ হয়েছিল। দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্যত্র যেতে হলে কোন বিশেষ অনুমতি নিতে হত না; বিধি-

মন্তব্য

নিষেধের বোঝা যে হালকা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে ফা-হিয়েনের বিবরণে কিছু বাহুল্য মাঝে মাঝে আছে মনে হয়; অর্থের দিক থেকে দেশের সবাই সম্পন্ন, তাদের মধ্যে সৎকর্ম করার যেন প্রতিযোগিতা চলত, এমন কথা যে কিছু পরিমাণে অত্যুক্তি, তা নিশ্চিত।

দক্ষিণ বিহারে তখন বড় বড় শহর ছিল, তাদের মধ্যে অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ হল পাটলিপুত্র। অশোক যে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তখনও তা ধ্বংস হয়ে যায় নি; এই প্রাসাদ দেখে ফা-হিয়েন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন, আর বলেছিলেন যে মানুষ তো এমন সৌধ নির্মাণ করতে পারে না, এ যেন কোন দানবের কাজ। পাটলিপুত্রে এক বিরাট চিকিৎসালয় তখন ছিল; ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই সেখানে থেকে শুশ্রূষা পেত, খেতে পেত, চিকিৎসার বন্দোবস্ত নিখুঁত ছিল। শহরের ধনীদের কাছ থেকে নাকি এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয় সংগ্রহ করা হত। পশুচিকিৎসালয়ও তিনি দেখেছিলেন। মনে রাখা উচিত যে ইয়োরোপে এ ধরনের চিকিৎসালয় আরও বহুকাল অজ্ঞাত ছিল। পাটলিপুত্রে বৎসরে একদিন বিরাট উৎসব হত। দেবমূর্তিকে রথে বসিয়ে শোভাযাত্রা করে শহরের পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হত; কোন্ দেবতার পূজা এভাবে হত, তা জানা নেই। মথুরা নগরী দেখেও ফা-হিয়েন মুগ্ধ হয়েছিলেন; সেখানে কুড়িটি মঠে প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করছেন দেখে পরিব্রাজকের মন উৎফুল্ল হয়েছিল। বৎসরে একবার সেখানে বৌদ্ধ ধর্মনীতি ব্যাখ্যা ও প্রচারের জন্য এক মহাসম্মেলনের অধিবেশন বসত। তখন রাজা ও ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন।

শহরের আধিক্য

পাটালিপুত্রে অশোকের প্রাসাদ

দাতব্য চিকিৎসালয়

পশু চিকিৎসালয়

উৎসব

মথুরার বৈশিষ্ট্য

ফা-হিয়েনের পর্যটনকালে এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ঘটছিল, হিন্দু দেবদেবীর আরাধনা সম্পর্কে বহু তথ্য তাঁর গ্রন্থে আছে। বৌদ্ধদের কোন কোন পীঠস্থানের দুর্দশা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কপিলবাস্তু তখন যেন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল; বুদ্ধ গয়া ছিল প্রায় জনশূন্য। তবে তথাগতের স্মৃতিপূত বোধিবৃক্ষের কাছে অবস্থিত একটি মহাযান ও অপর একটি হীনযান বৌদ্ধ মঠে তখনও প্রায় ছয় বা সাত শত ভিক্ষু বাস করতেন। সম্ভবত এই হীনযান মঠটি সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি নিয়ে সিংহলরাজ মেঘবর্ণ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। যে শ্রাবস্তী নগরের সঙ্গে বুদ্ধদেবের স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তার লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প দেখে পরিব্রাজকের মনে খেদ উপস্থিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণস্থান কুশীনগরে মঠ ও চৈত্যাদি তখনও দেখা গেলেও জনসংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। কিন্তু মোটের উপর বৌদ্ধধর্ম ও আচারের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি ফা-হিয়েন লক্ষ্য করেছিলেন। ভারত-সীমান্তের বাহিরে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও প্রভাব অবিকৃত ছিল। গন্ধার ও পঞ্জাবে

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার

ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের হীনাবস্থা

ভারতের বাহিরে ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব

হীনযান মহাযান উভয় মতাবলম্বী অসংখ্য মঠ তিনি দেখেন। মথুরায় বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুর অবস্থানের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সর্বত্র যে সৌষ্ঠব ও মর্যাদা সহকারে বিভিন্ন মঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়, তার সপ্রশংস উল্লেখ তিনি করেছেন।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে রাজার পৃষ্ঠ-পোষকতা

রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হয়েও বৌদ্ধ মঠগুলিকে সাহায্যে পরান্মুখ ছিলেন না, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যাতে দেশের সর্বত্র অবারিতভাবে পর্যটন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতেন।

হিন্দু-বৌদ্ধের সহ-অবস্থিতি

হিন্দু বৌদ্ধ একত্র বাস করত, বিবাদ-বিসংবাদ ছিল না। ফা-হিয়েন স্পষ্টাক্ষরেই লিখে গেছেন যে এদেশের মানুষকে তিনি দেখেছিলেন ধর্মভীরু, ভদ্র, অহিংসা নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সৌজন্য বিষয়ে যত্নবান।

ভারতীয় পুঁথি ও তার দুষ্প্রাপ্যতা

পাটলিপুত্রে বিনয়পিটকের পুঁথি বহু চেষ্টার পর তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ভূর্জপত্র, তালপাতা ইত্যাদির উপর লেখা পুঁথির সংখ্যা ছিল কম, হাতছাড়া কেউ করতে চাইত না, পুঁথি প্রায়ই বেশীদিন টিকত না, তখনও চীনে ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত কাগজের ব্যবহার এদেশে জানা ছিল না।

ভ্রমণবৃত্তান্তে বিশেষভাবে মগধ ও বাংলার কথার উল্লেখ

যাই হোক, বিনয়পিটকের মূল গ্রন্থ পেয়ে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ নকল করে নিয়ে যান। মগধে আর বাংলা দেশে বহুদিন ছিলেন বলে সেখানকার অবস্থা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন।

তদানীন্তন সমাজরীতি

চণ্ডাল আর একেবারে নীচ জাতির লোক ছাড়া সকলের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে তারা প্রাণিহত্যা করত না, মাছ-মাংস খেত না, মদ্য পান করত না, পেঁয়াজ-রসুনও খেত না। বাজারে মাংসের বা মাছের দোকান দেখা যেত না; শূকর বা মুরগী ঘরে পোষার রেওয়াজ ছিল না। মনে হয় যে এই বর্ণনার মধ্যে অত্যুক্তি আছে, তবে যখন আজও এদেশের বহু কোটি লোক নিরামিষভোজী তখন হয়তো অহিংসা নীতির প্রভাব গুপ্তযুগে খুব সুপরিব্যাপ্ত থাকা অস্বাভাবিক নয়।

চণ্ডাল ও নীচ জাতির অবস্থা

চণ্ডাল এবং অন্য নীচ জাতি সম্বন্ধে ফা-হিয়েন বলেছেন যে তাদের শহরের বাইরে থাকতে হত আর শহরের ভিতরে ঢুকতে হলে কাঠির আওয়াজ করত, যাতে সতর্ক হয়ে সবাই দূরে সরে যায়।

মন্তব্য

এ থেকে অনুমান হয় যে অস্পৃশ্যতা প্রথা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই প্রচলিত হয়েছিল। পশুহত্যা ও অশুচি ব্যবহারের দণ্ডস্বরূপ যেন তাদের সমাজ বহির্ভূত করা হয়েছিল, এই ধারণা ফা-হিয়েনের লেখা থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বনিম্ন জাতিতে যারা, তারা যে অস্পৃশ্য এমন কথা পূর্বে দেখা যায় নি।

দেশের লক্ষ্যণীয় আর্থিক সমৃদ্ধি

এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ফা-হিয়েনের বক্তব্যে কোন দ্বিধা নেই। ফা-হিয়েনের ধারণা হয়েছিল যে মগধের মতো অঞ্চলে সবাই ধনী;

একথা ঠিক হতে পারে না, কিন্তু মোটামুটি দেশে সমৃদ্ধির লক্ষণ অনেক ছিল। ভারতবর্ষের লোক জাহাজে সমুদ্র পার হয়ে বাণিজ্য করত। বাংলার তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) ছিল বিখ্যাত বন্দর ও শিক্ষাকেন্দ্র। এখান থেকে সিংহল, ব্রহ্ম, মালয়, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের বণিকরা বাণিজ্যপোত নিয়ে যেত। এই বন্দর থেকেই ফা-হিয়েন স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

তাম্রলিপ্তির খ্যাতি

ফা-হিয়েন-এর বর্ণনায় ধর্মভাব অবশ্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আছে তাঁর কৌতূহলী চোখ আর সজাগ মনের পরিচয়। মালবের মতো কোন কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জলবায়ু ও অন্যান্য গুণের কথা বেশ স্বচ্ছ ভাষায় বলেছেন। মাঝে মাঝে সহজ ভাষায় তাঁর মনের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে—সিংহলে বুদ্ধমূর্তির কাছে উৎসর্গ করা সাদা রেশমের একটি ছোট চীনা ছাতা দেখে হঠাৎ বহুদিন ছেড়ে আসা স্বদেশের মায়া তাঁকে অভিভূত করেছিল ; দেশে ফেরার পথে সমুদ্রে বিষম ঝড় ওঠায় যখন ভারী মাল জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন পাছে তাঁর বহুযত্নে সংগৃহীত গ্রন্থ ও মূর্তিগুলি ফেলতে হয়, এই আশঙ্কা করে কেবলই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান আর সমুদ্র শান্ত হয়ে আসে! বাস্তবিকই ফা-হিয়েনের ছোট বইটি হল নানা মনোমুগ্ধকর ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ভাণ্ডার।

ফা-হিয়েন-এর বৃত্তান্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য :
প্রাকৃতিক বর্ণনা

স্বদেশপ্রীতি

সামুদ্রিক ঝড়ের কথা

গুপ্তযুগে সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসন

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন অনুশাসন ও শিলালিপি থেকে এবং ফা-হিয়েনের গ্রন্থ ইত্যাদি সমসাময়িক রচনা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে। হিন্দুভারতের সাম্রাজ্য-শাসনরীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ তখন দেখা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মৌর্যধারার উত্তরাধিকার পেয়েছিল গুপ্তরাজ্য ; ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংস্থানে তখন কোন পরিবর্তন ঘটে নি, প্রাক মৌর্যযুগ থেকে নির্ধারিত প্রণালী মোটামুটি একইভাবে তখনও চলছিল। তবে সামগ্রিক দিক থেকে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য ও গুরুত্ব গুপ্তযুগে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় ; পূর্বে যে গণরাজ্যসমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতেও যাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় নি, সেগুলি গুপ্তশাসনের ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিলীন হয়ে গিয়েছিল। রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদাও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেল ; সম্ভবত অন্তর্বর্তীকালে

গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক উপাদান

মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার অনুবর্তন

রাজতন্ত্রের প্রাধান্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি ;

গণরাজ্যের বিলুপ্তি

রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও দেবতা-অভিধা লাভ

বৈদেশিক শাসন যখন বিস্তার পায়, তখন রাজশক্তি সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণারও প্রচার হয়েছিল। সম্রাট অশোক নিজেকে "দেবগণের প্রিয়" বলেছিলেন, নিজেই দেবতার ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। গুপ্তযুগে রাজা যে দেবতার অংশ, একথা বলতে সঙ্কোচ ছিল না। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তকে ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের ইত্যাদি দেবগণের সমতুল্য বলে বর্ণনা করেছেন; সৃষ্টিলয়ের কর্তা বলেও সম্রাটকে অভিহিত করা হয়েছে, "মর্ত্যরাজ্যের ঈশ্বর" এই সম্বোধনও দেখা গিয়েছে। রাষ্ট্রের ধর্ম ও সমাজের প্রধান ধারক, শাসনব্যবস্থার সর্বময় প্রভু হলেন রাজা, তাই দেবতারই ন্যায় তিনি শ্রদ্ধাভাজন বলে কথিত হয়েছিলেন। গুপ্তশাসনকালে রাজার

রাজার সর্বময় কর্তৃত্বের বিপদ

মর্যাদা ও ক্ষমতা যে শিখরে আরোহণ করেছিল, তা নিঃসন্দেহ। রাজা যে সর্বদা সর্বগুণমণ্ডিত হবেন তা প্রত্যাশা করা বৃথা; তাই রাজ্যের সাফল্য ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য রাজার উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে থাকার বিপদ সহজেই প্রতীয়মান হবে। স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পর তেমন ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাসম্পন্ন নরপতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের এ হল অন্যতম কারণ। রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাই রাজ্যের ভবিষ্যৎ দুর্বলতার সম্ভাবনাও উপস্থিত হয়েছিল।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী সম্রাট

বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

গুপ্তশাসনে সর্বোপরি ছিলেন সম্রাট; পূর্বযুগের মতো তখনও সম্রাট পদ ছিল বংশানুক্রমিক। কখনও কখনও নিজের জীবদ্দশায় সম্রাট পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন। সমুদ্রগুপ্তকে তাঁর পিতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে তাঁর পিতা সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাধিকারী বলে নিজেরাই স্থির করে গিয়েছিলেন। স্বভাবত রাজার পক্ষে স্বয়ং

পরবর্তী পদাধিকারী মন্ত্রী

সর্ব ব্যাপারে শাসনকার্যের দায়িত্ব বহন করা সম্ভব ছিল না; তাই উচ্চপদস্থ মন্ত্রীদের সংবাদ আমরা পাই। যুদ্ধ পরিচালনা, বিচারব্যবস্থা,

রাজার দায়িত্ব ও মন্ত্রীর কর্তব্য

রাজ্যের বিধান নির্ধারণ ইত্যাদি সম্পর্কে চরম ও একক দায়িত্ব ছিল রাজার, কিন্তু নিপুণ রাজপুরুষদের মন্ত্রণা বিনা তিনি চলতে পারতেন না। মন্ত্রীদের উপর তাই গুরুভার অর্পিত হত; মাঝে মাঝে মন্ত্রীর পদও বংশানুক্রমিক হয়ে গেছে দেখা যায়, যেন উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁরাও উচ্চপদে আসীন থাকতেন। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় "অন্বয়প্রাপ্ত সচিব্য" বলে

মৌর্যযুগানুসারী মন্ত্রি-পরিষদের অভাব

বর্ণিত হরিষেণের পুত্র বীরসেন। মৌর্যযুগের তুলনায় যে তারতম্য দেখা যায়, তার মধ্যে প্রধান হল এই যে খুব সম্ভব মন্ত্রি-পরিষদ বলে কিছু এখন ছিল না। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে আছে যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সভ্যদের সমক্ষে

সমুদ্রগুপ্তকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন ; এই সভ্যেরা মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য কিনা, বলা দুরূহ। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার তথ্য দেখে মনে হয় যে কেন্দ্রশাসন বিষয়ে মন্ত্রীদের নিয়ে কোন পরিষদ ছিল না ; সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকার ঘোষণা সম্ভবত হয়েছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সভ্যদের সমক্ষে। পরিষদ-সভ্য কারা ?

রাজকার্যে প্রধান সহায়করূপে সন্ধি-বিগ্রহিক (যুদ্ধাদি ব্যাপারের মন্ত্রী), অক্ষ-পাটলিক (সরকারী নথিপত্রের তত্ত্বাবধায়ক), মহাদণ্ডনায়ক (প্রধান বিচারপতি), মহাবলাধিকৃত (সেনাধ্যক্ষ), মহাপ্রতীহার (রাজপুরীর রক্ষক) ইত্যাদি নাম উল্লিখিত হয়েছে। গুপ্ত রাজ্যকালের প্রথম দিকে কেবল "মন্ত্রী" বলে অভিহিত একান্ত-সচিবের উল্লেখ পাওয়া যায় ; সম্ভবত গোপন বিষয়ে রাজার প্রধান পরামর্শদাতার এই ছিল আখ্যা। সামরিক ও বেসামরিক শাসন-বিভাগের মধ্যে কোন স্পষ্ট প্রভেদ ছিল না ; একই ব্যক্তিকে উভয়বিধ দায়িত্ব দিতে কোন বাধা থাকত না। সাম্রাজ্য কয়েকটি দেশ ও ভুক্তিতে ভাগ করা ছিল ; সুকুলি, সুরাষ্ট্র, দভল ইত্যাদি "দেশ" এবং পুণ্ড্রবর্ধন, নগরভুক্তি, তীরভুক্তি (উত্তর বিহারে অবস্থিত আধুনিক "তিরহুত") ইত্যাদি "ভুক্তি"-র উল্লেখ পাওয়া যায়। "দেশ" শাসন করতেন "গোপ্তা", আর "ভুক্তি"-র ভার ছিল "উপরিক মহারাজা" অভিহিত রাজবংশীয় ব্যক্তির উপর। এঁরাই "কুমার-অমাত্য" কিনা, তা বলা কঠিন। সম্ভবত যুবরাজকে "আর্যপুত্র" আখ্যা দেওয়া হত ; কোন এক বিশিষ্ট প্রদেশের রাজ্যপালরূপে যুবরাজের নিয়োগ সম্বন্ধে সংবাদ মাঝে মাঝে মেলে। দেশ এবং প্রদেশের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। "বিষয়" সম্ভবত ছিল জেলা কিংবা তারও নিম্নস্থ বিভাগ ; এর শাসনভার ছিল "বিষয়পতি"-র হাতে। "গ্রামিক" দ্বারা পরিচালিত "গ্রাম" ছিল সবচেয়ে ক্ষুদ্র শাসন-বিভাগ ; গ্রামাঞ্চল যে অনেকটা স্বাধীন ও গণতন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে শাসিত হত তা অনুমান করা ভুল নয়। "নগরপতি" অভিধেয় কর্মচারীর উল্লেখ দেখা গেছে ; গুপ্তযুগের কোন কোন অনুশাসনে নগর-পরিষদের কথাও আছে। প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও মন্ত্রী শাসন সৌকর্যে আঞ্চলিক বিভাগ : দেশ ভুক্তি বিষয় গ্রাম নগর-শাসন

রাজস্বের প্রধান উপাদান ছিল সরকারকে প্রদেয় ভূমিতে যা উৎপাদন হয় তার একাংশ, কিংবা "ভাগ"। এই ভাগের পরিমাণ এক-ষষ্ঠাংশ বলে অনেকের মত, কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দুরূহ। এছাড়া বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক, দুর্গ বা অনুরূপ কোন রাষ্ট্র কর্তৃক সুরক্ষিত স্থানের রাজস্ব "ভাগ" শুল্ক

অন্যান্য কর

অধিবাসীদের প্রদেয় বিশেষ কর, খেয়া, বন্দর ইত্যাদিও সরকারের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করত। অনুমান করা হয়েছে যে বিশেষ স্থলে সরকার বিনা পারিশ্রমিকে কাজ আদায় করার অধিকার রাখত। সরকারী খাসমহল, ভূগর্ভস্থ খনি, করদ রাজাদের কাছ থেকে প্রাপ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করে অর্থাগম অল্প হত না। যাই হোক, মোটের উপর জনসাধারণের সন্তুষ্টি, দণ্ডবিধির উদারতা প্রভৃতি লক্ষ্য করে বলা যায় যে গুপ্ত রাজ্যকালের শাসনব্যবস্থা প্রায় দুইশত বৎসর ধরে যথেষ্ট প্রশংসার দাবি করতে পারে।

সাধারণ মন্তব্য

সামন্ত-চক্রের অভ্যুত্থান

অবশ্য তদানীন্তন সমাজ ও রাষ্ট্রের যে পরিবেশ অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাতে রাজাকে কেন্দ্র করে সামন্ত-চক্রের অভ্যুত্থানও অনিবার্য হয়েছিল। বহু গুপ্ত অনুশাসনে এই সামন্তদের ক্রমবর্ধমান শক্তির উল্লেখ আছে। কেন্দ্রে রাজার শক্তি হ্রাস পেলে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্তদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা সম্ভব হত। রাজশক্তি আবার সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত তারা নতি-স্বীকার কিংবা সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি পালন করত না। মহাসামন্ত এবং বিভিন্ন স্তরের সামন্তবর্গ সম্পর্কে সমসাময়িক লিপি ও বৃত্তান্তে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সমাজকেও তখন কোন কোন পণ্ডিত সামন্তধর্মী বলেছেন ; বর্গভেদ, শ্রেণীবিভাগ তখন যেন পূর্বের চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। আর্থিক অবস্থা ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে সমাজ যেন শ্রেণীবদ্ধ হতে থাকছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ক্ষত্রিয় সামন্ত, ধনী শ্রেষ্ঠী ও বণিক, কৃষি ও ব্যবসায় নিরত বৈশ্য ইত্যাদিকে সমাজে নিজ নিজ স্থান স্বতন্ত্রভাবে নিতে দেখা গেল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এই যুগে অগ্রসর হতে থাকায় সামাজিক বিধিনিষেধ পূর্বের চেয়ে যেন কঠোর হয়েছিল, জাতিভেদ প্রথা আরও দৃঢ় হয়েছিল। মেয়েদের মর্যাদা ও অধিকারও যেন আগের তুলনায় কমতে আরম্ভ করে। গুপ্ত রাজ্যকালে হিন্দুর যে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সন্নিবদ্ধ হতে থাকে, তা থেকে তদানীন্তন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল রূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই যুগে শক প্রভৃতি বিদেশীরাও ভারতবর্ষের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হতে থাকে। তাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তারা ক্রমে উচ্চবর্ণের হিন্দু বলে পরিগণিত হয়, নিষ্ঠাবানদের পক্ষ থেকে আপত্তি ও বাধা ঘটে থাকলেও তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

অর্থ ও পদ-মর্যাদার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাগ

সামাজিক বিধি-নিষেধের কঠোরতা

রক্ষণশীলতার ব্যতিক্রম

অর্থনৈতিক জীবন

গুপ্তযুগে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধির বহু পরিচয় মেলে। বাণিজ্যের বিপুল প্রসারের কথা আমরা জানি ; চীন দেশের রেশম ব্যবহার খুব প্রচলিত হয়েছিল, রেশমের ব্যবসায় ভারতবর্ষীয়দের ভূমিকা নগণ্য ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূল থেকে বাণিজ্যপোত তখন এদেশের সম্ভার নিয়ে যাত্রা করত ; একদিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি আর অন্যদিকে সুদূর প্রাচ্যে স্থাপিত ভারতীয় উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক ঘনীভূত হয়েছিল। বাণিজ্যের যখন এরূপ ব্যাপ্তি, তখন যারা ধনী তাদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি ঘটল, নবলব্ধ ঐশ্বর্যের একাংশ তারা শিল্পকলার উন্নতির জন্য যে ব্যয় করেছিল তা স্বাভাবিক। বহু বিত্তবান শ্রেষ্ঠী, কিংবা বণিকসঙ্ঘ, কিংবা শ্রমিক শিল্পী ও কারিগরদের নিজস্ব সংস্থার পক্ষ থেকে অর্থ মন্দির, মঠ, দানশালা, চিকিৎসালয় বা অন্য সৎকর্মে ব্যবহৃত হওয়ার কথা অনেক সমসাময়িক লেখে দেখা গেছে। ইয়োরোপের প্রাচীন যুগে গ্রীসে বা রোমে দাসপ্রথা যেমনভাবে অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল, ভারতবর্ষে তা ছিল না। মনুসংহিতায় ও অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে দাসশ্রেণী উল্লিখিত হয়েছে ; ক্রীতদাস যে এদেশে ছিল না, তা নয়। কিন্তু সমাজ ও অর্থনীতি শুধু ক্রীতদাসদের পরিশ্রমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি ; মেহনতী মানুষের স্বাধীন জীবনযাত্রা ও সঙ্ঘ স্থাপনের অধিকার নিশ্চিতভাবেই ছিল। গুপ্তযুগে সমাজ পূর্বের তুলনায় আরও বিধিবদ্ধ হচ্ছিল, সন্দেহ নেই ; কিন্তু তখন এদেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সমারোহ দেখা দিয়েছিল, আর সমুদ্র পার হয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ যেভাবে ঘটেছিল, তাতে মনে হয় যে সমাজের প্রাণবস্তু তখনও ভেদাভেদ ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির চাপে শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে নি।

বাণিজ্যের বিপুল প্রসার

ভারতীয় উপনিবেশ

অর্জিত অর্থ-শিল্পে নিয়োগ

ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি

মন্তব্য

সংস্কৃতির নবজাগরণ

ধর্ম

গুপ্তযুগের গরিমার কথা তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে রয়েছে। শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্ম—সর্ববিধ ক্ষেত্রে তখন যেন নূতন জীবনের জোয়ার এসে হাজির হয়েছিল। ম্যাক্সমূলর-প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেছেন যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অভাবনীয় অগ্রগতি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে গুপ্তযুগে হিন্দুধারার পুনর্জন্ম

গুপ্তযুগে হিন্দু-ধর্মের পুনর্জন্ম

("Renaissance") ঘটেছিল। অবশ্য এই কথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যে কঠিন, তা বলা উচিত। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রসার ঘটে থাকলেও সারা দেশ কখনও বৌদ্ধভাবাপন্ন হয়েছিল মনে হয় না। বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে দ্বন্দ্ব-দ্বেষ-সঙ্ঘাতের প্রায় কোন দৃষ্টান্তই মেলে না; বরং দেখা যায় যে উভয় ধর্মধারার মধ্যে শুধু সহ-অবস্থান নয়, পরস্পর-সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যেরই চেষ্টা হচ্ছে। বৌদ্ধধারার অগ্রগতি ও বিকাশ যখন দ্রুত ও স্পষ্ট, তখনও যে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা মুমূর্ষু, তা একেবারেই নয়। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে বৌদ্ধযুগ বলে কোন স্বতন্ত্র কালক্রম আমাদের ইতিহাসে নেই। বৌদ্ধ প্রভাব যখন প্রখর, তখনও হিন্দু ধর্মচিন্তা ও শিল্প, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ম্লান হয়ে যায় নি। শিল্পক্ষেত্রেও এদেশের স্বকীয় ধারা বিদেশী প্রভাবকে সহজে অতিক্রম করার শক্তি রাখত, তা পূর্বে আমরা দেখেছি। যাই হোক, "renaissance" শব্দের প্রতিশব্দ "পুনর্জন্ম" না করে যদি "নবজাগরণ" বলা হয় তো গুপ্তযুগের পক্ষে তা প্রযোজ্য। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তখন যে সাড়া পড়ে যায় তা বাস্তবিকই মনে রাখার মতো বস্তু।

তথ্য বিশ্লেষণ

সিদ্ধান্ত

বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন, নিপুণ শাসনব্যবস্থা, বাণিজ্যের বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। ধর্ম সম্পর্কেও দেখা গেছে যে গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী হলেও (হয়তো শেষ দিকে একজন বৌদ্ধ ছিলেন) বৌদ্ধ চিন্তা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে হিন্দুধর্ম বলতে আজও যা বুঝায়, তারই প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ যেন গুপ্তযুগেই দেখা গেল। বেদে যজ্ঞাদি যে অনুষ্ঠানের কথা আছে, তা বহু পূর্ব হতেই অপ্রচলিত হয়ে পড়ছিল; এখনও অগ্নি সাক্ষী রেখে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে হিন্দুর অনুষ্ঠান পালিত হয়, কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞানুষ্ঠান ঘটে না, বৈদিক দেবতাদেরও প্রায় বিলুপ্তি ঘটেছে। উপনিষদে বাক্য ও মনের অগোচর নৈর্ব্যক্তিক "ব্রহ্মণ্" সম্বন্ধে যে শিক্ষা আছে, তা স্বভাবতই শুধু বিদগ্ধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। শিব, বিষ্ণু, দেবী বা অন্য কোন নামে ব্যক্তিরূপে দেবতার আবাহন ও উপাসনার প্রচলন গুপ্তযুগে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। বৈদিক যজ্ঞবেদীর ভস্ম তখন নির্বাপিত হয়ে গেছে; মূর্তিপূজার যে ধারা প্রাক বৈদিকযুগ থেকে চলে এসেছে, মহাযান বৌদ্ধ মতে যে মূর্তিপূজার মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল, সেই মূর্তিপূজার প্রসার দেখা গেল গুপ্তশাসনে। মন্দিরে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ

অধুনা-প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রথম প্রকাশ

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও দেবতাদের প্রায়-বিলুপ্তি

উপনিষদ্ তত্ত্বের সীমাবদ্ধ প্রসার

মূর্তিপূজার প্রচলন

ও পূজার্চনার ভার নিলেন, কিন্তু মন্দিরের বাইরে দেবতা গিয়ে স্থান নিলেন ভক্তের হৃদয়ে; ভক্তিবাদের এই প্রচলন হিন্দু, বৌদ্ধ উভয় চিন্তাতেই তখন প্রকাশ পেল। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদিকে গুপ্তযুগে আমরা স্পষ্টভাবেই যেন দেখতে পাই; গুণাঢ্যের "বৃহৎকথা"র মতো কাহিনী থেকে বিভিন্ন তান্ত্রিক ধারার প্রচলন যে পূর্ব হতে দেখা দিয়েছিল, তন্ত্রের মধ্যে "বামমার্গ" অনুসরণ যারা করত, সমাজের শাসন ও শৃঙ্খলাকে তারা যে স্বীকার করে নি, ইত্যাদি অনেক খবর পাওয়া যায়। রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতিও গুপ্তযুগে বর্তমান আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য খুবই বেশী। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বহুলাংশ যে হিন্দু সভ্যতার অন্তর্ভূ‌ত হয়ে থেকেছে, তারই বিচিত্র ও নব উন্মেষশালী রূপ গুপ্ত শাসনকালে প্রকাশ পেয়েছিল।

ভক্তিবাদের প্রচলন

তন্ত্রের প্রভাব

হিন্দু-সভ্যতার বিচিত্র ও নব উন্মেষ

নারদ, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতা প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্র-গ্রন্থ গুপ্তযুগে সঙ্কলিত হয়েছিল। বর্তমান কালে প্রচলিত হিন্দুধর্ম, আচার, নিত্যকর্ম, সমাজ-বিধান ইত্যাদি বিষয়ে প্রামাণিক বিবৃতি গুপ্ত শাসনকালে প্রকাশিত হয়। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বহু পূর্ব থেকে সুপরিজ্ঞাত ছিল; এই মহাকাব্যদ্বয়ের কোন কোন অংশের মূল রচনা যে বহু প্রাচীন, তাতে সন্দেহ নেই। খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বে রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় পুরাণ গ্রন্থগুলিও পরিচিত ছিল। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে রামায়ণ-মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণকে আজ আমরা যে আকারে দেখি, তা গুপ্তযুগেই নির্ধারিত হয়েছিল। পাণিনির কাল থেকে কালিদাসের সময় এরই মধ্যে সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল, পরিশুদ্ধ ঔজ্জ্বল্য তার বৈশিষ্ট্য। ভাগবত, স্কন্দ, শিব, মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণ-গ্রন্থে বহু পূর্ব যুগের বৃত্তান্ত রয়েছে, কিন্তু সেগুলি পুনর্লিখিত ও একত্র সঙ্কলিত হয় গুপ্তযুগে। রামায়ণ-মহাভারতের সংকলন পূর্ব হতে আরম্ভ হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সম্পাদনা গুপ্তযুগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শ বিষয়ে এই দুই মহাকাব্যে যে অগাধ ঐশ্বর্যের সঞ্চয়ন রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাভারতের প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত সংস্করণ প্রণয়নে অগ্রণী, আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান সুখ্‌তঙ্কর বলেছেন: "মহাভারত থেকে যে অনেক কথা বাদ দেওয়া হয়েছে আবার অনেক কথা যোগ করে দেওয়া হয়েছে কিংবা বিস্তারিত করে বলা হয়েছে তা এই মহাগ্রন্থের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের এক

বর্তমান হিন্দুধর্ম সম্পর্কে প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা

সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ বিকাশ

অষ্টাদশ পুরাণ-এর বর্তমান আকার লাভ

মহাকাব্য ও মহাকাব্যের প্রভাব

মহাভারত সম্পর্কে মনীষী সুখ তঙ্কর

বাহ্যিক পরিচয় মাত্র। মহাভারত ধুলোয় ভরা, তাকে অপঠিত অবস্থায় ফেলে রাখার মতো বই নয়; মহাভারত হল দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা সর্বদা আহরণ করে নেবার মতো বই। মহাভারতেরই সঙ্গে তুলনীয় কাব্য 'গিল্‌গামেশ' ভাগ্যের বিধানে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেছে, কিন্তু বোধ হয় মাঝে মাঝে নূতন হাতের অদলবদলের কল্যাণে সেই দুর্ভাগ্য থেকে মহাভারত নিস্তার পেয়েছে।" যাই হোক, এই মহাভারতেই রয়েছে ভগবদ্‌গীতা, যাকে একই রচনার মধ্যে হিন্দু ধর্মচিন্তার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক বলা একটুও অত্যুক্তি নয়, আর আছে নল-দময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি অনবদ্য কাহিনী। রামায়ণ আর মহাভারত এখনও এদেশের ঘরে ঘরে পঠিত হয়ে থাকে; তার গল্প সকলের জানা, প্রধান চরিত্র সকলের পরিচিত। এই দুই মহাকাব্য আর অষ্টাদশ পুরাণের সঙ্কলন, সম্পাদনা ও পুনর্লিখন গুপ্তযুগের অক্ষয় কীর্তি।

ভগবদ্‌গীতা

মহাভারত বর্ণিত কাহিনী

ধর্ম-মূলক গ্রন্থ সঙ্কলনের কারণ নির্দেশ

'বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিরোধ' কারণ নির্দেশের অযৌক্তিকতা : হিন্দু-বৌদ্ধ বিদ্বেষের অভাব

কারও কারও মনে হয়েছে যে বৌদ্ধ ভাবধারার প্রাধান্য সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে তাকে প্রতিহত করার জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগীরা এই উদ্যোগে নেমেছিল। বলা হয়েছে যে বৌদ্ধ জাতকাবলীর প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষের মনকে সরিয়ে দিতে হলে হিন্দু ধর্মবিষয়ক কাহিনীর বহুল প্রচার প্রয়োজন বলে অনুভূত হওয়াতেই গুপ্ত শাসনকালে এই প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বৌদ্ধ-হিন্দুর মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের কোন প্রকৃত প্রমাণ, পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ধর্মচিন্তার বিরুদ্ধে হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের কোন লক্ষণই নেই; গুপ্তরাজগণ যে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বৈরিতা পোষণ করতেন না, তা অবধারিত; জনসাধারণের মধ্যেও বৌদ্ধ-হিন্দু প্রতিযোগিতার কোন চিহ্ন কোথাও দেখা যায় নি। সংস্কৃত ভাষাতে বৌদ্ধ দর্শনচিন্তা প্রকাশিত হয়েছে; অশ্বঘোষ-কৃত "বুদ্ধচরিত" ও "সৌন্দরনন্দ-কাব্য" বৌদ্ধ বিষয়বস্তু নিয়ে সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল। যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জগতে বৌদ্ধবিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, যার খ্যাতি পরবর্তী যুগে দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হয়েছিল, তার প্রথম অধ্যায়ে সমুদ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের দানলিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে; বিভিন্ন গুপ্ত রাজার তাম্রলিপিতে নালন্দার উল্লেখ আছে। গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর অন্তত চারশত বৎসর বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রভূত শ্রদ্ধা পেয়েছিল, তার প্রচারে কোন বাধা ছিল না। তাই বলা যায় যে হিন্দু-বৌদ্ধ দ্বন্দ্বকে গুপ্তযুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহুমুখী অভিব্যক্তির কারণ মনে করা ভুল। তবে গ্রীক, পার্থিয়ান,

হিন্দু গুপ্তরাজগণ কর্তৃক বৌদ্ধ-ধর্মের পৃষ্ঠ-পোষকতা

শক, কুশান প্রভৃতি বিদেশাগত শক্তির প্রাদুর্ভাবে ভারতবর্ষীয় চিন্তা ও কর্মধারায় কিঞ্চিৎ বিকৃতি প্রবেশ করছে আশঙ্কা করে ধর্ম, নীতি, সমাজ, আচার, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে এদেশের স্বকীয় অবদানকে সমুজ্জ্বল রূপ দেওয়ার সচেতন চেষ্টা গুপ্তযুগে হয়েছিল মনে করা অসঙ্গত নয়।

'বিদেশী প্রভাব প্রতিরোধ' কারণরূপে নির্দেশ

সাহিত্য

সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করলে গুপ্তযুগকে নিয়ে গর্ব করার যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে অসাধারণ উৎকর্ষ তখন দেখা গিয়েছিল। অবশ্য কাব্যসাহিত্যের যে তখন সহসা এক নব অভ্যুদয় ঘটে, তা নয়; ভাস ও অশ্বঘোষের রচনা থেকে প্রমাণ হয় যে প্রাক-গুপ্তযুগে কাব্য-প্রতিভার প্রভূত প্রকাশ ঘটেছিল। সমুদ্রগুপ্তের সময়কার এলাহাবাদ প্রশস্তি কিংবা আনুমানিক ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বৎসভট্টির মান্দাসোর অনুশাসনে তখন প্রচলিত কাব্যাদর্শের উল্লেখ রয়েছে। যাই হোক, যে কালিদাসকে বহু পণ্ডিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সম-সাময়িক মনে করেন, সেই মহাকবির রচনাবলী গুপ্তযুগের সাহিত্যে অতুলন ভাতি বিকীরণ করে রেখেছে। শকুন্তলা, মেঘদূত, রঘুবংশ, ঋতুসংহার প্রভৃতি অমর রচনায় কালিদাসের যে কবিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে, তা যুগ যুগ ধরে নন্দিত হতে থাকবে। অনুপম নাটক "মৃচ্ছকটিক"-এর রচয়িতা শূদ্রক, "মুদ্রারাক্ষস"-প্রণেতা বিশাখদত্ত, বৌদ্ধ দার্শনিক ও সাহিত্যিক বসুবন্ধু, এলাহাবাদ গুপ্ত-প্রশস্তির লেখক হরিষেণ প্রভৃতি গুপ্তযুগের সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রেখে গিয়েছেন। হরিষেণ ছিলেন যাঁর সভাকবি, সেই সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে "কবিরাজ" আখ্যা দিয়ে গর্ব অনুভব করতেন; তাঁর পুত্র চন্দ্রগুপ্ত সাহিত্যব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন এবং সম্ভবত হরিষেণের পুত্র কবি বীরসেনকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। গুপ্তযুগের শেষপর্বে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে "কিরাতার্জুনীয়ম্" কাব্যের প্রসিদ্ধ রচয়িতা ভারবীর নাম করা চলে; এঁর খ্যাতির উল্লেখ বাণভট্ট-কৃত "হর্ষচরিত"-এ রয়েছে। গুপ্তশাসনকালে মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির সম্পাদনার কথা মনে রাখলে আমরা বুঝব, মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন না হলেও গুপ্তযুগের সাহিত্যকীর্তি প্রকৃতই অসামান্য।

সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ

এলাহাবাদ প্রশস্তি ও মান্দাসোর অনুশাসন

কালিদাস

শূদ্রক, বিশাখ-দত্ত, বসুবন্ধু ও হরিষেণ

ভারবী

মন্তব্য

"হর্ষচরিত" থেকে গুপ্তযুগের শেষভাগে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে যারা উল্লিখিত হয়েছে তাদের মধ্যে দেখি সৌগত বা বৌদ্ধ, দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন, বৈষ্ণব, আজীবিক, এবং

গুপ্তযুগের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শনের যুগপৎ অভ্যুদয়

সাংখ্য, লোকায়তিক, বৈশেষিক, বেদান্ত ও ন্যায়দর্শনের অনুগামীরা। যে কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়, তখনই বৌদ্ধ দর্শনের যে অসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল, তা অসঙ্গ, বসুবন্ধু, কুমারজীব ও দিঙ্‌নাগের মতো প্রখ্যাত বৌদ্ধ আচার্যের অবদান থেকে প্রমাণ হয়।

শৈব ও বৈষ্ণব ধারা

পাশুপত বা শৈব আচার্যদের কথা বহু গুপ্তলিপি থেকে জানা যায় ; বৈষ্ণব (ভাগবত বা পঞ্চরাত্র) ধারা পূর্ব হতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

লোকায়তিক দর্শন

লোকায়তিক দর্শনের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে গতানুগতিক ধর্মধারার বিরুদ্ধে বস্তুবাদের প্রচার সমাজপতিদের রোষের কারণ হলেও তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

নাট্যশাস্ত্র ও স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ

সম্ভবত গুপ্তযুগেই "ভরতনাট্যশাস্ত্র" লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এদেশের নাটকের পরম্পরা অত্যন্ত প্রাচীন ; বৈদিক যুগ থেকে তার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এদেশের ধারা অনুযায়ী এই বিশ্বাস প্রচলিত যে স্বর্গের স্থপতি বিশ্বকর্মা প্রথম নাট্যগৃহ নির্মাণ আর ভরত-মুনি নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন।

শিল্পশাস্ত্রকে লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা

যাই হোক, নাট্যবিষয়ে "ভরত নাট্যশাস্ত্র" এবং স্থাপত্য বিষয়ে "মানসার" গ্রন্থ সম্ভবত গুপ্তযুগে একত্র সন্নিবদ্ধ হয়েছিল। যে কালে চৌষট্টি কলার চর্চা বিনা নাগরক-পদবাচ্য হওয়া যেত না, তখন সর্ববিধ শিল্পশাস্ত্রকেই নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা যে ঘটবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপরূপ অভিব্যক্তি

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপরূপ অভিব্যক্তি গুপ্তযুগে লক্ষিত হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ, এই উভয় ধর্মের মনন ও অনুভূতি তদানীন্তন শিল্পকর্মে যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিল তার স্পন্দন আজও মানুষকে অভিভূত করার শক্তি রাখে।

সারনাথ ও পাটলিপুত্রে প্রাপ্ত শিল্প-নিদর্শন

বারাণসীর কাছে সারনাথ এবং পাটলিপুত্রের কাছে নালন্দার খনন কার্যের ফলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকে বেশ বুঝা যায় যে, গান্ধার শিল্পে স্পষ্ট প্রতীয়মান বৈদেশিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ভারতবর্ষের একান্ত স্বকীয় শিল্পধারা সেখানে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে রয়েছে। গ্রীক ও কুশান শাসনের প্রভাব যে সাময়িক ও সংকীর্ণ কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়েছিল, তা জানা যায়।

ভারতীয় শিল্পের বিদেশী প্রভাব-মুক্ত স্বকীয়তা

শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভার অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল এত যে বৈদেশিক প্রভাব তাকে বিকৃত করতে পারে নি।

উত্তর ভারতে শিল্প-নিদর্শন

উত্তর ভারতে গুপ্ত-শিল্পের বহু সাক্ষ্যই পৌত্তলিকতাদ্বেষী মুসলিম আক্রমণের ফলে এবং প্রকৃতির প্রতিকূলতায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু উত্তর প্রদেশে অবস্থিত দেওগড়ের দশাবতার প্রস্তরমন্দির, কিংবা

ভিত্‌গাঁও-য়ের ইষ্টক মন্দির খুবই উল্লেখযোগ্য। গুহা-স্থাপত্যে গুপ্তযুগের অবদান স্মরণীয়; জগদ্বিখ্যাত অজন্তার যে উনত্রিশটি গুহা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ হিসাবে ব্যবহৃত হত, সেখানে গুপ্তযুগের শিল্পকর্ম অনেক আছে। স্তম্ভ, অলিন্দ, বিরাট বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পর্বতগাত্র থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; আর গুহাগাত্রে আছে বহু চিত্র। প্রধানত জাতক ও বোধিসত্ত্ব-কাহিনী হল তাদের বিষয়বস্তু। অজন্তা ও কিছু দূরে অবস্থিত বাগ গুহায় (এখন ধ্বংসোন্মুখ) ছবিগুলি সজীবতা ও বর্ণাঢ্যতায় আজও বিশ্বের বিস্ময় হয়ে রয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবন নিয়ে কত চিত্র আছে; কোথাও তিনি ধর্ম প্রচার করছেন, কোথাও বা দেখানো হয়েছে যে কপিলবাস্তুতে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর কাছে স্ত্রী গোপা পুত্র রাহুলকে নিয়ে ভিক্ষা চাইছে। বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রা ইত্যাদি কাহিনীও গুহাগাত্রে চিত্রিত হয়ে রয়েছে। অজন্তার ভিক্ষুরা যে জীবনের আস্বাদে অপ্রসন্ন, সংসারত্যাগী, ধর্মাগ্রহী ছিলেন না, তা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই চক্ষুষ্মান ভিক্ষুরা প্রকৃত মানবিক মমতা নিয়ে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, তাই মানুষ, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা সবই এত জীবন্ত, এত কমনীয় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। নীলপদ্ম হস্তে বোধিসত্ত্বের মূর্তি ও ভঙ্গীতে করুণার অনবদ্য প্রকাশ এখনও দর্শককে মুগ্ধ করে। গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে লাবণ্যের সঙ্গে তেজ, চলমান জীবনের ছন্দ ও ভারসাম্যের সৌম্য প্রশান্তি যেন একত্র বিরাজ করছে। পরিণতির লক্ষণ প্রায় সর্বত্র, কিন্তু আতিশয্য নেই, মাত্রাধিক্য নেই, উদ্বেলতাকে সংযত করে রাখা হয়েছে। শিল্পের মহিমা গুপ্তযুগে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা অবিস্মরণীয়।

অজন্তার গুহা-চিত্র

গুহাচিত্রের বিষয়বস্তু

শিল্পকৃতির গুণ-বিচার

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচারে গুপ্তযুগের উৎকর্ষও উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ও গ্রীক বিদ্বানদের মধ্যে আদান-প্রদানের ফল তখন দেখা যায় ভূগোলে, গণিতে ও জ্যোতির্বিদ্যায়। গর্গ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের নাম এই উপলক্ষে স্মরণীয়। গণিতের উপর ভিত্তি করে আর্যভট্ট গ্রহনক্ষত্রের অবস্থিতি সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করেন, পৃথিবী যে তার অক্ষপথে ঘূর্ণায়মান একথা তিনি জানতে পেরেছিলেন। বরাহমিহির পাঁচটি প্রাচীন সিদ্ধান্ত সঙ্কলন করেন; এদের মধ্যে শুধু সূর্যসিদ্ধান্ত সংরক্ষিত হয়েছে। ব্রহ্মগুপ্ত মাধ্যাকর্ষণ বিধি সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালে আরব দেশে ভারতীয় বিজ্ঞান প্রসার লাভ করে; জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থাদি আরব ভাষায় অনূদিত হয়। গুপ্তযুগের জ্যোতির্বিদরা গ্রীক

জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের অবদান

জ্যোতির্বিদ্যা

জ্যোতির্বিদদের ঋণ স্বীকার

("যবন") পণ্ডিতদের কাছে ঋণ স্বীকারে সঙ্কুচিত হন নি; বিদেশী পণ্ডিতদের আচার্য বলে মানতে তাঁদের দ্বিধা হয় নি। গুপ্ত রাজ্যকালে

চিকিৎসা-বিজ্ঞান

চিকিৎসা-বিজ্ঞান অগ্রসর হতে থাকে; শল্যবিদ্যা, জীবদেহে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি সম্বন্ধে তখন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল। কালিদাসকে নিয়ে যে নবরত্নের কথা কাহিনীতে বিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে ছিলেন

ধন্বন্তরী

ধন্বন্তরী, চিকিৎসকরূপে যাঁর যশ ভারতে আজও অনন্য। গ্রীক ও আরবরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষ থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন প্রমাণ আছে। ধাতব শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় দিল্লীতে চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ দেখে;

ধাতব শিল্প ও রসায়ন

দেড় হাজার বৎসর কেটে গেলেও লোহায় জং ধরে নি একটুও। রসায়ন-শাস্ত্রে নাগার্জুনের মতো প্রতিভার সাক্ষাৎ গুপ্তযুগেই মিলেছিল।

ইতিহাসের গৌরবময় বিভিন্ন যুগের সাথে গুপ্তযুগের তুলনা

ইতিহাসের বিভিন্ন গৌরবমণ্ডিত যুগের সঙ্গে তাই গুপ্ত শাসনকালের তুলনা করার প্রবৃত্তি লেখকদের মধ্যে প্রায় দেখা গিয়েছে। প্রাচীন গ্রীসে অ্যাথেন্স নগর-রাষ্ট্রের স্বর্ণযুগ বলে নন্দিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পেরিক্লীসের সময়। তার সঙ্গে কিংবা রোমে সম্রাট অগস্টস্-এর শাসনকালের সঙ্গে গুপ্তযুগের তুলনা করা হয়েছে। গুপ্তযুগে সাহিত্যের বিকাশ লক্ষ্য করে কোন কোন লেখক ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রথম এলিজাবেথের শাসনকালের কথা (ষোড়শ শতাব্দী) ভেবেছেন। এই ধরনের তুলনা খুব বেশীদূর নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়; পরিস্থিতি বিভিন্ন যুগে একেবারে অনুরূপ হতে পারে না। কিন্তু গুপ্ত রাজ্যকালে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি এমনই স্পষ্ট যে বিভিন্ন দেশের ও কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়গুলির সঙ্গে তার তুলনার কথা ভাবা একেবারে অসঙ্গত নয়।

মৌর্যযুগের সাথে গুপ্তযুগের তুলনা

মৌর্যযুগে রাষ্ট্রের আয়তন ছিল বৃহত্তর; মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বা অশোকের কীর্তি কখনও নিষ্প্রভ হওয়ার নয়; বিপুল সাম্রাজ্যে মৌর্য শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব সমধিক; মৌর্য শিল্পের বিস্ময়কর আবির্ভাব ভুলবার নয়; কোন কোন দিক থেকে মৌর্যযুগকে গুপ্ত শাসনকালের চেয়ে স্মরণীয় মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা যতদূর আজও জানি, মৌর্যযুগে সাহিত্যের বিকাশ হয়েছিল অল্প; তার চিত্রকলা, সঙ্গীত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না; বাণিজ্য বিস্তারে, উপনিবেশ স্থাপনে গুপ্তযুগের অবদান হল বেশী। গুপ্তযুগের বহুমুখী কৃতিত্ব আলোচনা করে তাই বলা চলে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে গুপ্তযুগকেই সবচেয়ে গৌরবমণ্ডিত অধ্যায় বলে পরিগণিত করলে অন্যায় হবে না।

হূন আক্রমণ ঃ হর্ষবর্ধনের রাজ্যকাল

প্রথমে পুষ্যমিত্র জাতিকে এবং তারপরে দুর্ধর্ষ হূন-জাতির আক্রমণকে স্কন্দগুপ্ত প্রতিহত করেছিলেন, কিন্তু আবার যখন হূনদের আঘাত পড়ল, তখন আরও বহু কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্য হীনবল। বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর পঞ্জাব এবং মালবের একটা বৃহৎ অংশ হূনদের অধিকারে দেখা গেল। মধ্য এশিয়ার প্রান্তরে এই হূনদের আদিবাস। পঞ্চম শতাব্দীতে তারা প্রতীচ্যে রোমান সাম্রাজ্য আর প্রাচ্যে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল। স্কন্দগুপ্তের কাছে পরাস্ত হয়েও তারা পরে আবার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এল; ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাদের নায়ক তোরমানকে দেখা যায়, পঞ্জাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তখন তিনি মালব আক্রমণের প্রয়াসে লিপ্ত। প্রায় একশো বৎসর এই হূনরা ভারত সীমান্তে অল্পাধিক পরিমাণে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছিল। মনে হয় যে এদেশের আবহাওয়াতে তাদের প্রকৃতিও বদলে আসছিল। তোরমানকে ঠিক এক যাযাবর ও বর্বর জাতির নেতা বলে মনে হয় না; যেসব বিদেশীরা সীমান্তে রাজ্যস্থাপন করে প্রায় হিন্দু বনে যাওয়ার উপক্রম করত তোরমান যেন তাদেরই একজন, পুত্র মিহিরগুল নাকি শৈব হয়েছিলেন। গুপ্তরাজ ভানুগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে মালবে তোরমানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর উত্তরাধিকারী মিহিরগুল নৃশংস স্বৈরাচারী রাজা বলে ইতিহাসে কুখ্যাত। কথিত আছে যে গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা বালাদিত্যগুপ্ত উত্তর ভারতের অপর কয়েকজন নরপতির সঙ্গে মিলে আনুমানিক ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিপুল যুদ্ধে মিহিরগুলকে পরাভূত করেন। এর কিছু পরে আবার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে মিহিরগুল অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করায় মান্দাসোরের বিখ্যাত রাজা যশোধর্মন তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। শোনা যায় যে, সাকল-এ (বর্তমান সিয়ালকোট) রাজধানী ছেড়ে মিহিরগুলকে কাশ্মীরে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। যাই হোক, হূন রাজ্যের অবসান ঘটতে বিশেষ বিলম্ব হয় নি। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কিংবা মালবের কোন কোন এলাকায় মাঝে মাঝে হূন দলপতিদের সঙ্গে এদেশের রাজাদের যুদ্ধের কথা শোনা গেছে। কিন্তু ক্রমশ এই

ভারতে হূন-অধিকার

তোরমান কর্তৃক পঞ্জাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা

হূন প্রকৃতিতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব

তোরমানের অগ্রগতি ব্যাহত

মিহিরগুলের পরাজয়

হুনদের ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্তি

দুর্দমনীয় বর্বরজাতি এদেশের জীবনে স্থান করে নিল ; পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে সম্ভবত তারা অবশেষে রাজপুত জাতির অংশীভূত হয়ে যায়। একান্ত বিদেশীকেও এভাবে আত্মস্থ করতে পারা ভারত ইতিহাসের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত
রাষ্ট্রশক্তি

ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তরাজ্যের সংহতিও ব্যাপ্তি আর ছিল না। মালবে মিহিরগুলের অত্যাচারী শাসন তখন সেখানকার অধিবাসীদের যেন শ্বাসরুদ্ধ করে তুলছিল। এ সমস্ত ঘটনা থেকে মাঝে মাঝে মনে হতে পারে যে তখন বুঝি এদেশে অরাজকতার যুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনকার যেসব খবর আমরা পেয়েছি তাকে একত্র করে দেখলে ষষ্ঠ শতাব্দীকে একেবারেই এক ব্যর্থ যুগ মনে হবে না। রাজ্যসীমা সংকীর্ণ হয়ে গেলেও পরবর্তী গুপ্তেরা সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত মগধে রাজত্ব করেছিলেন। নালন্দার মহাবিদ্যায়তন এই নিষ্ঠাবান হিন্দু রাজবংশের সহায়তা ও বদান্যতায় পুষ্ট হয়েছিল। পূর্বকীর্তি বিলীন হলেও মগধে গুপ্ত রাজবংশের মর্যাদা হ্রাস পায় নি। বিন্ধ্য ও আরাবল্লী পর্বত অঞ্চলে দ্বিতীয় প্রবরসেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনে বাকাটক রাজ্যের পূর্ব খ্যাতি একেবারে ম্লান হয়ে পড়ে নি। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য শাসনের ঐতিহ্য ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাহুগ্রস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষণ তখন স্পষ্ট, সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাফল্যের পরিমাণও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়।

রাষ্ট্রগত দুর্বলতা সত্ত্বেও ব্যর্থযুগ নহে

গুপ্তরাজাদের মর্যাদা

বাকাটকদের পূর্বখ্যাতি

মালবরাজ যশোধর্মন ও হুনদের পরাজয়

সমগ্র আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে এই যুগে একজন বীরপুরুষের আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য। এঁর নাম মালবরাজ যশোধর্মন ; আনুমানিক ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুদ্ধে হুনদের চরম পরাজয় ঘটান। শিলালিপিতে "সম্রাট" বলে যশোধর্মনের বর্ণনা আছে ; দুর্দান্ত রাজাদের পরাস্ত করে এবং বিশেষত চির-উদ্ধত হুনরাজ মিহিরগুলের শির অবনত করে দিয়ে, তিনি তদানীন্তন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। কথিত আছে যে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিম সাগর এবং হিমালয় থেকে পূর্বঘাট পর্বত পর্যন্ত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের চেয়ে আয়তনে বিশাল এই রাষ্ট্রের কথা প্রায় অবিশ্বাস্য বলে কারও কারও মনে হয়েছে। আবার কারও কারও মতে যশোধর্মন হলেন উজ্জয়িনীর "শকারি"

সাম্রাজ্য-বিস্তার

যশোধর্মন কি বিক্রমাদিত্য ?

বিক্রমাদিত্য। একথা অবশ্য গ্রহণীয় বলে মনে হয় না। যশোধর্মন যুদ্ধ করেছিলেন হূনদের বিরুদ্ধে, শকদের বিরুদ্ধে নয়; উজ্জয়িনীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু জানা নেই, দশপুরে (বর্তমান মান্দাসোর) তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল; সমসাময়িক কোন সূত্র থেকে তাঁর "বিক্রমাদিত্য" আখ্যা জানা যায় না। যশোধর্মন কিংবা তাঁর বংশধরদের সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। তবে কিছুকাল যে এক বিজয়ী মহাবীর ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন অকস্মাৎ তাঁর আবির্ভাব, তিরোভাবও যেন তেমনই অকস্মাৎ ঘটেছিল। রাজ্যের অস্থায়িত্ব

এই ষষ্ঠ শতাব্দীতে কনৌজের মৌখরীবংশ গুপ্তরাজ্যের অধোগতির সুযোগ নিয়ে শক্তি বিস্তার করতে থাকে। বহু প্রাচীন বলে এই বংশের গর্ব ছিল। ঈশানবর্মন "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করে বংশের প্রতিপত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেন। আনুমানিক ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এক লেখ থেকে জানা যায় যে ঈশানবর্মন আন্ধ্র, শুলিক ও গৌড়দের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। এই আন্ধ্র ও শুলিক বংশ সম্ভবত দাক্ষিণাত্যে রাজ্যশাসন করত; "গৌড়" বলতে সম্ভবত পশ্চিম বাংলার কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অধিবাসী বুঝাত। মৌখরী রাজবংশকেও মাঝে মাঝে বিদেশী হূনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে; সমগ্র উত্তর ভারতে সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে হূনরা যেখানে যেখানে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও লড়ছিল তাদের পরাজিত করা প্রয়োজন ছিল। যশোধর্মনের মতো মৌখরীদেরও মনে ছিল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাভিলাষ।

মৌখরীবংশের অভ্যুদয়

রাজ্যজয়

হূনদের সাথে সঙ্ঘর্ষ

ঈশ্বরবর্মনের পর সর্ববর্মন, অবন্তীবর্মন ও গ্রহবর্মন এই তিন রাজার নাম পাওয়া যায়। গ্রহবর্মন বিবাহ করেন থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে। এই রাজ্যশ্রী হলেন রাজ্যবর্ধন ও তাঁর চেয়ে খ্যাতিমান হর্ষবর্ধনের ভগ্নী। গ্রহবর্মনের মৃত্যু ও রাজ্যশ্রীর কারাবাস প্রভৃতি ঘটনা পুষ্যভূতিবংশের কথা আলোচনার সময় উল্লেখ করা যাবে। মৌখরী বংশের অবসানের পর কনৌজ থানেশ্বরের উদীয়মান রাজ্যের অংশীভূত হয়েছিল।

মৌখরীরাজ গ্রহবর্মন

মৌখরী রাজ্যের পরিণতি

এই সময় অপরাপর বিশিষ্ট রাজবংশের মধ্যে বাকাটকদের কথা বারবার বলা হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই একদাখ্যাত বংশের রাজশক্তি বিলুপ্ত হয়; কলচুরি বা কলচুরি নামে অভিহিত এক দক্ষিণ ভারতীয় বংশ বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে বাকাটক রাজ্যের অবসান ঘটায়। আর এক

বাকাটক রাজবংশ

বলভীর মৈত্রক বংশ

উল্লেখযোগ্য পরিবার হল গুজরাটে অবস্থিত বলভীর মৈত্রক-রা। অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনশত বর্ষ ধরে এই বংশের শাসন চলেছিল; শোনা যায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের এক সেনাপতি এর প্রতিষ্ঠাতা। মৈত্রক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধ্রুবভট্ট বা ধ্রুবসেন থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, আবার যুদ্ধান্তে হর্ষবর্ধনের কন্যাকে বিবাহ করেন। ক্রমশ এই রাজ্য দুর্বল হতে থাকে, আর অষ্টম শতকের শেষ ভাগে আরব আক্রমণে এর অবসান ঘটে। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক এবং কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের কথা হর্ষবর্ধনের কাহিনী আলোচনাকালে জানা যাবে। এখানে শুধু মনে রাখা দরকার যে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত দেখা যায় যে উত্তর ভারতে অরাজক অবস্থা কোথাও নেই, বরঞ্চ রয়েছে কয়েকটি সুসংবদ্ধ রাজ্য যারা সাম্রাজ্য স্থাপনেও প্রয়াসী। হর্ষবর্ধনের পূর্বে যে উত্তর ভারতের ইতিহাস ঘনান্ধকার, তা একেবারেই নয়।

ধ্রুবসেন

ভারতে অরাজকতা যুক্তির নিরসন

সংস্কৃতির অগ্রগতি

অরাজক বলে বর্ণিত এই শতাব্দীতে সংস্কৃতির যে অগ্রগতি ঘটে, তা যথেষ্ট স্মরণীয়। বালাদিত্যগুপ্তের অনুশাসনে লিখিত আছে যে "কৈলাস পর্বতকে পরাজিত দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে বালাদিত্য নালন্দাতে শুদ্ধোদনের যশস্বী পুত্রের (বুদ্ধ) সম্মানে এক বিশাল ও বিস্ময়কর মন্দির নির্মাণ করেছেন।" ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে আচার্য স্থিরমতি ছিলেন নালন্দার অধ্যক্ষ; কিছু পরে ছিলেন আচার্য ধর্মপাল; সপ্তম শতাব্দীতে অধ্যক্ষপদে সমাসীন দেখা যায় প্রথিতযশা শীলভদ্রকে। পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে নালন্দায় ছিলেন প্রখ্যাত মনীষী বসুবন্ধু; তাঁর সময় থেকে শীলভদ্র পর্যন্ত নালন্দার স্বর্ণযুগ চলছিল বলা যায়।

নালন্দার স্বর্ণযুগ

সাহিত্যকৃতি: ভারবী দণ্ডিন্ বিশাখদত্ত

"কিরাতার্জুনীয়ম্"-এর রচয়িতা ভারবী, "জানকীহরণ" কাব্যের লেখক কুমারদাস, "দশকুমারচরিত"-প্রণেতা দণ্ডিন্ প্রভৃতি কবি, "কৌমুদী-মহোৎসব"-এর লেখক বিশাখদত্তের মতো নাট্যকার, ষষ্ঠ শতাব্দীতেই লিখেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে আর্যভট্ট ষষ্ঠ শতাব্দীতে মারা যান; বরাহমিহিরের জীবনের বহুলাংশ ষষ্ঠ শতাব্দীতেই অতিবাহিত হয়েছিল মনে হয়। ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের বিভিন্ন বিভাগের চর্চা তখন উচ্চ স্তরে উঠেছিল; বৌদ্ধ ও হিন্দুদর্শন উভয়েরই অগ্রগতি ষষ্ঠ শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভিন্ন জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষা

দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি ও প্রাকৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ

প্রাকৃতের সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রথম লক্ষণ তখন দেখা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের রাজ্যকালে ভারতীয় সংস্কৃতির যে সমুজ্জ্বল প্রকাশ, রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে তখন যে মাহাত্ম্যের লক্ষণ স্পষ্ট, তা যে একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, একথা তাই আমরা বুঝব। হর্ষবর্ধনের পূর্বে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন ছেদ পড়ে যায় নি। মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের মতো সুবিশাল রাষ্ট্র না থাকলেই যে দেশের আকাশে অন্ধকার নেমে আসে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কোন কোন দিক থেকে হর্ষবর্ধনের পূর্ববর্তী যুগ আরও স্মরণীয়; হিউয়েনসাং-এর হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আর বাণভট্টের বিস্তারিত প্রশস্তি হর্ষবর্ধনের রাজ্যকালকে এমনভাবে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে যে তার মধ্যে কিছু কৃত্রিমতা ও অতিরঞ্জনেরই সন্ধান পাওয়া অসঙ্গত নয়। *ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাসের মূল্যায়ন*

পুষ্যভূতি বংশ ঃ সম্রাট হর্ষবর্ধন

বর্তমান পঞ্জাবের পূর্বভাগে, কাহিনীখ্যাত কুরুক্ষেত্রের অনতিদূরে অবস্থিত থানেশ্বরকে হর্ষবর্ধনের পিতামহ পুষ্যভূতিবংশীয় আদিত্যবর্ধনের অধীনে এক করদরাজ্যরূপে দেখা যায়। তাঁর পুত্র প্রভাকরবর্ধন মাতৃকুলে গুপ্তবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন; সম্ভবত তিনিই থানেশ্বরকে এক প্রতিপত্তিবান রাজ্যে পরিণত করেন, এবং রাজ্যসীমান্তে ক্রমাগত হূন এবং মালব রাজ্যের শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন; আনুমানিক ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে হূনরা থানেশ্বর আক্রমণ করলে যুবরাজ রাজ্যবর্ধন তাকে প্রতিহত করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ প্রভাকরবর্ধন দিয়েছিলেন মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুর পর ৬০৫ সালে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু দীর্ঘকাল রাজত্ব করা তাঁর ভাগ্যে ছিল না। পুষ্যভূতি ও মৌখরী উভয় বংশের শত্রু মালবরাজ কনৌজ আক্রমণ করে গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন, স্বয়ং রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করে রাখেন। এই পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে রাজ্যবর্ধন মালবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন ও দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু তদানীন্তন ভারতবর্ষের এক শক্তিমান রাজা, দেবগুপ্তের মিত্র, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে পরাস্ত করেন। কথিত আছে যে শান্তির কথাবার্তার অজুহাতে শশাঙ্ক নাকি নিজের শিবিরে রাজ্যবর্ধনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন। আবার অন্য যে

আদিত্যবর্ধন

প্রভাকরবর্ধন

হূন-প্রতিরোধ ও রাজ্যবর্ধন

মালবরাজের কনৌজ আক্রমণ

দেবগুপ্তের পরাজয়

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু

বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা গেছে যে রাজ্যবর্ধন ও শশাঙ্কের মধ্যে এক দ্বৈতযুদ্ধে ("duel") রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ঘটে। যাই হোক, এ বিষয়ে একেবারে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। এভাবে থানেশ্বর রাজ্যের যখন ঘোর দুর্দিন, তখন হর্ষবর্ধন নিহত ভ্রাতার শূন্য সিংহাসনে আহূত হয়েছিলেন। বাণভট্টের "হর্ষচরিত" এবং হিউয়েনসাং-এর বিবরণে লিখিত আছে যে সিংহাসনে বসতে হর্ষবর্ধনের অনিচ্ছা ছিল, ভণ্ডি-প্রমুখ সভাসদদের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি স্বীকৃত হন। মনে হয় যে, গ্রহবর্মনের মৃত্যুর পর নির্বংশ মৌখরীদের রাজ্যভারও তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা হয়েও প্রথমে হর্ষ "রাজপুত্র শিলাদিত্য" এই আখ্যা গ্রহণ করেন বলে মনে হয় যে থানেশ্বর ও কনৌজ উভয় রাজ্যের অধিকার সম্পর্কে তিনি তখনও নিশ্চিত ছিলেন না। যাই হোক, সিংহাসনে বসেই গৌড়রাজ শশাঙ্ককে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া এবং ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করে আনাই হল তাঁর প্রথম সঙ্কল্প।

হর্ষবর্ধনের সিংহাসনলাভ

বাণভট্ট-কৃত "হর্ষচরিত" গ্রন্থে আছে যে গৌড়রাজ্যকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে হর্ষবর্ধন নাকি বলেছিলেন যে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণ না হলে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। এই গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে যে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে তিনি জানতে পান যে রাজ্যশ্রী কনৌজের কারাগার থেকে পালিয়ে বিন্ধ্য পর্বতের অরণ্য অঞ্চলে রয়েছেন। তখনই হর্ষ বিন্ধ্য অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন, এবং পার্বত্য বাসিন্দাদের সহায়তায় রাজ্যশ্রীর সন্ধান পেয়ে যখন ঠিক জায়গায় হাজির হন তখন দেখা যায় যে রাজ্যশ্রী ভাগ্যহত অবস্থায় জীবন সম্বন্ধে একান্ত বীতস্পৃহ হয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগের জন্য উদ্যোগ করছেন। অনেক অনুনয়ের পর হর্ষবর্ধন ভগ্নীকে থানেশ্বরে ফিরিয়ে আনেন। চৈনিক এক বিবরণে আছে যে তিনি কিছুকাল রাজ্যশ্রীকে সহযোগিনীরূপে নিয়ে রাজ্য চালিয়েছিলেন। রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মন নিহত হওয়ার পর মৌখরী বংশের কোন পুরুষকে রাজ্য দাবি করতে দেখা যায় নি; মৌখরী রাজ্য হর্ষেরই কর্তৃত্বে চলে আসে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বোধ হয় ৬০৬ থেকে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মৌখরীদের শাসিত অঞ্চলকে নিজের রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন বলে হর্ষবর্ধন ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

হর্ষবর্ধনের গৌড়-ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা

রাজ্যশ্রীর উদ্ধারসাধন

মৌখরী রাজ্য ও থানেশ্বরের একত্ব-বিধান

সমগ্র আর্যাবর্তে আধিপত্য বিস্তারের জন্য হর্ষবর্ধন বিভিন্ন রাজাকে আনুগত্য স্বীকার নতুবা যুদ্ধে আহ্বান করেন বলে "হর্ষচরিতে" বিবৃত হয়েছে। কিছুকাল পরে বিপুল সৈন্যদল নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন; প্রাচীন ভারতের চিরাভ্যস্ত রথযুদ্ধের রীতি তিনি পরিত্যাগ করেন, বহু হস্তী, অশ্ব এবং পদাতিক সেনা নিয়ে তাঁর অভিযান আরম্ভ হয়। শশাঙ্কের চরম শাস্তিবিধানের যে সঙ্কল্প হর্ষবর্ধন নিয়েছিলেন, তা অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল মনে হয়। শশাঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সমস্ত সংবাদ আসে শত্রুপক্ষ থেকে; ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্বেষী এবং কঠোর প্রকৃতির লোক বলে তাঁর নামে রটনা আছে। কিন্তু যেমন রাজ্যবর্ধনের হত্যা ব্যাপারে, তেমনই তাঁর চরিত্র সম্পর্কেও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। হর্ষ এবং শশাঙ্কের যুদ্ধ কিভাবে চলেছিল, কারই বা জয় আর কারই বা পরাজয় ঘটেছিল, এ সমস্ত বিষয়ে তথ্যের অভাব আছে। তবে মনে হয় যে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দেও যখন শশাঙ্কের রাজ্য শুধু বাংলা নয়, বিহারের দক্ষিণাংশ এবং উড়িষ্যাতেও সম্ভবত বিস্তৃত, তখন হর্ষবর্ধন কোন সাময়িক সাফল্য অর্জন করে থাকলেও শশাঙ্কের পক্ষে রাজশক্তি কবলিত রাখা অসম্ভব হয় নি।

হর্ষবর্ধনের বিজয়াভিযান : হর্ষ-শশাঙ্ক যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্যের অভাব শশাঙ্কের অব্যাহত রাজশক্তি

শশাঙ্ক যে প্রকৃত ক্ষমতাবান ও বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন, তা বোধ হয় বেশ ভরসা করেই বলা যায়। দেশের পূর্বাঞ্চলে তাঁর রাজ্য; উদীয়মান থানেশ্বর রাজ্যকে পরাভূত করার জন্য পশ্চিমস্থিত মালব রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা তাঁর পক্ষে গর্হিত ছিল না, বরঞ্চ কূটনীতি-নৈপুণ্যেরই পরিচায়ক ছিল। যাই হোক, অনুমান হয় যে শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন বাংলায় কর্ণসুবর্ণ রাজ্য অধিকার করতে পারেন নি। শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন হর্ষের বশ্যতা স্বীকার করেন; তেমনই মগধের গুপ্ত রাজারাও হর্ষবর্ধনের আধিপত্যে সম্মত হয়েছিলেন। ভাস্করবর্মনের নিধনপুর লিপি থেকে জানা যায় যে বাংলা দেশের একাংশ তাঁর শাসনে ছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন যখন সফল অভিযান চালিয়ে দক্ষিণে কঙ্গোদ (বর্তমানে গঞ্জাম) পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন, তখন যুদ্ধে সহায়তাদানের পুরস্কারস্বরূপ বাংলার একাংশ হয়তো ভাস্করবর্মনকে দিয়েছিলেন, কিংবা এমনও হতে পারে যে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরই বাংলার কতকাংশে কামরূপরাজ্যের কর্তৃত্ব বিস্তৃত হয়।

শশাঙ্কের কার্য-বিচার ভাস্করবর্মন ও গৌড়রাজ্য

ছয় বৎসর নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে তিনি লিপ্ত ছিলেন বলে চীনা পর্যটক হিউয়েনসাং-এর বৃত্তান্তে রয়েছে; "পঞ্চভারত"-এর ("Five Indias")

হর্ষবর্ধনের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ ও রাজ্য জয় :

বিরুদ্ধে নাকি হর্ষের সংগ্রাম চলেছিল। হিউয়েনসাং-এর এই উক্তির সমর্থক কোন বিশেষ তথ্যের সন্ধান মেলে নি। মোটামুটি জানা আছে যে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানের পর সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত বলভীর মৈত্রক রাজবংশের সঙ্গে হর্ষের যুদ্ধ হয়, সাময়িকভাবে হর্ষ বলভীরাজ্য অধিকারও নাকি করেছিলেন, কিন্তু বলভীরাজ ধ্রুবসেন গুর্জররাজ দ্বিতীয় দদ্দ-এর সাহায্যে রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। পরে ধ্রুবসেন হর্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন; এই মৈত্রক বংশ যে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকে এবং মালব প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে, তার সাক্ষ্যস্বরূপ ধ্রুবসেনের লিপি এবং হিউয়েনসাং-এর বিবরণে অনেক কিছু মেলে। হর্ষচরিতে বলা হয়েছে যে সিন্ধুদেশে যুদ্ধ করে হর্ষবর্ধন জয় লাভ করেন, কিন্তু আবার যখন হিউয়েনসাং বলেন যে তিনি দেখেছিলেন সিন্ধুদেশ ছিল এক স্বাধীন রাজ্য, তখন মনে হয় যে সম্ভবত সাময়িক কোন সাফল্য অর্জন ছাড়া আর কিছু হর্ষ করতে পারেন নি। কাশ্মীর সম্পর্কে কথিত আছে যে সেই "তুষারশৈল" দেশে অভিযান পাঠিয়ে হর্ষবর্ধন সেখান থেকে কর পেতেন, কিন্তু কখন যে এ ঘটনা ঘটে তা জানা নেই, কখনই বা তিনি আবার কাশ্মীর আক্রমণ করে সেখান থেকে বুদ্ধদেবের দাঁত নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, তাও জানা নেই। খুব নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা তাই কঠিন। "উত্তরাপথনাথ" বলে হর্ষের বর্ণনা আছে চালুক্যরাজের বিখ্যাত আইহোল প্রশস্তিতে; কিন্তু বোধ হয় চালুক্যরাজের বিজয় যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাই দর্পভরে প্রচারের জন্য পরাজিত হর্ষকে "উত্তরাপথনাথ" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বিন্ধ্য ও নর্মদার উত্তরে হর্ষবর্ধন যে সবচেয়ে শক্তিমান শাসক ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার বেশী কিছু দাবি করা বোধ হয় ভুল।

বলভীরাজ্য

সিন্ধুদেশ

কাশ্মীর

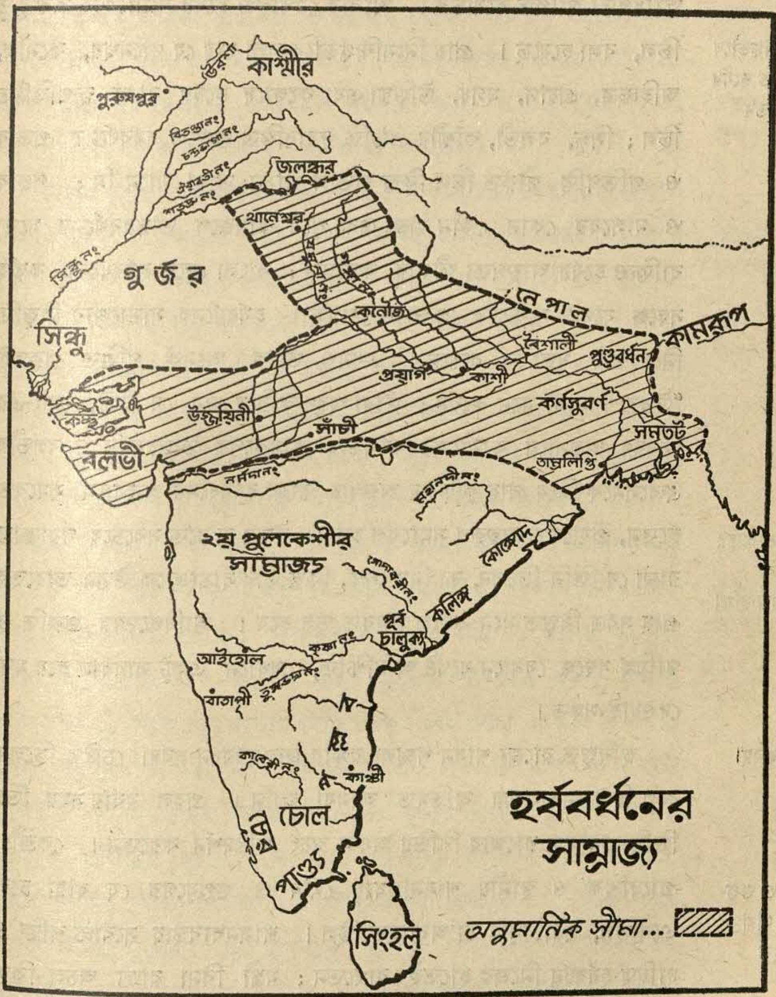
"উত্তরাপথনাথ" সম্পর্কে ভাষ্য

মন্তব্য

তাপ্তি নদীতীরে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে আর্যাবর্তের এবং দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের যে যুদ্ধ হয়, সেখানে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনকে পরাস্ত করেন। সম্ভবত দাক্ষিণাত্য জয়ের কোন পরিকল্পনা হর্ষের ছিল, কিন্তু এবার তা পরিত্যাগ করতে হল; কারও কারও মতে ধর্মের দিকে হর্ষের মনোযোগ তখন থেকে আগের চেয়ে অনেক বাড়তে থাকল। চালুক্যরাজ এই যুদ্ধজয়ের কথা যে আইহোল (Aihole) লিপিতে বিবৃত করেছেন, তাতে আছে যে মালব, গুর্জর প্রভৃতির উপর দ্বিতীয় পুলকেশীর আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। তাই প্রশ্ন ওঠে যে নর্মদা পর্যন্ত হর্ষবর্ধনের রাজ্য সম্প্রসারিত বলে যে কথা প্রচলিত, তা সত্য কি না।

দাক্ষিণাত্যে হর্ষবর্ধনের পরাজয়

হর্ষবর্ধনের রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে বিভিন্ন মত


কাশ্মীর
পুরুষপুর
বিতস্তা নং
চন্দ্রভাগা নং
ইরাবতী নং
শতদ্রু নং
জলন্ধর
থানেশ্বর
সিন্ধু নং
গুর্জর
সিন্ধু
নেপাল
কামরূপ
কনৌজ
বৈশালী
পুণ্ড্রবর্ধন
প্রয়াগ
কাশী
কর্ণসুবর্ণ
কচ্ছ
উজ্জয়িনী
সাঁচী
সমতট
বলভী
তাম্রলিপ্তি
নর্মদা নং
মহানদী নং
২য় পুলকেশীর সাম্রাজ্য
কোঙ্গোদ
গোদাবরী নং
কলিঙ্গ
পূর্ব চালুক্য
কৃষ্ণা নং
আইহোল
তুঙ্গভদ্রা নং
বাতাপী
কাবেরী নং
কাঞ্চী
চোল
পাণ্ড্য
সিংহল
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
অনুমানিক সীমা...

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে পূর্বে গঞ্জাম থেকে পশ্চিমে বলভী, এবং উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে হর্ষবর্ধনের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। আবার নেপালও হর্ষের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, বলা হয়েছে। প্রায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় যে থানেশ্বর, কনৌজ, অহিচ্ছত্র, প্রয়াগ, মগধ, উড়িষ্যা এবং কঙ্গোদে হর্ষের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ; সিন্ধু, বলভী, কাশ্মীর প্রভৃতি দূরাবস্থিত অঞ্চলে হর্ষবর্ধনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বীকৃত ছিল কিন্তু প্রত্যক্ষ শাসন তারা মানে নি ; পঞ্জাব ও মালবের কোন কোন রাজা এবং পূর্বে কামরূপে ভাস্করবর্মনের মতো ব্যক্তিও হর্ষের আনুগত্য স্বীকার করতেন ; বাংলা দেশে হর্ষবর্ধনের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি নিয়ে তাই মতভেদ রয়েছে। এখনও তাঁকে অনেক পণ্ডিত প্রকৃতই "উত্তরাপথনাথ" মনে করেন ; তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেন যে হিউয়েনসাং-এর বিবরণ অনুসারে কনৌজের ধর্মসভায় কামরূপের ভাস্করবর্মন ও বলভীর ধ্রুবসেনকে নিয়ে প্রায় কুড়িজন অনুগত রাজা হর্ষবর্ধনের আহ্বানে সমবেত হতেন, প্রয়াগেও অনুরূপ সমাবেশ হত। উত্তর ভারতে সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা যে তিনি ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্যকে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত মনে করলে সম্ভবত ভুল হবে। আধিপত্যের প্রকৃতি ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যেখানে যথেষ্ট অনিশ্চিতি, সেখানে একটু সাবধান হয়ে মত দেওয়াই সঙ্গত।

নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হর্ষের রাজ্যায়তন

উত্তর-ভারতের সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা

শাসনব্যবস্থা

সুবিস্তৃত রাজ্যে শাসন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য হর্ষবর্ধন সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন বলে হিউয়েনসাং-এর অভিমত আমরা জানি। প্রবল বর্ষার সময় ভিন্ন তিনি ক্রমাগত রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল স্বয়ং পরিদর্শন করতেন। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনবিষয়ে মৌর্য ও গুপ্তযুগের যে ধারা চলে এসেছিল, মোটামুটি তা অব্যাহত ছিল। শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ শক্তি ও দায়িত্ব হর্ষবর্ধন নিজের হাতেই রাখতেন ; মন্ত্রী বিনা রাজ্য অচল কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ বলে কোন সংস্থা ছিল কিনা বলা দুরূহ। সরকারী কাজকর্ম সম্বন্ধে দলিল দস্তাবেজের উল্লেখ পাওয়া যায় ; সম্ভবত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হত। হিউয়েনসাং শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে পথঘাট খুব নিরাপদ ছিল না, কয়েক বার ডাকাতের হাতে পড়ে চীনা ভিক্ষুর সর্বস্ব খোয়া যায়। এদিক থেকে গুপ্তযুগের তুলনায় অবনতি লক্ষ্য করা যায় ; দণ্ডবিধি পূর্বের চেয়ে খুব

মৌর্য ও গুপ্ত-যুগের ধারা অব্যাহত

পথঘাটের নিরাপত্তার অভাব

কঠোর হয়েছিল ; কারাবাস, অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি দণ্ডের প্রচলন ঘটেছিল। রাজকোষ থেকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। সরকারের অর্থ আসত প্রধানত ভূমিরাজস্ব থেকে, মনে হয় ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা হিসাবে আদায় করা হত। রাজপুরুষদের বেতনের পরিবর্তে ভূমির উপর স্বত্ব দেওয়ার প্রথা ছিল অনুমান করা গেছে ; পরবর্তী কালে জায়গিরদারী ব্যবস্থার পূর্ব লক্ষণ যেন দেখা দিয়েছিল।

দণ্ডবিধির কঠোরতা

রাজস্ব

রাজপুরুষদের বেতন

কথিত আছে যে হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন, কিন্তু হিউয়েনসাং-এর বিবরণ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে রাজত্বের শেষভাগে তিনি বৌদ্ধ মত অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে সর্বধর্ম সম্বন্ধে শুধু সহিষ্ণুতা নয় প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব তিনি পোষণ করতেন। কোন কোন লেখক মন্তব্য করেছেন যে একদিকে পূর্বগামী সম্রাট অশোকের ন্যায় তিনি বহু মঠ, চিকিৎসাগার, যাত্রীশালা প্রভৃতি নির্মাণ করে দেন, আবার অন্যদিকে ভবিষ্যৎ যুগের সম্রাট আকবরের মতো ধর্মসভা আহ্বান করে ধর্মবিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক শুনতেন, বক্তাদের পুরস্কার দিতেন। ধর্মব্যাপারে হর্ষবর্ধনের আগ্রহের কথা হিউয়েনসাং-এর বৃত্তান্তে খুবই স্পষ্ট। কনৌজের ধর্মসভার চিত্তাকর্ষক বিবরণ চীনা ভিক্ষুর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন ও অন্যান্য অনুগত রাজাদের নিয়ে হর্ষ ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ধর্মসভায় উপস্থিত হন ; নালন্দা ও অন্যান্য মঠ থেকে চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং তিন হাজার ব্রাহ্মণ ও জৈন সাধু সেখানে ছিলেন। গঙ্গাতীরে এই সভা উপলক্ষে এক প্রকাণ্ড মন্দির ও মঠ নির্মিত হয় ; মন্দিরের সু-উচ্চ চূড়ার উপর স্বর্ণনির্মিত বিরাট বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মূর্তি নিয়ে প্রতিদিন হর্ষবর্ধনকে পুরোভাগে রেখে সকলের শোভাযাত্রা হত। এই ধর্মসভায় হিউয়েনসাং বৌদ্ধশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে আবার রাজার বৌদ্ধপ্রীতিতে রুষ্ট হয়ে কিছু ব্রাহ্মণ রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন বলেও হিউয়েনসাং জানিয়েছেন।

হর্ষবর্ধনের ধর্মবিশ্বাস

সকল ধর্মের উপর শ্রদ্ধা

কনৌজের ধর্মসভা

ধর্মসভা শেষ হওয়ার পর হিউয়েনসাং হর্ষের আমন্ত্রণে প্রয়াগের বিখ্যাত মেলায় উপস্থিত হন। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও (অদৃশ্য) সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে প্রতি পাঁচ বৎসরে এক মেলা বসত। প্রায় পঁচাত্তর দিন ধরে এই মেলা চলত, বহু লক্ষ লোকের সেখানে সমাবেশ হত। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সাধুসন্ন্যাসীর দল এবং অন্যান্য ভিক্ষুকেরা রাজার কাছ থেকে

প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিকী মেলা

প্রচুর দান পেত। সবচেয়ে ধুম হত তিনদিন। হর্ষবর্ধন প্রথম দিন বুদ্ধের পূজা করতেন, দ্বিতীয় দিন শিবের ও তৃতীয় দিন সূর্যের অর্চনা করতেন। প্রতিদিনই বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও দীনদরিদ্রদের অকাতরে অর্থদান করা হত। শেষদিনে রাজকোষ নিঃশেষ করে হর্ষবর্ধন নিজের রাজবেশ ও সমস্ত অলঙ্কার পর্যন্ত বিতরণ করে দিতেন, একেবারে ভাণ্ডার উজাড় হওয়ার পর হর্ষ ও তাঁর ভগ্নী রাজ্যশ্রী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর বেশ পরিধান করতেন। অবশ্য রাজ্যের সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেলে শাসন বিকল হয়ে পড়ে, কিন্তু হিউয়েনসাং-এর বিবরণ থেকে মনে হয় যে অন্তত রাজার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতি পাঁচ বৎসরে এইভাবে বহুজনের মধ্যে বিতরিত হত। বিবরণে কিছু অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নয়; কিন্তু সন্দেহ নেই যে প্রকৃত আন্তরিকতা নিয়ে কর্তব্য পালন হিসাবেই হর্ষবর্ধন এই যে বদান্যতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, ইতিহাসে তার তুলনা দুর্লভ।

সর্বস্ব দানের তাৎপর্য

বহুগুণান্বিত ব্যক্তি

হর্ষবর্ধন যে বহুগুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন, সুকবি ছিলেন, হস্তাক্ষর তাঁর নিখুঁত ছিল। "রত্নাবলী", "নাগানন্দ" ও "প্রিয়দর্শিকা" এই তিনখানি নাটক তিনি স্বয়ং রচনা করেছিলেন বলা হয়। তিনি যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তার বহু পরিচয় রয়েছে। তাঁর রাজসভায় ছিলেন "কাদম্বরী" আখ্যানের প্রখ্যাত লেখক কবি বাণভট্ট। বাণভট্ট-কৃত "হর্ষচরিত" হর্ষবর্ধনের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যের আকর; প্রায় ঐতিহাসিক রচনা বলে যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান আমরা প্রাচীনকালে পাই, তার মধ্যে "হর্ষচরিত" অন্যতম। জ্ঞানের চর্চায় হর্ষবর্ধনের আগ্রহ কত বেশী জানাতে গিয়ে হিউয়েনসাং বলেছেন যে রাজকীয় ভূসম্পত্তি থেকে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হত। যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধ-ধর্ম ও অন্যান্য শাস্ত্র ও সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, হর্ষবর্ধনের অকৃপণ বদান্যতা বিনা তার অগ্রগতি অবশ্যই ব্যাহত হয়ে পড়ত।

'রত্নাবলী' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা

কবি বাণভট্ট

হর্ষচরিত

জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে দান

আনুমানিক ৬৪৬ কিংবা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করার পর হর্ষবর্ধনের মৃত্যু ঘটে। কোন উত্তরাধিকারী না রেখে যাওয়ায় গতানুগতিক ধারা অনুসারে দেখা গেল যে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল, আবার রাজনৈতিক জীবনে অন্ধকার নেমে এল। থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্যের শাসনভার যখন হর্ষের হাতে এসে পড়ে, তখন প্রবল সঙ্কট চলছিল, কিন্তু

হর্ষ-সাম্রাজ্যের অস্থায়িত্ব

কৃতিত্ব ও চরিত্র বিচার : উত্তর ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ রাজা

নিজের চেষ্টা ও প্রতিভার গুণে উত্তর ভারতে অন্তত তিনি এমন এক রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন যাতে বিজয়ী চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত হর্ষবর্ধনকেই "উত্তরাপথনাথ" বলে অভিহিত করতে কুণ্ঠিত হন নি। পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও তদানীন্তন কালে তিনিই যে উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন, এ বিষয়ে দ্বি-মত নেই। ব্যক্তিগত জীবনে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতি তাঁর মমতার কথা আমরা জানি; সামরিক নৈপুণ্য যে তাঁর ছিল, তা সুনিশ্চিত; শাসনব্যাপারে পরিশ্রমী ও বিবেকবান তিনি ছিলেন; ধর্মবিষয়ে ঔদার্য ও বদান্যতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চীন দেশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন তিনি করেছিলেন, রাজদূত বিনিময় ঘটেছিল; তদানীন্তন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে বিদেশে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। হর্ষবর্ধন যে স্বয়ং উচ্চস্তরের কবি ও নাট্যকার ছিলেন এবং বাণভট্ট, ময়ূর প্রভৃতি লেখকও নালন্দার মতো প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তা কিছু পূর্বেই বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের বহুমুখী কৃতিত্ব এবং চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য যে তাঁকে সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী করে রেখেছে, তা সর্বসম্মত।

বহুগুণের অধিকারী

চীনের সঙ্গে রাজদূত বিনিময়

হিউয়েনসাং

হর্ষ-রাজত্বের ঐতিহাসিক উপাদান

"সি-ইউ-কি"

হর্ষ সম্বন্ধে আমাদের তথ্য মিলেছে প্রধানত হিউয়েনসাং-এর পর্যটন বৃত্তান্ত এবং বাণভট্ট-কৃত "হর্ষচরিত" থেকে; মধুবন ও বাঁসখের তাম্রশাসন থেকেও কিছু সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে, হর্ষের স্বহস্তের স্বাক্ষর একটিতে খোদিত রয়েছে। চীনা পরিব্রাজকের গ্রন্থের নাম "সি-ইউ-কি", অর্থাৎ পশ্চিম জগতের বিবরণ; মনে রাখতে হবে যে তখন চীনের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষ ছিল পশ্চিম জগতে। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে ভারতবর্ষ অভিমুখে হিউয়েনসাং যখন যাত্রা করেন, তখন বয়স মাত্র উনত্রিশ হলেও বিরাট বিদ্বান বলে তাঁর খ্যাতি ছিল; বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মূল গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করলেন। তিনি দেখতে সুপুরুষ ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব অপরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখত, নির্ভীক এবং ধর্মবিশ্বাস ও চরিত্রগুণে তিনি যে অটল ছিলেন তা তাঁর গ্রন্থ থেকে পরিষ্কার-ভাবেই জানা যায়। চীন সাম্রাজ্যের সীমান্তে তখন বিক্ষোভ চলছিল বলে বিদেশযাত্রার অনুমতি তিনি পান নি; অতি সংগোপনে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করেন; প্রচণ্ড বাধাবিপত্তিতেও বিহ্বল হয়ে পড়েন নি।

হিউয়েনসাং-এর পরিচয়

ভারতের পথে হিউয়েনসাং

একবার মরুভূমিতে পথ হারিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের কাছে প্রার্থনার ফলে জীবন ফিরে পান বলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল; প্রার্থনা শেষ করার পর মৃতপ্রায় ঘোড়া যেন চাঙা হয়ে উঠে হঠাৎ এক মরূদ্যানের রাস্তা খুঁজে পায়।

ভারতবর্ষে তিনি যে আন্তরিক আতিথেয়তা পেয়েছিলেন, তার বর্ণনা

কাশ্মীরে হিউয়েনসাং-এর অভ্যর্থনা

তিনি করেছেন। কাশ্মীরে তাঁকে খুব সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করা হয়; সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের সমস্ত সুযোগ তিনি পান; বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির নকল তিনি নিয়ে যেতে চান বলে রাজা নাকি কুড়িজন লোককে পুঁথি নকল করার কাজে লাগিয়ে দেন। যাই হোক, পরিব্রাজকের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল নালন্দার বিশ্রুতকীর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা। ইতিমধ্যে তাঁর

নালন্দায় অভ্যর্থনা

বিদ্যা ও ধর্মনিষ্ঠার খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল; কথিত আছে যে নালন্দায় উপনীত হওয়ার পূর্বে দুইশত ভিক্ষু অন্য বহুজনকে নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন; পত্রপুষ্প, ধূপধুনা, ছাতা ইত্যাদি নিয়ে শোভাযাত্রা হয়েছিল। নালন্দায় হিউয়েনসাং পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন।

ভারতে অবস্থিতিকাল

উত্তর ভারতের বহু স্থানে এবং নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ বৎসর (৬৩০-৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) এদেশে তাঁর কাটে।

তখন ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতই প্রচলিত ছিল, কিন্তু

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য

কিছুকাল থেকেই যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই। হিউয়েনসাং লিখেছেন যে বিদেশীর চোখে তখন ভারতবর্ষ

শিক্ষিতের মধ্যে সংস্কৃতের প্রচলন

ব্রাহ্মণের দেশ বলে পরিগণিত ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারে তখন উৎসাহী; বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাও সংস্কৃতে বিদ্বান ছিলেন,

পরধর্ম সহিষ্ণুতা

সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। অবশ্য পরিব্রাজক দেখেন যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ নেই, এক সম্প্রদায় অপরকে উৎপীড়ন

"মধ্যদেশ"-এর প্রশংসা

করে না। "মধ্যদেশ" সম্বন্ধে হিউয়েনসাং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, সেখানকার লোক মার্জিত, সংস্কৃতিবান, শিক্ষা ও সংযম গুণের অধিকারী। বৌদ্ধধর্ম পূর্বে যে প্রসার ও মর্যাদা পেয়েছিল, তা হ্রাস পেয়ে থাকলেও হিউয়েনসাং যা দেখেন, তাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ ঘটে নি।

বৌদ্ধধর্মের আঞ্চলিক বিদ্যমানতা

কাশ্মীর, জলন্ধর, কান্যকুব্জ, বৈশালী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিতকে তিনি দেখেন; ধর্ম ও বিদ্যার চর্চা নিয়ে এভাবে যে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রভৃতিকে তিনি ব্যাপৃত থাকতে লক্ষ্য করেন, তাদের সংখ্যা তিনি অনুমান করেন দুই লক্ষ, বৌদ্ধ মঠই তিনি গণনা করেছিলেন প্রায় পাঁচ

হাজার। ইতিহাসখ্যাত পাটলিপুত্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ তিনি দেখেন; শ্রাবস্তী প্রভৃতি বৌদ্ধযুগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান তখন প্রায় জনশূন্য, ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ; বহু আক্রমণ ও রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলার ফলেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। বারাণসীতে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন; সেখানে তখন বহুজনের বাস, হিন্দু মন্দির অসংখ্য, কিন্তু হিন্দু প্রাধান্য সত্ত্বেও বৌদ্ধ মঠ এবং ভিক্ষুদের যে দেখা যেত না, তা নয়। *কতিপয় তীর্থস্থানের দুরবস্থা*

হিউয়েনসাং তাঁর গ্রন্থে এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন; তিনি ১৩৮টি ভারতীয় রাজ্যের নাম করেছেন; অবশ্য সবচেয়ে বৃহৎ ছিল উত্তরে হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য। হর্ষের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার অনেক মনোগ্রাহী বর্ণনা আছে; কামরূপের কুমারবর্মনের মতো বহু রাজা যে তাঁর বশ্যতা মানতেন, তা আমরা শুনেছি। বিদ্বানদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য জমি দান করার রীতি তখন ছিল। কৃষিকর্মের অবস্থা ভালো ছিল; ধান, গম প্রভৃতি উৎপন্ন হত, প্রয়োজন হলে রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে কৃষকরা চাষবাস সম্পর্কে সাহায্য পেত। নানারকম ফলের উল্লেখ চীনা পর্যটকের বর্ণনায় আছে। শহর সম্পর্কে আগে বলা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলেও ঘন বসতি ছিল। পথঘাট তেমন নিরাপদ ছিল না, চোর-ডাকাতের উপদ্রবের কথা তিনি বলেছেন, দণ্ডবিধিও গুপ্তদিগের তুলনায় কঠোর ছিল। কিন্তু মন্দ লোকের সংখ্যা যে বেশী নয়, তাও হিউয়েনসাং বলেছেন; দেশের সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয় ও নীতিপরায়ণ বলে তাঁর মনে হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য তখন বেশ উন্নত ছিল; মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সমুদ্রপথে পশ্চিম জগতের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। পূর্বে বাংলায় তাম্রলিপ্তি (তমলুক) ছিল প্রধান বন্দর; চীন ও পূর্বাভিমুখে যেতে হলে সেখান থেকে জাহাজে রওনা হতে হত। *ভারতের রাজা ও রাজ্য* *কৃষিজাত দ্রব্য* *পল্লীর অবস্থা* *সাধারণ মানুষ* *ব্যবসা-বাণিজ্য*

শুধু উত্তর ভারত নয়, দক্ষিণাপথ সম্বন্ধেও হিউয়েনসাং-এর বহু চিত্তাকর্ষক বক্তব্য রয়েছে। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে গিয়েছিলেন; চালুক্যরাজের চরিত্র ও পরাক্রমের তিনি প্রশংসা করেন, তাঁর সুবিবেচনা ও হৃদয়বত্তার কথাও বলেছেন। পুলকেশীর সাম্রাজ্য ছিল বহুবিস্তৃত; পশ্চিমে মালব ও গুজরাট এবং দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য ও পল্লব রাজা নাকি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। চালুক্য রাজধানীর আকার ও সমৃদ্ধি তাঁকে মুগ্ধ করে। সেখানকার যোদ্ধাদের *চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী* *পুলকেশীর সাম্রাজ্যের আয়তন*

চালুক্য রাজ্য সম্পর্কে নানা কথা

দুর্ধর্ষ খ্যাতি তিনি শুনেছিলেন ; যুদ্ধকালে নাকি হাতীদের মদ্যপান করিয়ে দিয়ে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা হত যে তাদের সামনে শত্রু দাঁড়াতে পারত না। চালুক্য রাজ্যের অধিবাসীদের সম্পর্কে চীনা পরিব্রাজকের ধারণা হয় যে তারা যেমন সহজে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, তেমনই আবার রাগ পড়ে গেলে ক্ষমা করতেও জানে। কোন সেনাপতি যুদ্ধে পরাজিত হলে নাকি স্ত্রীবেশ পরিয়ে দিয়ে অপমান করা হত, অন্য কোন দণ্ড দেওয়া হত না। যাই হোক, চালুক্য রাজ্যে শিল্পচর্চা যে বেশ হত, সেকথাও তিনি বলেছেন ; রাজবংশের উৎসাহে ও আনুকূল্যে শিল্পসৌষ্ঠবে অতুলন বাদামির প্রসিদ্ধ গুহামন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল।

কাঞ্চীর খ্যাতি

ইতিহাসখ্যাত কাঞ্চী নগরী ছিল পল্লভরাজ নরসিংহবর্মার রাজধানী ; এই কাঞ্চীকে উত্তরে কাশীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, দক্ষিণ ভারতের ধর্ম ও শিল্পসম্পদের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল কাঞ্চী। চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও প্রস্তর-স্থাপত্যে এই পল্লভবংশের কীর্তি অবিস্মরণীয় ; দক্ষিণ ভারতের জগদ্বিখ্যাত মন্দির নির্মাণের প্রধান রীতিকে পল্লভ শাসনের অবদান বললে ভুল হয় না, মহাবলীপুরমে সমুদ্রতীরে যে মন্দির ও সপ্তরথ ও অন্যান্য শিল্প পরিচয় আছে তা নিয়ে ভারতবর্ষের আজও গর্বের অবধি নেই। হিউয়েনসাং তদানীন্তন কাঞ্চী রাজ্যের প্রভূত প্রশংসা করে গিয়েছেন।

কাঞ্চীর প্রস্তরশিল্প

মহাবলীপুরম্

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

হিউয়েনসাং-এর গ্রন্থ থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা অমূল্য। তখন নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশহাজার ; দেশদেশান্তর থেকে জ্ঞানানুসন্ধিৎসুর দল সেখানে সমবেত হত। বহু যশস্বী বৌদ্ধ আচার্য অধ্যাপনার ভার নিয়েছিলেন ; তাঁদের পাণ্ডিত্য ও মনীষার খ্যাতি দিগ্‌বিদিকে বিস্তৃত হয়েছিল ; আর চীন, তাতার, কোরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় অঞ্চল প্রভৃতি দূরদেশ থেকে ছাত্রেরা তাই আকৃষ্ট হয়ে সেখানে আসত। ছাত্রাবস্থায় কারও কোন অর্থব্যয়ের কথা উঠত না ; ছাত্রদের ভরণপোষণের ভার নাকি ন্যস্ত ছিল ছয়জন রাজা এবং অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের হাতে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পক্ষ থেকে নালন্দায় খননকার্য সুন্দরভাবে চলার ফলে সেখানকার ধ্বংসাবশেষ আমরা দেখতে পাই, আর দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। একটি বড় গ্রাম জুড়ে যে এলাকায় খননকার্য হয়েছে, সেখানে নালন্দার মঠ এবং মহাবিদ্যায়তনের বহু পুরাতন

নালন্দার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

গৃহ আবিষ্কৃত হয়েছে ; পূর্বে যে মঠের ছয়তলা বাড়ি ছিল বলে জানা যায়, তার তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়ি এখনও অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। অনেক স্তূপ সেখানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে আর মূর্তি ও ছোটখাট ভাস্কর্যের সংখ্যা গুণে শেষ করা শক্ত। তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনের ধ্বংসাবশেষ দেখেও মন অভিভূত হয়ে পড়ে। হিউয়েনসাং লেখেন যে উপরকার ঘরগুলি ছিল আকাশচুম্বী আর মানমন্দিরের গম্বুজ যেন মেঘের মধ্যে হারিয়ে যেত।

নালন্দার গ্রন্থাগার

নালন্দায় গ্রন্থাগার ছিল বিরাট ; রত্নোদধি, রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক—তিব্বতী বৃত্তান্তে তিন গ্রন্থালয়ের এই নাম রয়েছে। পুঁথির সংগ্রহ দেখে হিউয়েনসাং-এর ন্যায় বিদ্বান চমৎকৃত হয়েছিলেন। পুঁথি পড়ার ঘর, অধ্যাপনা শোনার ঘর, ছাত্রদের থাকার জন্য প্রকাণ্ড দালান-ঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা বাস্তবিকই সুন্দর ছিল। নালন্দার প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদের নাম আমরা কিছু কিছু জানি ; ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, স্থিরমতি, গুণমতি প্রমুখ পণ্ডিত শুধু মনীষা নয়, চরিত্র-মাহাত্ম্য জন্যও বিখ্যাত। হিউয়েনসাং-এর সময়ে প্রধান আচার্য ছিলেন মহাজ্ঞানী শীলভদ্র ; পূর্ব ভারতের অধিবাসী তিনি ছিলেন, তাঁকে বাঙালী বলেও কোন কোন গবেষক স্থির করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন নালন্দায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও অন্যান্য বহু বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। অক্ষর পরিচয় ও ব্যাকরণকে সাধারণভাবে আয়ত্ত করে গদ্য ও পদ্য রচনায় ভাষাজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করা হত, তারপর আরম্ভ হত "বিদ্যা" অর্থাৎ বিশেষ কোন বিষয়ে গভীরভাবে জ্ঞানের চর্চা। হিউয়েনসাং লিখেছেন যে প্রধান পাঁচটি বিষয় ছিল শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব), হেতুবিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র), অধ্যাত্মবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও শিল্পস্থানবিদ্যা। সহজে যে নালন্দায় প্রবেশাধিকার মিলত, তা নয় ; সেখানে থাকতেন "দ্বারপণ্ডিত", যাঁদের কাজ ছিল শিক্ষার্থী এলে প্রশ্ন করে সমুচিত পরীক্ষা নিয়ে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া। এ থেকে মনে হয় যে নিশ্চয়ই তখন বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে সমাজে এমন আগ্রহ ছিল যে বহু ছাত্র নালন্দায় প্রবেশ করার জন্য প্রতিযোগিতায় নামত, যারা সবচেয়ে যোগ্য তাদেরই বাছাই করে নেওয়া হত। প্রশ্নোত্তর, তর্ক, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সেখানে ছিল।

অধ্যাপকমণ্ডলী

শিক্ষিতব্য বিষয়

নালন্দায় পাঠেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন

ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বহু পূর্ব থেকে আমরা দেখেছি ; তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতির কথা সহজে স্মরণ হবে। নালন্দার জন্ম পঞ্চম শতাব্দীতে,

নালন্দার শ্রেষ্ঠত্ব

পরবর্তী যুগে দক্ষিণে কাঞ্চী, পশ্চিমে বলভী, পূর্বে বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতির কথা আমরা জানি। কিন্তু নালন্দার গৌরব যেন সর্বশীর্ষে। সর্বভারতের মনীষা যেন সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল; বসুবন্ধু, আসঙ্গ, নাগার্জুন-প্রমুখ আচার্য যে পরম্পরার সূত্রপাত ঘটান, তারই বিকাশ দেখা গেল নালন্দাতে। শীলভদ্র ছিলেন পূর্বভারতীয়; তাঁর পুরোগামী আচার্য ধর্মপাল এসেছিলেন দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী থেকে, জিনমিত্র নামে আর এক বিখ্যাত অধ্যাপক আসেন আন্ধ্র হতে। চীনের হিউয়েনসাং ও ইৎসিং, কোরিয়ার হুই-নিয়ে (এখানে নামকরণ হয় আর্যবর্মন) প্রভৃতি বিদেশী বিদ্বান নালন্দায় এসেছিলেন। তিব্বত এবং চীনে যে নালন্দার বহু পণ্ডিত গিয়েছিলেন, তার বিবরণ আছে উভয় দেশের গ্রন্থাদিতে। যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলেও নালন্দার জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ হয়েছিল, "দ্বীপান্তর ভারতে" শ্রীবিজয় রাজ্যের পক্ষ থেকে নালন্দায় বহু অর্থ প্রদত্ত হয়েছিল। নালন্দার জ্ঞানতীর্থে আমরা দেখলাম ভারতবর্ষের সমন্বয়-প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন; বৌদ্ধশাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মচিন্তার মধ্যে যেন এক যোগসূত্র সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল। সংস্কৃতে বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা হতে থাকল, আচার্য দিঙ্‌নাগ যে ধারার প্রবর্তন করেন তা ক্রমশ যোগাচার, মাধ্যমিকা প্রভৃতি চিন্তার মধ্যে প্রকাশ পেল, শাক্যমুনির শিক্ষা অস্বীকৃত না হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহুবিচিত্র ধারার মধ্যেই মর্যাদার স্থান পেল।

সর্বভারতের মনীষী-সমাবেশ

বহির্ভারতে খ্যাতি-বিস্তার

ভারতের সমন্বয়-প্রতিভার বিকাশ

কনৌজ, কাশ্মীর ও গুর্জর-প্রতীহার সাম্রাজ্য

কনৌজ

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যেরও আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল। তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল বলে জানা নেই; কন্যার বিবাহ হয়েছিল বলভীর মৈত্রকবংশীয় রাজা ধ্রুবসেনের সঙ্গে। সম্ভবত হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র, অর্থাৎ ধ্রুবসেনের পুত্র, চতুর্থ ধরাসেন "পরমভট্টারক মহা-রাজাধিরাজ পরমেশ্বর চক্রবর্তী" উপাধি নিয়ে নিজেকে অন্তত পশ্চিম অঞ্চলে মাতামহের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনে করেছিলেন। এদিকে কনৌজে অর্জুন বা অরুণাশ্ব বলে হর্ষবর্ধনের এক মন্ত্রী ক্ষমতা দখল করে বসেন। কথিত আছে যে চীন সম্রাটের এক প্রতিনিধি উত্তর বিহারে অবস্থিত ত্রিহুতের প্রধান রাজপুরুষের হাতে অপমানিত হওয়ায়, তিব্বত আর নেপালের সাহায্য নিয়ে এবং কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সমর্থনে চীনারা যুদ্ধে জয়লাভ করে; স্বয়ং অর্জুনকে নাকি চীন দেশে ধরে নিয়ে যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্ এই ঘটনার মধ্যে ভারতে চীনা আক্রমণের পরিচয় খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু বাস্তবিকই তা হল কষ্টকল্পনা। সীমান্তের নিকটে এরূপ এক ঘটনার কোন গভীর গুরুত্ব নেই; তবে তখন যে হর্ষবর্ধনের অনুপস্থিতিতে অনিশ্চিত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তা মনে রাখতে হবে।

হর্ষবর্ধনের উত্তরাধিকারী

ভারতে চীনা আক্রমণ?

মন্তব্য

আনুমানিক ৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যদেশে আদিত্যসেন নামে এক শক্তিশালী রাজার সন্ধান গবেষকরা পেয়েছেন। তিনি ছিলেন হর্ষের মিত্র মাধবগুপ্তের পুত্র; শোনা যায় তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, মৌখরী রাজবংশ এবং নেপাল ও কামরূপের রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত নামে এঁর পরবর্তী তিন রাজার উল্লেখ দেখা যায়। এঁদের বিষয়ে বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই; গৌড়শক্তিকে বিলুপ্ত করার যে দাবি দেখা যায়, তার চেয়ে গৌড় রাজ্যের শক্তিবিস্তারে এঁদের ক্ষমতা

আদিত্যসেনের অশ্বমেধ যজ্ঞ

গৌড় জয়ের দাবির ভিত্তিহীনতা

নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে। গৌড়-বিষয়ে আলোচনা এখানে না করে পরে করা যাবে।

যশোবর্মন

যশোবর্মন নামে এক পরাক্রান্ত রাজা যেন অন্ধকারকে অপসৃত করে কনৌজের পটভূমিকায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সম্ভবত ৭০০ থেকে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যশোবর্মন রাজ্য করেছিলেন। প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ "গৌড়বহো" থেকে এ বিষয়ে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। যশোবর্মন গৌড় রাজ্যের অধিকৃত মগধ জয় করেন, বাংলা দেশও সম্ভবত তাঁর কর্তৃত্বে আসে। দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রলুব্ধ হয়ে তিনি নর্মদা নদীতীর পর্যন্ত অভিযান করে গিয়েছিলেন, কিন্তু মনে হয় চালুক্যরাজ নিলয়াদিত্যের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে, প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি রাজস্থানের মরুভূমি অতিক্রম করে থানেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চল দিয়ে এসেছিলেন। সম্ভবত দাক্ষিণাত্যে পরাজয় সত্ত্বেও তাঁর পরাক্রমের খ্যাতি এভাবেই ব্যাপ্ত হয়েছিল। কাশ্মীরের শক্তিমান রাজা ললিতাদিত্যের সঙ্গে কিছুকাল তিনি সখ্যস্থাপন করেছিলেন। চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল; ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে তিনি দূত প্রেরণ করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে যশোবর্মন সম্ভবত চীন ও কাশ্মীরের সমর্থন পেয়ে আরব ও তিব্বতীদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। "গৌড়বহো" গ্রন্থে পারসীকদের বিরুদ্ধে যশোবর্মনের সফল সংগ্রামের কথা আছে; সম্ভবত এখানে আরবদের সঙ্গে যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে। যাই হোক, ললিতাদিত্যের সঙ্গে যশোবর্মনের মৈত্রী স্থায়ী হয় নি; উভয়ের মধ্যে যে সঙ্ঘর্ষ ঘটে, তাতে যশোবর্মন সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হন। যশোবর্মনকে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতো ঐতিহাসিক হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তুলনীয় বলেছেন, কিন্তু যশোবর্মন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অল্প বলে তুলনাকে বেশী দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছুদিন কনৌজের রাজশক্তি উত্তর ভারতের ইতিহাসকে আলোকিত করলেও যশোবর্মনের কৃতিত্ব ছিল একান্ত ক্ষণস্থায়ী। তাঁর যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে রাজসভায় মহাকবি ভবভূতি এবং প্রাকৃত "গৌড়বহো" কাব্যের বিখ্যাত রচয়িতা বাক্‌পতিরাজের ন্যায় স্মরণীয় ব্যক্তির উপস্থিতির জন্যই যশোবর্মনকে ইতিহাস সহজে বিস্মৃত হবে না।

রাজ্যকাল

"গৌড়বহো" কাব্য

মগধ জয়

দাক্ষিণাত্যে পরাভব

চীন দেশে দূত প্রেরণ

আরব-প্রতিরোধ

ললিতাদিত্যের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ

ভবভূতি ও বাক্‌পতিরাজ

কাশ্মীর

কাশ্মীর অশোক এবং কণিষ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল নিশ্চয়ই, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যেরও অন্তর্গত ছিল বলে কোন কোন গবেষক মনে করেন, কিন্তু স্বয়ং

হিউয়েনসাং যা লিখে গেছেন, তা থেকে ধারণা হয় যে তাঁর পর্যটনকালে কার্কট বংশের দুর্লভবর্ধন সেখানে স্বাধীন নরপতিরূপে শাসন পরিচালনা করছিলেন। চীনের সঙ্গে এই রাজ্যের হয়তো একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। দুর্লভবর্ধনের পৌত্র চন্দ্রাপীড় এবং ললিতাদিত্য (মুক্তাপীড়) উভয়েই রাজাসনে বসার সময় চীন সম্রাটের কাছ থেকে "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন বলে কথিত আছে। চন্দ্রাপীড় শক্তিশালী শাসক ছিলেন, সন্দেহ নেই। আনুমানিক ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা কাশ্মীর আক্রমণ করলে চীনের কাছে সাহায্য তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সাহায্য না আসা সত্ত্বেও আরবদের পরাক্রান্ত নায়ক মুহম্মদ বিন্ কাসিমের আক্রমণ প্রতিহত করেন। শাসকরূপে তাঁর সততা, ন্যায়বোধ ও সুবিবেচনার বহু পরিচয় পাওয়া যায়।

কার্কট বংশীয় রাজা দুর্লভবর্ধন

চন্দ্রাপীড়

আরব-আক্রমণ প্রতিরোধ

কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলে খ্যাতি পেয়েছেন ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়; কহ্লনের "রাজতরঙ্গিণী" থেকে তাঁর সম্বন্ধে আমরা যে সংবাদ পাই, স্তুতির অংশ বাদ দিলে তা বেশ মূল্যবান। কিছুকাল যখন যশোবর্মনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা ছিল, তখন একত্রে আরব ও তিব্বতীদের অগ্রগতি প্রতিহত করার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই বন্ধুতা ভেঙে যাওয়ার পর ললিতাদিত্য যশোবর্মনকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, কনৌজ অধিকারও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তারপর তাঁর বিজয় অভিযান এগিয়ে চলেছিল; শোনা যায় বাংলা দেশে পর্যন্ত গিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন, গৌড়ের এক রাজাকে হত্যা করেছিলেন। কম্বোজ, তুর্কী, দর্দ্ এবং তিব্বতীদের বিরুদ্ধে ললিতাদিত্যের বিজয়কাহিনী বিবৃত হয়েছে। মগধ, কামরূপ, কলিঙ্গ, গুজরাট প্রভৃতি দূরবিস্তীর্ণ অঞ্চল তিনি জয় করেছিলেন শোনা যায়। কোন কোন পণ্ডিত এমন কথাও বলেছেন যে অন্তত সাময়িকভাবে ললিতাদিত্য যে বিপুল ভূখণ্ডে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন, তা দেখে মনে হয় গুপ্তযুগের পর এত বৃহৎ এক সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে দেখা যায় নি। ললিতাদিত্যের এই কীর্তি স্থায়ী হয় নি, কিন্তু অন্তত বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দিরের নির্মাতা হিসাবে তাঁর স্মৃতি সহজে ম্লান হবে না।

ললিতাদিত্য

সামরিককৃতিত্ব ও রাজ্য জয়

রাজ্যের বিস্তার

বোধ হয় ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য গৌড় এবং কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ললিতাদিত্যের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য যে একেবারেই স্থায়ী হয় নি, তার প্রমাণও এ থেকে মিলছে। জয়াপীড় রাজসভায় ক্ষীরস্বামিন্, উদ্ভট, দামোদরগুপ্ত, বামন

জয়াপীড় বিনয়াদিত্য

কিংবদন্তীর তাৎপর্য

প্রকৃত অর্থ উদ্‌ঘাটন করে বলা হয়েছে যে "অগ্নিকুলোদ্ভব" এক বিশেষণ মাত্র ; এর তাৎপর্য হল যে সম্ভবত অগ্নিশুদ্ধি দ্বারা বর্ণবহির্ভূত বিদেশীকে উচ্চবর্ণের হিন্দুর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল। রাজপুতানা ও দক্ষিণ পঞ্জাবের শক, হূন প্রভৃতিরা হয়তো এইভাবে হিন্দুর সমাজে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করে। আবার যারা ছিল শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভূত, তারা ক্ষত্রিয় আখ্যা নিল, নিজেদের সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় ঘোষণা করে জাতি-গৌরব প্রকাশের চেষ্টা করল। সাধারণ গুর্জর বা জাট যারা, তারা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরেই থাকতে বাধ্য হল ; অভিজাতদের উপরে তুলে তাদের নীচেই রাখা হয়েছিল। সম্ভবত মধ্য ভারতের আদিবাসীদের মধ্য থেকেও অনেকে ক্রমে রাজপুত বলে গণ্য হয়। যাদেরই প্রধান বৃত্তি হল যুদ্ধ, তারা বিভিন্ন উপজাতি, গোষ্ঠী থেকে এসেও মোটামুটি ক্ষত্রিয় বলে পরিগণিত হতে পারল, রাজপুত বলে অভিহিত হল। ভারতের ইতিবৃত্তে যাদের বিচিত্র বীর্যকাহিনী কীর্তিত হয়েছে, তাদের উৎপত্তি বিষয়ে এই সমস্ত তথ্য বিভিন্ন প্রকৃতি ও পর্যায়ের মানুষকে হিন্দুর সমাজদেহে আত্মস্থ করে নেওয়ার যে বৈশিষ্ট্য, তার পরিচয় বহন করছে।

রাজপুত জাতি ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজপুতদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভিন্‌সেন্ট স্মিথের অভিমত হল এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটাকে রাজপুত যুগ বলা চলে। একথা পুরাপুরি স্বীকার করে নেওয়া একটু কঠিন। কাশ্মীর, কামরূপ, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত স্বাধীন রাজ্য দেখা যায়, তাদের প্রতিষ্ঠা রাজপুতরা করে নি। নবম শতাব্দীর পূর্বে উত্তর ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নগর কনৌজ গুর্জর-প্রতীহার বংশের অধিকারে আসে নি ; একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে মুসলমান আক্রমণে কনৌজের পতন ঘটার পূর্ব পর্যন্ত প্রতীহার শক্তি উত্তর ভারতে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিল। রাজপুত শাসনে যে সামন্ত-ব্যবস্থামূলক সমাজ ভারতবর্ষে প্রথম স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়, তা একাদশ শতাব্দীর পূর্বে নয়, পরে। যাই হোক, এই গুর্জর-প্রতীহার সাম্রাজ্যের দিকে এবার লক্ষ্য দিতে হবে।

হর্ষোত্তর যুগ কি রাজপুত যুগ ?

ভিন্‌সেন্ট স্মিথের অভিমত বিচার

ষষ্ঠ শতাব্দীর কোন্ সময়ে গুর্জরগণ এদেশে আসে, বর্তমান রাজস্থানের দক্ষিণে, গুজরাটের সন্নিকটে, তারা যে রাজ্য স্থাপন করে, তা হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। হিউয়েনসাং-এর কথা থেকে মনে হয় যে 'পি-লো-মো-লো' (এখনকার ভিন্‌মাল) ছিল তার রাজধানী। তখনই রাজবংশ ক্ষত্রিয়

ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুর্জরদের ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা

বলে স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিল। তারপর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে নূতন এক গুর্জর-প্রতীহার বংশ স্থাপন করেন প্রথম নাগভট। যে আরব আক্রমণকারীরা তখন সিন্ধুদেশ হতে রাজপুতানা এবং ক্রমশ উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হয়, সম্ভবত প্রথম নাগভট তাদের পরাজিত করেছিলেন। চতুর্থ নরপতি বৎসরাজের বীর যোদ্ধা বলে খ্যাতি ছিল; গুর্জর-প্রতীহারদের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাকে একত্র সংগঠিত করে রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়।

গুর্জর-প্রতীহার বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম নাগভট

বৎসরাজ

বৎসরাজের পর আসেন দ্বিতীয় নাগভট। ইতিহাসে ইনি যশস্বী হয়ে আছেন। কথিত আছে যে উত্তরে সিন্ধু থেকে দক্ষিণে আন্ধ্র এবং পশ্চিমে গুজরাটের কাথিয়াওয়াড়ে অবস্থিত আনর্ত থেকে পূর্বে কলিঙ্গ পর্যন্ত তাঁর শাসন বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলার বিখ্যাত রাজা ধর্মপালের কীর্তি যখন তুঙ্গে আরোহণ করেছে, তখন তাঁরই বাহিনীকে পরাস্ত করে তাঁর আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজের রাজাসন থেকে সরিয়ে দ্বিতীয় নাগভট কনৌজে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন ভারতে কনৌজের মর্যাদা ছিল অনন্য; ইয়োরোপে যেমন রোম বা কন্স্টান্টিনোপল শহরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল শক্তির মানদণ্ড, তেমনই এদেশে তখন ছিল কনৌজের স্থান। কনৌজের এই জয়লাভ হল দ্বিতীয় নাগভটের শেষ কীর্তি; রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ চলার পর তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। গুর্জর-প্রতীহার, রাষ্ট্রকূট এবং পাল, এই তিন রাজবংশের ত্রিকোণী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৎকালীন ইতিহাসের এক স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় নাগভট

শাসন-বিস্তার

ধর্মপালের পরাজয়

কনৌজের মর্যাদা

ত্রিকোণী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নাগভটের পরাজয়

নাগভটের পুত্র রামভদ্র বৎসর দুয়েক রাজ্য করার পর পৌত্র মিহিরভোজ (প্রথম ভোজ) সিংহাসনে বসেন (৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)। কনৌজে প্রতীহার বংশের রাজধানী তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর মিহিরভোজের রাজ্যকাল; সাম্রাজ্যের গৌরব ও শক্তি তখন শিখরে আরোহণ করেছিল, প্রতীহার বংশে তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি তা নিঃসন্দিগ্ধ। কথিত আছে যে হিমালয় থেকে নর্মদা এবং শতদ্রু নদী থেকে উত্তরবঙ্গে অবস্থিত পাহাড়পুর পর্যন্ত ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের প্রসার। স্বভাবতই তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ এবং বাংলার পালরাজ; আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন জেজক্-ভুক্তির উদীয়মান চান্দেল্ল বংশ। মুঙ্গেরের কাছে পালরাজ্যের সৈন্য-বাহিনীকে

প্রতীহার-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মিহিরভোজ

সাম্রাজ্যের বিস্তার

পালরাজ ও চান্দেল্লরাজের পরাজয়

মিহিরভোজ পরাস্ত করেন বলে কথিত আছে ; চান্দেল্ল-রাজকেও পরাজয় মানতে হয়েছিল। কেবল রাষ্ট্রকূটরাজের বিরুদ্ধে তিনি সাফল্য অর্জনে অসমর্থ হন। যাই হোক উত্তর ভারতের ইতিহাসে রাজপুত প্রাধান্যের প্রবর্তন তিনি করেছিলেন বলা চলে। আরব সওদাগর স্থলেমান ভোজের রাজ্যকালে এখানে ভ্রমণ সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিখেছিলেন, তাতে দেখা যায় যে দেশে শান্তি রক্ষার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল ; সম্পদের প্রাচুর্য ছিল খুব ; সৈন্যদলে অশ্বারোহীদের অসামান্য নৈপুণ্য দেখা যেত। "আদিবরাহ" ও "প্রভাস" প্রভৃতি আখ্যা মিহিরভোজ পরিগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন বলে কথিত আছে। তৎকালীন বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে ; তা থেকে মনে হয় যে তখন হিন্দুসংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মিহিরভোজ। দীর্ঘকাল ধরে বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করে তিনি ইতিহাস ও কিংবদন্তী উভয়ক্ষেত্রেই বিশ্রুতকীর্তি হয়ে রয়েছেন।

উত্তর ভারতে রাজপুত প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠাতা

আরব স্থলেমানের বৃত্তান্ত

ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

মিহিরভোজ যে যুগে রাজত্ব করেন, তখন পূর্ব ভারত ও মগধে ছিল ধর্মপালপুত্র দেবপালের সাম্রাজ্য। বিন্ধ্য অঞ্চলের আধিপত্য ছিল রাষ্ট্রকূট-বংশের হাতে, যারা পরে মালব থেকে তাঞ্জোর পর্যন্ত রাজ্য স্থাপন করে, ইলোরার জগদ্বিখ্যাত কৈলাস মন্দির যাদের কীর্তি, যাদের সম্বন্ধে বলা যায় যে সাতবাহনদের পর থেকে তাদের রাজ্যের উৎপত্তি আর চালুক্য শক্তি দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিস্তৃতি। যে এলাকাকে মোটামুটি হিন্দুস্থান বলা হয়ে থাকে সেখানে ছিল গুর্জর-প্রতীহারদের প্রাধান্য। তাঁর সমকালীন রাষ্ট্রকূট নরপতি অমোঘবর্ষ বহুগুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। বংশের গৌরব তিনি বৃদ্ধি করেন, ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী ভূভাগে তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিহিরভোজ এই রাষ্ট্রকূটরাজের বিরুদ্ধে বিজয়ী না হলেও তাঁর শক্তি যাতে আরও বৃদ্ধি না পায়, তার ব্যবস্থায় সমর্থ হয়েছিলেন। কয়েকবার যুদ্ধ করে শক্তিমান দেবপালকে কিছু পরিমাণে দুর্বল করে দেওয়া হল মিহিরভোজের রাজ্যকালের এক প্রধান কৃতিত্ব। গুর্জর-প্রতীহার বংশের কর্তৃত্ব উত্তর ভারতের দূরপরিব্যাপ্ত অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠ ছিল বলে সিন্ধুদেশের মুসলিম শাসকরা তখন ক্ষমতা বিস্তারের পরিকল্পনা করেও সাফল্য লাভ করতে পারে নি। ভোজের মৃত্যুকালে তাই দেখা যায় যে সেই অঞ্চলে মুসলমানদের মাত্র দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য রয়েছে, হিন্দুস্থানের যে বিপদ আসন্ন হওয়ার উপক্রম করেছিল তা অপসৃত হয়েছে।

মিহিরভোজের কার্য বিচার ঃ

দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটদের প্রাধান্য বিস্তারে বাধাদান

বাংলার দেবপালের শক্তির খর্বতা সাধন

মুসলিম প্রসারে সফল প্রতিরোধ

মিহিরভোজের পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন কবি রাজশেখর। পূর্বে ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করে তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এর পর রাজা হন দ্বিতীয় ভোজ ; কিন্তু অচিরে নিজের ভাই মহীপালের হাতে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। মহীপালের শাসনকালে আরব পর্যটক মাসুদি এসে রাজার সৈন্যদলের শক্তির বিশেষত উষ্ট্রবাহিনীর উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রকূট নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দ মহীপালকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে খাস কনৌজ শহর দখল করেন, প্রয়াগে গিয়ে মহীপালকে আশ্রয় নিতে হয়। এই ঘটনা সম্বন্ধে রাজশেখর ও ক্ষেমীশ্বর বিপরীত বিবরণ দিলেও তা নির্ভরযোগ্য নয়। সম্ভবত চান্দেল্লরাজের সাহায্যে মহীপাল আবার কোনক্রমে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। কিন্তু এই সময় থেকে বিশাল গুর্জর-শক্তি ক্রমশ হীনবল হতে থাকে। দেবপাল, রাজ্যপাল প্রমুখ কয়েকজন কোন মতে রাজ্য বজায় রাখতে পারেন, কিন্তু তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাজ্য বহুধা বিভক্ত হয়ে যেতে বিলম্ব নেই। দশম শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে গুর্জর-প্রতীহার রাজ্যের যে অধঃপতন আরম্ভ হয়ে যায়, তা একাদশ শতাব্দীতে যেন পূর্ণ হয়ে গেল। তখন ধারা বা মালবের পরমার রাজ্য, জেজকভুক্তির (বুন্দেলখণ্ড) চান্দেল্ল রাজ্য, মধ্য ভারতের চেদি রাজ্য, কনৌজের গহড়ওয়াল বা রাঠোর রাজ্য, আজমীরের চহমান বা চৌহান রাজ্য এবং গুজরাটের চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি রাজ্য প্রতীহার শক্তির উত্তরাধিকারী হয়ে বসল। এর মধ্যে সাম্রাজ্যের মর্যাদা দাবি করার ক্ষমতা সাময়িকভাবে এবং কিয়ৎ পরিমাণে দেখা দিয়েছিল ধারার পরমার-বংশের।

মহেন্দ্রপাল

দ্বিতীয় ভোজ

মহীপাল

রাষ্ট্রকূট রাজার সহিত বিরোধ

গুর্জর-প্রতীহার সাম্রাজ্যের পতন

সাম্রাজ্যের বহুধা বিভক্তি

গুর্জর-প্রতীহার শাসনের মূল্যায়ন

প্রায় দুইশত বৎসর উত্তর ভারতে প্রতীহার রাজ্যের প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি মিহিরভোজ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি হর্ষবর্ধনের মতো শুধু আধিপত্য-স্বীকৃতি আদায় করে সন্তুষ্ট থাকতেন না ; বিভিন্ন রাজ্য তিনি নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন, প্রত্যক্ষভাবে সর্বত্র শাসন পরিচালনায় প্রবৃত্ত হতেন, সীমান্তের নিকটবর্তী নগরে বিশেষ সৈন্যদল মোতায়েন করে রাখতেন। মুসলমান আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন ; সৈন্যবাহিনীতে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী থাকায় মুসলমান শক্তিকে প্রতিহত

বিজিত রাজ্যের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি

দেশরক্ষা ব্যবস্থা

করে রাখতে এই হিন্দু রাজ্য সমর্থ হয়েছিল। সাম্রাজ্যকে সংগঠিত রাখার জন্য পরমার, চহমান, সোলাঙ্কি প্রভৃতি কয়েকটি অন্তর্ভূত রাজ্যকে নাকি তিনি পরস্পর সংলগ্ন করে রেখেছিলেন। যাই হোক, এই প্রতীহারদের শাসনে প্রচুর ঐশ্বর্য দেশে ছিল, রাজারা প্রায়ই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, শাসননিপুণ, যুদ্ধকুশলী। আরবদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে তাদের শক্তিক্ষয় ও অগ্রগতি রোধ করেছিলেন বলে গুর্জর-প্রতীহারদের কথা ইতিহাসে নন্দিত হবে।

অন্তর্ভূত রাজ্যের সংলগ্নতা সাধন

দেশে ঐশ্বর্য

প্রধান কৃতিত্ব :

কিছু পূর্বে রাজপুতদের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কালানুক্রমিক না হলেও এখানে এই রাজপুত বংশগুলি ইতিহাসে যে অবদান রেখে গেছে, তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যে রাজ্যগুলিকে প্রতীহার শক্তির উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে, তাদের কোন কোন রাজার কথা ইতিহাস সহজে ভুলবে না। চেদি রাজ্যের কলচুরিবংশীয় রাজা লক্ষ্মীকর্ণ, চৌলুক্যবংশের দ্বিতীয় মূলরাজ, গহড়ওয়াল রাজা গোবিন্দচন্দ্র, চৌহান বংশাবতংস পৃথ্বীরাজ, পরমার-নৃপতি মুঞ্জ ভোজরাজ এবং চান্দেল্লবংশের যশোবর্মন শুধু যে সাহস ও বিক্রমের অধিকারী ছিলেন তা নয়, কেবল যে তাঁরা ক্রমাগত দুর্ধর্ষ তুর্কী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছিলেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন যুগে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার কাজে তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। সাহিত্য ও শিল্পেরও অগ্রগতি যাতে ঘটে, সেদিকে তাঁদের নজর ছিল। খাজুরাহোতে যে বহুসংখ্যক হিন্দু ও জৈন মন্দির স্থাপত্যের মহিমায় এবং ভাস্কর্যের উৎকর্ষ ও প্রাচুর্যে আজও বিস্ময় উৎপাদন করছে, যাদের নির্মাণরীতি-বৈশিষ্ট্য আজও চমৎকারিতায় অতুলন, সেগুলি চান্দেল্ল নৃপতিদের কালে পরিকল্পিত ও নির্মিত হয়েছিল। আবু পর্বতের অপূর্ব মন্দিরে জৈন ও হিন্দু শিল্পধারার বৈচিত্র্য ও কারুকর্মের ঐশ্বর্য আজও দর্শককে আশ্চর্য করে। রাজপুত শিল্পকলার বিকাশ প্রকৃতই যেন বিস্ময়কর। হিমালয়ের পাদদেশে কাংড়া অঞ্চলে রাজপুত চিত্রকলার যে প্রকাশ দেখা গিয়েছে, ভারতীয় চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে তা এক অভিনব ব্যঞ্জনারূপে নন্দিত হয়েছে। পুরুষের বীর্য আর নারীর মর্যাদাবোধ, স্বধর্মের প্রতি মমতা এবং অকুণ্ঠে আত্মবিসর্জনের জন্য নিয়ত প্রস্তুতি রাজপুত কবি ও চারণদের গাথায় আজও ভারতবর্ষে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। রাজপুত সমাজ সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়ে উঠেছিল ; রাজা, জায়গিরদার, সর্দার, সাধারণ মানুষ ইত্যাদির স্বতন্ত্র ক্ষেত্র

ইতিহাসে রাজপুত জাতির অবদান

তুর্কী আক্রমণের প্রতিরোধ

ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক

খাজুরাহোর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

আবু-পর্বতের শিল্প-সৃষ্টি

কাংড়া চিত্রকলা

রাজপুত গাথা

সমাজের সামন্ততান্ত্রিক রূপ

ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রে সংহতি রক্ষা ক্রমে অনিবার্যরূপেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সামন্তধর্মী সমাজের বহু গুণ রাজপুতদের মধ্যে দেখা যায়; ইয়োরোপে মধ্যযুগের "chivalry" বা বীর্য-কাহিনী এদেশের রাজপুত কথার পাশে যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কিন্তু সকলকে একত্রিত করে রাজ্য সংগঠন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি; বিদেশী মুসলমানদের আক্রমণ রোধ করার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল যাদের উপর, অসমসাহসিকতা সত্ত্বেও সে কাজে শেষ পর্যন্ত তারা বিফল হয়ে গেল। রাজপুত বীর্যকাহিনী রাজপুত-বিফলতা

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

বাংলার কথা ঃ পাল ও সেন রাজ্যকাল

প্রাচীন বাংলার কথা

প্রাচীন বাংলার আঞ্চলিক বিভাগ

প্রাচীন কালে সারা বাংলার কোন একটি বিশেষ নাম ছিল না। উত্তরে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী, দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি, দক্ষিণ আর পূর্বে সমতট, হরিকেল, বঙ্গ, বঙ্গাল প্রভৃতি নামে পরিচিত অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কিয়দংশ গৌড় বলে অভিহিত ছিল। পাণিনি-সূত্রে এবং কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রে গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গৌড় একটি নগরী কিংবা দেশ, আর কোথায়ই বা তার অবস্থান, সে বিষয়ে স্পষ্ট সংবাদ নেই। সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের নিকট কর্ণসুবর্ণ নগরে। রাজ্যের নাম হিসাবে গৌড় তখন থেকে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। পাল ও সেন রাজাদের উপাধি ছিল গৌড়েশ্বর। হিন্দুযুগের শেষ দিকে বাংলার উত্তর ও পশ্চিম অংশ গৌড় এবং পূর্ব অংশ বঙ্গ বলে বর্ণিত মনে হয়। মুসলমান আমলের শেষ ভাগে গৌড়দেশ বললে সারা বাংলা বুঝাত।

গৌড় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা

শশাঙ্কের গৌড়

গৌড়েশ্বর

গৌড় ও বঙ্গ

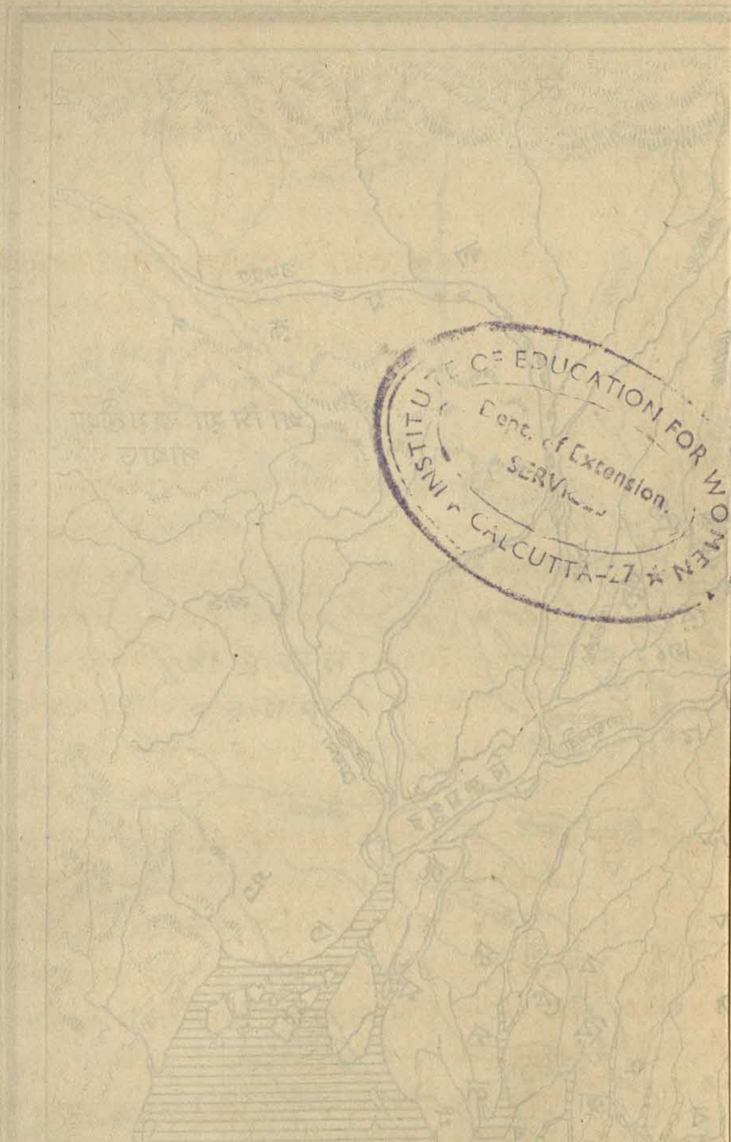
বৈদিক সূক্তে বাংলার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বৈদিক যুগের শেষ দিকে রচিত ঐতরেয়, আরণ্যক ও বৌধায়ন ধর্মসূত্রে আছে যে পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশে অনার্য ও দস্যুরা বাস করে, সেখানে স্বল্পকাল বাস করলেও প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। মস্তিষ্কের গঠন প্রভৃতি তথ্য থেকে নৃতত্ত্ববিদরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে বাঙালী একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জাতি ; আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ক্রমে তার অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, পরিচ্ছদ, পল্লীশিল্প প্রভৃতির দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্য এখনও একেবারে লোপ পায় নি। "বাঙালীর 'খোকা-খুকী' ডাক, বাঙালী মেয়ের শাড়ী-সিন্দূর ও পান-হলুদ ব্যবহার, বাঙালীর কালী-মনসা পূজা ও শিবের গাজন, বাংলার বালাম চাউল প্রভৃতি আজও অনার্য যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে" —একথা লিখিয়াছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে কয়েক শতাব্দী ধরে যুদ্ধ, বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি ব্যাপদেশে

ধর্মসূত্রে পুণ্ড্র ও বঙ্গ নামের উল্লেখ

নৃতত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্ত

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের অভিমত

আর্যদের আগমন ও বসবাস



বাংলায় আর্যদের আগমন ও বসবাস আরম্ভ হয়েছিল, অনুমান করা ভুল নয়। গুপ্তযুগের তাম্রশাসন ও শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তখন আর্য ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ; উত্তরাপথের রাষ্ট্রিক ঐক্যের মধ্যেও বাংলা দেশের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে ; গরুড়, বন্ধুমিত্র, চিরাতদত্ত প্রভৃতি ব্যক্তির নাম এবং পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ, পঞ্চনগরী প্রভৃতি স্থানের নামে বিশুদ্ধ আর্য ভাষা তখন ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অবলুপ্ত না করেই বাংলা দেশ তখন থেকে যে আর্যাবর্তের অংশ বলে পরিগণিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহ।

গুপ্তযুগে সুপ্রতিষ্ঠ আর্যধর্ম ও সামাজিক রীতি নীতি

স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-সহ আর্যাবর্তের অংশ

গুপ্তযুগের পূর্বে বাংলার মোটামুটি কালানুক্রমিক ইতিহাস বিবৃত করা এখনও সম্ভব নয়। নানা সূত্র থেকে অবশ্য বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত, পুরাণ, সিংহল দেশের পালিতে লিখিত "মহাবংশ"গ্রন্থ (এতে আছে বাঙালী বিজয়সিংহ কর্তৃক লঙ্কাবিজয়ের কাহিনী, কিন্তু ইতিহাস তা সমর্থন করে না), আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক গ্রীকদের বিবরণ ইত্যাদিতে বাংলা সম্বন্ধে কিছু কথা আছে। কিন্তু ভরসা করে তখনকার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়। মহাভারতে বাংলার কয়েকটি রাজ্যের যে উল্লেখ আছে, তা থেকে শুধু মনে হয় যে খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত বাংলায় মাঝে মাঝে পরাক্রান্ত রাজা দেখা দিত, দেশের অপর অঞ্চলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল, শৌর্যবীর্যের খ্যাতি বাংলার বাহিরেও ছড়িয়ে যেত। কথিত আছে যে জরাসন্ধের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ অঙ্গ (পূর্ব বিহার), সুহ্ম (পশ্চিম বাংলা), পুণ্ড্র (উত্তর বাংলা) ও বঙ্গদেশকে (পূর্ব বাংলা) এক যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে এনেছিলেন। একথা গ্রহণযোগ্য কিনা ইতিহাস এখনও তার বিচারে সমর্থ নয়।

প্রাচীন বাংলার কালানুক্রমিক ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব

মহাভারতের বিবরণ

ঐতিহাসিক যুগে দেখা যায় একজন গ্রীক লেখকের মন্তব্য : "ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস ; তাদের মধ্যে 'গঙ্গারিডই' জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ (কিংবা সবচেয়ে প্রভাবশালী)। এদের চার হাজার প্রকাণ্ড এবং সুসজ্জিত রণহস্তী আছে। এজন্য অন্য কোন রাজ্য এই দেশ জয় করতে পারে নি। স্বয়ং আলেকজাণ্ডার এই সব হাতীর খবর শুনে ঐ জাতিকে পরাস্ত করার আশা পরিত্যাগ করেছিলেন।" গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে 'প্রাসিয়ই' নামে আর এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় ; এদের সঙ্গে 'গঙ্গারিডই'-দের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন রকম কথা আছে, কিন্তু অধিকাংশ গ্রীক সূত্র থেকে জানা যায় যে এই দুই জাতি 'গঙ্গারিডই'

গ্রীক লেখকের মন্তব্য

প্রাসিয়ই ও গঙ্গারিডই জাতি

গঙ্গারিডই জাতির রাজ্যের বিস্তার

রাজার অধীনে ছিল, তাদের রাজধানী ছিল 'পালিবোথ্‌রা' (পাটলিপুত্র) এবং পঞ্জাবের বিপাশা নদী থেকে ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পুরাণে শূদ্র বলে অভিহিত নন্দ রাজারা বাংলা থেকে গিয়ে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন, অনুমান করা একেবারে অসঙ্গত নয়।

নন্দরাজারা কি বাংলার লোক ?

যদি এই 'গঙ্গারিডই' রাজ্যের অস্তিত্ব অবাস্তব না হয়, তো আকস্মিকভাবে তার বিলুপ্তি এবং নন্দরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কেমন করে হল, কেনই বা সমসাময়িক লেখায় তার কোন উল্লেখ নেই, বুঝতে পারা কঠিন। অবশ্য নন্দ রাজাকে বাঙালী মনে করার নিশ্চিত কারণ এখনও নেই। কিন্তু গ্রীকদের বর্ণিত 'গঙ্গারিডই' রাজা এবং পাটলিপুত্রের নন্দ রাজাকে যদি এক ও অভিন্ন মনে করা সম্ভব হয়, তো নিশ্চয়ই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীকে বাংলার ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল যুগ বলা চলবে। এই মতকে স্বীকার না করলেও বলতে হবে যে বাংলা দেশের কোন এক অজ্ঞাত-নামা রাজা দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মনে ভয়, বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেক করেছিলেন, এ সংবাদের গুরুত্ব অল্প নয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন : "দুঃখের বিষয়, বিদেশীয় লেখকগণের কয়েকটি সম্ভ্রমসূচক উক্তি ব্যতীত বাংলার এই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই।"

মন্তব্য

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার

সম্ভবত বাংলা দেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়েছিল। কুশান আমলেও বাংলার কতকটা অধিকৃত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যখন সুবিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটছিল, গ্রীক-শক-পহ্লব-কুশান ইত্যাদি বিদেশী জাতির আক্রমণ যখন হল, উত্তরাপথে বহু খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব এবং দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় যখন হয়েছিল, তখনকার বাংলা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। "পেরিপ্লস্" ও টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেও বাংলার স্বাধীন 'গঙ্গারিডই' রাজ্য প্রবল ছিল, রাজধানী ছিল গঙ্গাতীরবর্তী গঙ্গে-নগরী। এই 'গঙ্গে' শুধু রাজধানী ছিল না, এখানকার বন্দর থেকে মসলিন কাপড় ইত্যাদি বহু পণ্য সুদূর পশ্চিমে রপ্তানি হত। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে ও পরে মোট প্রায় ছয়শত বৎসর বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে এর খুব বেশী আমরা এখনও জানতে পারি নি।

মৌর্যোত্তর বাংলার ইতিহাসের অস্পষ্টতা

পেরিপ্লস্ ও টলেমির বিবরণে স্বাধীন 'গঙ্গরিড্‌ই' রাজ্যের উল্লেখ

সুখের বিষয়, কয়েক বৎসর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম-এর পক্ষ থেকে কলকাতার অনতিদূরে চন্দ্রকেতুগড়,

হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। এ বিষয়ে এখনও বিশদ বিবরণ নিশ্চিতভাবে দেওয়ার সময় আসে নি, কিন্তু এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা যে খুবই মূল্যবান, সন্দেহ নেই। প্রধানত চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলায় অনুসন্ধানের ফলে কুশান ও সুঙ্গ রাজ্যকালের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, মৌর্যযুগের হতে পারে এমন জিনিসও মিলেছে, বন্দর আর কেল্লার হদিস পাওয়া গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার এই এলাকায়, তাম্রলিপ্তির সন্নিকটে যে এখনও অনেক দামী জিনিস পাওয়া যাবে, তার স্পষ্ট আভাস এসেছে। মেদিনীপুর জেলায় এক পোড়ামাটির ফলকে গ্রীক অক্ষরে খোদিত আছে কয়েকটি কথা যার অর্থোদ্ধার হল—"'পূর্ব বায়ু এবং উষার' প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন"; হয়তো প্রত্যূষে পূর্ব দিক থেকে যে হাওয়া বয়ে আসে, তাকেই দেবতা কল্পনা করা হয়েছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ

মেদিনীপুরের পোড়ামাটির ফলক

গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাংলা দেশে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। মনে হয় বাংলার পূর্বভাগ, সমতট সমুদ্রগুপ্তের অধীন এক করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল, সম্ভবত পরে একেবারে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ইত্যাদি থেকে স্থির করা হয়েছে যে সেখানে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ গুপ্তসম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত এক শাসকের কর্তৃত্বে ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে সমগ্র বাংলা দেশকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশীভূত মনে করা হয়েছে। গুপ্তরাজশক্তির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার অবসান ঘটে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কয়েকটি তাম্রশাসনে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিন রাজার নাম পাওয়া যায়। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে তখন গুপ্তসাম্রাজ্যের আধিপত্য অস্বীকার করে এই তিন রাজাই 'মহা-রাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন, স্বীয় নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করেন। মনে হয় এঁদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন হলেন গোপচন্দ্র। তিন জনের রাজ্যকাল সম্ভবত ছিল ৫২৫ থেকে ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গোপচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের বহু উল্লেখ আছে; 'ময়নামতীর গান' বলে খ্যাত লোকসাহিত্য এই গোপীচন্দ্রকে উপলক্ষ করে রচিত মনে হয়। এই সময়কার স্বাধীন বাংলা বেশ প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ছিল অনুমান করা চলে, কিন্তু কখন কি ভাবে তার অবসান ঘটল জানা নেই। চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মন ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করেছিলেন

সমগ্র বাংলায় গুপ্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা

বাংলায় আঞ্চলিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা

গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব

'ময়নামতীর গান'

চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মন কর্তৃক বঙ্গ অধিকার

বলে প্রশস্তিকারের দাবি দেখা যায়। কিন্তু সম্ভবত স্বাধীন গৌড়রাজ্যের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলা দেশে নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল।

বাংলার ঐতিহাসিক যুগ প্রবর্তনা : রাজা শশাঙ্ক

শশাঙ্ক প্রথম জীবনে গুপ্ত রাজার সামন্ত

যাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অবিসংবাদিত, এমন যে ব্যক্তি প্রথম বাংলা দেশ থেকে সার্বভৌম নরপতি বলে বর্ণিত হতে পারেন, তাঁর নাম হল শশাঙ্ক। পূর্বেই মৌখরীরাজ গ্রহবর্মা এবং থানেশ্বরের রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সঙ্ঘর্ষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম জীবনে হয়তো শশাঙ্ক ছিলেন কোন গুপ্ত রাজার সামন্ত; একটি শিলালিপিতে তাঁর আখ্যা দেওয়া হয়েছে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক"। সম্ভবত ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময় গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্য তিনি স্থাপনা করেন; কর্ণসুবর্ণ (কানাসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের নিকটে) ছিল তাঁর রাজধানী। দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও কঙ্গোদ (গঞ্জাম জেলা) তিনি জয় করেন; পশ্চিমে মগধ ও পূর্বে বঙ্গরাজ্যও তাঁর অধিকারে আসে, মনে হয়। এতেও তুষ্ট না হয়ে গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরীবংশকে দমনের চেষ্টায় তিনি নিযুক্ত হন।

স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা : রাজধানী কর্ণসুবর্ণ

রাজ্য বিস্তার

মৌখরীরাজের বিরুদ্ধে মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতা স্থাপন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মা থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশীয় রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেছিলেন; কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা শশাঙ্ক সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট ও শঙ্কিত হয়ে থানেশ্বরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। এই মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে যোগ দেন। কেন, কখন এবং কিভাবে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধে, তা নিশ্চিত জানা নেই; কিন্তু বাণভট্টের কল্যাণে যুদ্ধকালীন ঘটনার এক বিবরণ পাওয়া গেছে। দেবগুপ্ত কনৌজ জয় করে শশাঙ্কের জন্য অপেক্ষা করেন নি, থানেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে রাজ্যবর্ধনের হাতে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। ইতিমধ্যে শশাঙ্ক থানেশ্বরের দিকে আসায় রাজ্যবর্ধন ও শশাঙ্কের মধ্যে যুদ্ধ হয়। রাজ্যবর্ধন পরাস্ত ও নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে শশাঙ্কের উপর দোষারোপ করে বাণভট্ট এবং হিউয়েনসাং যা লিখে গেছেন, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তা বহু অসঙ্গতিপূর্ণ ও অগ্রাহ্য। ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার পর হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ধরণীকে "গৌড়শূন্য" করার ঘোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন বলে বাণভট্টের বিবরণ আছে। "আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" বলে এক পরবর্তী বৌদ্ধ গ্রন্থে

দেবগুপ্তের জয়-পরাজয়

শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের পরাজয় ও মৃত্যু

বাণভট্ট ও বৌদ্ধগ্রন্থের বিবরণের অসারতা

হর্ষবর্ধন কর্তৃক শশাঙ্কের পরাজয়ের কথা আছে, কিন্তু এই উক্তি সত্য বলে স্বীকৃত হয় নি ; শশাঙ্ক সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে আরও বহু নিন্দাসূচক মন্তব্য আছে যা পণ্ডিতেরা ভ্রান্ত বলে মনে করেন। খুব সম্ভব শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করে হর্ষবর্ধন বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। খুব সম্ভবত আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন।

হর্ষবর্ধনের বাংলা জয়ে অসাফল্য

শশাঙ্কের মৃত্যু

শশাঙ্ক শৈব ছিলেন বলে জানা আছে। কিন্তু হিউয়েনসাং তাঁকে বৌদ্ধধর্মের ঘোর শত্রু বলে যে বর্ণনা করেছেন কিংবা বুদ্ধগয়ায় সমূলে বোধিবৃক্ষ উৎপাটিত করার গল্প বলেছেন, তা অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বিশ্বাস করা কঠিন। হিউয়েনসাং-এর রচনা থেকেই জানা যায় যে রাজধানী কর্ণসুবর্ণে এবং শশাঙ্কের রাজ্যের অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। বাংলার প্রথম প্রকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম নরপতি বলে শশাঙ্কের কৃতিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত হওয়া ইতিহাসের অকর্তব্য। হর্ষবর্ধনের ন্যায় শক্তিশালী বৈরীর সঙ্গে যুদ্ধের দ্বাদশ বৎসর পরেও শশাঙ্কের স্বাধীন প্রতাপ ও প্রতিপত্তি যে ক্ষুণ্ণ হয় নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কূটনীতি ও সমর-নৈপুণ্যের বলে শশাঙ্ক মৌখরী রাজবংশের নিপাত সাধন করেন। "উত্তরাপথনাথ" বলে খ্যাত হর্ষবর্ধনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি স্বীয় আধিপত্য অটুট রেখেছিলেন। বাণভট্ট এবং হিউয়েনসাং-এর পক্ষপাতিত্বের ফলে শশাঙ্কের খ্যাতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। শত্রুপক্ষের অপবাদ চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে তাঁর কীর্তিকে মলিন করে রেখেছে। এই অবিচারের প্রতিকার গবেষকদের চেষ্টাতেই সাধিত হবে।

হিউয়েনসাং-এর বিবৃতির তথ্য-নির্ভরতার অভাব

শশাঙ্কের কৃতিত্ব

ইতিহাসে শশাঙ্কের কৃতিত্বের অস্বীকৃতি

পাল যুগ ঃ গোপাল

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর আবার বাংলার ইতিহাসে ঘনতমসার আচ্ছাদন এসে পড়ে। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের যা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাই ঘটতে থাকে। আনুমানিক ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মগধ অধিকার করেন, উৎকল ও কঙ্গোদে অভিযান করেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা কিছুকাল গৌড় রাজ্যের কিয়দংশ দখল করেন। সম্ভবত ভাস্করবর্মাকে পরাজিত করে, জয়নাগ নামে এক রাজাকে মহারাজাধিরাজ উপাধি নিয়ে কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করতে দেখা যায়। তারপর বাক্‌পতিরাজকৃত "গৌড়বহো" কাব্য থেকে জানা যায় যে অষ্টম শতাব্দীতে কনৌজের

শতবর্ষব্যাপী অন্ধতামস যুগ

ভাস্করবর্মা কর্তৃক বাংলার কিয়দংশ দখল

রাজা জয়নাগ

যশোবর্মন কর্তৃক বাংলা আক্রমণ

প্রখ্যাত নরপতি যশোবর্মন গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন, মধ্য ও পূর্ব বাংলা তাঁর আয়ত্তে যায়। আবার কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য এবং তাঁর পৌত্র বিনয়াদিত্যের সঙ্গেও গৌড়ের সঙ্ঘর্ষ ঘটেছিল।

কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য ও বাংলা

ললিতাদিত্যের গুণাবলী কীর্তন করেও "রাজতরঙ্গিণী" রচয়িতা কহ্লন বলেছেন যে বিশ্বাসঘাতকতা করে গৌড়রাজকে হত্যা ললিতাদিত্যের আদর্শ জীবনে অনপনেয় কলঙ্ক।

বিনয়াদিত্য জয়াপীড় ও বাংলা

ললিতাদিত্যের পৌত্র বিনয়াদিত্য জয়াপীড় পুণ্ড্রবর্ধনের সামন্ত রাজা জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করে গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে জয়ন্তের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন বলে কথিত আছে। এ ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণ দুরূহ ; তবে মনে হয় যে সম্ভবত তখন গৌড় পাঁচ, কিংবা অন্তত একাধিক,

বাংলার শোচনীয় অবস্থা

খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। শতবর্ষব্যাপী এই আত্মকলহ, অনৈক্য ও আক্রমণের ফলে বাংলার অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলায় মাৎস্যন্যায়

ভারতীয় রাজনীতির ভাষায় কথিত হয়েছে যে তদানীন্তন বাংলার অরাজক পরিস্থিতিকে "মাৎস্যন্যায়" বলে বর্ণনা করা চলে। জলে যেমন বড় মাছ ছোট মাছকে গ্রাস করে, তেমনই প্রবল যখন অবাধে দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে পারে, সেই অবস্থার অভিহিতি হল মাৎস্যন্যায়। ইয়োরোপের রাষ্ট্রচিন্তায় সমাজগঠনের পূর্ববর্তী অবস্থাকে বলা হয়েছে "State of nature"—এ এমন এক অবস্থা যখন কোন বিধি নেই, বিধান নেই, শাসন নেই. শৃঙ্খলা নেই, সৌষ্ঠব নেই, যখন Hobbes-এর ভাষায় বলতে গেলে মানুষের জীবন ছিল "Solitary, nasty, brutish and short" (একক, জঘন্য, পশুতুল্য ও স্বল্পস্থায়ী), বাংলা দেশের প্রধান

গোপালকে রাজপদে বরণ

নায়কেরা এবং সাধারণ প্রজারা একত্র হয়ে এই অবাঞ্ছিত অরাজকতা অপসৃত করার জন্য গোপাল নামধেয় এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করেন। সমসাময়িক লিপিতে এই মাৎস্যন্যায়ের উল্লেখ আছে, এবং পরবর্তীকালে তিব্বতী বৌদ্ধ লামা তারানাথ এই নির্বাচনের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা

গোপালের পরিচয়

মোটামুটি সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। গোপালের তারিখ নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয় নি, তবে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি রাজপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত বংশপরিচয় অজ্ঞাত, কিন্তু তিনি এবং তাঁর

গোপালের নির্বাচনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

বংশধরগণ যে বৌদ্ধ ছিলেন, তা নিশ্চিত। সর্বসাধারণ একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে যোগ্য ব্যক্তিকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত করার এই দৃষ্টান্ত শুধু বাংলা নয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। গোপালের প্রায়

চল্লিশবর্ষব্যাপী রাজ্যকাল সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু যেখানে শতাব্দীর অধিক সময় বিশৃঙ্খলা ও ভেদাভেদ লক্ষিত হয়েছিল, সেইখানেই সুদৃঢ় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হল গোপালের কীর্তি। পুত্র ধর্মপালের খ্যাতি গোপালের যশঃপ্রভাকে ম্লান করবে না, বরঞ্চ পিতার কৃতকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কেই সাক্ষ্য দেবে।

গোপালের কৃতিত্ব

ধর্মপাল

ধর্মপালের রাজত্বকাল

ধর্মপাল রাজত্ব করেন আনুমানিক ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, কিন্তু তারিখ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিতি নেই। পঞ্জাবের জলন্ধর অঞ্চল পর্যন্ত উত্তর ভারতের বিস্তৃত ভূভাগ তিনি জয় করেছিলেন বলে কথিত আছে।

ত্রিকোণী সংগ্রাম ও কান্যকুব্জের গুরুত্ব

পূর্বোল্লিখিত গুর্জর-প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সঙ্গে পালবংশের সংগ্রাম ধর্মপালের সময় থেকে চলতে থাকে; তৎকালীন ভারত-ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা ছিল তাই। প্রাচীনকালে পাটলিপুত্র এবং বর্তমানে দিল্লীর মতো সে যুগে কনৌজ (কান্যকুব্জ) আর্যাবর্তের রাজধানী বলে বিবেচিত হওয়ায় সকল শক্তিশালী রাজ্যের লোলুপ দৃষ্টি কনৌজের উপর নিবদ্ধ থাকত; এর দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেও দেখেছি।

ধর্মপাল-বিজয়ী বৎসরাজের ধ্রুবের নিকট পরাজয়

প্রতীহার নরপতি বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাস্ত করলেও দেখা যায় যে দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব আর্যাবর্তে অভিযান করে বৎসরাজকে পরাজিত করলেন, মরু অঞ্চলে তাঁকে আশ্রয় নিতে হল। মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে ধর্মপাল তখন অগ্রসর হচ্ছিলেন। ধ্রুবের সঙ্গে ধর্মপালের যুদ্ধ হল, রাষ্ট্রকূটপক্ষীয় বৃত্তান্ত অনুসারে ধর্মপাল পরাস্ত হলেন।

ধর্মপালের উপাধি গ্রহণ

কিন্তু ধ্রুব অচিরে দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্তন করায় ধর্মপালের লাভ হল; তিনি তখন "পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ" ইত্যাদি বিশেষণবহুল উপাধি গ্রহণ করে নিজের সার্বভৌম অধিকার ঘোষণা করলেন। কনৌজে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান হল;

আর্যাবর্তের রাজগণ কর্তৃক ধর্মপালের আনুগত্যস্বীকার

মালদহের কাছে খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে মৎস্য, মদ্র, ভোজ, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজা ধর্মপালের বশ্যতা স্বীকার করে গেলেন। হয়তো বললে ভুল হবে না যে আর্যাবর্তের প্রায় সমস্ত অঞ্চল ধর্মপালের আয়ত্ত হয়েছিল।

ধর্মপালের আয়ত্তাধীন ও প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল

বাংলা ও বিহারে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন, অন্যান্য স্থানে স্থানীয় রাজারা ধর্মপালের আধিপত্য স্বীকার করে শাসন পরিচালনা করতেন। কনৌজে ইন্দ্রায়ুধকে রাজ্যচ্যুত করে ধর্মপাল নিজের বশ্য মিত্র চক্রায়ুধকে রাজাসনে মনোনীত করে স্বকীয়

নাগভটের হস্তে ধর্মপালের পরাজয়

পরাক্রম ঘোষণা করেন। কিন্তু ধর্মপালের এই গৌরব স্থায়ী হয় নি; গুর্জর-প্রতীহারবংশীয় দ্বিতীয় নাগভট কনৌজ থেকে চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন, যুদ্ধে ধর্মপালের পরাজয় ঘটে। ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর-প্রতীহার রাজ্য আক্রমণ করেন। নাগভটের কান্যকুব্জকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভেঙে যায়।

নাগভটের স্বপ্নভঙ্গ

ধর্মপাল-রাষ্ট্রকূটরাজ-সম্পর্ক বিচার

রাষ্ট্রকূটরাজের প্রশস্তিতে আছে যে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ উভয়েই তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে যে নাগভটের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট রাজের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটবংশের প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ নিয়েছিলেন, এবং ধ্রুবের মতো তৃতীয় গোবিন্দও উত্তরাপথে খুব বেশী দিন না থেকে দক্ষিণে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আবার ধর্মপাল আর্যাবর্তে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় থেকে গেলেন।

খালিমপুর তাম্রশাসন

ধর্মপালের শেষজীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিল মনে হয়। মৌর্যযুগের গৌরবস্মৃতি-বিজড়িত পাটলিপুত্রে বোধ হয় সাময়িকভাবে তিনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন; খালিমপুর তাম্রশাসনে পাটালিপুত্রের মহিমা ও ধর্মপালের প্রবলপরাক্রম সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা রয়েছে। ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, শাসনব্যবস্থা, শক্তিবিস্তার সকল দিক দিয়ে তখন বাংলার উদীয়মান প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল। ধর্মপাল মগধে যে বিক্রমশীলা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য বিষয় অধ্যাপনার যে বিখ্যাত কেন্দ্র ও মঠ, মন্দির প্রভৃতি নির্মিত হয়, নালন্দার ন্যায় তারও যশ দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মতো প্রকাণ্ড বিহার ভারতবর্ষের অন্য কোথাও ছিল বলে জানা নেই। সম্ভবত ওদন্তপুরী বিহার ও বিদ্যায়তন ধর্মপালই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; বহু শিক্ষালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন বলে কথিত আছে।

বাংলার সর্বতোমুখী প্রতিভার স্ফুরণ

বিক্রমশীলা বিহার প্রতিষ্ঠা

পাহাড়পুরে বিহার প্রতিষ্ঠা

ওদন্তপুরী বিহার

হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

বৌদ্ধ হলেও হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ তাঁর ছিল না; হিন্দু মন্দিরের জন্য তাঁর নিষ্কর ভূমিদানের সংবাদ পাওয়া যায়। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ; এঁর বংশধরেরা বহু দিন পুরুষানুক্রমে পালরাজাদের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমরনিপুণ বাক্‌পাল এবং প্রধানমন্ত্রী গর্গের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে প্রধানত তাদেরই

ধর্মপালের প্রধান সহায়: গর্গ ও বাক্‌পাল

সাহায্যে ধর্মপালের বহুমুখী সাফল্য সম্ভব হয়েছিল; একথা পূর্ণ বিশ্বাস্য না হলেও ধর্মপাল যে যোগ্য সহায়ক ও মন্ত্রণাদাতা পেয়েছিলেন, তা হয়তো ঠিক। খালিমপুর তাম্রশাসনে বর্ণিত হয়েছে যে তৎকালীন বাংলার সর্বত্র, জীবনের সর্বস্তরে ধর্মপালের গুণ কীর্তিত হত। বর্তমানে শুধু কয়েকটি তাম্রশাসন, শিলালিপি ও তিব্বতী গ্রন্থ থেকে ধর্মপালের কীর্তিকথা আমরা জানতে পারি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলাদেশের এই বীর সন্তান যে সমুচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভারত-ইতিহাসে ধর্মপালের মর্যাদা

দেবপাল

ধর্মপালের পুত্র দেবপালের শাসনে (আনুমানিক ৮১০ থেকে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পাল রাজ্য শক্তি ও সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল বলা চলে। হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল মনে করা ভুল হবে না। দেবপালের সভাকবির মুখে শোনা গেছে যে হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত প্রসারিত ভূখণ্ডে দেবপাল অধীশ্বর বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। গরুড়স্তম্ভ লিপিতে দেবপাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "উৎকলিত-উৎকলকূলং খর্বীকৃত-দ্রাবিড়-গুর্জর-দর্পং হৃত-হূন-গর্বং", অর্থাৎ তিনি উৎকলকূলকে ধ্বংস, দ্রাবিড় ও গুর্জরের দর্প খর্ব এবং হূন-গর্ব হরণ করেছিলেন। বাংলার দুই সীমান্তে অবস্থিত আসাম ও উড়িষ্যায় দেবপাল যে জয়লাভ করেন, তা অবিসংবাদিত। সম্ভবত হিমালয়ের পাদদেশে হূনদের কোন একটি রাজ্য অধিকার করে তিনি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাম্বোজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। সে যুগে হূনদের বিরুদ্ধে বিজয় বার্তা ঘোষণা করলেই রাজশক্তির গৌরব সবচেয়ে বৃদ্ধি পেত। সম্ভবত গুর্জর-প্রতীহার বংশীয় নাগভটের পৌত্র প্রথম ভোজকে দেবপাল পরাস্ত করেছিলেন। সুদূর দক্ষিণে তাঁর অভিযানের কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু হয়তো কোন রাষ্ট্রকূট রাজাকে পরাভূত করে দ্রাবিড়-দর্প খর্ব করার দাবি তিনি করেন।

দেবপালের রাজ্যকাল

দেবপালের সভাকবির বিবরণ

গরুড়স্তম্ভ লিপি-বিচার

ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেবপালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল পালবংশের চিরবৈরী গুর্জর-প্রতীহার রাজ্যের পরাজয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তখন সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিপতি শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজা বালপুত্রদেব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি

উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে দেবপালের নিকট দূত

মঠ নির্মাণ করে দেবার জন্য দেবপালের কাছে দূত পাঠিয়ে অনুমতি গ্রহণ করেন, এবং সেখানকার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন। কথিত আছে যে দেবপাল এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ ছিল, তার এক পরিচয় মেলে যখন দেখা যায় যে, সেখানকার অধিবাসী বীরদেব নামে এক ব্রাহ্মণকে দেবপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ কার্যে নিযুক্ত করেন। পাটলিপুত্রের চেয়ে মুঙ্গের শহরের প্রতি দেবপালের টান ছিল বেশী ; সেখানে (মুদ্গগিরি) তাঁর এক "জয়স্কন্ধাবার" ছিল। পিতার ন্যায় দেবপাল বৌদ্ধ হলেও হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর রাজ্যকালে গর্গদেব ও দর্ভপাণি নামে দুই ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর কথা জানা যায় ; শাসন-ব্যাপারে মন্ত্রীর ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর ছিল না। প্রায় চল্লিশ বৎসর দেবপালের রাজত্ব চলেছিল। পাল রাজ্যের যে গৌরব এই সময় সর্বোচ্চ শীর্ষে আরোহণ করে বলা চলে, দেবপালের মৃত্যুর পর থেকে তা হ্রাস পেতে থাকে। বিগ্রহপাল (বা শূরপাল), নারায়ণপাল প্রভৃতির রাজ্যকালে গুর্জর-প্রতীহারদের আক্রমণে পাটলিপুত্র, মুঙ্গের প্রভৃতি হস্তচ্যুত হতে থাকে ; নবম শতাব্দীর শেষদিকে প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপাল উত্তর বঙ্গ অধিকার করেন।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ

মুঙ্গেরে "জয়স্কন্ধাবার"

গর্গদেব ও দর্ভপাণি

দেবপালের মৃত্যু ও পাল রাজ্যের প্রাধান্য হ্রাস

মহীপাল

পাল-শক্তি নিস্তেজ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্বল্পস্থায়ী রাজবংশের কথা শোনা যায়। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমে শূরবংশ এবং চন্দ্রবংশের রাজাদের উল্লেখ রয়েছে। সাহিত্যে ও লেখমালায় শূর রাজাদের কথা আছে ; বিশেষত আদিশূরের খ্যাতি সুবিস্তৃত হয়েছিল, আজও কিংবদন্তীতে তাঁর স্থান রয়েছে, কিন্তু ইতিহাসে একজন ব্যক্তিরূপে তাঁর সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নি। যাই হোক, কিছুকাল রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকার পর পালসাম্রাজ্যকে উদ্ধার করেন প্রথম মহীপাল (আনুমানিক রাজ্যকাল ৯৮৮ থেকে ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)। সম্ভবত এর কিছু পূর্বে কম্বোজ নামে এক জাতি বাংলা আক্রমণ করে ; এদের আদি নিবাস কোথায়, উত্তর-পশ্চিমে কি তিব্বতে, কি কাম্বোডিয়ায়, তা নির্ধারিত হয় নি।

বাংলায় আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব

আদিশূর

প্রথম মহীপাল

কম্বোজ জাতি কর্তৃক বাংলা আক্রমণ

মহীপালের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতের পরাক্রান্ত চোলবংশীয় রাজা প্রথম রাজেন্দ্রচোল পশ্চিম বাংলা আক্রমণ করেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষে চোল রাজবংশ ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ; উড়িষ্যা থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর

রাজেন্দ্রচোল কর্তৃক বাংলা আক্রমণ

পর্যন্ত সমগ্র উপকূল তাদের অধিকারে ছিল, বিরাট নৌ-বাহিনী বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অতুল বাণিজ্য-ভাণ্ডারের স্বর্ণদ্বার তাদের কাছে উন্মুক্ত ছিল। কথিত আছে যে চোল রাজ্যকে পবিত্র করার জন্য প্রচুর পরিমাণে গঙ্গাজল আনয়ন করার উদ্দেশ্যে বাংলায় অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। "গঙ্গাবিজয়ী" হয়েছিলেন বলে চোলরাজের প্রশস্তিকারের ঘোষণা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবিকই যুদ্ধ কতদূর, কিভাবে এবং কার সঙ্গে হয়েছিল আর তার ফলাফলই বা কি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন তথ্য নেই।

চোল-শক্তি ও সমৃদ্ধি

রাজেন্দ্রচোলের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্যের অভাব

মহীপাল যে দুর্বল রাজা ছিলেন না, তা নিশ্চিত। প্রথম রাজেন্দ্র-চোল-এর ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত রাজার সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। তখনকার আর এক প্রখ্যাত বীর, কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব, মহীপালকে পরাজিত করে বারাণসী অধিকার করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সদ্যরাহুমুক্ত পাল রাজ্যকে পুনর্বার আসন্ন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার কাজে মহীপালের সাফল্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত এভাবে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বলেই পশ্চিম ভারতে গজনীর সুলতানরা যখন ক্রমাগত আক্রমণ করে শক্তিশালী শাহী ও প্রতীহার রাজবংশকে ধ্বংস করছিল, তখন মহীপালের পক্ষে আর্যাবর্তের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিধর্মী বিদেশীদের বিপক্ষে অভিযানে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। কোন কোন ঐতিহাসিক তাই মহীপালকে কাপুরুষ বা দেশের সামগ্রিক স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন বলে যে তীব্র সমালোচনা করেছেন, তা সঙ্গত মনে হয় না।

গাঙ্গেয়দেবের হাতে মহীপালের পরাজয়

মহীপালের বিরুদ্ধে কাপুরুষতার অভিযোগ খণ্ডন

ভারতবর্ষের দুই প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলার পূর্ব প্রান্ত থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পাল রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা মহীপালের প্রকৃত শৌর্য ও দক্ষতারই পরিচায়ক। প্রাচীন কীর্তি রক্ষায় তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত নালন্দা মহাবিহারের জীর্ণোদ্ধার, বুদ্ধগয়া, কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি স্মরণীয়। বাংলা দেশের জনমানসে গোপাল, ধর্মপাল বা দেবপালের স্মৃতি জাগ্রত হয়ে নেই ; কিন্তু মহীপালের নাম শুধু যে বহু নগর, পল্লী, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে, তা নয়, "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" বলে যে কথা আমরা বলে থাকি, তার আদি রূপ হল "ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত" ; সাধারণ লোকের মুখে মুখে এভাবের কথা পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে।

মহীপালের কৃতিত্ব

জনপ্রিয়তা

রাজা জয়পাল

মহীপালের পর থেকে পাল রাজশক্তি ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ে। পুত্র জয়পাল যখন রাজা, তখন চেদীর কলচুরি বংশীয় রাজা লক্ষ্মীকর্ণ বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু তখনও পাল বংশের সম্ভ্রম অটুট, তাই জয়পালের পুত্রের সঙ্গে চেদী রাজকন্যার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। দেশের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় পাল রাজ্যের সঙ্কট বিষম হয়ে উঠল। সামন্তদের রাজভক্তির উপর পাল শক্তি বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু ক্রমেই তাদের উপর বিশ্বাস রাখা দুরূহ হয়ে উঠল।

কৈবর্ত-বিদ্রোহ

বরেন্দ্রী অঞ্চলে কৈবর্ত জাতির বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; তখন রাজা ছিলেন দ্বিতীয় মহীপাল। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে জনপ্রিয়তা তিনি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। অভিজাত শ্রেণী কৈবর্তদের প্রতি খুব অনুকূল ছিল ধারণা করা কঠিন, কিন্তু প্রবল জনসমর্থন নিয়ে কৈবর্ত অভ্যুত্থান বিজয়ী হল, দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হলেন, কৈবর্ত দলপতি দিব্বোক বা দিব্য সিংহাসন অধিকার করলেন। এই ঘটনার গুরুত্ব নিরূপণ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রখর মতভেদ আছে। পরবর্তী কালের তুলনায় হয়তো কৈবর্তদের জাতিগত মর্যাদা তখন কিছু বেশী ছিল, কিন্তু পাল রাজ্যের প্রসাদভোজী সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী যে ভাবে ও ভাষায় দিব্য এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ভীমকে আক্রমণ করেছেন, কুরূপ, কুচক্রী, দুনিয়ার আপদ ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে সমাজের উপরতলা থেকে এই কৈবর্ত বিদ্রোহ অত্যন্ত কুৎসিত ও ভয়াবহ মনে হয়েছিল। উত্তর বাংলায় কিছুকাল পাল বংশকে অপসৃত করে দিব্য এবং পরে তাঁর ভ্রাতা (কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্র) ভীম রাজত্ব করেছিলেন। উভয়েরই শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে সন্দেহ নেই ; কিন্তু বহু ঐতিহাসিক এই কৈবর্ত বিদ্রোহকে বাংলার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মানতে রাজী হন নি, দিব্য এবং ভীমকে সম্মানের আসন দিতে স্বীকৃত হন নি।

দিব্য কর্তৃক সিংহাসন অধিকার

সন্ধ্যাকর নন্দীর কটুভাষণ

কৈবর্ত-বিদ্রোহ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ

"দিব্য-স্মৃতি-উৎসব"

কিছুকাল পূর্বে উত্তর বাংলার নানা স্থানে "দিব্য-স্মৃতি-উৎসব" অনুষ্ঠিত হত ; বিখ্যাত বিদ্বানরা অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ক্রমে দেখা গেল যে অধিকাংশ পণ্ডিত কৈবর্ত বিদ্রোহকে বিশেষ মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নন। রমেশচন্দ্র মজুমদার একটু যেন বিদ্রূপের সুরে বলেছেন : "রামচরিতকার (সন্ধ্যাকর নন্দী) তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন তাহা পুরাপুরি সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিলেও দিব্যকে দেশের ত্রাণকর্তা মহাপুরুষ মনে করিবার কোনই কারণ নাই।" অবশ্য রামপাল

রমেশচন্দ্রের মন্তব্য

যখন রাজ্য উদ্ধার করলেন, তখন পরাজিত ভীমকে সপরিবারে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তা থেকে কৈবর্ত-সাফল্যে রাজবংশের সমর্থকদের যে প্রচণ্ড আক্রোশ, গাত্রদাহ এবং ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়েছিল, তার পরিচয় মেলে। শুধু শত্রুপক্ষের বক্তব্য জেনে, দিব্য, ভীম এবং কৈবর্ত অভ্যুত্থান সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা করা যে ন্যায়সঙ্গত নয়, তা নিশ্চয় বলা চলে। জনসাধারণের মধ্য থেকে উদ্ভূত শক্তি যে অন্তত সাময়িকভাবে পাল রাজ্যকে বিপর্যস্ত করতে পেরেছিল, এরূপ ঘটনার গুরুত্ব হ্রাস করার প্রবৃত্তিকে সম্ভবত শ্রেণীগত পক্ষপাতের পরিচায়ক বললেও অন্যায় হবে না।

শত্রুপক্ষের বক্তব্যে আক্রোশ ও ঘৃণার প্রকাশ

মন্তব্য

আত্মীয়তাসূত্রে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের সহায়তা নিয়ে রামপাল পাল রাজশক্তির পুনরুদ্ধার ঘটালেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" কাব্যে রামায়ণের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে রামপালের রাজ্যকালের বর্ণনা আছে। এর অর্থগ্রহণ দুরূহ হলেও, অনিবার্য অতিরঞ্জন সত্ত্বেও কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। রামপালের পর কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল, মদনপাল প্রভৃতি রাজার নাম পাওয়া যায়। তারপর পাল রাজ্যের বিলোপ ঘটে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশাগত বিজয়সেনের আক্রমণে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যায় যে বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই পাল শাসন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই পাল বংশের রাজত্বকে বেশ দীর্ঘায়ু বলা চলে; মাঝে মাঝে বিড়ম্বিত হলেও প্রায় চারশো বৎসর পাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাল বংশের বহুমুখী কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। সমাজের সাধারণ স্তর থেকে এই বংশের উদ্ভব। কোথাও কোন অনুশাসনে পাল রাজারা তৎকালীন প্রথা অনুসরণ করে নিজেদের "দৈববংশসম্ভূত" বলেন নি। পাল বংশ সম্বন্ধে একথা কম স্মরণীয় নয়।

পাল-শক্তির পুনরুদ্ধার

"রামচরিত" কাব্য

পাল বংশের বিলোপ

৪০০ বৎসর স্থায়ী পাল রাজ্য

সাধারণ স্তর থেকে পাল বংশের উদ্ভব

বাংলায় সেন বংশের রাজ্য ও মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ থেকে বাংলায় এসে সেন বংশের সামন্তসেন ও হেমন্তসেন প্রথমে রাঢ় অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেন। সম্ভবত তখনও তাঁরা পাল রাজ্যের সামন্ত বলে পরিচিত ছিলেন। পাল বংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিজয়সেন প্রায় সমস্ত বাংলা, কামরূপ ও মিথিলা জয় করে সেন রাজ্যের পত্তন করেন বলে জানা যায়। কলিঙ্গের সঙ্গে তিনি বোধহয় মিত্রতা স্থাপন করেন। পূর্ব বাংলার যাদব বংশকে পরাভূত করে বিক্রমপুর

বাংলায় সেন বংশ

সেন বংশের পত্তন

বল্লালসেনের সিংহাসন-আরোহণ

অধিকার করেন। পশ্চিম বাংলায় বিজয়পুর নামে এক নগরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজ্য শাসন করে তাঁর মৃত্যু ঘটে ; তখন পুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে বসেন (আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

বল্লালসেন

পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেন বংশ ছিল আনুষ্ঠানিক হিন্দু। বল্লালসেনের নাম আজও বাংলার কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক বলে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও আচার-ব্যবহারের জন্য কতকগুলি পরিবারকে "কুলীন" আখ্যা দিয়ে হিন্দু সমাজকে নূতনভাবে সংগঠনের প্রচেষ্টা তিনি করেন। "দানসাগর" নামে স্মৃতিশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন ; তেমনই আবার নাকি লিখেছিলেন জ্যোতিষ বিষয়ে "অদ্ভুতসাগর" বলে গ্রন্থ। উভয় গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত ; তিনি একাধারে পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হিন্দুর সমাজ-শৃঙ্খলাকে সুগঠিত করতে চেষ্টিত ছিলেন। রাজা হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব অল্প ছিল না ; পিতৃরাজ্যের আয়তন তিনি বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু ধর্ম ও সমাজ-ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তাঁর খ্যাতি আজও রয়েছে।

কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন

"দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থ রচনা

লক্ষ্মণসেন

লক্ষণসেন পিতৃসিংহাসনে যখন বসেন (আনুমানিক ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ), তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট ; আশী বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর যে কাপুরুষ-খ্যাতি চলে এসেছে, মনে হয় তা ভিত্তিহীন। কিন্তু সেই কুখ্যাতি রয়েছে বলেই শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে তিনি যুবাবয়সে যথেষ্ট শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন ; উড়িষ্যা, বারাণসী, মগধ ও কামরূপ জয় করে সমরনৈপুণ্য ও সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। কাশী, প্রয়াগ এবং পুরীতে তিনি জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজও মিথিলা অঞ্চলে লক্ষ্মণসেনের নামে একটি অব্দ প্রচলিত আছে ; এই অব্দ সম্পর্কে কয়েকটি সমস্যার সমাধান এখনও হয় নি, কিন্তু ঘটনাটির অবশ্যই গুরুত্ব আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে ধর্মপাল ও দেবপাল ভিন্ন বাংলার অন্য কোন রাজার কৃতিত্ব লক্ষ্মণসেনের তুলনায় কম। পিতা বল্লালসেনের ন্যায়ই তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ; বহুগুণমণ্ডিত এই ব্যক্তির দুর্ভাগ্য যে, ঘটনাচক্রে বাংলায় মুসলিম শক্তির অগ্রগতি রোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি বলে তাঁকেই দেশ সেই অপমানের প্রথম

লক্ষ্মণসেন

লক্ষ্মণসেনের বীরত্ব-গৌরব

লক্ষ্মণসেনের মর্যাদা

বহুগুণান্বিত রাজা লক্ষ্মণ-সেনের দুর্ভাগ্য

লজ্জাকর প্রতীক বলে ভাবতে শিখেছে। কিন্তু এ বিষয়েও ইতিহাসের পক্ষপাতহীন বিচার-ফল আমাদের মেনে নেওয়া কর্তব্য।

লক্ষ্মণসেনের রাজধানী

লক্ষ্মণসেনের প্রধান রাজধানী ছিল বর্তমান মালদহ জেলায় গৌড় নগরীতে; এর অপর নাম হয়েছিল লক্ষ্মণাবতী। পিতার মতন ভক্ত ও নিষ্ঠাবান হিন্দু বলে গঙ্গা নদীর সান্নিধ্য কামনা করে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন নদীয়ায়। লক্ষ্মণসেন যখন অতি বৃদ্ধ, তখন মুসলমানরা যে বঙ্গ জয় করেছিল, সে বিষয়ে কাহিনী প্রচলিত আছে যে, বখতিয়ার খিল্‌জি নামে মহম্মদ ঘুরীর এক তুর্কী সেনাপতি মাত্র আঠারো জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে নদীয়া শহর দখল করে বসে। নবীনচন্দ্র সেন কবিতায় আক্ষেপ করেছেন যে কাপুরুষ লক্ষ্মণসেন "সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে" "সোনার বাংলা রাজ্য" বিসর্জন দিয়েছিলেন। ইতিহাসকার মিন্‌হাজ-উদ্দীনের যে রচনা থেকে এই কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে, তা শুধু ঘটনার চল্লিশ বৎসর পরে লেখা বলেই অবিশ্বাস্য নয়, কোন দলিল বা তথ্যের নির্ভরযোগ্য বিবরণের উপর ভিত্তি করে সেই রচনা লিখিত হয় নি, এক অতি বৃদ্ধ সৈনিকের মুখ থেকে শোনা অসঙ্গতিপূর্ণ এক গল্প হল এর প্রমাণ। তাই বলা যায় যে লক্ষ্ণৌ শহরের বাজারে যেসব মুখরোচক বৃত্তান্ত প্রচলিত ছিল, তারই উপর এ কথা প্রতিষ্ঠিত। মিন্‌হাজ-উদ্দীনের প্রায় একশো বৎসর পরে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে আর এক ঐতিহাসিক মুসলমানদের "নুদীয়া" অধিকার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার সঙ্গেও এই বিবরণের সামঞ্জস্য নেই।

মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয় সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী

কাহিনীর সত্যতা বিচার

ঐতিহাসিক বিবরণের অসামঞ্জস্য

সম্ভবত নদীয়া অভিযান সম্পর্কে তখন অনেক বিচিত্র রটনা প্রচলিত ছিল। অবশ্য মিন্‌হাজ-উদ্দীনের বিবরণকে একেবারে সম্পূর্ণ অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়াও ঠিক হবে না, মনে হয়। সম্ভবত আক্রমণ অতর্কিতভাবেই হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে নির্দোষ অশ্বব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে প্রথম অল্প কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নদীয়ায় ঢুকে পড়ে, আর তারপর আরও বহু শত্রু এসে শহর লুণ্ঠন করে। কোথাও তাদের কেউ সন্দেহ করল না, রাজপ্রাসাদে এসে তারা হানা দিল, রাজার রক্ষীদল ছিল না বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু বখতিয়ারের দলের কারও গায়ে আঁচড় লাগল না, শুধু ভয় পেয়ে খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাজা নৌকা চড়ে পালিয়ে গেলেন, এমন কথা কঠোর প্রমাণ বিনা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। লক্ষ্মণসেন জীবনে শৌর্যবীর্যের বহু পরিচয় দিয়েছিলেন। মুসলমানদের বিহার

সম্ভাব্য প্রকৃত ঘটনা

সম্ভাব্য অতিরঞ্জন

লক্ষ্মণসেনের দৃঢ়তা

অধিকারের কথা জেনে রাজ্যের বহু লোক যখন সন্ত্রস্ত ও নদীয়া ছেড়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত, তখনও বৃদ্ধ রাজা রাজধানী ত্যাগ করেন নি। অতর্কিত আক্রমণে সফলভাবে আত্মরক্ষা অসম্ভব জেনে পলায়ন করে থাকলে তা বেদনাদায়ক ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তাতে অপমানের কালিমা তাঁর চরিত্রে পড়ে নি। মিন্‌হাজ-উদ্দীন নিজেই লক্ষ্মণসেনকে "রায় লখমনিয়া" এবং "হিন্দুস্থানের" খলিফা-স্থানীয় বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁর শাসন ও বদান্যতার সুখ্যাতি করেছেন। নির্লজ্জ কাপুরুষ সম্বন্ধে এমন উক্তি সম্ভব নয়।

লক্ষ্মণসেনের কার্য-বিচার

মুসলমানদের নদীয়া জয়ের পর বহু বৎসর লক্ষ্মণসেন এবং তাঁর বংশধরেরা পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন; সমগ্র বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে বিলম্ব ঘটে। সারা উত্তর ভারত যখন তুর্কীদের পদানত, তখন বাংলাদেশের এই প্রতিরোধকে অকিঞ্চিৎকর মনে করা অসঙ্গত হবে। বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন, মধুসেন প্রভৃতি রাজার নাম আমরা পেয়েছি। তুর্কী আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্রভৃতি কারণে সেন রাজবংশের পতন ঘটে; সুন্দরবন অঞ্চলে এবং অন্যত্র স্বাধীন রাজ্যের পত্তন সংবাদও মেলে, কিন্তু কার্যত মুসলমান আধিপত্য বাংলার সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল।

বাংলার প্রতিরোধ

বাংলার পাল ও সেন যুগে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাল বংশের শাসনকালে বাংলার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলার এই রাজবংশ এক স্মরণীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাই পাল যুগে যে বহু অগ্রগতি ও সাফল্যের চিহ্ন দেখা যায়, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যখন সেন বংশের হাতে বাংলার শাসনভার, তখন রাজনীতির দিক থেকে বাংলার প্রভাব ও কৃতিত্ব ঠিক পূর্ববৎ না হলেও একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ছিল না; সমাজে কথঞ্চিৎ স্থাণুভাব দেখা দিলেও, সেন রাজ্যকালও নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

পাল ও সেন যুগের সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন

আলোচ্য কালের কিছু পূর্বে, সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসাং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে মন্তব্য করেছিলেন : "সমতটের লোক স্বভাবতই শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তির অধিবাসীরা দৃঢ় ও সাহসী কিন্তু চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ, এবং কর্ণসুবর্ণবাসীরা সাধু ও অমায়িক।" পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে তিনি লক্ষ্য করেন যে সর্বসাধারণ শিক্ষার জন্য একান্ত আগ্রহশীল। পরে আমরা দেখি যে জ্ঞানলাভের

হিউয়েনসাং-এর মন্তব্য

জন্য বাঙালী ছাত্র সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত যেত, কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে তাদের দুর্নাম ছিল। কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র "দশোপদেশ" নামক হাস্যরসাত্মক কাব্যে লিখেছেন যে গৌড়ের ছাত্রেরা যখন প্রথম কাশ্মীরে আসে, তখন তাদের আকার ক্ষীণ, মনে হয় যেন স্পর্শ করলেই তারা ভেঙে পড়বে। কিন্তু জলবায়ুর গুণে তারা হয়ে ওঠে সবল ও উদ্ধত, দোকানদার দাম চাইলে দেয় না। সামান্য উত্তেজনায় ছুরি বার করে! বিতর্ক আর বিবাদপ্রবণ বলে কিছু অখ্যাতি সেকালে বাঙালীর ছিল, কিন্তু মানুষ সর্বত্র দোষে গুণে মিলে গড়া হয়ে থাকে আর বাঙালীদের গুণ সম্পর্কেও বহু সাক্ষ্য রয়েছে।

কবি ক্ষেমেন্দ্রের উক্তি

দোষ-ক্ষালন

বাংলার মেয়েদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাৎস্যায়ন তাদের বলেছেন মৃদুভাষিণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতী। কোন কোন রচনা থেকে মনে হয় যে, সে যুগে অবরোধ প্রথা ছিল না, অন্তত তখনও কঠোর হয়ে দেখা দেয় নি; রাজবাড়ির মেয়েরা অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলত পর্দার আড়াল থেকে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাতেও মেয়েদের প্রকৃত স্বাধীনতা তখন ছিল না; বিধবা-বিবাহ নিন্দিত ছিল, কিন্তু পুরুষের বহু বিবাহে বাধা ছিল না, মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হিন্দু আইনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা, "দায়ভাগ" গ্রন্থ-রচয়িতা জীমূতবাহন, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার যে অধিকার ভারতবর্ষের অন্যত্র স্বীকৃত ছিল না, বাংলাদেশে সেই অধিকার স্বীকৃত বলে ঘোষণা করেন। সম্পত্তিসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যক্তির স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট অধিকারের কথা এবং বাংলার সমাজ-তাত্ত্বিক চিন্তার স্বকীয়তা জীমূতবাহনের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে; জীমূতবাহনের জীবনকাল সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও তিনি যে পালযুগে বর্তমান ছিলেন তা নিশ্চিত।

বাৎসায়ন বর্ণিত বাংলার মেয়ে

মেয়েদের অবস্থা

"দায়ভাগ" প্রণেতা জীমূত-বাহনের চিন্তার স্বকীয়তা

সে যুগে অন্য যুগেরই মতো সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী উভয় প্রকার লোক নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সামাজিক জীবনে কিছু দুর্নীতি ও অশ্লীলতার কথা জানা যায়। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "যে যুগের স্মার্ত পণ্ডিতগণ প্রামাণিক গ্রন্থে অকুণ্ঠচিত্তে লিখিয়াছেন যে শূদ্রাকে বিবাহ করা অসঙ্গত কিন্তু তাহার সহিত অবৈধ সহবাস করা তাদৃশ নিন্দনীয় নয়; যে যুগের কবি রাজপ্রশস্তিতে রাজার কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ গর্বভরে বলিয়াছেন যে রাজপ্রাসাদে (অথবা রাজধানীতে) প্রতি সন্ধ্যায় বেশবিলাসিনী জনের 'মঞ্জীর মঞ্জুস্বনে' আকাশ প্রতিধ্বনিত হয়; যে

সমাজ-জীবনে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার প্রকাশ

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র হইতে উদ্ধৃতি

যুগের কবি মন্দিরের একশত দেবদাসীর রূপযৌবন বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছেন যে ইহারা 'কামিজনের কারাগার ও সঙ্গীত-কেলি-শ্রীর সঙ্গমগৃহ' এবং ইহাদের দৃষ্টিমাত্রে ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়; যে যুগের কবি বিষ্ণুমন্দিরে লীলাকমলহস্তে দেবদাসীগণকে লক্ষ্মীর সহিত তুলনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; সে যুগের নরনারীর যৌন-সম্বন্ধের ধারণা ও আদর্শ বর্তমান কালের মাপকাঠিতে বিচার করিলে খুব উচ্চ ও মহৎ ছিল এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন। এ বিষয়ে বাঙালীর যে খুব সুনাম ছিল না, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ আছে।" ("বাংলা দেশের ইতিহাস", পৃঃ ১৮৪-১৮৫)।

শাসন-ব্যাপারে সামন্ত ব্যবস্থার প্রচলন তখন আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় সমাজেও তার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। বাণিজ্য যথেষ্ট অগ্রসর হলেও দেশ ছিল কৃষিনির্ভর। যারা ভূমিস্বত্ব ভোগী, কিংবা অন্য কারণে সঙ্গতিপন্ন, তাদের অবস্থা উন্নত ছিল, কিন্তু ভূমিহীন গৃহস্থ ও সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের আর্থিক সাচ্ছল্য ছিল না। তখনকার চর্যাগীতিগুলিতে দরিদ্র জীবনের দুঃখ-বেদনা অভাব-অনটনের পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। দেশের অধিকাংশ মানুষ যে গ্রামে বাস করে কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকত, তা বলা বাহুল্য। প্রধান শস্য এখনকার মতন ছিল ধান্য; চাষের পদ্ধতিও বর্তমান কালের অনুরূপ ছিল। প্রাচীন কাল থেকে ইক্ষুর চাষ হত এবং আখের রস থেকে প্রচুর গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়ে দেশ-বিদেশে চলে যেত। তুলা, সরিষা, পান, সুপারি, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা, লেবু প্রভৃতি বহু প্রকার ফলের চাষ হত। বাংলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি সর্বজনবিদিত; বহু দূর দেশেও বাংলায় প্রস্তুত সূতী কাপড়ের চাহিদা খুব বেশী ছিল। তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খকার, মালাকার, তৈলকার প্রভৃতি কারিগরদের নিজস্ব সঙ্ঘের কথা জানা যায়। সম্ভবত পরে এই সব সঙ্ঘ এক-একটি বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অন্নগ্রহণ ও বিবাহ-সম্বন্ধ বিষয়ে কঠোরতা ক্রমশ হিন্দু সমাজে লক্ষিত হয়েছে, কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা পরিবর্তিত হওয়ার বৃত্তান্ত এত জটিল যে এখানে তার বর্ণনা সম্ভব নয়।

দেশের কৃষি-নির্ভরতা

মানুষের অবস্থা

কৃষিজাত দ্রব্য

বাংলার বস্ত্র-শিল্পের খ্যাতি

সঙ্ঘ ও জাতি

বাঙালীর প্রধান খাদ্য বর্তমানের ন্যায় তখনও ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূল, দুধ ও দুগ্ধজাত বিভিন্ন দ্রব্য (দই, ক্ষীর, ঘি ইত্যাদি)। সাধারণত বাংলার বাইরে ব্রাহ্মণদের মাছমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু

প্রধান খাদ্য

বাঙালী ব্রাহ্মণেরা আমিষ খেতেন, ভবদেবভট্ট প্রভৃতি নানা যুক্তি দিয়ে এর সমর্থন করেছেন। সুরাপান ভবদেবভট্টের মতে সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এই নির্দেশ যে সম্পূর্ণ কার্যকরী হত না তা বলাই বাহুল্য। পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যাপারে রাজরাজড়া আর খুব ধনবানদের কথা বাদ দিলে বিশেষ কোন আড়ম্বর তখন ছিল না। পাহাড়পুরের মূর্তি থেকে অনুমান করা হয়েছে যে সেকালের পুরুষেরা মালকোঁচা দিয়ে যে খাটো ধুতি পরত তাতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা যেত, আর মেয়েরা পরত গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা শাড়ি। একখানি ধুতি বা শাড়ি পরাই রেওয়াজ ছিল; মাঝে মাঝে পুরুষরা গায়ে দিত চাদর ("উত্তরীয়") আর মেয়েরা ওড়না ও কদাচিৎ চৌলি বা "বডিস্" ধরনের জামা ব্যবহার করত। উৎসবে অনুষ্ঠানে অবশ্য সাজসজ্জার বাহার অনেক বেশী হত, কিন্তু মোটামুটি এই ছিল ধরন। — পরিধেয়

মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই গয়না পরার রীতি প্রচলিত ছিল; কানে কুণ্ডল, গলায় হার, হাতে আংটি আর পায়ে মল পুরুষ ও নারী উভয়েই পরত। শাঁখের বালা কেবল মেয়েরা হাতে পরত, তারা অনেকগুলি চুড়ি, বালা ইত্যাদি পরতে ভালোবাসত। মণিমুক্তা আর দামী সোনারূপার অলঙ্কার ধনীরা ব্যবহার করত। মেয়েদের খোঁপা ছিল নানা ধরনের; পুরুষদের বাবরি চুল কাঁধের উপর ঝুলে থাকত। কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার তখন খুব ছিল। মেয়েদের সাজগোজে আলতা, সিঁদুর ও কুমকুমের প্রচলন ছিল। পুরুষরা কাঠের খড়ম বা চামড়ার চটি মাঝে মাঝে ব্যবহার করত, ছাতার কথাও জানা যায়। — অলঙ্কার ও প্রসাধন

তখনকার কালে নানা রকম খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের খবর পাওয়া যায়। পাশা আর দাবা খেলা খুব চলত; নাচ, গান, অভিনয়ের প্রচলন খুব বেশী ছিল। পাহাড়পুরের ভাস্কর্যে অনেক-রকম বাজনার চেহারা দেখা যায়। বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, করতাল প্রভৃতি তো তখন ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় যে মাটির ভাঁড়কেও বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হত। কুস্তি, শিকার, ব্যায়াম আর বাজীকরের খেলা পুরুষদের খুব পছন্দ ছিল। পূজা-পার্বণে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকত প্রচুর। সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" কাব্যে লিখেছেন যে উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রে বিপুল উৎসব হত; অন্য পুরাতন গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। বিজয়া-দশমীর দিন "শাবরোৎসব" নামে এক প্রকার নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হত; লক্ষ্য করার বিষয় এই যে স্বয়ং জীমূতবাহন "কালবিবেক" গ্রন্থে এই — খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ; "রামচরিত-" কাব্যোল্লিখিত উৎসব; "শাবরোৎসব"

ধর্মানুষ্ঠানে তান্ত্রিক প্রভাব / *কাম মহোৎসব হোলি* / *কোজাগরী পূর্ণিমা উদ্‌যাপন* / *অন্যান্য অনুষ্ঠান*

নৃত্যগীতের উল্লেখ করে বলেছেন যে কুৎসিত ও অশ্লীল হলেও এই নৃত্যগীত না করলে দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেবেন! ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা "বৃহদ্ধর্মপুরাণে" আছে যে কতিপয় অশ্লীল শব্দ আশ্বিন মাসে মহাপূজার দিনে উচ্চারণ করতে হবে, তবে মাতা, ভগ্নী এবং অদীক্ষিতা শিষ্যার সম্মুখে নয়। তান্ত্রিক প্রভাবে সম্ভবত কিয়ৎ পরিমাণ বীভৎসতা তখন ধর্মানুষ্ঠানে প্রবেশ করেছিল। চৈত্র মাসে কাম-মহোৎসবে বাদ্য সহকারে অশ্লীল গানের রীতি তখন ছিল। হোলকা বা বর্তমান কালের হোলি একটি প্রধান উৎসব ছিল। কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রিতে অক্ষক্রীড়া এবং আত্মীয় বন্ধু মিলে চিঁড়া ও নারিকেলের প্রস্তুত নানাবিধ খাদ্য ভোজন সেই রাত্রির প্রধান কাজ ছিল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশপ্রদীপ, জন্মাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া, দশহরায় গঙ্গাস্নান, মহাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রস্নান ইত্যাদি বর্তমানে সুপরিচিত অনুষ্ঠান সেকালেও প্রচলিত ছিল।

যানবাহন / *প্রাচীন ও বর্তমানে জীবনযাত্রার প্রায়-সমতা*

যানবাহনের মধ্যে তখন প্রধান ছিল গরুর গাড়ি আর নৌকা। হাতী, ঘোড়া, রথ, পালকি ইত্যাদিও ছিল, সাধারণত ধনী ব্যক্তিরা তা ব্যবহার করত। বিবাহের পর নববধূ গরুর গাড়ি করে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, এমন উল্লেখ অনেক আছে। মোটের উপর মনে হয় যে আধুনিক কালের শহর-অঞ্চল আর কলকারখানা-এলাকার কথা বাদ দিলে সেকালের বাঙালী জীবন আর আজকালকার জীবনযাত্রার মধ্যে খুব বড় দরের কোন তফাত নেই।

ব্যবসা-বাণিজ্য / *তাম্রলিপ্তি ও সপ্তগ্রাম* / *সমুদ্র-বাণিজ্য* / *আরব সওদাগরদের মন্তব্য*

পাল আর সেন যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তদনুরূপ সমৃদ্ধিও দেখা গিয়েছিল। তাম্রলিপ্তি (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার তমলুক) এবং সপ্তগ্রাম (বর্তমানে হুগলী জেলার অন্তর্গত) ছিল বাংলার বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। যে সরস্বতী নদী এখন প্রায় বিলুপ্ত, তা তখন ভাগীরথীর চেয়ে বড় ছিল; সপ্তগ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাম্রলিপ্তির কাছে সরস্বতী যেখানে সমুদ্রে মিশত, সেখানে রূপনারায়ণ, দামোদর ও সাঁওতাল পরগণার অনেক ছোট নদী মিলে বিরাট মোহনা সৃষ্টি করেছিল। এই দুই বন্দর থেকে তখনকার বণিকরা সমুদ্রপথে সিংহল, ব্রহ্ম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, মলয় দ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশে তাদের পণ্য নিয়ে যেত। তৎকালীন এক আরব সওদাগরের একটি কথা আমরা এখনও বলাবলি করে থাকি, বাংলাদেশের অত্যন্ত মিহি কার্পাস বস্ত্রের একখানি পুরা ধুতি ছোট একটি আংটির ফাঁকে ঢুকিয়ে বার

করে নেওয়া যেত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ তখন ছিল। আরব বণিক সুলেমান লিখে গেছেন যে চীনে বাংলা থেকে গণ্ডারের শিং রপ্তানি করা হত। এখানে টিন পাওয়া যেত বলে "অভিধান রত্নমালা" গ্রন্থে উল্লেখ আছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ", সুতরাং সেকালে সমাজের কোন কোন শ্রেণী প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিল, সন্দেহ নেই। ধনবান যারা, তারা স্বভাবতই শহরে বাস করত; আর তখনকার শহর কেমন ছিল, তার আন্দাজ পাওয়া যায় সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত "রামচরিত" কাব্যে তৎকালীন পাল রাজধানী রমাবতীর বর্ণনা থেকে। নগরীতে ছিল প্রশস্ত রাজপথ; তার উভয় পার্শ্বে আকাশচুম্বী হর্ম্য, তার চূড়ায় শোভা পেত স্বর্ণকলস। অতিরঞ্জন সত্ত্বেও এই বর্ণনা থেকে তখনকার বিত্তবানদের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা চলে।

টিনের প্রাপ্যতা

ধনীদের ঐশ্বর্য

সাহিত্য-ক্ষেত্রে পাল যুগে এবং সেন যুগেও বাংলার মনীষা ও প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা গৌরব করার বস্তু। বাংলাদেশে পূর্ব হতেই সংস্কৃতে সাহিত্য রচনায় গৌড়মার্গ ও গৌড়ী রীতির উল্লেখ রয়েছে। "হস্ত্যায়ুর্বেদ" অভিধেয় যে বিশাল গ্রন্থে হস্তীর বিবিধ ব্যাধি ও তার চিকিৎসা-বিষয়ক আলোচনা আছে, তার রচনাকাল অনির্দিষ্ট, কিন্তু মনে হয় বাংলাদেশে এই গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। চান্দ্র ব্যাকরণ ও কাব্য-নাটক ইত্যাদির রচয়িতা চন্দ্রগোমিন্ সম্ভবত বাঙালী ছিলেন এবং পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাস করতেন। বিখ্যাত "গৌড়পাদকারিকা" গ্রন্থের প্রণেতা গৌড়পাদ বোধ হয় বাঙালী ছিলেন; গৌড়াচার্য নামে যশস্বী এই দার্শনিকচূড়ামণি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে তিনি শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু ছিলেন।

সাহিত্য রচনায় গৌড়মার্গ ও গৌড়ী রীতি

"হস্ত্যায়ুর্বেদ"

চন্দ্রগোমিন্

দার্শনিক গৌড়পাদ

পাল যুগে বাংলায় সংস্কৃত রচনার ঐতিহ্য আরও পুষ্ট হয়েছিল; তখনকার বহু তাম্রশাসনে বৈদিক সাহিত্য, মীমাংসা, ব্যাকরণ, তর্ক, বেদান্ত ও প্রমাণ শাস্ত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির পাণ্ডিত্যের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, রাজপুরুষদের মধ্যে দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণি এবং কেদারমিশ্র ও ভবদেবভট্টের ন্যায় বিদ্বানের উল্লেখ আছে। গৌড় অভিনন্দ-কৃত "কাদম্বরী কথাসার" কাব্য সম্ভবত নবম শতাব্দীতে লিখিত হয়। রামপালের প্রসিদ্ধ সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" কাব্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুরূহ কাব্য এমন সুকৌশলে রচিত যে প্রতি শ্লোক দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, তার অর্থ এক দিকে রামায়ণের

পাল যুগে জ্ঞানচর্চার প্রসার

"কাদম্বরী কথাসার"

"রামচরিত"

রামচন্দ্র এবং অপর দিকে পালরাজ রামপালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চরক ও সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকা-প্রণেতা চক্রপাণিদত্ত বাঙালী ছিলেন বলে পণ্ডিতেরা অভিমত দিয়েছেন। জীমূতবাহনের জীবনকাল সুনিশ্চিত না হলেও পাল যুগে তাঁর স্থান নির্ণয় করা অসঙ্গত হবে না; তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি "দায়ভাগ" গ্রন্থ অনুসারে এখনও বাংলার উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন ইত্যাদি বিধান স্থিরীকৃত হচ্ছে। যখন বাংলার বাইরে ভারতের প্রায় সর্বত্র "মিতাক্ষরা" আইন প্রচলিত, তখন বাংলার বৈশিষ্ট্যসূচক এই গ্রন্থের বিপুল গুরুত্ব সহজে প্রতিপন্ন হবে।

চক্রপাণিদত্ত

জীমূতবাহন

সেন যুগে সংস্কৃতের প্রভূত চর্চা

সেন যুগেও সংস্কৃতের প্রভূত চর্চা হয়েছিল। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক প্রভাবে হিন্দুর নিত্যকর্মপদ্ধতিতে বহু বিকৃতি উপস্থিত হওয়ায় সমাজ ও ধর্মানুষ্ঠানকে নবরূপে সংগঠনের চেষ্টা তখন হয়; প্রধানত এই উদ্দেশ্যে স্বয়ং বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন বহু গ্রন্থ রচনা করেন। হলায়ুধ এই যুগের একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। মেঘদূতের অনুকরণে রচিত "পবনদূত" কাব্যের যশস্বী প্রণেতা ধোয়ী, জয়দেব যাঁকে বাক্‌বিন্যাসপটু বলেছেন সেই উমাপতিধর, দুরূহ ও দ্রুত রচনায় সিদ্ধহস্ত কবি শরণ, শৃঙ্গাররসনিপুণ গোবর্ধন এবং স্বয়ং জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। জয়দেবের স্থান যে সর্বোচ্চে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাদৃত "গীতগোবিন্দম্" জয়দেবের শ্রেষ্ঠ কীর্তি; এমন শ্রুতিমধুর, ভাবঘন, রসসমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় কাব্য অতি অল্পই আছে, বহুগুণ-সন্নিপাতে বর্ণাঢ্যতার বাহুল্য ও অনুপ্রাস-প্রবণতার ন্যায় দোষ গীতগোবিন্দে সম্পূর্ণ প্রক্ষালিত হয়ে গেছে। মিথিলা ও উড়িষ্যা জয়দেবকে দাবি করেছে, কিন্তু এখনও প্রতি বৎসর মাঘী সংক্রান্তি দিবসে জয়দেবের জন্মস্থান বীরভূমস্থিত কেন্দুবিল্বে (কেঁদুলি) বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়, আর বলা চলে যে জয়দেব যে বাঙালী ছিলেন তা নিশ্চিত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধকে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা হয়েছে; একই সময়ে হলায়ুধ, বল্লালসেন, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্ধন ও শরণের মতো কবি ও কোবিদের একত্র সমাবেশ বাস্তবিকই স্মরণীয়।

বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন

রাজকবি-গোষ্ঠী

"গীতগোবিন্দম্"

জয়দেব কি বাঙালী?

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ

বাংলা ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় পাল যুগে। প্রাচীন বৌদ্ধ চর্যাপদ আবিষ্কার করে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামক গ্রন্থে তার এক সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন। এই দোঁহা ও চর্যাপদের রচয়িতা ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া গেছে

পাল যুগে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন

তিব্বতীয় ভাষায় দোঁহাগুলির অনুবাদ হয়েছিল, তিব্বতী সূত্র থেকে অধিকাংশ তথ্য মিলেছে। পাল যুগে লুইপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ গুরুদের লেখা চর্যাপদ হল বাংলা রচনার সবচেয়ে পুরাতন নমুনা। বাংলার শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার গানের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় চর্যাপদে। সাহিত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে অনেক দোঁহাকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না, কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের দিক থেকে তাদের মূল্য খুব বেশী। আর জটিল তত্ত্বের চাপে রসবস্তু নষ্ট হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে প্রকৃত কাব্যগুণের পরিচয় দোহাগুলিতে পাওয়া যায়।

চর্যাপদ

চর্যাপদের গুণ-বিচার

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যখন বৌদ্ধধর্ম কতকটা পশ্চাদপসরণ করেছে, তখন বাংলায় পালযুগে রাজাদের শ্রদ্ধা ও বদান্যতায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নালন্দা মহাবিহার তাঁদের অকুণ্ঠ দানে সংবর্ধিত হয়েছিল; বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এই বিশ্ববিখ্যাত পীঠস্থানের সমুন্নতিসাধন হল পাল রাজগণের অক্ষয় কীর্তি। সহজে স্মরণ করা যাবে যে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় মঠ নির্মাণের জন্য দেবপালের অনুমতি পেয়েছিলেন। ওদন্তপুরী, সোমপুর ও বিক্রমশিলা মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পাল যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাট ধর্মপালের এক উপাধি ছিল "বিক্রমশীলদেব"; বিক্রমশিলার প্রসিদ্ধ বিহারের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা মনে হয়। ত্রৈকূটক মঠ নামে আর এক বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন দেবপাল। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে যে প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে সোমপুর বিহারের কিছু চিহ্নও পাওয়া গেছে। ওদন্তপুরী বিহার সম্ভবত পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল স্থাপনা করেছিলেন। বিক্রমশিলা মহাবিহার নির্মিত হয়েছিল বর্তমান ভাগলপুরের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে; সেখানে নাকি ১০৭টি মন্দির ও ছয়টি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধজ্ঞানপাদ এর প্রধান আচার্য ছিলেন; তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বহু বিষয়ে এখানে অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। কমলশীল, রাহুলভদ্র, কল্যাণরক্ষিত, প্রভাকর, পূর্ণবর্ধন, প্রশান্তমিত্র, বুদ্ধশান্তি প্রভৃতি প্রথিতযশা পণ্ডিত সেখানে অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যার্থীদের সর্ববিধ ব্যয় মহাবিহারের পক্ষ থেকেই নির্বাহিত হত; কৃতী বিদ্যার্থীদের উপাধি-পত্র অর্পণ করার রীতি ছিল।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার

নালন্দার উন্নতি সাধন

পাল যুগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়

বিক্রমশিলা

বিক্রমশিলা মহাবিহার ও তিব্বতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

বিক্রমশিলার সঙ্গে বিশেষত তিব্বতের সম্পর্ক ছিল নিবিড়; সেখানে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হত। বিক্রমশিলার বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অথবা অতীশ)। অতীশের বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়েছিল, তিব্বতে ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেশে আজও সেই খ্যাতির ভাতি বিলীন হয় নি। কথিত আছে যে সুবর্ণ দ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে বহু বৎসর শিক্ষালাভ করে পালরাজ মহীপালের আহ্বানে তিনি বিক্রমশিলার প্রধান আচার্য-পদ গ্রহণ করেন। নয়পালের রাজ্যকালে তিব্বতের তৎকালীন রাজার সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে অতীশ তিব্বত যাত্রা করেন। প্রায় তেরো বৎসর সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে তিব্বতেই তিনি দেহত্যাগ করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকটি পংক্তি সহজে মনে পড়বে—

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ

> বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
> জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।

বাংলার মধ্যস্থতায় সংস্কৃতির প্রসার

সন্দেহ নেই যে প্রধানত বাংলার মধ্যস্থতায় ভারতবর্ষের ধর্ম, চিন্তা, শিল্প প্রভৃতির প্রভাব নেপাল, তিব্বত, চীন ইত্যাদি দেশে বিস্তৃত হয়, আর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করে তন্ত্রমন্ত্র প্রবেশ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মকে রূপান্তরিত করে দেয়।

পালরাজাদের হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

পাল রাজারা বৌদ্ধ এবং মহাযান সম্প্রদায়ের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হয়েও হিন্দু সংস্কৃতি ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্বন্ধেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন; খালিমপুর তাম্রশাসন, মুঙ্গের লিপি, বাদল গরুড়স্তম্ভ প্রভৃতি থেকে সৌর, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি পৌরাণিক ধর্ম সম্পর্কিত উল্লেখ পাওয়া গেছে, শক্তিপূজার পরিচয়ও মিলেছে। বৌদ্ধ ও জৈনদের সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা যায়, কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বৌদ্ধধর্ম ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির বিবর্তন। হিউয়েনসাং সপ্তম শতকে এদেশে বৌদ্ধধর্মের যে রূপ দেখেছিলেন, তা গৌতম বুদ্ধ, অশোক, এমনকি কণিষ্কের কালের বৌদ্ধধর্ম থেকে যথেষ্ট পৃথক। পালযুগে দেখা গেল যে সর্বাস্তিবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধমত তখন লোপ পেয়েছে; মহাযানও বজ্রযান, তন্ত্রযান প্রভৃতিতে পরিণত হয়ে একেবারে বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করেছে। বুদ্ধপূজার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ হিন্দু দেবদেবীর অর্চনায় অঙ্গীভূত মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। ক্রিয়াকাণ্ড, জপ, হোম, মন্ত্র, মুদ্রা প্রভৃতি

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও অনুষ্ঠানের বিবর্তন

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আচারগত নৈকট্যবৃদ্ধি

বৌদ্ধ পদ্ধতিতে স্থান পেয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আচারগত সান্নিধ্য বৃদ্ধি পেল। তান্ত্রিকতা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করে ফেলা হিন্দুধর্মের পক্ষে আর দুরূহ রইল না। বিচিত্র এক সংমিশ্রণের ফলে দেখা গেল যে ইতিহাসে যাকে বৌদ্ধধর্ম বলে আমরা জানি, তা ক্রমশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত হয়ে গেল; যে বাংলায় ও বিহারে একদা বৌদ্ধধর্মের অমিত প্রভাব ছিল, তা শুধু চট্টগ্রাম জেলার স্বল্পসংখ্যক বৌদ্ধকে বাদ দিলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেনবংশের রাজ্যকালে পৌরাণিক ধর্মের শক্তিবৃদ্ধি এবং হিন্দুর আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি নির্দিষ্ট হতে থাকায় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অধোগমন আরও দ্রুত ঘটতে বাধ্য হল।

হিন্দুধর্ম-কবলিত বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্য-নাশ

সেনরাজত্বে বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন

বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর সঙ্ঘটনকে সম্ভবত ধর্মব্যাপারে বাংলার বিশিষ্ট অবদান বলা যেতে পারে। বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমত অখিল ভারতবর্ষীয় ধর্মেরই অনুরূপ; শুধু অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরে বাঙালীর প্রভাব যে অধিক, তা নিশ্চিত। বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়েছে, একথা এক হিসাবে সত্য হলেও বহু লৌকিক অনুষ্ঠানে ও মানসিক প্রবণতায় তার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। যাকে সহজযান বা সহজিয়া ধর্ম বলা হয়েছে, সিদ্ধাচার্যেরা যে ধর্মের প্রবক্তা, তার মধ্যে যে বৌদ্ধ ধারার পরিচয় রয়েছে তা নিঃসন্দিগ্ধ।

বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরে বাংলার অবদান

সহজিয়ার ছদ্মাবরণে বৌদ্ধধারা

নৈতিক অধোগতি ও অসংযমের কথা তুলে অনেক সময় সহজিয়াদের সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়, কিন্তু সহজিয়া, নাথপন্থী, অবধূত, বাউল প্রভৃতিদের এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া ইতিহাস সমর্থন করে না। সহজিয়া মত অনুসারে গুরুর স্থান খুব উচ্চে; "গুরু বুদ্ধ অপেক্ষাও বড়", এমন কথাও পাওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন চিন্তার শৃঙ্খল চূর্ণ করে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপর যে জোর সহজিয়া মতে দেওয়া হয়, তা বাস্তবিকই মনে করে রাখার মতো বস্তু। যেমন—"হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয়, এই মাত্র।" "ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিটমিট করে, কানে ঘুসঘুস করে ও লোককে ধাঁধা দেয়।" "যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল কুকুরের মুক্তি আগে হইবে।" "যদি বল সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও তো, ব্যাকরণের মধ্যে

সহজিয়া ধর্মে স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ

তো বেদের শব্দ আছে।” সহজিয়া মতে স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নির্বিচারে গুরুর প্রতি অবিচল আস্থা ও ভক্তি এবং সাধন প্রণালীর অতি গুহ্য রহস্য মিলে কখনও কখনও বীভৎসতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সমাজের নিম্নস্তরে সহজিয়া চিন্তার প্রসার হয়েছিল সবচেয়ে বেশী; জাতিভেদের বিরোধিতা করায় এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল; পরবর্তী কালে সহজিয়া সম্প্রদায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হয়ে বাংলার জীবন ও সংস্কৃতিতে এক বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

পরবর্তীকালে বাঙালীর জীবনে সহজিয়া ধর্মের প্রভাব

পালযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ব্যাপারে প্রভূত উৎকর্ষ লক্ষিত হয়েছিল। মন্দির, স্তূপ ও বিহারের যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তা থেকে বুঝা যায় যে পাথর ও পোড়া মাটির উপর কাজে বাংলার শিল্পীরা যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। তিব্বতের সর্বপ্রথম বৌদ্ধ বিহার ওদন্তপুরীর স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। তেমনই কথিত আছে যে সোমপুরী বিহারের অনুকরণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে বহু স্থাপত্য রয়েছে। পালযুগে শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল; প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি গঠনে এঁরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিভিন্ন শিলালিপি থেকে মঙ্খদাস, বিমলদাস, বিষ্ণুদাস, কর্ণভদ্র প্রভৃতি শিল্পীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ থেকে অনবদ্য শিল্পের নিদর্শন যা মিলেছে, তা অল্প নয়। চিত্রশিল্প বিষয়ে যে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল, তার পরিচয় মিলেছে রাজা রামপালের সময়ে লেখা একটি পুঁথিতে আঁকা অতি চমৎকার ছবি থেকে। সেন-রাজ্যকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে শূলপাণির নাম সবচেয়ে বিখ্যাত।

বাঙালী শিল্পীর পাথর ও পোড়ামাটির কাজে কৃতিত্ব

বাংলার অনুকরণে বহির্ভারত

ধীমান, বীতপাল ও বাংলার অন্যান্য শিল্পী

চিত্রশিল্পের নিদর্শন

শিল্পী শূলপাণি

উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে উচ্চাঙ্গের শিল্পসামর্থ্যের অভাব লক্ষিত হয়েছে, সেখানেও দেখা যায় যে বাংলার ভাস্করদের সঙ্গে সমাজ ও সংসারের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। পাহাড়পুরে বাংলার প্রাচীন লোকশিল্পের নিদর্শন সর্বদা শিল্পরসোত্তীর্ণ না হয়েও তাই মনোহারী; শুধু দেবদেবী নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনচিত্র সেখানে রয়েছে—মেয়েরা নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করছে, শিশুক্রোড়ে মাতা কূপ থেকে জল তুলছে বা জলের কলসী নিয়ে ঘরে ফিরছে, চাষী লাঙল-কাঁধে মাঠে যাচ্ছে, বাজিকর বাজি দেখাচ্ছে, তীরধনুক নিয়ে যোদ্ধা, সাধু-সন্ন্যাসী, প্রেমিক-প্রেমিকা, শিকার হাতে নিয়ে

বাংলা-শিল্পের বৈশিষ্ট্য

চলছে শবর রমণী, এমনই কত ছবি সেখানে ফুটে রয়েছে। পালযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষ রূপায়িত হয়েছে—"কোমল অথচ সংযত, ভাবপ্রবণ অথচ ধ্যানস্থ, লীলায়িত অথচ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ।" বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ পাল যুগের এক বৈশিষ্ট্য; তখনকার বহুমুখী অগ্রগতির আর এক সাক্ষ্য মিলবে বৃহত্তর ভারত বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে। নানা কারণে সেন-রাজ্যকালের পরিণতি হল বিদেশী শক্তির কাছে পরাভব। কিন্তু পাল ও সেন যুগের সংস্কৃতিবৈভব ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা।

শিল্পে মানবিক আদর্শ

দক্ষিণ ভারতের ভূমিকা

দক্ষিণ ভারতের আদিকথা

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে উপেক্ষার মনোভাব

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসকে সাধারণত যেন উত্তর ভারতের ইতিহাসের ক্রোড়পত্ররূপে পরিগণিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণার পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গৌরব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। ইতিহাস-গ্রন্থাদিতে তাই দক্ষিণ ভারতের উল্লেখ ও আলোচনা যেন একটা হ্রস্ব স্থান অধিকার করে আছে, উত্তর ভারতের তুলনায় তার গুরুত্ব অল্প বলে প্রতিভাত হয়েছে। অধুনা এই ধারার অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে। বহু প্রাচীনকালে আর্যাবর্তের প্রভাব-বর্জিত অবস্থায় দক্ষিণাপথে সভ্যতার যে বিশিষ্ট বিবর্তন ঘটেছিল, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে বিভিন্ন অঞ্চলে মানব সংস্কৃতি যে অগ্রসর হয়ে আসছিল, ইতিহাসের কোন লিখিত বর্ণনার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই যে আমরা সেখানে লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন জনসমষ্টির সংবাদ পাই, তা আজ কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

দক্ষিণাপথে আর্য সভ্যতার প্রভাববর্জিত স্বকীয় সভ্যতার বিকাশ

দ্রাবিড়রা কি বহিরাগত ?

দ্রাবিড় বলে বর্ণনা করা যেতে পারে এমন অনেকগুলি দল যে বিদেশ থেকে এসে দক্ষিণ ভারতে বসবাস শুরু করেছিল, কোন কোন পণ্ডিত তা মনে করলেও তার স্বপক্ষে কোন সাক্ষ্য নেই। ভারতবর্ষের দক্ষিণে বা উত্তরে যারা এদেশেরই অধিবাসী তারা বিদেশাগতদের সহায়তা বিনা সভ্যতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে না মনে করার বিন্দুমাত্র যুক্তি নেই। উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতেও আদিম জাতিগুলি পিছিয়ে পড়ে পাহাড় এবং অরণ্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু তাতে দক্ষিণ ভারতে সভ্যতার স্বকীয় বিকাশে কোন প্রচণ্ড বাধা দেখা দেয় নি।

খ্রীষ্টপূর্ব যুগে দক্ষিণের সহিত মধ্য প্রাচ্যের যোগাযোগ

খ্রীষ্টজন্মের এক হাজার বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাসের যে অধ্যায় বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, তাতে দেখা যায় যে সমুদ্রপারে মেসোপটেমিয়া, মিশর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরকূলস্থ বন্দরগুলির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম তটের বাণিজ্য সম্বন্ধ

আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ইহুদীদের ইতিহাসে ডেভিড, সলোমন প্রভৃতি নায়কদের সময়ে "ওফির" বন্দরে দক্ষিণ ভারতের পণ্যদ্রব্য আসা-যাওয়া করছে বলে শোনা যায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণ ভারতের এই বৈদেশিক বাণিজ্য উত্তর ভারতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থাতেই চলেছিল। অতীতের অন্ধকার অধ্যায়ে দক্ষিণ ভারত থেকে পূর্ব ও পশ্চিম অভিমুখে সমুদ্র বেয়ে জনসমষ্টির গতায়াত হয়তো ঘটেছিল, পশ্চিমে আফ্রিকার সন্নিকটস্থ মাদাগাস্কার দ্বীপ থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতবাসীরা হয়তো ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোন তথ্য এখনও উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

দক্ষিণ ভারতের জনসমষ্টির সম্ভাব্য ব্যাপ্তি

রামায়ণে দেখা যায় যে লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করে রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যা অঞ্চলে (বর্তমানে মহীশূরের অন্তর্গত বেলারী এলাকা) উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সভ্য মানুষের বসবাস লক্ষ্য করেন নি। মহাভারতে দক্ষিণ ভারতের পরিচিতি অবশ্য অনেক বেড়েছে বলে বুঝা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক যখন পর্বতগাত্রে তাঁর অনুশাসন সাম্রাজ্যের সর্বত্র খোদিত করে দিচ্ছিলেন, তখন বেশ মনে হয় যে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিস্তৃত অঙ্গনে দক্ষিণ ভারতেরও স্থান রয়েছে, যাকে আর্য সভ্যতা বলা চলে তারই প্রসার দাক্ষিণাত্যে ঘটেছে। মহীশূর পর্যন্ত দক্ষিণাপথের বিভিন্ন অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়েছিল, মহীশূরে চিতলদুর্গ জেলায় তাঁর শিলালিপি রয়েছে। চোল, চের, পাণ্ড্য, দক্ষিণ ভারতের এই বিখ্যাত ত্রি-রাজ্য সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হলেও তারা অশোকের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করেছিল। আরও দক্ষিণে গিয়ে সিংহল দ্বীপে যে অশোক ধর্মপ্রচারক দল পাঠিয়েছিলেন, তা সুবিদিত। এই সব ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর ভারতের সভ্যতা দক্ষিণে অনুপ্রবেশ করছিল, আর ক্রমশ সংস্কৃতির দিক থেকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের পার্থক্য হ্রাস পেয়ে আসছিল, এবং চোল, পাণ্ড্য, চের ইত্যাদি রাজ্য ভারতবর্ষীয় রাজ্যরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। সমুদ্রের সান্নিধ্য এবং পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে চলতে থাকল।

রামায়ণ ও মহাভারতে দক্ষিণ ভারতের কথা

অশোকের সমকালীন দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণী স্বকীয়তাসহ উত্তর-দক্ষিণের সমন্বয়

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু বলা হয়েছে। শোনা যায় যে এক স্পেন ছাড়া

রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য

অন্য সব দেশের চেয়ে ইতালীতে ভারতীয় পণ্য আমদানি হত বেশী। প্লিনির হিসাব থেকে জানা যায় যে আমদানি-রপ্তানি ব্যাপারে প্রতি বৎসর রোম থেকে ভারতবর্ষ পাঁচ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত লাভ করত। সম্প্রতি পণ্ডিচেরীর নিকটে আরিকামেডু নামক স্থানে খননকার্যের ফলে দক্ষিণ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া গেছে। পশ্চিম উপকূলে মুজিরিস্ (বর্তমানে ক্র্যাঙ্গানোর) এবং পূর্ব উপকূলে আরিকামেডু ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেখানে বহু সংখ্যক রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, তদানীন্তন সমৃদ্ধির বহু পরিচয় মিলেছে। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকে রচিত তামিল সাহিত্য থেকেও এর সমর্থনসূচক বিবরণ দেখা যায়। কাবেরীপত্তনম্ নগরের বর্ণনা উপলক্ষে প্রাচীন তামিল গ্রন্থে লিখিত হয়েছে: "বন্দরের কাছে খোলা ছাদ আর গুদাম-ঘর আর মৃগচক্ষুর মতো গবাক্ষ-সমন্বিত গম্বুজের উপর সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়েছে। যে যবনদের ঐশ্বর্য যেন অক্ষয়, তাদের বাসস্থানগুলি নানা জায়গাতে চোখে না পড়ে পারে না। বন্দরে বহু দূর দেশ থেকে আগত নাবিকদের দেখা যাচ্ছে।"

প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের উদ্ধৃতি

ঐ সব অঞ্চলে রোমান মুদ্রা ছাড়া রোমান পাত্রও অনেক পাওয়া গেছে। সম্ভবত রোমান মুদ্রার বেশ প্রচলন ছিল, আর এদেশ থেকে মসলা, কাপড়, প্রবাল প্রভৃতি রপ্তানির বদলে রোম থেকে আমদানি হত মৃৎপাত্র, কাঁচের জিনিস আর সোনা। সন্দেহ নেই যে সুদূর দক্ষিণের ত্রি-রাজ্য এভাবে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মেগাস্থিনীসের "ইণ্ডিকা" থেকে দেখা যায় যে পাণ্ড্য রাজ্যের কথা তিনি শুনেছিলেন। তিনি এবং প্লিনি উভয়েই লিখেছেন যে পাণ্ড্য রাজারা হেরাক্লিস-দেবতার একমাত্র কন্যার বংশধর। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে এই হেরাক্লিস-কাহিনীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লিখিত হচ্ছে; কিংবদন্তী অনুসারে এই কন্যা শূরসেনদের দেশ থেকে (শৌরসেনী) দক্ষিণাপথে পিতৃদত্ত আসমুদ্র ভূভাগের অধীশ্বরী হয়েছিলেন।

আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য

পাণ্ড্য রাজবংশের ইতিকথা

আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে "মহাভাষ্য"-রচয়িতা পতঞ্জলি কাঞ্চীপুরমের উল্লেখ করেছেন। বৈয়াকরণ কাত্যায়ন "পাণ্ডু" শব্দ থেকে "পাণ্ড্য" দেশের উৎপত্তি নির্ণয় করেছেন, চোল ও কেরল দেশ সম্বন্ধেও তিনি জানতেন। অশোক-অনুশাসন থেকে জানা যায় যে সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র, পাণ্ড্য ও চোল রাজ্য এবং তাম্রপর্ণী তাঁর সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল। কৌটিল্য

পাণ্ড্য, কেরল ও চোল রাজ্যের প্রাচীনত্ব

অর্থশাস্ত্রে দক্ষিণ দেশের মহেন্দ্র পর্বতের কাছে এবং তাম্রপর্ণীতে মুক্তার সন্ধান পাওয়া যায় বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগে পেরিপ্লাস-গ্রন্থে সাতবাহন সাম্রাজ্য এবং সুদূর দক্ষিণে বিভিন্ন বন্দরের যে উল্লেখ আছে, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দ্বিতীয় শতকে কলিঙ্গরাজ খারভেল-এর হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে কথিত আছে যে তিনি সম্মিলিত তামিল রাজ্যকে পরাজিত করে বহু প্রবাল নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ থেকে দক্ষিণ ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্র-সংগঠন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়।

পেরিপ্লাস-গ্রন্থে সুদূর দক্ষিণের উল্লেখ

খারভেল কর্তৃক তামিল রাজ্য জয়ের কথা

কেরলপুত্র রাজ্য বোধ হয় ছিল বর্তমান ত্রিবাঙ্কুরের একাংশ; সতিয়পুত্র রাজ্য উত্তর মালাবারে অবস্থিত ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। পাণ্ড্য রাজ্য ছিল বর্তমান মাদুরা জেলাকে কেন্দ্র করে; প্রথমে করকাই ও পরে মাদুরা এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। পাণ্ড্য রাজ্যের কিছু উত্তরে বর্তমান তিরুচিরাপল্লী ও তাঞ্জোর নিয়ে চোলরাজ্য গঠিত ছিল; উরাইউর (প্রাচীন ত্রিচিনাপল্লী) ছিল এর রাজধানী। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তামিলরা সিংহল অধিকার করে। পাণ্ড্য রাজার কাছ থেকে রোমান সম্রাট অগস্টস্-এর সভায় দূত প্রেরিত হয়েছিল। তামিল সাহিত্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম; সেখানে এই কালের বহু উল্লেখ আছে। প্রথম "সঙ্গম্" বা সাহিত্য পরিষদ সে যুগে তামিল দেশে স্থাপিত হয়েছিল; "শিলপ্পডিকারম্" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তামিল মহাকাব্য তখন রচিত হয়েছিল। যাই হোক, দক্ষিণ ভারতের রাজাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটত। মনে হয় যে প্রথমে পশ্চিম উপকূলে উদিয়ন্ জেরল্ নামে এক চেরবংশীয় রাজা খুব প্রবল হয়ে ওঠেন (আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি নাকি বহু দেশ জয় করেছিলেন, সমুদ্রপথে যুদ্ধ জয় করে বহু যবনকে বন্দী করেছিলেন, হিমালয় পর্বত পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করেছিলেন। অবশ্যই এ কথায় অতিরঞ্জন রয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ইতিবৃত্তে এই রাজা সুবিখ্যাত। তাঁর পুত্র সেরন্ সেঙ্গুতুবন্ অনুরূপ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। কিছু পরে (আনুমানিক ১৯০ খ্রীষ্টাব্দ) কারিকলচোল সিংহলের কিয়দংশ জয় করেন এবং পাণ্ড্য ও চের-দের পরাভূত করে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেন। ভূমির উন্নতি, পূর্তকার্য, সরোবর-খনন ইত্যাদি কল্যাণকর কর্মের জন্য তিনি বিখ্যাত। চোল বংশের আধিপত্য কিছুকাল চলার পর কাঞ্চীর পল্লভবংশীয়েরা দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করে।

সুদূর দক্ষিণের রাজ্যগুলির স্থান নির্ণয়

পাণ্ড্য রাজের রোমে দূত প্রেরণ

তামিল সাহিত্য

চেরবংশীয় উদিয়ন্ জেরল্

কারিকলচোল

পল্লভ বংশের প্রাধান্যলাভ

চালুক্য

দক্ষিণ ভারতে সুদীর্ঘ সাম্রাজ্য পরম্পরা

দক্ষিণ ভারতের উত্তরাংশে সাতবাহন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সাতবাহন শক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিন্ধ্যের উত্তরে বাকাটক বংশ এবং দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য বংশ আর সুদূর দক্ষিণে পল্লভেরা রাজ্য বিস্তার করে। সাম্রাজ্যের পরম্পরা দক্ষিণাপথে রক্ষিত হতে থাকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ; বিজয়নগর-রাজারা নিজেদের তখনও চালুক্য চূড়ামণি বলে ঘোষণা করতে থাকেন।

অনমনীয় দক্ষিণ

সাতবাহনদের পর চালুক্যদের প্রাধান্যলাভ

চালুক্যদের পরিচয়

গুপ্ত-রাজ্যকালে এবং তার পরবর্তী যুগে উত্তর ভারতের কোন রাজশক্তি সুদূর দক্ষিণে তামিল অঞ্চল কখনও জয় করতে পারে নি, এমনকি দাক্ষিণাত্যে, অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের উত্তরাংশেও আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি। ষষ্ঠ শতাব্দীতে, দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন সাম্রাজ্যের যে ঐতিহ্য, তারই বাহক হয়ে চালুক্যবংশীয় রাজারা প্রবল হয়ে ওঠে, ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বাদামি অথবা বাতাপি নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। চালুক্যেরা নিজেদের সূর্যবংশীয় বলে গর্ব করত, অনেকে তাদের রাজপুতানা থেকে আগত গুর্জর জাতির এক শাখা মনে করেন, কিন্তু সম্ভবত তারা ছিল স্থানীয় একটি গোষ্ঠী, তদানীন্তন রাষ্ট্রকূট রাজাদের সঙ্গে বহুদিন সঙ্ঘর্ষের পর আধিপত্য স্থাপনে সাফল্য লাভ করে। চালুক্যদের প্রথম শক্তিশালী রাজা জয়সিংহ রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে বংশের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। জয়সিংহের পুত্র প্রথম পুলকেশী অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

রাজা জয়সিংহ

দ্বিতীয় পুলকেশীর সামরিক কৃতিত্ব

পুলকেশীর রাজখ্যাতি

চালুক্য বংশের প্রধান নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশী সপ্তম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে হর্ষবর্ধনের অভিযানকে বিধ্বস্ত করেন, "উত্তরাপথনাথে"র এই বিপর্যয় সঙ্ঘটন করার জন্য তাঁর সঙ্গত গর্বের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসাং-এর বৃত্তান্তে দ্বিতীয় পুলকেশী সম্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। দক্ষিণ মালব ও গুজরাট জয় করে পুলকেশী দক্ষিণ ভারতের সুদূর অঞ্চলে অভিযান করেন। পাণ্ড্য, চের (কেরল) ও চোল রাজ্যকে নিজের আধিপত্যে আনার চেষ্টা করেন। তৎকালীন পল্লভরাজ মহেন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করায় পুলকেশীর শক্তি ও যশ প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কথিত আছে যে পারস্যরাজ খসরুর সঙ্গে তাঁর দৌত্য-বিনিময় হয়েছিল ; তদানীন্তন এশিয়ার একজন প্রকৃত পরাক্রান্ত রাজা বলে তখন পুলকেশী সর্বস্বীকৃত। কিন্তু শেষ জীবনে পুলকেশীকে আবার

বিড়ম্বিত হতে হয়েছিল। পল্লভরাজ্য ইতিমধ্যে সতর্ক প্রযত্নে শক্তি বৃদ্ধি করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধে অগ্রসর হল। সম্ভবত ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশী প্রতিদ্বন্দ্বী পল্লভরাজের কাছে পরাভূত হলেন, রাজধানী বাতাপি শত্রু-অধিকারে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হল, স্বয়ং পুলকেশী মৃত্যুমুখে পতিত হলেন বলে শোনা যায়। রাজ্যের পূর্বদিকে সরে গিয়ে চালুক্য বংশের এক-শাখা বেঙ্গিতে পূর্ব চালুক্য নামে এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনা করতে বাধ্য হল। পল্লভদের হাতে পুলকেশীর পরাজয়

পল্লভ

পল্লভ-বংশীয়েরা সম্ভবত একদা সাতবাহন সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশে শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় তারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। সমুদ্রগুপ্ত যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, তখন বিখ্যাত কাঞ্চীনগরীতে তারা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ-রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বিজিত রাজাদের মধ্যে পল্লভরাজ বিষ্ণুগোপের নামোল্লেখ রয়েছে। তখনও পল্লভরাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে নি ; চোল রাজবংশ রাজধানী কাঞ্চী থেকে বিতাড়িত হয়েও তখনও প্রভূত শক্তির অধিকারী ছিল, পাণ্ড্যরাজ্যও তখনও একেবারে নির্বীর্য হয়ে পড়ে নি। যাই হোক, বিদেশাগত যে পহ্লবদের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে পল্লভ নামের সাদৃশ্য থেকে কোন কোন পণ্ডিত এক সময় মনে করতেন যে সম্ভবত তাদের মধ্যে জাতি-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এ সম্বন্ধে পাণিক্কর বলেছেন যে এদেশের যা কিছু ভালো তার মধ্যে যেমন করে হোক বিদেশী প্রভাব খুঁজে পাওয়ার ঝোঁক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রায়ই দেখা দিত, আর পল্লভ ও পহ্লবের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার হল ঐ ঝোঁকেরই আর এক দৃষ্টান্ত ! কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার-প্রমুখ ইতিহাসবেত্তার গবেষণায় সম্পূর্ণ প্রমাণ হয়েছে যে তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না। পল্লবদের পরিচয় পল্লভরাজ বিষ্ণুগোপ পল্লভরা পহ্লব নহে

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কাঞ্চীকে কেন্দ্র করে পল্লভ রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু তখনও ক্রমাগত বাতাপির বিখ্যাত চালুক্য রাজ্যের সঙ্গে তার সঙ্ঘর্ষ চলছিল। প্রথম দিকে পল্লভ আখ্যা নাকি চারটি স্বতন্ত্র বংশ সম্পর্কে প্রযুক্ত ছিল। প্রায় ছত্রিশজন রাজার নাম পাওয়া গেছে, পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁদের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে সংবাদ মেলে। অবশ্য সর্বদাই তাঁদের শক্তি যে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা নয়। আনুমানিক ৬২৫ থেকে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ সুপ্রতিষ্ঠ পল্লভ শক্তি

নরসিংহবর্মন

হল পল্লভরাজ নরসিংহবর্মনের রাজ্যকাল; পল্লভ-শক্তি তখন উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল। হর্ষবর্ধন-বিজয়ী দ্বিতীয় পুলকেশীকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত ও নিহত করে এবং চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধিকার করে নরসিংহবর্মন বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। উত্তরে কৃষ্ণা নদী এবং দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র মাদুরার সন্নিকটস্থ অঞ্চল পর্যন্ত পল্লভ রাজ্যের বিস্তার হয়েছিল, পল্লভ শাসনে তৎকালীন ভারত সভ্যতার যে বিকাশ ঘটে, আজও মহাবলিপুরমের অপূর্ব স্থাপত্যে তার বিস্ময়কর পরিচয় মিলছে। কিন্তু বিভিন্ন রাজবংশের ভাগ্যচক্র তখন ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছিল; আবার চালুক্যেরা তাদের নষ্ট গৌরব উদ্ধার করে, আনুমানিক ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী নগরী অধিকার করেন। চালুক্য শক্তিও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধিতে রাষ্ট্রকূটবংশের নূতন সুযোগ আসে, নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ পল্লভ রাজশক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করেন।

পল্লভ রাজ্যের বিস্তৃতি

পল্লভ শাসনে ভারত সভ্যতার বিকাশ

পল্লভ শক্তির পতন

পল্লভ যুগের অবদান

ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে পল্লভ যুগের অবদান ইতিহাস কখনও বিস্মৃত হবে না। নরসিংহবর্মনের এক নাম ছিল মহামল্ল; পূর্ব উপকূলে মহামল্লপুরম্ বা মহাবলিপুরম্ ছিল তদানীন্তন পল্লভ রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র, হিউয়েনসাং তার চমৎকার বর্ণনা লিখে গেছেন। পল্লভ যুগের শিল্পীরা তখন থেকে স্থাপত্যে যে নব সৃষ্টি-প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে গেছেন, দক্ষিণ ভারতের অপরিমেয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে শিল্পরীতির বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যকে সেই প্রতিভার স্ফুরণ বলা যেতে পারে। প্রায় সমুদ্রবক্ষে নির্মিত মন্দির, অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিষয়ের প্রস্তর-আলেখ্যরূপ "সপ্তরথ", যার প্রত্যেকটি এক-একটি বিরাট শিলাখণ্ড থেকে খোদিত, "গঙ্গাবতরণ" দৃশ্যে গিরিগাত্রে দেবদেবী, নরনারী ও জীবজন্তুর প্রাণবন্ত প্রতিকৃতি ইত্যাদি শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন মহাবলিপুরম্‌কে বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পতীর্থে পরিণত করে রেখেছে।

শিল্প

মহাবলিপুরম্

সাহিত্য

পল্লভ রাজারা প্রায়ই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; নরসিংহের পিতা মহেন্দ্রবর্মন নাট্যকার ছিলেন, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারবী ও দণ্ডিন্ পল্লভ রাজসভায় সম্মানিত আসন পেয়েছিলেন। পল্লভ শাসনের প্রথম দিকে অনুশাসন ইত্যাদি সাতবাহন বংশের অনুকরণে প্রাকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হত, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে সংস্কৃতের ব্যবহার লক্ষিত হয়। সম্ভবত কাঞ্চীর বহু বিদ্যায়তনে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন

বাড়তে থাকে। তাই বলা হয়েছে যে পল্লভ শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে আর্যাবর্তের সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রথম সুপ্রতিষ্ঠ হতে থাকে। আপস্তম্ব ও বৌধায়ন-কৃত ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণদের পল্লভ রাজ্যে বসবাসের অনুমতি-বিষয়ক অনুশাসনের সন্ধান পাওয়া যায়; এর অর্থ যে দক্ষিণ ভারতে আর্যাবর্তের ধর্মশাস্ত্রীয় বিধান ক্রমশ রাজশক্তির আনুকূল্য পেয়ে স্বীকৃত হচ্ছে। কাঞ্চী নগরীতে সংস্কৃত ভাষার চর্চা সম্বন্ধে হিউয়েনসাং-এর সাক্ষ্য রয়েছে; কথিত আছে যে স্বয়ং দিঙ্‌নাগ কাঞ্চীতে অধ্যয়ন করেছিলেন। শুধু দক্ষিণ ভারত নয়, ভারতবর্ষের বাইরে সুদূর প্রাচ্য দেশগুলিতে সংস্কৃতের প্রসার সঙ্ঘটনে কাঞ্চীর প্রভূত অবদান ছিল।

দক্ষিণী সংস্কৃতিতে আর্যাবর্তের পূর্ণ প্রভাব

সংস্কৃত ভাষার প্রসার

হিউয়েনসাং কাঞ্চী ভ্রমণের সময় লক্ষ্য করেন যে বৌদ্ধ ও জৈন আচার্যেরা সেখানে আর পূর্বের ন্যায় প্রভাবশালী নন; একদা দক্ষিণে জৈন প্রভাব খুব বেশী থাকলেও ক্রমশ সেখানে পরিবর্তন আসছিল। পল্লভ রাজারা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; কেউ কেউ শৈব হলেও সাধারণত তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব। অষ্টম শতাব্দীতে শিব ও বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রচণ্ড জোয়ার এসেছিল, আজও শৈব ও বৈষ্ণব সাধুসন্তের প্রভাব দক্ষিণ ভারতের ধর্মজীবনে প্রকট। মনে হয় যে সুন্দরমূর্তি-প্রমুখ এই শৈব ও বৈষ্ণব সাধুরা প্রধানত পল্লভযুগের লোক, তখনই তামিল ভাষায় বিপুল এক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তিধারা নিয়ে। বাস্তবিকই পল্লভ রাজ্যকাল ইতিহাসে এক গৌরবমণ্ডিত অধ্যায় রচনা করে রয়েছে।

ভক্তি আন্দোলন

আনুমানিক ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য যে পল্লভদের হাতে পূর্বপুরুষের অপমান-স্মৃতি মুছে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করে পল্লভ রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন, তা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কথিত আছে যে বিক্রমাদিত্য কাঞ্চীর প্রধান স্থপতি সর্বসিদ্ধি আচার্যদের নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং এঁদেরই একজন বিক্রমাদিত্যের মহিষীর আদেশে লোকেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন। চালুক্যশক্তি স্থায়ী হয় নি, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পল্লভ ও চালুক্য উভয় রাজ্যই সমুদ্রপথে শক্তি বিস্তারে চেষ্টিত ছিল। একটি অনুশাসনে দেখা গেছে যে পুলকেশী একশো জাহাজ নিয়ে শত্রুরাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার ও সেখানকার রাজ্যগুলির সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনে পল্লভ রাজারা আগ্রহান্বিত ছিলেন। যাই হোক, অষ্টম

চালুক্যরাজ কর্তৃক কাঞ্চী অধিকার

চালুক্যদের সমুদ্রপথে শক্তি বিস্তারের প্রয়াস

শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চালুক্যেরা বাতাপি নগর থেকে তাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। আনুমানিক ৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে দন্তিদুর্গ নামে এক দলপতির নেতৃত্বে রাষ্ট্রকূটেরা চালুক্যদের পরাভূত করে। এই রাষ্ট্রকূট বংশকে দশম শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগ পর্যন্ত, অর্থাৎ দুইশত বৎসরের কিছু বেশী এক প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিরূপে আমরা দেখতে পাই।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গের হস্তে চালুক্যদের পতন

রাষ্ট্রকূট

রাষ্ট্রকূটদের পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণের সহচর, যাদববংশীয় সাত্যকির বংশধর বলে রাষ্ট্রকূটরা আত্মপরিচয় দিত, কিন্তু তাদের উদ্ভব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য নেই। বাংলার পালবংশ যেমন সাধারণ মানুষের পর্যায় থেকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, রাষ্ট্রকূটদের সম্বন্ধেও তেমনই কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে তারা ছিল আন্ধ্র দেশের কৃষক, (তেলুগু এলাকার 'রেড্ডি'-দের সঙ্গে সম্পর্কও কেউ কেউ খুঁজে বার করেছেন)। চালুক্য শাসনে হয়তো তারা রাজকার্যে উন্নতি লাভ করে প্রদেশের ভার পায়, এবং তারই সুযোগে পরে ক্ষমতা দখল করতে পারে। সম্ভবত চালুক্যবীর দ্বিতীয় পুলকেশীর সমসাময়িক ছিলেন রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিবর্মা। পরে প্রকৃত শক্তি প্রসার করেন দ্বিতীয় দন্তিবর্মা বা দন্তিদুর্গ; তাঁর হাতে চালুক্যদের পরাভব-কথা একটু আগে বলা হয়েছে। কথিত আছে যে দন্তিদুর্গ কলিঙ্গ, কোশল, কাঞ্চী ইত্যাদিও নাকি জয় করেছিলেন। এর পর রাজাসনে বসেন কৃষ্ণরাজ; অল্পকালেই রাজত্ব শেষ হয়, আর তখন রাজা হন গোবিন্দরাজ। ইলোরার অপরূপ কৈলাসমন্দির কৃষ্ণ ও গোবিন্দরাজের রাজ্যকালে নির্মিত হয়েছিল বলেই তাঁরা একেবারে ইতিহাসে বিস্মৃত হন নি। এর কিছু পরে সিংহাসন অধিকার করেন ধ্রুব, যাঁর নাম ও কীর্তির সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। ধ্রুব ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম; স্বল্পকাল রাজ্য করলেও গুর্জর-প্রতীহার বংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে বৎসরাজকে সম্পূর্ণ পরাভূত করার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ দুর্জয় শক্তির অধিকারী ছিলেন; গুর্জররাজ স্বনামধন্য দ্বিতীয় নাগভটকেও তিনি পরাজিত করেন। বাংলার পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপাল এবং কনৌজে তাঁর আশ্রয়পুষ্ট চক্রায়ুধ প্রবল পরাক্রান্ত দ্বিতীয় নাগভটের বিরুদ্ধে তৃতীয় গোবিন্দের শরণ নিয়েছিলেন; এই ঘটনা থেকে গোবিন্দের তদানীন্তন গরিমার কথা জানা যায়। সন্দেহ নেই যে তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্ট্রকূটশক্তিকে

রাষ্ট্রকূটদের ক্ষমতালাভ

দন্তিদুর্গ

কৃষ্ণরাজ

গোবিন্দরাজ

ধ্রুব

তৃতীয় গোবিন্দ

তৃতীয় গোবিন্দের কৃতিত্ব

কিছুকাল ভারতবর্ষের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। উত্তরে নর্মদা থেকে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। বার বার তৎকালীন ভারতবর্ষের শক্তিকেন্দ্র কনৌজ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূট রণনৈপুণ্যের আস্বাদ পেয়েছিল।

অমোঘবর্ষ

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষকে রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলা হয়েছে (আনুমানিক ৮১৫-৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)। পিতার তুলনায় যুদ্ধ ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব অল্প; পূর্ব-চালুক্য রাজাদের পরাজিত করা এবং গুর্জররাজ প্রথম ভোজের দক্ষিণ ভারত অভিমুখে অগ্রগতি রোধ করা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য তাঁর ঘটেছিল বলে জানা নেই। কিন্তু অপর ক্ষেত্রে তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছিলেন। মালখেদ্ বা মান্যক্ষেত্র নগরে তিনি এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। বিদ্যোৎসাহী ও ধার্মিক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল; শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। রাজকোষ থেকে অকাতরে অর্থব্যয় করে রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি তিনি করেন; ইলোরায় গুহামন্দির নির্মাণে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জৈন গ্রন্থে কথিত হয়েছে যে অমোঘবর্ষ জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর আনুকূল্যে জীনসেন "পার্শ্ব অভ্যুদয়" নামে জৈনদের এক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্য, গণিত প্রভৃতির চর্চায় অমোঘবর্ষের উৎসাহ ও অকৃপণ আনুকূল্য ছিল।

মান্যক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন
শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান

বাণিজ্যের তৎকালীন অগ্রগতিও স্মরণীয়; অমোঘবর্ষের রাজ্যকালে ভৃগুকচ্ছ (বর্তমান ভরোচ) পশ্চিম উপকূলে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দর বলে পরিগণিত ছিল। বিদেশী বণিকদের তখন রাষ্ট্রকূট রাজ্যে গতায়াত খুব ছিল; তাদেরই একজন, আরবদেশীয় সুলেমান যে বিবরণ লিখে গেছেন তার গুরুত্ব কম নয়। মনে হয় সেই কালে গুর্জর-প্রতিহারদের সঙ্গে আরবদের ক্রমাগত সঙ্ঘর্ষ ঘটতে থাকলেও রাষ্ট্রকূটরাজ্যে বহু আরব বণিকের সমাগম হত, সম্ভবত উভয় পক্ষের বাণিজ্যব্যপদেশে যথেষ্ট লাভ হত। সুলেমান রাষ্ট্রকূট রাজাদের "বল্হব্" নাম লিখে গেছেন; অনুমান করা হয়েছে যে এই "বল্হব্" শব্দটি রাষ্ট্রকূট রাজাদের "বল্লভ" উপাধির অপভ্রংশ। অমোঘবর্ষের খ্যাতি যে কিরূপ ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন সুলেমান বলেন যে তিনি তৎকালীন বিশ্বের চারজন শ্রেষ্ঠ রাজার অন্যতম ছিলেন; অপর তিনজন হলেন বোগদাদের খলিফা, কন্স্টান্টিনোপলের সম্রাট এবং চীনদেশের সম্রাট।

সমসাময়িক বাণিজ্যিক যোগাযোগ

আরব সুলেমানের বিবরণ

প্রায় ৬৩ বৎসর রাজ্য শাসন করে অমোঘবর্ষের মৃত্যু হয়। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে তৃতীয় ইন্দ্র এবং তৃতীয় কৃষ্ণ পরাক্রান্ত নরপতি বলে খ্যাতি লাভ করেন ; ইন্দ্র গুর্জর-প্রতীহারদের বিরুদ্ধে এবং কৃষ্ণ চোল রাজবংশের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আনুমানিক ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় কৃষ্ণের অধীনস্থ এক সামন্তরাজ, দ্বিতীয় তৈল, যিনি চালুক্যবংশীয় বলে নিজের পরিচয় দিতেন, রাষ্ট্রকূটশক্তির বিলোপ সাধনে সমর্থ হন। তারপর বহুদিন ধরে দক্ষিণে চোল ও চালুক্যের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে ; উত্তর ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গজনীর মাহ্‌মুদ যখন এদেশের বহু রাজবংশের নিপাত ঘটাচ্ছিলেন, তখনও সে দ্বন্দ্বের অবসান দেখা যায় নি।

তৃতীয় ইন্দ্র ও তৃতীয় কৃষ্ণ

রাষ্ট্রকূট শক্তির পতন

কল্যাণের চালুক্য বংশ

তৈল-প্রতিষ্ঠিত চালুক্য বংশের প্রাধান্য

রাষ্ট্রকূটশক্তি যখন অন্তর্হিত, তখন দক্ষিণে, কর্ণাটে ও মধ্যভারতে তৈল-প্রতিষ্ঠিত এই চালুক্য বংশ রাজত্ব করতে থাকে। এদের রাজধানী ছিল কল্যাণ (আধুনিক হায়দরাবাদ অঞ্চলে অবস্থিত)। এই বংশের প্রধান রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য চোল রাজ্যকে পরাভূত করেন ; বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল আনুমানিক ১০৭৬-১১২৭ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর সভাকবি বিহ্লন "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" গ্রন্থে রাজার বিজয় কাহিনী বিবৃত করেছেন; সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী বলে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের প্রসিদ্ধি আছে। চোল রাজ্যের সঙ্গে ক্রমাগত সঙ্ঘর্ষের ফলে আনুমানিক ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই নব চালুক্য বংশের রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। এদেরই শাসিত অঞ্চলগুলিতে ক্রমশ বিভিন্ন রাজবংশ মাথা তুলে উঠতে থাকে ; ওয়ারঙ্গলে কাকতীয়, মহারাষ্ট্রে যাদব এবং মহীশূরে হয়সল বংশের সাক্ষাৎ এই ভাবে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

সভাকবি বিহ্লন

নব চালুক্য বংশের অবলুপ্তি

অঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব

তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ ও হিন্দুরাজ্যের অবসান

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিদেশাগত তুর্কী মুসলমান আক্রমণকারীরা সমগ্র উত্তর ভারত অধিকার করে। কিন্তু মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে আরও একশত বৎসর বিভিন্ন হিন্দুরাজ্য নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুজরাটের চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশ, মহারাষ্ট্রে অবস্থিত দেবগিরির যাদব বংশ, তার দক্ষিণে হয়সল বংশ এবং পূর্বে ওয়ারঙ্গলে কাকতীয় বংশ। সোলাঙ্কিরা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্বাধীন থাকতে পেরেছিল ; যাদব এবং হয়সল

রাজ্য কিছুকাল শক্তি বৃদ্ধিতে সমর্থ হলেও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী আক্রমণের আঘাতে বিনষ্ট হয়, কাকতীয়দেরও অনুরূপ অবস্থা ঘটে। ভারতের পূর্ব উপকূলে গোদাবরী ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে উড়িষ্যার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বেশ কিছুকাল পরাধীনতার বন্ধন এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। গঙ্গবংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অনন্তবর্ম চোড়গঙ্গ; আনুমানিক ১০৭৬-১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর রাজ্যকাল। উড়িষ্যার মন্দিরশিল্প অনন্তবর্মের শাসনে প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। গঙ্গবংশ নিঃশেষ হওয়ার পরও বহুদিন উড়িষ্যায় স্বাধীন হিন্দুরাজ্য টিকে ছিল।

উড়িষ্যার গঙ্গবংশ ঃ

অনন্তবর্ম চোড়গঙ্গ

সুদূর দক্ষিণের ত্রিরাজ্য ঃ চোল, চের ও পাণ্ড্য

এবার সুদূর দক্ষিণের চোল, চের (কেরল) ও পাণ্ড্য, এই ইতিহাস-খ্যাত ত্রি-রাজ্যের দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার। এদের পূর্ব-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আগেই দেওয়া হয়েছে; অশোকের শিলালিপিতে, এবং গ্রীক, রোমান ও তামিল রচনায় এদের উল্লেখ আছে। ভারতের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত চোল রাজ্য পল্লভ শক্তির পতনের পর বেশ প্রবল হয়ে ওঠে! খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত চোল রাজ্য পল্লভদের অধীন ছিল; তখন পূর্বতন নরপতি, সিংহল-বিজেতা, কাবেরীপত্তনমের নির্মাতা, কারিকল-এর (প্রথম শতাব্দী) শৌর্যবীর্যের স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছিল। আবার পল্লভ গৌরব অস্তমিত হওয়ার পর থেকে চোল রাজ্যের পুনরুত্থান ঘটে। নবম শতাব্দীতে বিজয়ালয় নামে এক চোল রাজা এই নবশক্তির প্রতিষ্ঠাতা; পুত্র আদিত্য রাজ্যের স্বাধীন শক্তিকে আরও সুদৃঢ় করে তোলেন; তারপর আসেন প্রথম পরান্তক (আনুমানিক ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ), বীর যোদ্ধা বলে তাঁর খ্যাতি। পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করে সেখানকার রাজধানী মাদুরা নগরী অধিকার এবং সমুদ্র পার হয়ে সিংহল আক্রমণের কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেন। কিছুকাল অক্ষম কয়েকজন রাজার শাসনে চোল রাজ্যে কথঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আবার চোল গৌরব ফিরে এল যখন সিংহাসন আরোহণ করেন রাজরাজ (৯৮৫-১০১৮ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রবল পরাক্রান্ত এই নরপতিকে প্রায়ই চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিহাসে তাঁকে "মহামহিম" (Rajaraja the Great) আখ্যা সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে।

চোল শক্তির ক্ষমতাবৃদ্ধি

বিজয়ালয় ও আদিত্য

পরান্তক

রাজরাজ

রাজরাজের বিজয়াভিযান

জলে স্থলে তখন চোল রাজ্যের প্রাধান্য স্বীকৃত হচ্ছিল। রাজরাজের বিপুল নৌ-বাহিনী ছিল ; তারই সাহায্যে সিংহলের কিয়দংশ, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি তিনি জয় করেন। চের ও পাণ্ড্য রাজ্যকে তিনি পরাজিত করেন ; পূর্ব-চালুক্যদের পরাস্ত করে বেঙ্গি দখল করেছিলেন।

শিল্প ও স্থাপত্যে অনুরাগ

কিন্তু কেবল যুদ্ধবিজেতা বলে তাঁর খ্যাতি ঘটে নি ; শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য বিষয়ে তাঁর অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তাঞ্জোরের সুবিখ্যাত বৃহদীশ্বর

বৃহদীশ্বর মন্দির

মন্দির নির্মাণের আয়োজন করে রাজরাজ অক্ষয় যশের অধিকারী হয়েছেন ; অনবদ্য এই মন্দির দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অনবদ্য নিদর্শন। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে বহু চিত্র আছে, রাজরাজের যুদ্ধজয়-কাহিনীও লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে ; শিব-উপাসক এই রাজা পরধর্ম

পরধর্মে শ্রদ্ধা

সম্পর্কে শ্রদ্ধাপোষণে পরাঙ্মুখ ছিলেন না ; কথিত আছে যে নেগাপটম্ নামক বন্দরে ব্রহ্মদেশীয়দের এক বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য তিনি প্রভূত অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কলিঙ্গ থেকে সিংহল পর্যন্ত প্রসারিত সাম্রাজ্যের এই অধিপতি চীনদেশে নিজের দূত প্রেরণ করেছিলেন।

রাজেন্দ্রচোল

রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্রচোল (১০১৮-৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) দিগ্বিজয়ী খ্যাতি লাভ করেছিলেন ; কারও কারও মতে রাজেন্দ্রচোলকেই চোল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি গণ্য করা উচিত। যুবরাজরূপে তিনি পিতার সহায়ক ছিলেন, রাজাসনে বসে পিতার অনুসৃত নীতি অবলম্বন করলেন।

দিগ্বিজয় খ্যাতি

চোল নৌ-বাহিনীর খ্যাতি তখন তুঙ্গে ; সমুদ্র অতিক্রম করে ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ রাজেন্দ্রচোল জয় করেন, সুমাত্রার বিখ্যাত শ্রীবিজয় রাজ্য আক্রমণ করেন, ব্রহ্মদেশ থেকে মালয় ও যবদ্বীপ পর্যন্ত বহু অঞ্চল তাঁর

বাণিজ্যের বিস্তৃতি

কর্তৃত্বে আসে। বাণিজ্য-সম্পর্ক তখন চতুর্দিকে বাড়তে থাকে ; পশ্চিমে মালদ্বীপ ও সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত চোল রাজ্যের বাণিজ্য-ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম্

বাংলার পাল বংশীয় রাজা প্রথম মহীপালকে তিনি পরাস্ত করেন ; "গঙ্গই-কোণ্ড" উপাধি ধারণ করে "গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম্" নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, গঙ্গানদীর দেশে জয়লাভের স্মারক রূপে। মন্দির, হর্ম্য, কৃত্রিম হ্রদ ইত্যাদিতে সুসজ্জিত এই রাজধানীতে আজও চোল স্থাপত্যের বহু চমৎকার নিদর্শন রয়েছে। রাজেন্দ্রচোলের মৃত্যুর পর পুত্র

রাজাধিরাজ

রাজাধিরাজ সিংহাসনে বসে রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দমন ও অপর রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, চালুক্য রাজার হাতে তাঁর প্রাণ

অধিরাজেন্দ্র

যায়। পরবর্তী রাজা অধিরাজেন্দ্রের শাসনে রাজ্যে অসন্তোষ ব্যাপক হয়ে

ওঠে ; এক আততায়ীর আঘাতে রাজার মৃত্যু ঘটে। অধিরাজেন্দ্র শৈব ছিলেন, বৈষ্ণবদের সম্পর্কে তাঁর বিদ্বেষ ছিল, আর তাই রামানুজাচার্যের ন্যায় বৈষ্ণবদর্শনে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকে চোল রাজ্য ছেড়ে মহীশূরে আশ্রয় নিতে হয়। রাজেন্দ্রচোলের দৌহিত্র তৃতীয় রাজেন্দ্রচোল "কুলোত্তুঙ্গ" কিছুকাল বংশের কীর্তিধ্বজা উড্ডীন রাখার চেষ্টা করেন, কল্যাণের চালুক্যরাজ এবং উড়িষ্যার গঙ্গরাজের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে ব্যাপৃত হন। তারপর থেকে সুবিশাল চোল সাম্রাজ্যের অধোগতি আরম্ভ হয়ে যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাণ্ড্য রাজ্য চোল শক্তিকে ছাপিয়ে ওঠে। কোনক্রমে চোল রাজ্য টিকে থাকে, আর চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দিল্লীর সুলতানের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে এসে মালিক কাফুর চোল রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেন (১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ)।

তৃতীয় রাজেন্দ্র-চোল কুলোত্তুঙ্গ

চোল শক্তির অবনতি ও বিলুপ্তি

যে পাণ্ড্য রাজ্যের কথা এখনই উল্লিখিত হয়েছে, তার প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। হিউয়েনসাং যখন দক্ষিণাপথ পর্যটন করেন তখন সম্ভবত পাণ্ড্য রাজ্য পল্লভবংশের অধীন ছিল। পাণ্ড্য রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে সুবিদিত হলেন সুন্দরপাণ্ড্য ; কথিত আছে যে তিনি জৈন ছিলেন, পরে শৈবধর্ম গ্রহণ করে জৈনদের উপর অত্যাচার করেছিলেন। চোল, পল্লভ এবং সিংহল রাজ্যের সঙ্গে পরবর্তী যুগে পাণ্ড্য রাজ্যের অবিরাম যুদ্ধ চলেছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চোল রাজ্যের আনুগত্য স্বীকারে পাণ্ড্য রাজ্য বাধ্য হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোল শক্তির অধঃপতন ঘটায় পাণ্ড্য রাজ্য দক্ষিণ ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। প্রখ্যাত ইতালিয়ান পর্যটক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাবে দুইবার পাণ্ড্য রাজ্যে আসেন (১২৮৮ ও ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দ)। নৌ-বাণিজ্যে তখন পাণ্ড্য রাজ্য অগ্রণী বলে মার্কো পোলোর বর্ণনা আছে ; জাহাজ নির্মাণে পাণ্ড্য দেশবাসীরা সুদক্ষ ছিল। কায়ল বন্দরের যে বর্ণনা মার্কো পোলোর লেখায় আছে, তা থেকে মনে হয় যে সেখানকার সমৃদ্ধি ছিল প্রভূত, শহরও ছিল সুন্দর। যাই হোক, অপ্রতিরোধ্য নিয়তির মতো ক্রমে মুসলিম শাসন যেন এদেশের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত হল। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সময়ে আলাউদদীন খল্‌জির সেনাপতি মালিক কাফুর চোল রাজ্যের মতো পাণ্ড্য রাজ্যেরও স্বাধীনতা বিলুপ্ত করে দেন।

পাণ্ড্য রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস

সুন্দরপাণ্ড্য

পাণ্ড্য রাজ্যের অভ্যুদয়

মার্কো পোলোর বিবরণ

তুর্কী আক্রমণে স্বাধীনতা লোপ

চের বা কেরল সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কয়েকটি কথা এখানে বলা যেতে পারে। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে এই অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্রপথে বৈদেশিক

কেরল রাজ্যের কথা

যোগাযোগ বহু প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছিল। হিন্দু ধর্ম ও চিন্তাকে পুনর্গঠিত করতে শঙ্করাচার্যের অমিত প্রতিভা ঐ অঞ্চলে আবির্ভূত হওয়ার (অষ্টম শতাব্দী) পূর্বে দুইটি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। একটি হল যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ শিষ্য খ্রীষ্টান সাধু টমাস্-এর, এবং আর একটি হল দেশচ্যুত ইহুদীদের আগমন। স্বয়ং টমাস্ এসেছিলেন কিনা, তা নিয়ে অনেক সংশয় রয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী খুব নিশ্চিতভাবে বহু কথা জানিয়েছে। যীশুর আর এক প্রত্যক্ষ শিষ্য সাধু ম্যাথু-র (মথী, Matthew) রচনা মালাবার এলাকায় বহুকাল ধরে সযত্নে রক্ষিত বলে অবিসংবাদিত সূত্র থেকে সংবাদ পাওয়া যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে টমাস্ নামে সীরিয়ার এক বণিক মালাবারে এসে সীরিয়ান (Syrian) খ্রীষ্টান সম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। সাধু টমাস্ সম্বন্ধে কিংবদন্তী সত্য না হলেও খ্রীষ্টধর্ম ইংলণ্ডে প্রচারিত হওয়ার পূর্বে যে ভারতবর্ষে এসেছিল, তা নিঃসন্দিগ্ধ।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব

খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব সম্পর্কীয় কিংবদন্তী

দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প ও সংস্কৃতি

দক্ষিণের ত্রি-রাজ্য : পাণ্ড্যমণ্ডলম্ তোণ্ডমণ্ডলম্ ও কেরল

দক্ষিণের তুলনায় উত্তর ভারতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের অভাব

দক্ষিণ ভারতের বৈশিষ্ট্য : নৌ-বাণিজ্য

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বারংবার সঙ্ঘর্ষের সংবাদ আমরা পেয়েছি, কিন্তু সেখানকার সমাজ ও সভ্যতা, শিল্প ও সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা স্মরণীয়। উত্থান-পতন সত্ত্বেও চের, চোল, পাণ্ড্য রাজ্য প্রাচীনকাল থেকে প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। পাণ্ড্যমণ্ডলম্, তোণ্ডমণ্ডলম্ (চোল অঞ্চল) এবং কেরল, দক্ষিণ ভারতের এই তিন ভূখণ্ড—ত্রি-রাজ্য নামে যার প্রসিদ্ধি—বহু পূর্ব হতে যেন এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। তুলনায় দেখা যায় যে সচরাচর উত্তর ভারতে রাজবংশের গুরুত্ব ছিল বেশী; কেবল প্রাচীন যুগে মগধ অঞ্চলের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য কিয়ৎপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, এবং পরবর্তীকালে গুজরাট ও বাংলা ভূখণ্ডরূপে তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। উত্তর ভারতের কাছে দক্ষিণ ভারতের ঋণ অবশ্য অপরিমিত; ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা উত্তর থেকেই দক্ষিণে সংক্রামিত হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের সহকারিতার ভিত্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের চমৎকার ব্যবস্থা, নৌপথে যাতায়াত ও বাণিজ্য, এবং একান্ত স্বকীয় মন্দিরশিল্প-রীতির মধ্যে দক্ষিণ ভারতের যে বৈশিষ্ট্য, তা মহামূল্য। ইতিপূর্বে গ্রীক ও রোমকদের সঙ্গে, এবং ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ

ভারতের নৌ-বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। নৌ-নির্মাণে ও চালনায় দক্ষিণ ভারতের, এবং বিশেষত মালাবার উপকূলের নাবিকেরা সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় বহুকাল ধরে দিয়ে এসেছে। চোল রাজশক্তি যখন শিখরে, তখনকার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ নৌ-বাহিনীর জোরে বঙ্গোপসাগর তখন "চোল হ্রদে" পরিণত হয়েছিল, সমুদ্রকে আয়ত্তে এনে তবে মালয় থেকে চীন পর্যন্ত সুদূরপ্রসারী অঞ্চলে ভারতবর্ষের প্রভাব বিস্তৃত হতে পেরেছিল।

নৌ-শক্তি ও সমুদ্রের উপর আধিপত্য

দক্ষিণ ভারতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু রাজতন্ত্র শক্তিশালী হলেও তা একেবারে নিরঙ্কুশ ও স্বেচ্ছাচারী রূপে দেখা দেয় নি। চোল শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করে আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে, তাতে মনে হয় যে ব্যবস্থায় সৌষ্ঠব ছিল, অনাচার সহজ ছিল না। রাজার ক্ষমতা সর্বস্বীকৃত হলেও সেখানকার সমাজে পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, মন্ত্রিদল (রাজপুরুষগণ) এবং সাধারণ প্রজা, এই পাঁচ শ্রেণীর "পঞ্চমহাসভা" রাজশক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করত। দাসপ্রথার তেমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না, আর গুর্জর-প্রতীহার বা পালবংশের শাসনে যে সামন্ত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তারও চিহ্ন দক্ষিণাপথে বিশেষ নেই। স্থায়ী এবং বেতনভোগী সৈন্যদল থাকায় জায়গীরদার ধরনের ব্যক্তি রাজশক্তিকে খণ্ডিত করতে পারে নি।

রাজা সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

"পঞ্চমহাসভা"

সামন্ত-প্রথার অভাব

চোল রাজা প্রথম পরান্তকের লিপি থেকে শাসনব্যবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে স্পষ্ট যে, গ্রাম ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি। চোল শাসন বিপুল ভূখণ্ডে বিস্তৃত হলেও গ্রামাঞ্চলে যে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের পরম্পরা চলে এসেছিল তা বিলুপ্ত হয় নি। বরং বলা যায় যে প্রবল রাজতন্ত্রের কর্তৃত্বে সেই পরম্পরা সুগঠিত হয়েছিল। কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিকে বলা হত "কুর্‌রম্"; কয়েকটি "কুর্‌রম্" মিলে গঠিত হত "নাড়ু" বা জেলা; কয়েকটি জেলাকে নিয়ে "কোট্টম্" আর কোট্টম্‌গুলিকে নিয়ে "মণ্ডলম্" বা প্রদেশ। ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত চোল রাজ্যের নাম ছিল "চোলমণ্ডলম্"। রাজবংশীয় কোন ব্যক্তিকে সচরাচর প্রদেশপাল নিযুক্ত করা হত; সকলের উপরে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন স্বয়ং রাজা; রাজকর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জমির উৎপন্ন ফলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হত; ফসলে কিংবা অর্থে এই রাজস্ব প্রদেয় ছিল। তা ছাড়া জলকর, খনি, অরণ্য-সম্পদ, ব্যবসায়ের

চোল শাসনে রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তি : গ্রাম

কুর্‌রম্

নাড়ু

কোট্টম্

মণ্ডলম্

রাজা

রাজকর্মচারী

রাজস্ব

লাভ ইত্যাদি খাতে অর্থ সংগ্রহের ফলে রাজকোষ পুষ্ট হত। অবশ্য চোল শাসনের স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হল গ্রামাঞ্চলে সাধারণ প্রজার সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকার। গ্রামসভার হাতে স্থানীয় সকল কর্মের ভার ন্যস্ত ছিল; গ্রামবৃদ্ধ ও প্রধানরা গ্রামসভা পরিচালনা করত। এই সভার কাজ ভাগ করে দেওয়া হত বিভিন্ন সমিতির হাতে—বিচার, রাজস্ব-সংগ্রহ, শান্তিরক্ষা, ঋণদান, পথঘাট, পুষ্করিণী ইত্যাদির তত্ত্বাবধান, গচ্ছিত ধনরক্ষা, শিক্ষা, ধর্মস্থান সম্পর্কে ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজের ভার বিভিন্ন সমিতির উপর অর্পিত থাকত। সকল গ্রামবাসীই গ্রামসভা এবং তার অন্তর্ভুক্ত সমিতির সদস্য হতে পারত। যে নির্বাচন-পদ্ধতির সংবাদ পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে গ্রামের স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে সর্বজনের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। গ্রামাঞ্চলে এবং বিভিন্ন প্রদেশে তত্ত্বাবধানের জন্য "অধিকারী" বলে অভিহিত রাজকর্মচারীরা কেন্দ্রীয় শাসন এবং স্থানীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করত। বাস্তবিকই, চোল যুগের "কুর্রম্"গুলি তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজের দৃষ্টান্ত ছিল। ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও এমন ধরনের জিনিস দেখা যায় নি। কেন্দ্রীয় শাসন-শৃঙ্খলাকে অটুট রেখে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ব্যাপারে সকলের উদ্‌যোগিতাকে উৎসাহ দেওয়া, অধিকার স্বীকার করে নেওয়া, এবং তৎকালের উপযোগী প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যবস্থা করে শাসনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন চোল শাসনের সমুজ্জ্বল কীর্তি।

গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন

গ্রামসভা ও সমিতি

নির্বাচন

অধিকারী

চোল শাসনের বৈশিষ্ট্য

সাধারণ লোক যে তখন শান্তিতে বাস করত, জীবনে যে তাদের কিছু স্বস্তি ছিল, ধর্ম ও অন্যান্য সমসাময়িক আদর্শে যে তাদের আস্থা ও অনুরাগ ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় শিল্প-সাহিত্যের তৎকালীন উৎকর্ষে। অতি প্রাচীন যুগে যে তামিল "সঙ্গম্" বা সাহিত্য পরিষদের সংবাদ পাওয়া যায়, খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকের পূর্বে তাদের উদ্যোগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্কলন প্রস্তুত হয়ে যায়। সম্ভবত প্রথম শতাব্দীর লেখক তিরুভল্লুভার "কুরল" নামে যে ভক্তি ও নীতিমূলক কাব্য রচনা করেন, আজও দক্ষিণ ভারতে তা হল সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। তামিল ছেলেমেয়েরা "কুরলের" শ্লোক মুখস্থ করে লেখাপড়া আরম্ভ করে। "শিলপ্পাদিকরম্" এবং তারই পরবর্তী ভাগ "মণিমেকলাই" থেকে প্রাচীন সমাজের অনবদ্য চিত্র পাওয়া যায়। আরও পরে দেখা যায় বৈষ্ণব সাধু নম্মলভার এবং শৈব সাধু মাণিক ভচকর-প্রমুখ বহু ভক্তের অতুলন কবিতা। দক্ষিণ

সাধারণ লোকের অবস্থা

সাহিত্যের উৎকর্ষ

কুরল

শিলপ্পাদিকরম্ মণিমেকলাই

পরবর্তী ভক্তি-মূলক কবিতা

ভারতের যে ঐতিহ্য তামিল সাহিত্যে নিহিত রয়েছে, তার পূর্ণ মর্যাদা এখনও আমরা দিতে পারি নি।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে দক্ষিণ ভারতের বৈভব বিপুল, বিস্ময়কর, অপরিমিত বললে অতিরঞ্জন দোষ ঘটবে না। এ বিষয়ে পল্লভ যুগের অবদান হল প্রথমে স্মরণীয়। ঐতিহাসিকেরা সাধারণত বলে থাকেন যে উত্তর ভারতে প্রস্তর শিল্পের প্রবর্তন করেন অশোক, আর প্রায় এক হাজার বৎসর পরে পল্লভরা দক্ষিণে সেই শিল্পকে নিয়ে আসেন। প্রস্তর-কারুকর্মে বহুদিনের অর্জিত নৈপুণ্য ও পরম্পরা বিনা কেমন করে উত্তর ভারতে অশোকের সময়ে এবং দক্ষিণে পল্লভ যুগে অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি ও কারু-উৎকর্ষ সম্ভব হল, এ প্রশ্নের অবশ্য এখনও কোন সন্তোষজনক উত্তর মেলে নি। কাষ্ঠ-স্থাপত্য থেকে প্রস্তর-স্থাপত্যে সংক্রমণ যে অতি দ্রুত সম্ভব, তা বিশ্বাস করা কঠিন বলে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আজও অধিকাংশ পণ্ডিতের মত স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠা আসে। যাই হোক, পল্লভ যুগের যে শিল্প সাক্ষ্য আজও কাঞ্চীর অপরূপ স্তম্ভ ও তোরণ-বিশোভিত শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরে রয়েছে, মহাবলিপুরমের সমুদ্রসৈকতে আজও যার ভাস্বর পরিচয় রয়েছে তটচুম্বী মন্দিরে, সপ্তরথে, গঙ্গাবতরণ দৃশ্যমালায়, কৃষ্ণমণ্ডপে, নরনারী ও জীবজন্তুর আশ্চর্য জীবন্ত শিলামূর্তিতে, তা প্রকৃতই মনকে অভিভূত করার শক্তি রাখে।

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য · *ভারতে প্রস্তর শিল্প* · *পল্লভ যুগের অবদান ঃ* · *কাঞ্চী ও মহাবলিপুরম্*

চালুক্য রাজ্যকথা যখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যাবে, তখনও চালুক্য শাসনকালের শিল্পকীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে, সন্দেহ নেই। বাদামির বিখ্যাত গুহামন্দিরগুলির স্থাপত্যগুণ সম্বন্ধে রসবেত্তাদের মতবিভেদ নেই; আইহোল্ নামক স্থানে যে গোলাকৃতি দুর্গামন্দির আছে, শিল্পরীতিতে তা বিশিষ্ট, সৌষ্ঠবে তা অভিনব। চালুক্য শাসনকালেই যে অজন্তা গুহার বহু চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, তা নিশ্চিত। আবার যখন রাষ্ট্রকূট শক্তি দাক্ষিণাত্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখনকার শিল্পকীর্তি অবিস্মরণীয়। ইলোরার জগদ্বিখ্যাত কৈলাস মন্দির যে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল, ইতিহাস কখনও তাদের কথা ভুলতে পারে না। কৃষ্ণরাজের এক তাম্রশাসনে লেখা আছে ঃ "দেবতারা যখন পুষ্পকরথে যেতে যেতে এই মন্দির দেখেন, তখন অবাক হয়ে তাঁরা কেবলই ভাবতে থাকেন আর মনে মনে বলেন, 'শিবের এই মন্দির নিশ্চয়ই স্বয়ম্ভূ, কোন শিল্পকর্মে এত সৌন্দর্যের সমাবেশ তো সম্ভব নয়!' এমন কি যে স্থপতি

চালুক্য শাসনকালের শিল্পকীর্তি · *রাষ্ট্রকূটদের শিল্পকীর্তি ঃ* · *ইলোরার কৈলাস মন্দির* · *কৃষ্ণরাজের তাম্রশাসন*

স্থপতির মন্তব্য

মন্দিরের পরিকল্পনা করেন, তিনিও অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'আশ্চর্য, আমি তো জানি না কেমন করে এমন জিনিস গড়েছি!'" হিন্দুর পুরাণকাহিনীর বিপুল বৈভব পাথর, কাঠ, তামা, ব্রঞ্জ প্রভৃতি উপাদানে নির্মিত অজস্র মূর্তিতে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা সত্যই আশ্চর্য ঘটনা। ইলোরায় অসংখ্য শিল্পী যে মৌলিক চিন্তা, কর্মনৈপুণ্য, ধৈর্য ও আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচয় রেখে গেছেন, ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে তার মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়।

চোল স্থাপত্য

মন্দির স্থাপত্যের পূর্ণ হিন্দু-রূপ দেখা দিল চোল রাজ্যকালে। শরতের নদী যেমন নিজের জলভার বইতে না পেরে দু'কূল ছাপিয়ে দিতে থাকে, ভারতবর্ষের শিল্পীমন চোল যুগে যেন স্বকীয় সমৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্দাম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, সুবিশাল, অলঙ্কারবহুল আতিশয্যের মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ না করে পারে না। পল্লভ শিল্পে আছে স্বল্পায়তন স্থাপত্যের সুষমা ও সামঞ্জস্য ; চোল যুগে আকাশচুম্বী, বিশালকায়, নভোচারী দীপ্তিমণ্ডিত মন্দির-তোরণ বা গোপুরম্-এর দৃপ্ত শোভা। যে মন্দিরে দেবতারা বিরাজ করছেন, তার আকৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু মন্দিরকে কেন্দ্র করে রয়েছে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ, গোপুরম্, নাটমন্দির, জলাশয়, বিপণি—মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে দেবতাকে আনা হয়েছে, আর অজস্র প্রস্তরমূর্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্যের ঐশ্বর্যে মানুষের কল্পনা ও প্রতিভা দেবতার কাছে সমর্পিত হয়ে রয়েছে। তাঞ্জোর, গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম্, চিদাম্বরম্, ত্রিচিনাপল্লী, এবং কিছু পরে মাদুরার মন্দিরে এবং সেখানকার সীমাহীন ভাস্কর্য-গৌরবে চোল শিল্পের যে স্বাক্ষর রয়েছে, তা ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। চোল রাজারা পূর্ত-কার্যের জন্যও বিখ্যাত ছিলেন ; জলসেচের ব্যবস্থা, কাবেরী নদীর খাল খনন, ইত্যাদি তাঁরা করেন। শিল্পক্ষেত্রে চোল যুগের কীর্তিমানদের সম্বন্ধে ভারতীয় স্থাপত্যের যশস্বী ঐতিহাসিক ফার্গুসন যে মন্তব্য করেন—চোল শিল্পের পরিকল্পনা যেন করেছে অতিমানুষেরা, আর সূক্ষ্ম কাজে তাকে ভূষিত করেছে মণিকারের দল—তার তাৎপর্য প্রণিধানের বিষয়।

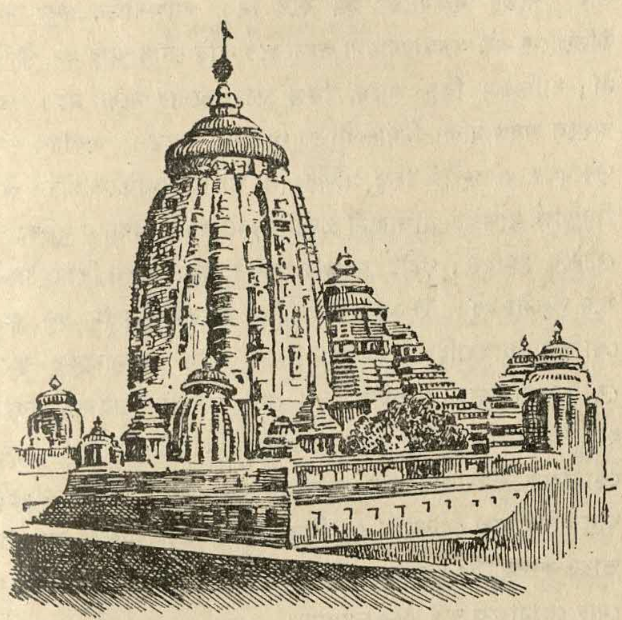
চোল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য

চোল শিল্পের নিদর্শন

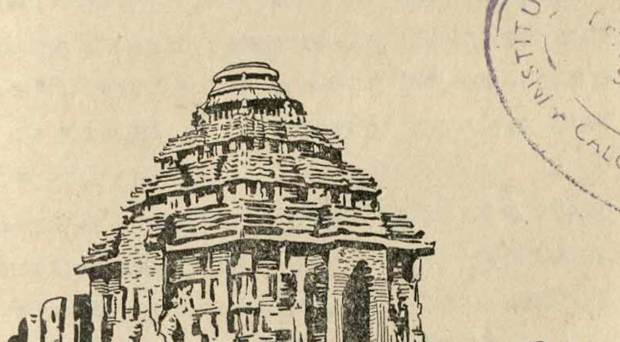
ফার্গুসনের মন্তব্য

হয়সল বংশের শিল্পকৃতি

কারুকার্যের অপরিসীম অজস্রতা সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায় হয়সল বংশের উদ্যোগে নির্মিত মহীশূরের হালেবিড় মন্দিরে ; নিকটস্থ বেলুড় ও সোমনাথপুরেও অনুরূপ নিদর্শন রয়েছে। বিস্ময়ের কথা এই যে যেখানে স্বল্পপরিসরে সহস্রাধিক হস্তী খোদিত হয়ে রয়েছে, সেখানেও সুসমঞ্জস সুষমার অভাব কোথাও নেই। সীমাহীন ধৈর্যের সঙ্গে সীমাহীন শিল্প-দক্ষতার সমাবেশ বিনা এমন কৃতিত্ব তো সম্ভব নয়। অলঙ্কারবাহুল্য



॥ পুরীর জগন্নাথ মন্দির ॥



॥ কোনারকের সূর্যমন্দির ॥

তাই শিল্পের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। দাক্ষিণাত্য, সুদূর দক্ষিণ ও উড়িষ্যাতে এই অলঙ্কারবাহুল্য লক্ষ্য করে তাই চোখ আর মন পীড়িত হয় না; ব্যতিক্রম কিছু আছে, কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এই তিন অঞ্চলে অবশ্য মন্দির নির্মাণ-রীতির পার্থক্যও আছে। একাদশ শতাব্দীতে ভুবনেশ্বর ও পুরীর হিন্দু মন্দিরগুলি স্বকীয় পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছিল। লিঙ্গরাজ, মুক্তেশ্বর, রাজারানী প্রভৃতি ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির স্থাপত্য সৌষ্ঠবে অনবদ্য; পুরীর জগন্নাথ মন্দির বৃহৎ হলেও শিল্পগৌরবে এদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। উড়িষ্যায় শিল্পকীর্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল দ্বাদশচক্র-শোভিত সপ্তাশ্ববাহিত রথের আকৃতিতে গঠিত কোনারকের সূর্যমন্দির। সে মন্দিরে আজ পূজারীর ভিড় নেই, গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ, পূজা বহুদিন হতে পরিত্যক্ত। কিন্তু মহৎ শিল্পের অনির্বচনীয় আস্বাদ পেতে হলে কোনারকে তীর্থযাত্রার মতো সৌভাগ্য আর নেই। অদূরে সমুদ্রসৈকত, বালুরাশির মধ্যে সৌন্দর্যের একাকিত্ব নিয়ে ভগ্নপ্রায় মন্দির পড়ে রয়েছে; ভারত-ইতিহাসের বিষাদ ও মহিমা যেন একত্র মিশ্রিত হয়ে এক অপরূপ মোহ কোনারকে সৃষ্টি করে রেখেছে।

আঞ্চলিক শিল্প-বৈশিষ্ট্য বিচার

ভুবনেশ্বরের মন্দির

পুরীর মন্দির

কোনারকের সূর্য মন্দির

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

বৃহত্তর ভারত

বহির্জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছিল। বহু যুগ পূর্বে প্রাচীন ব্যাবিলনের সঙ্গে এদেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল; মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য বিষয়ে অন্তত ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের নজির আছে। কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও প্রভাব একদিকে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াতে এবং অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ-উপদ্বীপে যে বিস্তৃত হয়েছিল, তা ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আরব, মিশর, রোম, মধ্য এশিয়া, চীন, মালয় অঞ্চল প্রভৃতি ভূভাগে স্থল ও জলপথে ভারতের বাণিজ্য তখন ছড়িয়ে পড়ে। অশোক যাদের ধর্ম প্রচারে পাঠিয়েছিলেন, তারা সিংহলে গেছে, পশ্চিম এশিয়ার প্রান্তে গেছে, এন্টিয়োক, আলেক-জান্দ্রিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরে তাদের যাত্রা ঘটেছিল। ঐ সমস্ত অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের ফলাফল সম্বন্ধে কিছু জোর করে বলা কঠিন। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং তার অপরপার্শ্বে ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক রাজবংশগুলিতে এদেশের প্রভাব যে বেশ পড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় "মিলিন্দপন্‌হ" বা মিলিন্দের প্রশ্নাবলী শীর্ষক গ্রন্থে। বৌদ্ধ ও গ্রীক ধারার সংমিশ্রণেই যথাসময়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব ঘটেছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক

বহির্ভারতে ভারতবর্ষের প্রভাব ও বাণিজ্য-সম্পর্ক

অশোকের প্রচারক দল

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও ব্যাক্‌ট্রিয়াতে ভারতীয় প্রভাব

কুশান সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ধর্ম ও চিন্তাধারা মধ্য এশিয়ায় ব্যাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কণিষ্ক মহাযান বৌদ্ধমতের অনুরাগী ছিলেন বলে ভারতবর্ষের বাইরে যেখানে যেখানে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল, সেখানে মহাযান মতের প্রচার সুগম হয়ে গেল। সীদিয়ান্‌দের দেশে মহাপণ্ডিত কাশ্যপমাতঙ্গ এবং ধর্মরত্ন যখন ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আনুমানিক ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের দূতের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে বলে কথিত আছে। তারপর ভারতবর্ষ থেকে চীনে অবিরাম ভিক্ষু ও পণ্ডিতদের গতায়াত ঘটতে থাকে, আর তারই ফলস্বরূপ দেখা যায় যে প্রসিদ্ধ বিদ্বান কুমারজীব চীনা ভাষায় অশ্বঘোষ,

মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার

কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন

চ নের সঙ্গে যোগাযোগ

কুমারজীব

নাগার্জুন ও বসুবন্ধুর রচনাবলী অনুবাদ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদ্যার এই প্রসার ব্যতিরেকেও ক্রমে দেখা গেল যে দেশদেশান্তরে, কখনও বা সমুদ্র অতিক্রম করে, ভারতবর্ষীয়েরা বসবাস করছে, শুধু যুদ্ধবিগ্রহ করে রাজ্য স্থাপন করছে না, সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সংস্কৃতিকে সেখানে প্রসারিত করে দিচ্ছে।

ভারতীয় উপনিবেশ

বৃহত্তর ভারত

"বৃহত্তর ভারত" এই আখ্যাটি খুব বেশীদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যবহৃত হয় নি কিন্তু বহির্জগতে ভারতের প্রভাব ও উপনিবেশ স্থাপনের বৃত্তান্ত এখনও সম্পূর্ণ সুবিদিত না হলেও বহুকাল থেকে এ বিষয়ে যা মূল কথা, তা অজানা ছিল না। একদিকে গান্ধার, কাপিশ, খোটান, কশ্‌গড়, এবং অপর দিকে সিংহল, ব্রহ্ম (শ্রীক্ষেত্র), মালয় (মলয়দ্বীপ), শ্যাম (দ্বারবতী), কাম্বোডিয়া (কম্বুজ), আনাম (চম্পা), সুমাত্রা (সুবর্ণদ্বীপ), জাভা (যবদ্বীপ), বোর্নিও (বরুণদ্বীপ) প্রভৃতি অঞ্চলকে "বৃহত্তর ভারত" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বামনপুরাণে "দ্বীপময় ভারত" কথাটির উল্লেখ রয়েছে ; আধুনিক কালে ব্যবহৃত "Indian archipelago" এর সঙ্গে তুলনীয়। সংস্কৃতি-বিস্তার যে কত গভীরভাবে হয়েছিল, তার কয়েকটি কথা এখানে মনে করা চলে। মধ্য এশিয়া এবং চীনে প্রভাব বিস্তার করেছে ভারতবর্ষের বেদ, আগম, রামায়ণ, বৌদ্ধ ত্রিপিটক, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, মধ্যমিকাবৃত্তি, ললিতবিস্তার, বুদ্ধচরিত, প্রজ্ঞাপারমিতা, অশোকাবদান, অভিধর্মকোষ, সূত্রালঙ্কার প্রভৃতি গ্রন্থ। সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাভারত, রামায়ণ, জাতক, মিলিন্দপন্‌হ, ললিতবিস্তার, মনুস্মৃতি, পুরাণ, আগম, তন্ত্র প্রভৃতির প্রভাব—সমাজ-সংগঠনে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট প্রকরণ, জাতিভেদ প্রথাও, সেখানে কোথাও কোথাও প্রবর্তিত হয়েছিল। অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" এবং আর্যশূরের "জাতকমালা" সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সমগ্র এশিয়াতে এই দুইটি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত "সদ্ধর্মপুণ্ডরীক" সম্বন্ধে কথিত হয়েছে যে ধর্ম, দার্শনিক তত্ত্ব ও কাব্যের এ এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ ; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্গে তুলনীয় এই গ্রন্থ বৌদ্ধ এশিয়ায় "বাইবেল" স্বরূপ পরিগণিত হয়েছিল।

দ্বীপময় ভারত

চীন ও মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাবের নির্দিষ্ট প্রকরণ

সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

বুদ্ধচরিত

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক

মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে অরেলস্টাইন-প্রমুখ পণ্ডিতেরা যে খননকার্য করেছেন, তার ফলে ভারতীয় নগরের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খোটান, কশ্‌গড়, সমরকন্দ প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত স্থানে

মধ্য এশিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

স্টাইনের

য়েন ও
য়েনসাং-এর

ীয়
তদের
গমন

কুমার
র্মন

ব্রাজকদের
তে
ামন

তের
গুতদের চীনে
বাস

ভারতী
উপনি

বৃহত্তর

দ্বীপময়

চীন ও
এশিয়ায়
ভারতী
প্রভাবে
প্রকরণ

সিংহল
দক্ষিণ-পূ
এশিয়া

বুদ্ধচরি

সদ্ধর্মপু

মধ্য এশি
প্রত্নতাত্ত্বি
আবিষ্কার

ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু পরিচায়ক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। হিউয়েনসাং ঐ সমস্ত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারত-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন; সুতরাং বহুকাল অজ্ঞাত থাকলেও এই আবিষ্কারে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, ; বহু স্তূপ, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ছবি, পুঁথিপত্র, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৌদ্ধ গ্রন্থ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। স্টাইন মন্তব্য করেছিলেন যে খননকার্যের সময় তাঁর কেবলই মনে হত যে তিনি বুঝি পঞ্জাবের কোন প্রাচীন শহরে রয়েছেন, ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে হলেও সেখানকার পরিবেশ ছিল ভারতবর্ষীয়। ফা-হিয়েন এবং হিউয়েনসাং উভয়েই খোটানে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির কথা বলে গেছেন; গোমতী-বিহার নামে এক বিরাট বৌদ্ধ মঠের বর্ণনা দিয়েছেন ফা-হিয়েন, আর হিউয়েনসাং-এর কাছে জানা গেছে যে দেশে ফেরার পথে তিনি খোটানের ভারতীয় রাজা বিজিতসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। মধ্য এশিয়ার দক্ষিণে খোটান এবং একটু উত্তরে কুচি এই অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল।

অরেলস্টাইনের মন্তব্য

ফা-হিয়েন ও হিউয়েনসাং-এর বিবরণ

কণিষ্কের রাজ্যকাল থেকে চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রদূত বিনিময় হত দুই দেশের মধ্যে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল বণিকদের গতায়াত, ধার্মিক ও বিদ্বানদের মধ্যে আদানপ্রদান। কাশ্যপমাতঙ্গ ও কুমারজীবের কথা পূর্বে বলা হয়েছে; তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সঙ্ঘভূতি, বুদ্ধজীব, ধর্মমিত্র, ধর্মযশ, বুদ্ধযশ প্রভৃতি ভিক্ষু চীনে গিয়েছিলেন। কথিত আছে যে কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মন যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর চীন সম্রাট কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন পঞ্চম শতাব্দীতে, চীনদেশে তিনি যাতে ধর্ম প্রচার করেন এবং মূল গ্রন্থাদি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন এই ছিল সম্রাটের অনুরোধ। ফা-হিয়েন, হিউয়েনসাং, ইৎসিং প্রভৃতি চীনা পরিব্রাজকের দল এদেশে এসেছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও আচার সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য, পুঁথি, মূর্তি ইত্যাদি ভক্তিভরে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ থেকেও যে শত শত বিদ্বান গিয়ে চীনদেশে বসবাস করেন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় জীবন-যাপন করেন, তা সমানভাবে উল্লেখযোগ্য; দুই দেশের ইতিহাসে এগুলি একান্ত স্মরণীয় ঘটনা। চীনে গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বারাণসীর প্রজ্ঞারুচি, মধ্যভারতের গুণভদ্র,

ভারতীয় পণ্ডিতদের চীনে গমন

রাজকুমার গুণবর্মন

চীনা পরিব্রাজকদের ভারতে আগমন

ভারতের পণ্ডিতদের চীনে বসবাস

চীনে বিশিষ্ট প্রচারকগণ

গান্ধারের জিনভদ্র ও জিনযশ, কাঞ্চীর রাজকুমার বোধিধর্ম, সর্বশাস্ত্রপারংগম উজ্জয়িনীবাসী পরমার্থ, বাংলার জ্ঞানভদ্র, যশোগুপ্ত প্রভৃতি মহাজনের নাম উল্লেখ করা যায়। ধর্মবিষয়ে এই যোগাযোগ ছাড়াও বাণিজ্য ও রাজনীতির দিক থেকে উভয় দেশের সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকায় ভারতীয় প্রভাব সুদৃঢ় হয়। চীন থেকে কোরিয়া এবং কোরিয়া থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ঘটে; আজও ঐ সমস্ত দেশে বৌদ্ধধর্ম নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে নি, প্রাচীন ভারতের প্রভাব পরোক্ষভাবে এখনও কার্যকরী হয়ে রয়েছে। শুধু ধর্ম ব্যাপারে নয়, ভারতীয় সঙ্গীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিত চীনদেশে সেই যুগে পরম সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। তাং সম্রাটদের রাজ্যকালে এই দুই দেশের মৈত্রীবন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছিল; ভারতের গুহামন্দির নির্মাণ-পদ্ধতি চীনে অনুসৃত হয়েছিল, এদেশের চিত্রাঙ্কনধারা, মূর্তিগঠন প্রভৃতিরও প্রভাব সেখানে অনুভূত হল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে চীনা মনীষীদের শ্রদ্ধা কত ছিল তার প্রমাণ শুধু বুদ্ধভক্তদের ভারত পরিব্রজ্যা নয়; ফা-হিয়েন প্রভৃতি সকলে এদেশ থেকে জ্ঞান-ভাণ্ডার পুষ্ট করার সঙ্গতি নিয়ে গিয়েছিলেন, দেশে ফিরে হিউয়েনসাং ৭৪ খানি ভারতীয় পুঁথির চীনা অনুবাদ করেন, ইৎসিং দশ বৎসর নালন্দায় অধ্যয়ন করে চারশত সংস্কৃত পুঁথি স্বদেশে নিয়ে যান। ভারতবর্ষে যে গ্রন্থের কোন সন্ধান মেলে না, চীনা অনুবাদ থেকে তার সংবাদ সম্প্রতি পণ্ডিতেরা বহু ক্ষেত্রে পেয়েছেন। ভারতবর্ষ ও চীন এই দুই সুপ্রাচীন দেশের মধ্যে চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে বহু শতাব্দী ধরে যে মৈত্রীপূর্ণ আদান-প্রদান হয়েছিল, তা জগতের ইতিহাসে বাস্তবিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার

চীনে ভারতীয় সঙ্গীত, চিকিৎসা শাস্ত্র ও গণিতের সমাদর

চীনের উপর ভারতীয় শিল্পের প্রভাব

চীনা মনীষীদের ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধার গভীরতা

চীন-ভারত দীর্ঘস্থায়ী মৈত্রী

তিব্বত-ভারতের সম্পর্ক

আধুনিক কালের তুলনায় তিব্বত পুরাকালে আমাদের কাছে এক গোপন রহস্যে ঢাকা দেশ বলে মনে হত না, চীন থেকে নেপাল পর্যন্ত সুপরিচিত এক পথ তিব্বতের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের এক রাজকুমার তিব্বতের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তিব্বতী ভাষায় লেখা পুঁথিতে উল্লেখ আছে। সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক স্রং-সান-গাম্পো তিব্বতের রাজা ছিলেন; শক্তিশালী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল, বৌদ্ধধর্ম তিনিই নাকি তিব্বতে প্রবর্তন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় লিপির চর্চা তখনই তিব্বতে আরম্ভ হয়; বহু মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাকে উপলক্ষ্য করে তিব্বত থেকে বহু পণ্ডিত এদেশে আসেন, নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা

ভারতীয় কর্তৃক তিব্বতে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা

স্রং-সান-গাম্পো

গ্রহণ করেন। বাংলার পাল রাজ্যের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিশ্লেষণ ও সংস্কার বিষয়ে বাংলার বিদ্বানদের প্রচুর অবদান রয়েছে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বাংলার গৌরব অতীশ দীপঙ্করের কথা; তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে তিনি সেদেশে যান, সেখানেই তাঁর তিরোভাব ঘটে, আজও মহাপুরুষ বলে তিব্বতে তাঁর স্মৃতি জাগরূক রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের অসংখ্য গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ হয়েছিল; "তঞ্জুর" ও "কঞ্জুর" নামে দুই সংগ্রহ-গ্রন্থ আজও রয়েছে। মধ্য এশিয়া, তিব্বত ও চীন থেকে অনিবার্যভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে বিস্তৃত হয়েছিল। ইৎসিং-এর লেখা থেকে জানা যায় যে কোরিয়া থেকে পাঁচজন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কথিত আছে যে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ ভারত থেকে বোধিসেন নামে এক বৌদ্ধ বিদ্বান জাপানে গিয়েছিলেন, জাপানের সম্রাট তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধ্যক্ষপদে বরণ করেন।

বাংলার সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

অতীশ দীপঙ্কর

তঞ্জুর ও কঞ্জুর

মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধধর্ম

ভারতে কোরিয়ার পরিব্রাজক

জাপানে বোধিসেনের সংবর্ধনা

মধ্য এশিয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে শুধু চীন ও অন্যান্য পূর্ব-দেশে নয়, পশ্চিমে আরব দেশেও ভারতবর্ষের জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা ও অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার ঘটে; পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনার গুরুত্ব অল্প নয়।

আরবে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশগুলি সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হতে বাংলা, কলিঙ্গ এবং পূর্ব-উপকূলের বন্দর থেকে ভারতীয় বণিকের দল সমুদ্রপথ দিয়ে সুবর্ণভূমির দিকে যেত; সহজে বিপুল পরিমাণে মসলা পাওয়া যেত, ধাতু দ্রব্যও মিলত অনেক, আর স্থানীয় অধিবাসীরা সভ্যতায় একেবারে পশ্চাৎপদ ছিল বলে সেখানে যাওয়ার প্রলোভন ছিল যথেষ্ট। জাতকমালা, কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি থেকে সুবর্ণভূমির ঐশ্বর্য নিয়ে বাণিজ্য-যাত্রা সম্বন্ধে বহু কাহিনী জানা যায়। ক্রমশ সেখানে ভারতীয়দের বসবাস আরম্ভ হয়, উপনিবেশ গড়ে ওঠে। কথিত আছে যে ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাজবংশীয়েরা কখনও কখনও সেখানে গিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করত। দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে ভারতীয় আখ্যা নিয়ে মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আনাম এবং সুমাত্রা, বলি, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে বিভিন্ন রাজ্য স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যায়। ঐসব

সুবর্ণভূমি

সুবর্ণভূমির সঙ্গে বাণিজ্য

ভারতীয় সাহিত্যে সুবর্ণ-ভূমির উল্লেখ

উপনিবেশ

ভারতীয় আখ্যায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা

চীনে বিশিষ্ট প্রচারকগণ

গান্ধারের জিনভদ্র ও জিনযশ, কাঞ্চীর রাজকুমার বোধিধর্ম, সর্বশাস্ত্রপারংগম উজ্জয়িনীবাসী পরমার্থ, বাংলার জ্ঞানভদ্র, যশোগুপ্ত প্রভৃতি মহাজনের নাম উল্লেখ করা যায়। ধর্মবিষয়ে এই যোগাযোগ ছাড়াও বাণিজ্য ও রাজনীতির দিক থেকে উভয় দেশের সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকায় ভারতীয় প্রভাব সুদৃঢ় হয়। চীন থেকে কোরিয়া এবং কোরিয়া থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ঘটে; আজও ঐ সমস্ত দেশে বৌদ্ধধর্ম নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে নি, প্রাচীন ভারতের প্রভাব পরোক্ষভাবে এখনও কার্যকরী হয়ে রয়েছে। শুধু ধর্ম ব্যাপারে নয়, ভারতীয় সঙ্গীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিত চীনদেশে সেই যুগে পরম সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। তাং সম্রাটদের রাজ্যকালে এই দুই দেশের মৈত্রীবন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছিল; ভারতের গুহামন্দির নির্মাণ-পদ্ধতি চীনে অনুসৃত হয়েছিল, এদেশের চিত্রাঙ্কনধারা, মূর্তিগঠন প্রভৃতিরও প্রভাব সেখানে অনুভূত হল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে চীনা মনীষীদের শ্রদ্ধা কত ছিল তার প্রমাণ শুধু বুদ্ধভক্তদের ভারত পরিব্রজ্যা নয়; ফা-হিয়েন প্রভৃতি সকলে এদেশ থেকে জ্ঞান-ভাণ্ডার পুষ্ট করার সঙ্গতি নিয়ে গিয়েছিলেন, দেশে ফিরে হিউয়েনসাং ৭৪ খানি ভারতীয় পুঁথির চীনা অনুবাদ করেন, ইৎসিং দশ বৎসর নালন্দায় অধ্যয়ন করে চারশত সংস্কৃত পুঁথি স্বদেশে নিয়ে যান। ভারতবর্ষে যে গ্রন্থের কোন সন্ধান মেলে না, চীনা অনুবাদ থেকে তার সংবাদ সম্প্রতি পণ্ডিতেরা বহু ক্ষেত্রে পেয়েছেন। ভারতবর্ষ ও চীন এই দুই সুপ্রাচীন দেশের মধ্যে চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে বহু শতাব্দী ধরে যে মৈত্রীপূর্ণ আদান-প্রদান হয়েছিল, তা জগতের ইতিহাসে বাস্তবিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার

চীনে ভারতীয় সঙ্গীত, চিকিৎসা শাস্ত্র ও গণিতের সমাদর

চীনের উপর ভারতীয় শিল্পের প্রভাব

চীনা মনীষীদের ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধার গভীরতা

চীন-ভারত দীর্ঘস্থায়ী মৈত্রী

তিব্বত-ভারতের সম্পর্ক

আধুনিক কালের তুলনায় তিব্বত পুরাকালে আমাদের কাছে এক গোপন রহস্যে ঢাকা দেশ বলে মনে হত না, চীন থেকে নেপাল পর্যন্ত সুপরিচিত এক পথ তিব্বতের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের এক রাজকুমার তিব্বতের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তিব্বতী ভাষায় লেখা পুঁথিতে উল্লেখ আছে। সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক স্রং-সান-গাম্পো তিব্বতের রাজা ছিলেন; শক্তিশালী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল, বৌদ্ধধর্ম তিনিই নাকি তিব্বতে প্রবর্তন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় লিপির চর্চা তখনই তিব্বতে আরম্ভ হয়; বহু মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাকে উপলক্ষ্য করে তিব্বত থেকে বহু পণ্ডিত এদেশে আসেন, নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা

ভারতীয় কর্তৃক তিব্বতে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা

স্রং-সান-গাম্পো

গ্রহণ করেন। বাংলার পাল রাজ্যের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিশ্লেষণ ও সংস্কার বিষয়ে বাংলার বিদ্বানদের প্রচুর অবদান রয়েছে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বাংলার গৌরব অতীশ দীপঙ্করের কথা; তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে তিনি সেদেশে যান, সেখানেই তাঁর তিরোভাব ঘটে, আজও মহাপুরুষ বলে তিব্বতে তাঁর স্মৃতি জাগরূক রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের অসংখ্য গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ হয়েছিল; "তঞ্জুর" ও "কঞ্জুর" নামে দুই সংগ্রহ-গ্রন্থ আজও রয়েছে। মধ্য এশিয়া, তিব্বত ও চীন থেকে অনিবার্যভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে বিস্তৃত হয়েছিল। ইৎসিং-এর লেখা থেকে জানা যায় যে কোরিয়া থেকে পাঁচজন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কথিত আছে যে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ ভারত থেকে বোধিসেন নামে এক বৌদ্ধ বিদ্বান জাপানে গিয়েছিলেন, জাপানের সম্রাট তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধ্যক্ষপদে বরণ করেন।

বাংলার সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

অতীশ দীপঙ্কর

তঞ্জুর ও কঞ্জুর

মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধধর্ম

ভারতে কোরিয়ার পরিব্রাজক

জাপানে বোধিসেনের সংবর্ধনা

মধ্য এশিয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে শুধু চীন ও অন্যান্য পূর্ব-দেশে নয়, পশ্চিমে আরব দেশেও ভারতবর্ষের জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা ও অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার ঘটে; পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনার গুরুত্ব অল্প নয়।

আরবে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশগুলি সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হতে বাংলা, কলিঙ্গ এবং পূর্ব-উপকূলের বন্দর থেকে ভারতীয় বণিকের দল সমুদ্রপথ দিয়ে সুবর্ণভূমির দিকে যেত; সহজে বিপুল পরিমাণে মসলা পাওয়া যেত, ধাতু দ্রব্যও মিলত অনেক, আর স্থানীয় অধিবাসীরা সভ্যতায় একেবারে পশ্চাৎপদ ছিল বলে সেখানে যাওয়ার প্রলোভন ছিল যথেষ্ট। জাতকমালা, কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি থেকে সুবর্ণভূমির ঐশ্বর্য নিয়ে বাণিজ্য-যাত্রা সম্বন্ধে বহু কাহিনী জানা যায়। ক্রমশ সেখানে ভারতীয়দের বসবাস আরম্ভ হয়, উপনিবেশ গড়ে ওঠে। কথিত আছে যে ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাজবংশীয়েরা কখনও কখনও সেখানে গিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করত। দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে ভারতীয় আখ্যা নিয়ে মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আনাম এবং সুমাত্রা, বলি, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে বিভিন্ন রাজ্য স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যায়। ঐসব

সুবর্ণভূমি

সুবর্ণভূমির সঙ্গে বাণিজ্য

ভারতীয় সাহিত্যে সুবর্ণভূমির উল্লেখ

উপনিবেশ

ভারতীয় আখ্যায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সুবর্ণভূমিতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি

অঞ্চলে অনেক সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গেছে ; চীনা সূত্র থেকেও এ বিষয়ে বহু তথ্য মেলে। সাধারণত ব্রাহ্মণ্য ধর্মই সেখানে প্রবল ছিল ; শৈবদের কথা শোনা যায় বেশী, তবে বৌদ্ধধর্মও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতীয়দের মেলামেশার ফলে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকলেও হাজার বৎসরেরও অধিক কাল সেখানে ভারতীয় সভ্যতার ছাপ জাজ্বল্যমান হয়ে ছিল।

সিঙ্গাপুরের কটাহ বন্দর

বর্তমান সিঙ্গাপুরের অদূরবর্তী কটাহ (আধুনিক নাম কেডা, Kedah) বন্দরে পূর্বসমুদ্রযাত্রী জাহাজ প্রথমে থাকত মনে হয়। কথাসরিৎসাগরের বহু কাহিনীতে এই কটাহ অঞ্চলে গিয়ে বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করার কথা আছে। সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি আবিষ্কারের জন্য সমুদ্রপথে

অগস্ত্যঋষির কাহিনী

সুনিপুণ অভিযান-শক্তির প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে অগস্ত্য মুনির নামে পুরাণে এক গল্প আছে ; আজও নাকি ইন্দোনেশিয়া ও জাপানের স্থানে স্থানে নাবিকদের বিশেষ নমস্য ঋষি হলেন অগস্ত্য। দক্ষিণ ভারতের উপকূলবাসীরা অগস্ত্যের কাছে অনুযোগ করে যে রাক্ষসের দল রাত্রের অন্ধকারে জাহাজে করে এসে উপকূলস্থিত গ্রামগুলিকে লুণ্ঠন করে। অগস্ত্য দেখলেন যে সমুদ্রে অবস্থিত দেশ থেকে রাক্ষসেরা আসে আর স্থলবাসীদের পক্ষে জলদস্যুদের প্রতিহত করা যাতে সম্ভব হয় সেজন্য সমুদ্রের জলকে গণ্ডূষ করে নিলেন, সেখানে স্থল দেখা দিল। এই গল্প থেকে মনে

কাহিনীর তাৎপর্য

হয় যে প্রথমে সম্ভবত জলদস্যুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে ক্রমে সমুদ্র পার হয়ে উপনিবেশ স্থাপন ঘটেছিল। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকে ভূগোলকার টলেমি জাভার উল্লেখ করেছিলেন ; রামায়ণেও যবদ্বীপের কথা আছে। যবদ্বীপে ভারতীয় প্রভাব সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই দেখা দিয়েছিল। দেববর্মন নামে যবদ্বীপের এক রাজা ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন।

কম্বুজের কথা

বর্তমানে ইন্দোচীন বলে অভিহিত ভূখণ্ডে কাম্বোডিয়া নামে রাজ্য আছে ; এর ভারতীয় নাম হল কম্বুজ, চীনারা একে বলত "ফু-নান" এবং চীনা ইতিবৃত্তে এর সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র কথা আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিংবদন্তী বলে

কৌণ্ডিন্য সম্পর্কিত কিংবদন্তী

যে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বর্শা নিয়ে কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ সমুদ্রপথে এসে স্থানীয় নাগবংশের রাজকুমারীকে বিবাহ করে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন ; এই কৌণ্ডিন্যের উত্তরাধিকারীরা ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের পরিচয়

দেয়, "বর্মা" উপাধি গ্রহণ করে। নাগকুমারীর নাকি পরিচ্ছদের কোন বালাই ছিল না, অর্থাৎ সভ্যতার মাপকাঠিতে স্থানীয় বাসিন্দারা তখনও কোন স্থান পায় নি। চীনা ইতিবৃত্তে দ্বিতীয় এক কৌণ্ডিণ্যের উল্লেখ আছে ; তিনি নাকি চতুর্থ শতাব্দীতে এসে "ফু-নান" রাজ্যের আইনকানুন স্থির করে দেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফু-নানের অধীনস্থ রাজ্য কম্বুজ দেশ ঐ অঞ্চলে আধিপত্য লাভ করে, সমগ্র অঞ্চল কম্বুজ বলে অভিহিত হয়। বহু অনুশাসন থেকে এই কম্বুজ রাজ্যের কীর্তি আমরা জানতে পারি। সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে ছিল ; ভারতবর্ষ এবং তার ঐতিহ্য ও দেবদেবীর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা বীরবর্মনের কন্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন যেন দ্বিতীয় অরুন্ধতী (বশিষ্টের সহধর্মিণী ছিলেন হিন্দু স্ত্রীর আদর্শস্থানীয়া) ; কোথাও অহোরাত্র রামায়ণ-মহাভারত থেকে পাঠ হবে বলে অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে। রাজা ভববর্মনের প্রশস্তি রচিত হয়েছিল কাব্যরীতি অনুসারে, স্বয়ং কালিদাসের "রঘুবংশম্" কাব্যের অনুকরণে। জয়বর্মন, যশোবর্মন, সূর্যবর্মন প্রভৃতি কৃতী রাজার কথা বর্ণিত হয়েছে। মহীপতিবর্মন ছিলেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌধ-নির্মাতা ; পল্লভ শিল্পরীতি তখন কম্বুজে অনুসৃত হয়েছিল। মহীপতিবর্মনের ব্রাহ্মণ মহিষীর গর্ভে জন্মেছিলেন যশোবর্মন, যাঁর খ্যাতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। যশোবর্মনের রাজ্যকালে বর্তমান আঙ্কোর ঠোম-এ (Angkor Thom) কম্বুজের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই রাজধানীর তৎকালীন নাম ছিল যশোধরপুর ; নগরপ্রাকারের চতুর্দিকে প্রশস্ত খাত ছিল, যে সেতু দিয়ে তা পার হওয়া যেত, তার দুই ধারে সমুদ্র-মন্থনের ছবি আঁকা ছিল। নগরে প্রবেশ করার তোরণ ছিল পাঁচটি ; নগরের মধ্যস্থলে ছিল বিরাট মন্দির, সম্ভবত সেখানে শিবপূজার ব্যবস্থা ছিল। মন্দিরের চূড়া ভেঙে পড়লেও এর মহিমময় স্থাপত্য এখনও মুগ্ধ ও বিস্মিত করে ; তিনটি স্তরে মন্দির খানিকটা পিরামিডের পদ্ধতিতে নির্মিত, হিন্দুর পুরাণ কাহিনী মন্দিরগাত্রে খোদিত হয়ে রয়েছে। চীনা রাজদূত এই যশোধরপুরের যে বর্ণনা রেখে গেছেন, তা চমৎকার। প্রকৃতই যশোধরপুরের শোভা ছিল অনবদ্য। বর্তমানে অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন নগরী ঘুমিয়ে রয়েছে, কিন্তু যখন তার দিন ছিল, তখন তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর অন্যতম ছিল যশোধরপুর। প্রশস্ত রাজপথ, বিশাল তোরণ, অলিন্দ, প্রাঙ্গণ, গবাক্ষ-শোভায় মনোমুগ্ধকর রাজপুরী, স্বচ্ছ পুষ্করিণী প্রভৃতি মিলে

চীনা ইতিবৃত্ত

কম্বুজ রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

মহীপতিবর্মন

যশোবর্মন

যশোধরপুর বা আঙ্কোর ঠোম

যশোধরপুরের শোভাসম্পদ

শহরের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। শূন্যপুরী আজ যেখানে পড়ে আছে, সেখানে একদিন রাজপথ দিয়ে হস্তী-অশ্ব-রথের চলাচল দেখা যেত, মন্দিরে পূজা আর উৎসবের কোলাহল উঠত, হ্রদে প্রমোদ-তরণী ভাসত, সর্বত্র জীবনের স্পন্দন দেখা দিত।

আঙ্কোর ভাট বিষ্ণু মন্দির

আঙ্কোর ভাট-এর কথাও এখানে বলা দরকার। প্রকাণ্ড এক সমতল বেদীর উপর নির্মিত এই অপূর্ব ও আশ্চর্য বিষ্ণু মন্দির আজও প্রকৃতির ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবর্মন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিরাট মন্দির হল কম্বুজে হিন্দুশিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্তি; শুধু পরিকল্পনার ভাবগম্ভীর বিশালত্ব নয়, সূক্ষ্ম ভাস্কর্য, অনুপাত বোধ, গঠন সামঞ্জস্য আর বিচিত্র শিল্পকৌশলে আঙ্কোর ভাট যে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রষ্টব্য সৌধসমূহের অন্যতম তা নিঃসন্দিগ্ধ।

শিল্প সৌষ্ঠব

চম্পা রাজ্য

কম্বুজের অনতিদূরে আর এক বিখ্যাত হিন্দু রাজ্য ছিল যার নাম হল চম্পা (বর্তমানে আনাম)। প্রাচীন যুগে এই অঞ্চলে পাণ্ডুরঙ্গ ও ভৃগু বলে অভিহিত দুই রাজ্যের সংবাদ পাওয়া যায়। এখানে ছিল বহু সমৃদ্ধিশালী নগর আর অগণিত হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির। ঈশ্বরমূর্তি, হরিবর্মন, জয়সিংহবর্মন প্রভৃতি বীর রাজার শাসনে চম্পার অগ্রগতি প্রায় তের শত বৎসর (১৫০-১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দ) অব্যাহত ছিল; পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে প্রতিবেশী চীনাদের আক্রমণ এবং দূরদেশাগত মোঙ্গলদের আঘাতে চম্পা রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে তার বহু পূর্বেই হিন্দু স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়েছিল।

চম্পার বিলুপ্তি

মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশ

মালয় উপদ্বীপ এবং "দ্বীপময় ভারতে" বহু হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। এখানে শৈলেন্দ্র বংশের শাসনে এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। চীন ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে শৈলেন্দ্র বংশের দৌত্য-বিনিময়ের কথা জানা যায়। অষ্টম শতাব্দীতে আরব সওদাগরেরা বাণিজ্য-ব্যপদেশে ঐ অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার যে বর্ণনা করে, তা থেকে বুঝা যায় যে সবচেয়ে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাশালী ছিলেন শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা। আরব রচনায় আছে যে "মহারাজা" উপাধি-ভূষিত এই রাজারা চম্পা ও কম্বুজের বিরুদ্ধে বহুবার সফল অভিযান করেছিলেন; বিপুল নৌ-বাহিনী তাঁদের ছিল, ভারতবর্ষ ও চীনের শাসকরাও তাঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করত। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখা এক আরব গ্রন্থে আছে যে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রতিদিনকার রাজস্ব ছিল দুই শত মণ সোনা!

আরব সওদাগরের বিবরণ

আরব গ্রন্থের মন্তব্য

অতিরঞ্জন প্রতীয়মান হলেও রাজার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বুদ্ধিমান বিদেশীদের ধারণা কেমন ছিল তা এরূপ কথা থেকেও জানা যায়। শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তৎকালীন বাংলা দেশ পাল শাসনে মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল; তাই শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব বাংলার দেবপালের কাছে দূত প্রেরণ করেছেন নালন্দায় এক মঠ নির্মাণের অনুমতি এবং মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়ে। বাংলা দেশ থেকে বৌদ্ধ সাধু কুমারঘোষ শৈলেন্দ্র রাজ্যে গিয়ে রাজগুরুর মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন; কথিত আছে যে কুমারঘোষের নির্দেশে রাজা তারাদেবীর এক চমৎকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিল্পকলার দিকে শৈলেন্দ্র বংশের প্রভূত আগ্রহ ছিল; আজও বরবুদুরের বিশ্ববিখ্যাত স্তূপ শৈলেন্দ্র রাজাদের শিল্পানুরাগ ও অকাতরে সুবিশাল স্থাপত্যকীর্তির ব্যয় বহনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। গিরিশিখরে অবস্থিত এই বিরাট মন্দির নয় থাকে নির্মিত, প্রত্যেকটির উপর প্রশস্ত ছাদ, সবচেয়ে নিম্নে যে স্তর তার দৈর্ঘ্য হল প্রায় ১৩১ গজ; একেবারে উপরে ঘন্টার আকারে তৈরী এক বৃহৎ স্তূপ। অগণিত বুদ্ধমূর্তি, অলিন্দে অলিন্দে কারুকার্যের সমারোহ, বৌদ্ধজাতক ও রামায়ণ-মহাভারতের অসংখ্য কাহিনী সেখানে রূপায়িত। বরবুদুরকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলা হয়েছে; বাস্তবিকই ভারতবর্ষ থেকে উদ্ভূত এবং ক্রমাগত ভারতবর্ষ থেকে প্রভাবিত কম্বুজ ও যবদ্বীপের এই শিল্পকীর্তি ভারতবর্ষের স্বকীয় সৃষ্টিকেও যেন ম্লান করে দিয়েছে।

শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব

বৌদ্ধ সাধু কুমারঘোষ

বরবুদুর

নির্মাণ-কলা

অষ্টম আশ্চর্য

সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম (প্রাচীন নাম দ্বারবতী, বর্তমানে থাইল্যাণ্ড) প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হয়ে সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কথিত আছে যে মগধ থেকে শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। সম্রাট অশোকের এই ব্যাপারে যে বিরাট অবদান রয়েছে, তা সর্বজনবিদিত। সিংহলের স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিতে ভারতীয় শিল্পকৃতির ছাপ সুস্পষ্ট; সিগিরিয়া ও অনুরাধাপুরকে ভারতশিল্পের তীর্থ বললে ভুল হয় না। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের মন্দির, মঠ ইত্যাদিও হিন্দু রীতির প্রভাবচিহ্ন বহন করছে। ঐ দুই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও নদীর নামকরণে ভারতবর্ষীয় ধারা যেন ফুটে রয়েছে; যেখানে ইরাবতী বয়ে চলেছে, শ্রীক্ষেত্র, অযোধ্যা, সুখোদয় প্রভৃতি স্থান যেখানে রয়েছে, সেখানে কোন ভারতবর্ষীয় নিজেকে নিছক বিদেশী বলে অনুভব করতে পারে না। ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া পালি ভাষাতেই সেখানকার ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয়েছে, আজও পালিতে তা পড়া হয়ে থাকে।

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় শিল্প রীতির প্রভাব

ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে ভারতীয় নামকরণ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শৈলেন্দ্র রাজ্য একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে চলেছিল ; তারপর কিছুকাল বঙ্গোপসাগর যখন প্রায় এক "চোল-হ্রদ"-এ পরিণত হয়েছিল, তখন প্রথম রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণে শৈলেন্দ্র রাজ্যের বহুলাংশ চোল শক্তির অধীন হয়ে পড়ে। বহুদূর হতে চোল রাজ্যের পক্ষে সেখানে বেশীদিন শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় নি, আবার শৈলেন্দ্র বংশ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু সিংহল আক্রমণ করতে গিয়ে শৈলেন্দ্র রাজ্য শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপের এক হিন্দুরাজ্য ঐ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। তিক্তবিল্ব (বর্তমান নাম মাজাপাহিত) ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মালয় উপদ্বীপ এবং দ্বীপপুঞ্জ এর অধিকারে আসে। যবদ্বীপ থেকে পালিয়ে এক হিন্দু মালাক্কাদ্বীপে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে রাজ্য স্থাপন করে, কিন্তু দ্বিতীয় রাজা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে ক্রমশ সমস্ত প্রতিবেশী অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব বাড়ে। যবদ্বীপে ইসলামের প্রসার ঘটে, হিন্দু রাজ্যের পতন হতে বিলম্ব হয় না, আর একমাত্র বলিদ্বীপ ভিন্ন অন্য প্রায় সমস্ত অঞ্চলে ইসলামের জয়ধ্বজা অচিরে উড্ডীন হতে থাকে। আজও বলিদ্বীপে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু অন্যত্র ইসলাম প্রাধান্য পেয়েছে। হিন্দু যুগের বহু চিহ্ন আজকের ইন্দোনেশিয়াতে স্পষ্ট ; অধিবাসীদের নামকরণে পর্যন্ত হিন্দু প্রভাব মুছে যায় নি।

শৈলেন্দ্রবংশের অবনতি

যবদ্বীপের হিন্দুরাজ্য

মালাক্কায় হিন্দুরাজ্য

বলিদ্বীপ ছাড়া অন্যত্র মুসলমান ধর্মের প্রাধান্য

ইন্দোনেশিয়াতে হিন্দু প্রভাবের বিদ্যমানতা

রবীন্দ্রনাথ ইন্দোনেশিয়ায় যান ১৯২৫ সালে। সেখানে সর্বত্র ভারত সংস্কৃতির লক্ষণ তিনি দেখেন ; অসংখ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, সংস্কৃতে লেখা প্রচুর পুঁথি, সাধারণ মানুষের জীবনে ও নৃত্যনাট্য প্রভৃতি শিল্পে আজও রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব দেখে পূর্ব-পুরুষদের কথা স্মরণ করে তিনি লেখেন :

ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

সাগরজলে সিনান করি
সজল এলোচুলে,
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
... ...
এবার মোর মকরচূড়
মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে ;
... ...
এনেছি শুধু বীণা—
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি
চিনিতে পার কিনা ॥

বৃহত্তর ভারতের যে পরিচয় আমরা পাই, তা প্রকৃতই গর্ব করার মতো বস্তু। মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি ভূখণ্ডে কত পরিবর্তন ঘটেছে, ইসলামের মতো প্রখর ও তেজস্বী শক্তি সেখানে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু এখনও তাদের আচারে, অনুষ্ঠানে, সামাজিক ধারায় ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্কের চিহ্ন মিলিয়ে যায় নি। একদিকে ভারত, অপর দিকে চীন, এই দুই বিরাট সমন্বয়ধর্মী সুপ্রাচীন দেশের প্রভাব প্রতিবেশীদের উপর একান্ত অনিবার্যভাবেই বিস্তৃত হয়েছে। আর একথা স্মরণ করে অহঙ্কার অসঙ্গত নয় যে সমুদ্র পার হয়ে ভারতবর্ষের মানুষ দূর দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে অগ্রণী হয়েছে, আর এমন সাফল্য অর্জন করেছে যে প্রায় দেড় হাজার বৎসর বিপুল এক দ্বীপময় জগতে তাদের প্রাধান্য অব্যাহত থেকেছে। স্বদেশে হিন্দুর স্বাধীনতা যখন লুপ্ত, তখনও বিদেশে তার গৌরব জাজ্বল্যমান। যেখানে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সভ্যতা প্রসার পায় নি, সেখানে ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভূত উন্নতি লক্ষিত হয়েছে। সংহারমূর্তি নিয়ে ভারতবর্ষ সেখানে যায় নি; বাস্তবিকই যেন সহজ সৌষ্ঠব নিয়ে সেখানে বিচিত্র জীবনধারার একত্র সংমিশ্রণ ঘটেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ও তাহার স্থায়িত্ব

ভারতবাসীর গর্ববোধের কারণ

স্বদেশে যখন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অধঃপতন দেখা গেল, হিন্দু স্বাধীনতার আয়ুষ্কাল যখন নিঃশেষ হয়ে এল, "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হওয়ার দিন যখন উপস্থিত হল, তখন থেকেই যেন উৎসমুখ শুষ্ক হয়ে গিয়ে বিদেশে ভারতীয় সভ্যতার জীবনীশক্তি ক্রমশ হ্রাস পেল, ইসলামের আঘাত যখন পড়ল পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে, তখন তাকে প্রতিহত করার শক্তি আর ছিল না।

ভারতীয় সভ্যতার বিলুপ্তির কারণ

এশিয়ার বিভিন্ন দিকে, পশ্চিমে, পূর্বে, মধ্যস্থলে ভারত-সংস্কৃতির এই জয়যাত্রার কথা একদা আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম। আজ আর তা ভুলে থাকার কোন কারণ নেই। আতিশয্য পরিহার করে, ইতিহাসের দৃষ্টিতে বৃহত্তর ভারতের বৃত্তান্ত পর্যালোচনা আমাদের কর্তব্য। কর্তব্য পালন করলে আনন্দ ও গর্ব উভয়েরই খোরাক মিলবে।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বেকার ভারত

মুসলিম শক্তির অভ্যুদয়

সপ্তম শতাব্দীতে যখন উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ অবস্থায় ছিল, তখন মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ আরবের মরুভূমিতে নূতন ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। যে ক্ষিপ্রবেগে এই শক্তি অগ্রসর হতে থাকে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার অনুরূপ ঘটনা একান্ত বিরল। অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই তদানীন্তন কালে পরিচিত জগতের প্রায় অর্ধেক এলাকা ইসলামের অধিকারে আসে। ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য দখল হয়ে যায় ; ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন মুসলিম শক্তির কবলিত হয়। এর একুশ বৎসর পরে, ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের দক্ষিণে চার্লস মার্তেল-এর অধিনায়কত্বে খ্রীষ্টান ইয়োরোপীয়রা মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করতে না পারলে হয়তো সারা ইয়োরোপের ইতিহাস বদলে যেত, খ্রীষ্টান ধর্মের চেয়ে ইসলাম সেখানে প্রবল হয়ে উঠত। যাই হোক, হজরত মহম্মদ ধর্ম প্রচারের জন্য মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পর একশত বৎসর কাটবার পূর্বেই দেখা গেল যে অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূল থেকে চীন সাম্রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত ইসলামের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। দেখা গেল যে বোগদাদ শহরকে কেন্দ্র করে এমন এক প্রকাণ্ড সামরিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে, যার তুলনায় রোমের সাম্রাজ্য একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। "দীন বলে মহীতলে, যে কার্য করিলে বলে"—বিস্মিত হয়ে বাঙালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্‌লামের এই প্রখর অগ্রগতির প্রশস্তি গেয়েছেন। পারস্যের ইতিহাসখ্যাত সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে, যেন একই প্রচণ্ড অভিযান চালিয়ে আফ্রিকার উত্তরাংশ অধিকার, স্পেন বিজয় এবং ফ্রান্সের গায়ে খলিফার তলোয়ার হানা যে সামরিক কৃতিত্বের পরিচায়ক, তা ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা গিয়েছে। ইসলামের এই উদীয়মান যুগে, তার শক্তি যখন অপরাজেয়রূপে সর্বত্র আতঙ্ক বিস্তার করছে, তখনই ভারতবর্ষে এসে তাকে বাধা পেয়ে স্তব্ধ হতে হয়েছিল। ভারতবর্ষ সর্বদা অতি সহজে বিদেশী আক্রমণকারীর শিকার হয়ে এসেছে, এই রূপকথা বার বার কথিত হলেও যে অসত্য, তা মনে রাখতে হবে।

ইসলাম শক্তির উদ্ভব

দ্রুত বিজয়

চার্লস্ মার্তেল্

সুবিশাল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা

ভারতের সফল প্রতিরোধ

ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঃ সিন্ধু বিজয়

পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেই নব ধর্মে দীক্ষিত, নব উন্মাদনায় উত্তাল, আরবদের দৃষ্টি যে পড়েছিল ভারতবর্ষের দিকে, তাতে সন্দেহ নেই। ৭১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ক্রমান্বয়ে বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ঘাঁটি দখলের চেষ্টা হয়েছিল। এরই পরিণতি স্বরূপ ৭১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের শাসনকর্তা হাজাজ সিন্ধু আক্রমণের আদেশ দেন। তখন সেখানে রাজত্ব করছিলেন দাহির নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা; কথিত আছে যে দাহিরের পিতা পূর্ববর্তী রাজবংশ উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, আলোর শহরে রাজধানী ছিল। যুদ্ধের উপলক্ষ ঘটল, যখন সিংহল দ্বীপ থেকে আসার সময় হাজাজের একখানি জাহাজ সিন্ধুদেশের উপকূলের সন্নিকটে জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং দাহির জলদস্যুদের উপর তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই বলে হাজাজ যে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন তা দিতে অস্বীকার করেন। দাহিরের মনোভাবে অপমান বোধ করে হাজাজ প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মহম্মদ বিন্ কাশিম নামে বীর যোদ্ধার পরিচালনায় এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলেন। কথিত আছে যে ছয় হাজার দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী নিয়ে মহম্মদ বিন্ কাশিম সিন্ধুদেশের বন্দর দেবলে হাজির হয়ে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করেন। দাহির যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু দেবলের পতনের পর নিরুন, সেওয়ান প্রভৃতি কেল্লা শত্রুর কবলে পড়ল, এবং দেবলের কাছে রাওর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় সেখানে দাহির পরাভূত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। দাহিরের পুত্র ও মহিষী দুর্গ থেকে প্রতিরোধ চালিয়ে যান, কিন্তু পরাজয় অনিবার্য দেখে পুরুষেরা রণক্ষেত্রে এবং মেয়েরা সকলে মিলে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেন। শত্রুর অগ্রগতি তখন চলতে থাকে; ব্রাহ্মণাবাদ, মুলতান ও অন্যান্য বহু অঞ্চলে বিদেশী কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। আরবদের লেখা বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে সিন্ধুদেশবাসীদের মধ্যে যারা বৌদ্ধ কিংবা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক, তারা মুসলিম শক্তিকে সাহায্য করেছিল। সম্ভবত তদানীন্তন হিন্দু রাজ্যের এই ছিল প্রধান দুর্বলতা; সমাজশাসন কঠোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বশ্রেণীর সংহতি নষ্ট হয়ে পড়েছিল।

হাজাজ কর্তৃক সিন্ধুদেশ আক্রমণের আদেশ

আক্রমণের অজুহাত

মহম্মদ বিন্ কাশিম সিন্ধুদেশ আক্রমণ

দেবলের যুদ্ধ ও রাজা দাহিরের মৃত্যু

ব্যর্থ প্রতিরোধ

দেশে দুর্বল সংহতি

বিদেশী বিধর্মী আরবদের রাজ্য এইভাবে এদেশে প্রথম স্থাপিত হল; ৭১৩ সালের মধ্যে মহম্মদ বিন্ কাশিম সিন্ধু অঞ্চলে নিজের অধিকারকে দৃঢ় করে তুললেন। এই নূতন শাসকদের খুব বেশী অত্যাচারী মনে করা ঠিক

সিন্ধুদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

হবে না। অবশ্য যুদ্ধের সময় এবং অব্যবহিত পর জয়োল্লাসে উন্মত্ত সৈন্যদল যে লুটতরাজ করে নি, তা নয়; ধর্মগত কারণে নরহত্যা কিংবা জোর করে ক্রীতদাস বানাবার ঘটনাও ছিল। কিন্তু মোটের উপর "কাফের"-দের প্রদেয় কর দিতে রাজী থাকলে হিন্দুর ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করা হত না; স্থানীয় ব্রাহ্মণদেরই দেশের শাসনকার্যে নিযুক্ত করা হত। মুসলিম আইন অনুযায়ী কাজীরা বিচার করতেন, কিন্তু হিন্দু আর মুসলমানদের সম্বন্ধে পৃথক আইন প্রযুক্ত হত। যাই হোক, লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সিন্ধুদেশে শক্তিশালী ঘাঁটি সংগ্রহ করার পরও যে খলিফার নামে তখন প্রায় সারা দুনিয়া থরহরি কম্পমান অবস্থায় ছিল, সেই খলিফার রাজ্যকে ভারতবর্ষে আরও সুবিস্তৃত করা সম্ভব হয় নি। এ ব্যাপারে যে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়েছিল, তা নয়। সিন্ধুদেশের শাসনকর্তা পদে বিন্ কাশিমের উত্তরাধিকারী জুনায়েদ ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট, ভরোচ ও মালব জয়ের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু প্রথম দিকে সাফল্য সত্ত্বেও তাঁকে নিরাশ হতে হয়। ৭৩১ সালে পরবর্তী শাসক তমীম্ দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হতে চান, কিন্তু সম্ভবত ৭৩৮ সালে চালুক্যরাজ পুলকেশীর কাছে নওসরির যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পরাস্ত হন। আবার খলিফার বাহিনী নূতন অভিযান চালিয়ে উজ্জয়িনী পর্যন্ত যখন অগ্রসর হয়, তখন গুর্জররাজ নাগভটের হাতে তাদের চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই বিজয়ের কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে; এর পর প্রায় ২৭৫ বৎসর ভারতবর্ষ বিদেশী আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল। একবার নবম শতাব্দীর শেষ দিকে, সম্ভবত ৮৮৩ সালে কচ্ছ অধিকারের জন্য বিন্ মুসা অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু মিহিরভোজ তাঁকে পরাভূত করেন। আবার ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নূতন বিপদ দেখা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নাগভটের বিজয়-ফলে ভারতবর্ষ বিদেশী আক্রমণ থেকে নিস্তার পেয়েছিল।

(মুসলিম শাসন-নীতি)

(মুসলিম রাজ্য-বিস্তার প্রয়াসের ব্যর্থতা)

(নওসরির যুদ্ধে পুলকেশীর নিকট পরাজয়)

(নাগভটের হাতে পরাজয়)

(মিহিরভোজের নিকট পরাজয়)

সিন্ধুদেশে আরব শাসন স্থায়ী হয় নি; ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্য-বিস্তারে আরবরা সফল হয় নি, সাফল্যের অধিকারী পরে হয়েছিল সভ্যতার বিচারে বহু নিম্নে অবস্থিত তুর্ক আক্রমণকারী। এর কারণ ছিল অনেক। খলিফাদের নিজেদের ঘরে ঝগড়া বেধে গিয়ে যখন ওমায়েদ খলিফাবংশের পতন হল, তখন থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে সিন্ধুদেশের যোগাযোগ দুর্বল ও প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অথচ সমুদ্রপথে এই যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজন উভয় দিকে ছিল। এ কথাও মনে হয় যে খলিফারা তখন সিন্ধুরাজ্যটিকে যথোচিত-ভাবে রক্ষা করা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটাবার দিকে খুব মনোযোগী ছিলেন

(ভারতে আরবদের রাজ্য-বিস্তারে ব্যর্থতার কারণ : গৃহবিবাদ)

(মনোযোগের অভাব)

না। অবশ্য খুবই সম্ভব যে অন্যান্য যে সব অঞ্চলে মুসলিম শক্তি বিস্তৃত হয়েছিল, তার তুলনায় ভারতবর্ষ তখনও রীতিমত "কঠিন ঠাঁই" ছিল বলে বিশেষ কিছু করাও খলিফাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া সিন্ধু প্রদেশ থেকে অগ্রসর হতে হলে থর মরুভূমি ছিল এক দুরূহ প্রতিবন্ধক; দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাওয়া একেবারে সহজ ব্যাপার ছিল না। আরবদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কারণ হিসাবে হয়তো বলা যায় যে তখনও হিন্দু রাজ্যগুলির সমরশক্তি পঙ্গু হয়ে পড়ে নি, দেশরক্ষার জন্য আগ্রহেরও খুব অভাব ঘটে নি। গুর্জর-প্রতীহার, চালুক্য প্রভৃতি রাজবংশ তখনও শক্তিশালী ছিল; বিধর্মীকে যুদ্ধে পরাজিত করার গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে মিহিরভোজ গোয়ালিয়র অনুশাসনে যেভাবে গুর্জর-প্রতীহার রাজ্যের আঘাতে ম্লেচ্ছদের পরাজয়-কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা থেকে মনে হয় যে দেশরক্ষা সম্পর্কে চেতনা তখনও প্রভূত। ক্রমশ পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মুসলিম বিজয়ের পথ সুগম হয়েছিল, কিন্তু তখনও তা ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

থর-মরুর বাধা

হিন্দু সামরিক শক্তির দৃঢ়তা এবং দেশরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা

আরবদের এই সিন্ধু বিজয়কে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিক্ষিপ্ত অধ্যায় ছাড়া আর কিছু মনে করার বিশেষ কারণ নেই। আরব রাজ্য যেখানে সীমাবদ্ধ ছিল, তা আয়তনে বৃহৎ নয়; তার প্রসার-প্রচেষ্টা বারবার প্রতিহত হয়েছে। অল্পকালের মধ্যে সিন্ধুদেশে ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্য দেখা দিয়েছিল; সেখানকার আরব আধিপত্য একেবারে বিলুপ্ত করেছিলেন তুর্কী যোদ্ধা মহম্মদ ঘুরী। ভারতে মুসলমান শাসন স্থাপনের দিক থেকে তাই আরবদের সিন্ধু জয়ের কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। কিন্তু রাজনীতির দৃষ্টিতে সিন্ধু বিজয় মাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক থেকে দেখলে এর মূল্য প্রভূত বলে প্রতীয়মান হবে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে ভারতীয় ও আরব সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগ ও আদানপ্রদানে ইতিহাসে বহু মূল্যবান ব্যাপার ঘটেছে। ভারতবর্ষ ও আরব জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় সভ্যতায় অগ্রসর দুই দেশের প্রতিভা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। তদানীন্তন আরবদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু মনীষীর অভাব ছিল না; গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে আরবরা ভারতের কাছে ঋণ গ্রহণে সঙ্কুচিত হয় নি। আরবরা মধ্যস্থ না হলে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে আরও বহুকাল অপরিজ্ঞাত থাকত। সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতীয় নাবিকদের স্থানচ্যুত করে সুদক্ষ আরব নাবিকরা এই সময় থেকে

সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য

সংস্কৃতিগত তাৎপর্য:

সভ্যতার যোগাযোগ

আরবের মধ্যস্থের ভূমিকা

সমুদ্রে আরবদের প্রাধান্য

প্রধান হয়ে ওঠে। ক্রমশ আরব সওদাগরদের জাহাজ আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের অন্যত্র অধিক সংখ্যায় দেখা দেয়, বহু পরে পাশ্চাত্য নৌশক্তি এ দিকে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাদের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল।

গজনীর তুর্ক রাজ্য ও ভারতবর্ষ

তুর্ক জাতি

আলপ্‌তিগীন

সবুক্ত্‌গীন

শাহী রাজবংশ

সবুক্ত্‌গীন ও জয়পালের যুদ্ধ

জয়পালের পরাজয়

আরবরা যেখানে রাজ্য বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে সাফল্য লাভ করল তুর্ক জাতি—এ যেন ইতিহাসের এক পরিহাস। মধ্য এশিয়া বা তুরানে এই তুর্ক জাতির আদি বাস ছিল। ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানের গজনী শহরকে কেন্দ্র করে ছোট একটি রাজ্য স্থাপন করেন তুর্কী আলপ্‌তিগীন। বোগদাদে খলিফার সাম্রাজ্যে যখন ভাঙন চলছিল, তখন খোরাসানের শাসনকর্তা আবদুল মালিক-এর অধীনে আলপ্‌তিগীন মাত্র একজন কর্মচারী ছিলেন; সুযোগ বুঝে গজনীতে জেঁকে বসে তিনি উপরওয়ালাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। আলপ্‌তিগীনের জামাতা সবুক্ত্‌গীন যখন গজনীতে রাজ্য আরম্ভ করেন (৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), বাস্তবিকপক্ষে তখন থেকেই গজনীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে, এবং আফগানিস্তানের একাংশ নিয়ে শাহী বলে অভিহিত এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাজত্ব করছিল। পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজ্য বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছিল। সবুক্ত্‌গীনের সময়ে জয়পাল ছিলেন শাহী বংশের রাজা ; উন্দ বা উদভাণ্ডপুরে তাঁর রাজধানী ছিল। উভয় রাজ্যের সীমান্ত পরস্পর সংলগ্ন বলে যুদ্ধের অজুহাতের কোন অভাব ঘটল না। জয়পাল একাধিকবার গজনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আর সারা আফগানিস্তানকে নিজের দখলে আনবার জন্য সবুক্ত্‌গীন তো খুবই আগ্রহ রাখতেন। ৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সজ্ঘর্ষ হল, জয়পাল পরাজিত হয়ে রাজ্যের যে অংশ আফগানিস্তানে অবস্থিত, তা ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। কয়েকটি এলাকা সম্পর্কে তুর্কীর আধিপত্য স্বীকার করলেন। দেশে ফিরে জয়পাল সন্ধির শর্ত অমান্য করায় সবুক্ত্‌গীন আবার (৯৮৮) শাহী রাজ্য আক্রমণ করলেন, কোন কোন ভারতীয় রাজার সহায়তা সত্ত্বেও জয়পাল আবার পরাজিত হলেন, শাহী রাজ্যের পশ্চিম ভাগ গজনীর সুলতানদের অধিকারে গেল। ৯৯৭ সালে সবুক্ত্‌গীনের মৃত্যু হয়। তাঁর সম্বন্ধে স্মরণীয় যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিশেষ অগ্রসর হতে না পারলেও তার সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্পষ্ট সঙ্কেত তাঁর কৃতিত্ব থেকে পাওয়া যায়।

একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থিতি এমন যে সেখানে শাসন দুর্বল ও বিশৃঙ্খল থাকলে ভারতবর্ষের কোন বিপদ থাকে না, কিন্তু সেখানে যদি কোন বৃহৎ শক্তির আবির্ভাব ঘটে তো ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসার প্রলোভন তাকে যুদ্ধে আকৃষ্ট করতে বাধ্য। বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর প্রমাণ মিলেছে; ঠিক এইজন্য যখন ইংরাজ সাম্রাজ্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন আফগানিস্তান যাতে শক্তিশালী না হয়, কিংবা তৎকালীন রুশ সাম্রাজ্যের প্রভাবে না পড়ে, সেদিকে ইংরাজের অখণ্ড মনোযোগ ছিল, বারবার যুদ্ধও আফগানিস্তানকে উপলক্ষ করে বেধেছে। বহুকাল পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্য যখন কাবুল নদীর উপত্যকাতে প্রসারিত হয়, তখন পঞ্জাবকেও সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হতে হয়েছিল। আলেকজান্দার পারস্যের সেই প্রদেশ আক্রমণ করেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, দুর্জয় প্রতিরোধের সম্মুখীন না হলে এদেশে আরও এগিয়ে আসার চেষ্টা অবশ্যই করতেন। তারপর কুশানরা যখন খিভা, বোখারা প্রভৃতি অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন তাদের অনিবার্য অগ্রগতি ঘটল ভারতবর্ষের দিকে। হূন রাজত্ব অল্পস্থায়ী হলেও সেক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সবুক্ত্গীন এবং তাঁর পরাক্রান্ত পুত্র সুলতান মাহ্মুদের সময় দেখা গেল যে ভারতবর্ষের সীমান্তে এক শক্তিশালী যুদ্ধপ্রবণ রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে। সমসাময়িকেরা ভালো রকম না বুঝলেও আমরা অন্তত ইতিহাসের শিক্ষা থেকে বুঝতে পারি যে যথাযোগ্য দেশরক্ষার ব্যবস্থা না হলে পঞ্জাব ও ভারতবর্ষের আরও কতকগুলি অঞ্চলে বিদেশী কর্তৃত্ব তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজাদের মনে এই চেতনা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় নি।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সামরিক গুরুত্ব

ইংরেজের আফগান নীতি

পারস্য

আলেকজান্দার

কুশান

হূন

সমসাময়িক ভারতে পর-কর্তৃত্বের অনিবার্যতা

সুলতান মাহ্মুদ

গজনীর ইয়ামিনি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান মাহ্মুদ পিতা সবুক্ত্গীনের মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করেন। তাঁর রাজ্যকাল হল ৯৯৮ থেকে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথমে পারস্যের সামানিদ বংশের আনুগত্য স্বীকার করলেও কার্যত তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন; শীঘ্রই "আমীর"-এর বদলে "সুলতান" উপাধি ঘোষণা করলেন, স্বয়ং খলিফার কাছ থেকে "ইয়াসিন-উদ্দৌলা" এবং "আমিন-উল্-মিল্লৎ" পদবী পেলেন। হিন্দুস্থানের অপার ঐশ্বর্যের কথা শুনে তাকে নিজহস্তগত করার প্রচণ্ড বাসনা তাঁর মনে জেগেছিল, আর সেখানে যুদ্ধ চালিয়ে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ ঘটাবেন বলে ধর্মের যে

মাহ্মুদের রাজ্যকাল

সুলতান উপাধি গ্রহণ

মাহ্‌মুদের ভারত-অভিযান

প্ররোচনা পেলেন তাতে প্রলোভন আরও দারুণ হয়ে উঠল। ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অন্তত সতেরো বার তিনি অভিযান করেন, ক্রমাগত ভারতবর্ষের দৌলত লুণ্ঠন করে নিয়ে যান; প্রতিবার আক্রমণের পর প্রলোভন বহুগুণ বাড়তে লাগল। প্রথম অভিযানে খাইবার গিরিবর্ত্মের নিকটে কয়েকটি কেল্লা দখলে আসায় তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কতকটা সুগম হয়েছিল। ১০০১ সালে পেশোওয়ারের কাছে এক প্রবল সঙ্ঘর্ষ ঘটে; পিতৃশত্রু জয়পালকে মাহ্‌মুদ পরাস্ত ও বন্দী করেন। শোনা যায় যে ভয়াবহ যুদ্ধে বহু সৈন্য হতাহত হওয়ার পর অনুচরসহ জয়পালকে বন্দী করা হয়, সুলতানের হুকুমে জয়পালের গলা থেকে মণিমুক্তাখচিত হার ছিনিয়ে নেওয়া হয়, প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ও দেড়শো হাতীর বিনিময়ে জয়পালকে মুক্তি দেওয়া হবে জানানো হয়। মুক্তিপণ এতই বিপুল ছিল যে তা দিতে কিছু বিলম্ব ঘটে, কিন্তু মাহ্‌মুদ গজনীতে ফেরার পূর্বেই জয়পালের পুত্র আনন্দপাল তা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মাহ্‌মুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েও জয়পাল অপমানের জ্বালা ভুলতে পারেন নি, রাজ্যভার পুত্রকে দিয়ে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে পরাজয়ের গ্লানি মোচন করেন। এই ধরনের ঘটনা থেকে মনে হয় যে সে যুগে হিন্দুদের মধ্যে সাহস ও মর্যাদাবোধের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না, অভাব যা ছিল তা হল, একত্র সঙ্ঘঠিত হয়ে বিষম বিদেশী বিপদের বিরুদ্ধে অনলস আয়োজন সম্বন্ধে প্রকৃত চেতনা।

জয়পালের সাথে যুদ্ধ

জয়পালের বন্দিত্ব

অপমানাহত জয়পালের অগ্নিতে আত্মাহুতি দান

শাহী বংশ প্রশস্তি

শাহী বংশ সম্বন্ধে শ্লাঘার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে যে শেষ পর্যন্ত দেশের সীমান্তরক্ষী এই রাজ্য বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অকাতরে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছিল। আনন্দপালের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুলতানকে নিজের আয়ত্তে আনতে মাহ্‌মুদকে খুব বেগ পেতে হয় নি, তবে একেবারে সম্পূর্ণ অধিকার সাব্যস্ত করতে ১০১০ সাল পর্যন্ত সময় লেগেছিল। ১০০৬ এবং ১০০৮ সালে আনন্দপালকে মাহ্‌মুদের শক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল; দ্বিতীয় বার তিনি তুর্কীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন হিন্দু রাজ্যের সহায়তা পেয়েছিলেন বলে যে কথা পূর্বে শোনা যেত, তা সত্য নয় বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। যুদ্ধে মাহ্‌মুদের চূড়ান্ত বিজয় ঘটে। আনন্দপালের মৃত্যুর পর পুত্র ত্রিলোচনপাল ও পৌত্র ভীমপালের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও তুর্কী আক্রমণের অবিরাম চাপে শাহী রাজবংশ ধ্বংস হয়ে যায় (১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে)। আরব মনীষী অল্‌বেরুনি এবং "রাজতরঙ্গিণী"-রচয়িতা কহ্লন উভয়েই এই বংশের সাহস ও চরিত্রবলের প্রভূত প্রশংসা করেছেন।

মাহ্‌মুদ-আনন্দপাল সঙ্ঘর্ষ

শাহী বংশের বিলুপ্তি

কাংড়া দুর্গ লুণ্ঠন করে সুলতান যে অপরিসীম স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য সম্পদ নিয়ে গজনী রাজ্যে ফেরেন, তার বর্ণনা পড়লে মনে হয় যেন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মন্দির আক্রমণ করে দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে নানাবিধ মহামূল্য অলঙ্কারের প্রলোভন সুলতানের যেন ক্রমশই বাড়ছিল। "কাফের"-দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সফল অভিযান চালিয়ে তখন তিনি "গাজী" উপাধি গ্রহণ করলেন, আরও পৌত্তলিকতা বিরোধী আয়োজনে লিপ্ত হলেন। সর্বত্র লোভের ও ধর্মান্ধতার যে পরিচয় মেলে, তা মাঝে মাঝে ন্যক্কারজনক না মনে হয়ে পারে না। থানেশ্বর (১০১৪ খ্রীষ্টাব্দ), কনৌজ (১০১৮ খ্রীষ্টাব্দ), মথুরা (১০১৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী নগরে অগণিত নরনারীর মৃত্যু ঘটে, অসংখ্য মন্দির চূর্ণ হয়, লুণ্ঠনের আর অবধি থাকে না। কনৌজ দখল আর লুঠ করে বিখ্যাত প্রতীহার রাজ্যকে তিনি একেবারে নিঃশেষ করে দেন। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূত যে মথুরা নগরী অন্তত হাজার বৎসর ধরে শিল্প ও সংস্কৃতির এক পীঠস্থানস্বরূপ ছিল, সেখানে মাহ্‌মুদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে সমসাময়িক এক বৃত্তান্ত থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

মাহ্‌মুদের লোভ ও ধর্মান্ধতা

থানেশ্বর, কনৌজ ও মথুরা অভিযান

"সেখানে তিনি (মাহ্‌মুদ) এসে দেখলেন এক আশ্চর্য শহর, যেন স্বর্গধাম বলে তার বর্ণনা করা যেতে পারে।...পাথরে গড়া এক হাজার প্রাসাদ সেখানে ছিল।...আর শহরের ঠিক মাঝখানে ছিল এক মন্দির, যা হল অন্য সমস্ত সৌধের চেয়ে উচ্চ, যার সৌন্দর্য ও সজ্জার বর্ণনা দিতে গেলে সমস্ত লেখকের কলম আর সমস্ত চিত্রকরের পেন্সিল হার মেনে যাবে।...সুলতান যে আত্মকথা লেখেন তাতেই আছে যে ঐরকম কিছু নির্মাণ করতে হলে এক হাজার "দিনার"-এ ভরা এক লক্ষ ঝোলাতে যত অর্থ ধরে তা খরচ করে, আর সবচেয়ে নিপুণ শিল্পীদের সহায়তা পেলে, দুশো বৎসরেও কাজ শেষ হবে না।"

সমসাময়িক মথুরার সমৃদ্ধি

মাহ্‌মুদের মন্তব্য

এর পর ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে কাথিয়াওয়াড়ের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠিত হয়। চালুক্যরাজ প্রথম ভীম সুলতানের গতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মন্দিরকে অপবিত্র করে, সেখানকার অতুল সম্পদ লুণ্ঠন করে, নিজ হস্তে বিগ্রহ চূর্ণ করে, মাহ্‌মুদ গজনীতে ফিরে যান। লুণ্ঠনের পরিমাণ অতি বিপুল হলেও ঠিক যে বিজয়গর্বে ফিরতে পেরেছিলেন, তা মনে হয় না। মাহ্‌মুদের জয়যাত্রার যে সমস্ত প্রশস্তি তাঁর আশ্রিত লেখকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা থেকে তৎকালীন হিন্দু রাজাদের প্রতিরোধ সম্পর্কে বিশেষ

সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন

কিছু থাকে না। কিন্তু তাঁদেরই বৃত্তান্ত থেকে মনে হয় যে সুলতানকে সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের পর কিঞ্চিৎ বিপন্ন হতে হয়েছিল। তাড়াতাড়ি গজনীর দিকে তাঁকে যে ফিরতে হয়েছিল, তা নিশ্চিত; আরও অনেক মতলব মুলতুবী রাখতে হয়েছিল। সুলতানের প্রশস্তিতে সিদ্ধহস্ত ইব্‌ন-উল্‌-অথির লিখেছেন : "সেখান (সোমনাথ) থেকে মাহ্‌মুদ ফিরলেন, কারণ হিন্দু রাজা পরমদেও তাঁর পথ রোধ করেছিল, আর আমীর মাহ্‌মুদ এই ভেবে ভয় পেলেন যে তাঁর বিরাট বিজয়ের ফলাফল বিকৃত হয়ে যেতে পারে। সোজা রাস্তায় না গিয়ে তিনি একজনের সাহায্য নিলেন যে অন্য রাস্তা জানত, আর মুলতানের দিকে গেলেন। পথে তাঁর সৈন্যদের দারুণ কষ্ট হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর বহু যোদ্ধা এবং অনেক পশু পথকষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে ধারার বিশ্রুতকীর্তি পরামর রাজা ভোজ কাথিয়াওয়াড়ে সুলতানের পথরোধ করেছিলেন। এখানে বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, লেখক, শাসকরূপে ভোজের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই যশস্বী রাজা যে মাহ্‌মুদের প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করেছিলেন, তা এক স্মরণীয় ঘটনা। মুসলিম ইতিহাসে তুর্কীদের সঙ্গে ভোজের কোন সজ্ঘর্ষের বিবরণ নেই, কিন্তু স্বয়ং ভোজের উদয়পুর-প্রশস্তিতে দাবি করা হয়েছে যে ভোজ বিধর্মীদের পরাস্ত করেছিলেন। মাহ্‌মুদ যে শুধু তাঁর বিজয় ঘোলা হয়ে যাবে মনে করে অত্যন্ত দুরূহ মরুপথ দিয়ে ফিরেছিলেন, জলাভাবে বহু প্রাণ নষ্ট হবে জেনেও সোজা পথ ধরতে পারেন নি, তার কারণ হয়তো এই যে সোজা পথে যেতে গিয়ে তিনি বাধা পেয়েছিলেন, হয়তো ভোজের সঙ্গে সুলতানের সৈন্যদলের কোন অংশের সজ্ঘর্ষ হয়েছিল, পরাজয় ঘটেছিল। যাই হোক, অন্তত সতেরো বার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠন করার পর ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে গজনীতে সুলতানের মৃত্যু হয়।

(প্রত্যাবর্তন পথে মাহ্‌মুদের বিপদ; পরামর রাজা ভোজ কর্তৃক মাহ্‌মুদের পথরোধ; উদয়পুর-প্রশস্তি; সম্ভাব্য ঘটনা; মাহ্‌মুদের মৃত্যু)

মাহ্‌মুদের চরিত্র

নিজের দেশে মাহ্‌মুদ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, গুণগ্রাহী ও সুবিবেচক; ইসলামের ইতিহাসে তিনি একজন বহুনন্দিত শাসক। নিষ্ঠাবান মুসলমান বলে তাঁর খ্যাতি সুবিস্তৃত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন শিল্পকলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক বলেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষে বারবার অভিযান করে তিনি যে সাফল্য লাভ করেন, এবং অপর দিকে পারস্য ও মধ্য এশিয়াতে নিজের শক্তি বিস্তারে যে সামরিক

(বহুনন্দিত শাসক; প্রতিভাবান সমরনায়ক)

প্রতিভার পরিচয় দেন তা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রকৃতই কোন সুপরিকল্পিত কার্যক্রম তাঁর ছিল কিনা বলা শক্ত। ক্রমাগত ভারত আক্রমণের যে বাস্তবিকই কি উদ্দেশ্য ছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইসলামের প্রসার সাধন, কিংবা সত্যধর্মে অবিশ্বাসীদের দেশে মুসলিম রাজত্ব স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা, কিংবা শুধু ভারতবর্ষের অপরিসীম সম্পদ হরণ, তাঁর যথার্থ উদ্দেশ্য ছিল, বলা যায় না। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকরা অবশ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ইসলামের প্রচার ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সেজন্য যে কোন বিশেষ প্রযত্ন তিনি করেছিলেন, যুদ্ধ ও লুণ্ঠন ব্যতিরেকে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন বলে জানা নেই। ভারতবাসীর চোখে তাই সুলতান মাহ্‌মুদ এক নির্মম, ধর্মান্ধ, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ভিন্ন অন্য কোন চেহারায় দেখা দেন নি। শাসক হিসাবেও প্রকৃত প্রতিভা তাঁর ছিল বলা সহজ নয়। পঞ্জাবকে তিনি গজনী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে যে মুসলিম শাসকরা বিদ্রোহ করছে (মাহ্‌মুদের পুত্র মাসুদের আমলে তিলক নামে এক হিন্দু সেনাপতি পঞ্জাবে মুসলিম শাসকদের বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন!), প্রকৃত সুশাসনের ব্যবস্থা তিনি পঞ্জাবে করতে পারেন নি। ভারতের অভ্যন্তরে কোথাও তাঁর আধিপত্য অবশ্য স্বীকৃত হয় নি; তবে যে মহম্মদ ঘুরী হিন্দুস্থানে মুসলিম রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, তিনি মাহ্‌মুদের প্রদর্শিত পথে চলেছিলেন বলা যায়, মাহ্‌মুদ পথ পরিষ্কার করে না রাখলে ঘুরীর সাফল্য সম্ভব হত না। যাই হোক, গজনীতে মাহ্‌মুদের শাসন ছিল খুবই প্রশংসনীয়; ভারতে সংগৃহীত সম্পদের বহুলাংশ তিনি গজনীর শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ব্যয় করতেন। নিজে নিরক্ষর হয়েও তিনি ছিলেন কবি এবং বিদ্যোৎসাহী; গজনীতে বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপন করে তিনি যশস্বী হয়েছেন। এই যশঃপ্রভা যে এত সমুজ্জ্বল তার কারণ হল মাহ্‌মুদের রাজসভায় ফার্সী মহাকাব্য "শাহ্‌নামা"-প্রণেতা মহাকবি ফির্দৌসি, সর্ববিদ্যাবিশারদ অল্‌বেরুনি, ঐতিহাসিক উৎবি, দার্শনিক ফরাবি প্রভৃতি মনীষীর উপস্থিতি। ফির্দৌসি ও অল্‌বেরুনি সর্বদা সুলতানের ব্যবহারে তুষ্ট ছিলেন না; হয়তো নিজের খ্যাতি বৃদ্ধির জন্যই সুলতান গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু রাজাদের ক্ষেত্রে এমন বস্তু অপ্রত্যাশিত নয়। চরিত্রে বৈপরীত্য সত্ত্বেও বহুগুণান্বিত নরপতি বলে সুলতান মাহ্‌মুদ স্মরণীয়।

ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য বিচার

ইসলাম-প্রচার সম্পর্কে তথ্যের অভাব

শাসক হিসাবে ব্যর্থতা

ঘুরীর পথপ্রদর্শক

গজনীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন

রাজসভার পণ্ডিত সমাজ

অল্‌বেরুনির পরিচয়

স্থলতান মাহ্‌মুদের রাজসভা যাঁরা অলঙ্কৃত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের দিক থেকে সবচেয়ে মনে করে রাখার মতো ব্যক্তি হলেন অল্‌বেরুনি (অপর নাম আবু রয়হান)। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে খিভা অঞ্চলে এই প্রতিভাধরের জন্ম হয়। কথিত আছে যে যুদ্ধের পর বন্দী অবস্থায় তিনি স্থলতানের কাছে আনীত হয়েছিলেন, গুণগ্রাহী মাহ্‌মুদ তাঁকে জানতে পেরে সম্মানের আসন দেন। স্থলতান যখন পঞ্জাব জয় করেন তখন অল্‌বেরুনি তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়ে কিছুকাল বসবাস করেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি তাঁর কাছে একান্ত অপরিচিত ও দুরূহ সংস্কৃত ভাষা, হিন্দু দর্শনচিন্তা ও অন্যান্য বিষয়ের অনুশীলন করেন, সর্ববিদ্যাপারংগম বলে তাঁর খ্যাতি একটুও অসঙ্গত নয়। অল্‌বেরুনি ভারত-বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তা হল এদেশের ইতিবৃত্ত, ভারতবাসীর চরিত্র, ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির এক অমূল্য আকর। বিশ্ব-সভ্যতায় আরব মনীষীদের অবদান অল্প নয় ; তাঁদের মধ্যে অল্‌বেরুনির অতি উচ্চ স্থান নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। ভারত সম্পর্কে অল্‌বেরুনির রচনা জগদ্বিখ্যাত ; তীক্ষ্ণ ও গভীর পর্যবেক্ষণের দিক থেকে এর তুলনা নেই, ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে এটি যে অন্যতম তা নিঃসন্দিগ্ধ। যে যুগে তিনি বাস করতেন, তার বহু কদর্যতার কথা ভাবলে মনে হয় স্থলেখক ও স্থপণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অল্‌বেরুনি সম্বন্ধে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"উন্মুক্ত তরবারি, অগ্নিদগ্ধ নগর আর লুণ্ঠিত দেবালয়ের উন্মত্ত পরিবেশে অল্‌বেরুনির "ভারত কথা" যেন উদার, নিরপেক্ষ জ্ঞানসাধনার এক স্বপ্নময় দ্বীপ"—তা খুবই সঙ্গত ও শোভন।

অল্‌বেরুনির সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা

ভারত-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন

অল্‌বেরুনির অবদান

মুসলিম বিজয়ের অনতিপূর্বে ভারত

বৈদেশিক আক্রমণের স্থদীর্ঘ বিরতি

ভারতে মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপন ও বিস্তারের অনতিপূর্ব কালের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। সাধারণত ইতিহাস গ্রন্থাদিতে এ সব কথার উল্লেখ না থাকলেও তাদের খুবই গুরুত্ব আছে। হুন-নায়ক তোরমানের সময় থেকে গজনীর স্থলতান মাহ্‌মুদের এদেশে আগমন পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বৎসর বিদেশী আক্রমণের ভয় থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত ছিল ; সিন্ধুর মরুঅঞ্চল খলিফার অধিকারে থাকলেও সারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য, আর পূর্বেই দেখা গেছে যে সিন্ধু থেকে নানা কারণে মুসলিম শক্তির পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীন সত্তাকে বিনষ্ট করে

দেওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। এই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে পাণিক্কর বলেছেন যে এত দীর্ঘকাল ধরে ছুনিয়ার অন্য কোন এলাকা বিদেশী আক্রমণের আশঙ্কা থেকে পরিত্রাণ পায় নি। গ্রীক, কুশান, শক, হূন প্রভৃতি আক্রমণকারীর কথা ভুলে গিয়ে তখন ভারতবর্ষ হয়তো ভেবেছিল যে আর কখনও দেশ আক্রান্ত হবে না। বিদেশ থেকে বিপদ আসতে পারে না, এই ধারণা মজ্জাগত হয়ে পড়লে আত্মসন্তুষ্টি দেখা যায়, ভারতবর্ষের স্বয়ংসম্পূর্ণ মহিমায় গদগদ হয়ে দেশরক্ষা সম্পর্কে চেতনা ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী বিপদের সম্মুখীন হয়ে সংগ্রাম করেছিল, তখন বিষ্ণুপুরাণে ভারত-গৌরব বিষয়ক শ্লোক রচিত হয়েছে, কিন্তু সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে যুগ, তখন সাহিত্যেও যেন জাগ্রত ভারতচেতনার লক্ষণ নেই, সঙ্কীর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে বাগাড়ম্বর দেখা দেয়। যুগ পরিবর্তন কালে তাই যথাযোগ্য ভূমিকায় নামতে ভারতবর্ষের অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল।

পাণিক্করের মন্তব্য

আত্মসন্তুষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি

জাগ্রত ভারত-চেতনার অভাব

সম্ভবত দেশের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকার ফলেই ভারতবাসীর আত্মতুষ্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ মনোভাব দৃঢ়ীভূত হয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছিল তাদের অহঙ্কার। অল্‌বেরুনি লিখে গেছেন ঃ "হিন্দুরা মনে করে তাদের মতো কোন দেশ নেই, কোন জাতি নেই, তাদের মতো রাজা, ধর্ম, বিজ্ঞান আর কোথাও নেই। যদি তাদেরই পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে হিন্দুরা বিভিন্ন দেশ পর্যটন করত এবং বিদেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করত, তো শীঘ্রই তাদের এই অভিমত বদলাতে হত। এখনকার হিন্দুদের যারা পূর্বপুরুষ, তারা এদের মতো সঙ্কীর্ণচেতা ছিল না।" বরাহমিহিরের লেখা উদ্ধৃত করে অল্‌বেরুনি বলেন যে যবনরা অপবিত্র হলেও তাদের মধ্যে বহু বিদ্বান রয়েছে, তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, এ কথা বিদেশীরা যখন দেশ আক্রমণ করছে তখনই বরাহমিহির বলেছিলেন। ফা-হিয়েন, হিউয়েনসাং, ইৎসিং প্রভৃতি বিদেশী পরিব্রাজক অবাধে এদেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনা করে-ছিলেন, কিন্তু অল্‌বেরুনি লিখেছেন যে তাঁর কালে বিদেশীর সঙ্গে বিজ্ঞান বা সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে ভারতবর্ষীয় বিদ্বানদের বেশ অনিচ্ছুক দেখা যেত। তিনি আরও বলেছেন যে কোন কিছু একবার অপবিত্র হয়ে গেছে মনে করলে হিন্দুরা তাকে আবার পবিত্র করিয়ে ফিরিয়ে নিতে চাইত না। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে পূর্বযুগের কথা, যখন গ্রীক হেলিওডোরসকে বিষ্ণুপূজক বলে হিন্দুর গণ্ডীভুক্ত করা হয়েছিল, যখন দুর্ধর্ষ বর্বর হূনদেরও হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবিকই মনে

অল্‌বেরুনির মন্তব্য

বরাহমিহিরের মন্তব্য

অতীতের তুলনায় সমসাময়িক ভারতীয় মনের সঙ্কীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা

হয় যে তখন দেশ আর সমাজ সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা থেকে বিপদ ক্রমে আসন্ন হয়ে উঠল।

গতিশীলতার অভাব

চাতুর্বর্ণ্য বিষয়ে নিয়মের কঠোরতা

নিজের দেশকে বিধির বিধানে নিরাপদ মনে করে দেশরক্ষা ব্যাপারে উদাসীন হওয়ার বিপদ অকাট্য। সমাজের কাঠামোকে কঠোর করে নিয়মসর্বস্বতায় ডুবে থেকে দেশ আর চলমান অবস্থায় রইল না, পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায় অসমর্থ হল। চাতুর্বর্ণ্য বিষয়ে পূর্বে যে সমস্ত বিধান প্রচলিত ছিল, তা এমনই কঠোর বাধনে পরিণত হয়েছিল যে সম্ভবত মনু আর যাজ্ঞবল্ক্যের পুনর্জন্ম ঘটলে তাঁরা নিজেদেরই লেখা স্মৃতিশাস্ত্রকে চিনতে পারতেন না। বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কও বেশ কিছুকাল থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছিল ; মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ কমে গিয়েছিল, পূর্বসাগরে শৈলেন্দ্র রাজ্যের এবং পশ্চিমসাগরে আরবদের প্রাধান্য থাকায় ক্রমশ ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছিল, দেশ বিরাট বলে তাতে খুব বেশী বিচলিত হওয়ার কারণও ঘটে নি। আর ভুললে চলবে না যে অবনতির যুগ আরম্ভ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের শক্তি তখনও অকিঞ্চিৎকর নয় ; সিন্ধু অঞ্চল থেকে খলিফার রাজ্য-বিস্তার-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, ম্লেচ্ছ সৈন্যকে নাগভট পরাজিত করার পর প্রায় তিনশো বৎসর মুসলমান আক্রমণ আর ঘটে নি, গুর্জর দেশেও ইসলামের দুর্জয় অভিযান সম্ভাবনা সম্পর্কে চেতনা যেন নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

বহিরাক্রমণ সম্পর্কে চেতনার অভাব

দক্ষিণ ভারতে প্রগতির চিহ্ন সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতায় গ্লানি

ভারতবর্ষ এত বিশাল, বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতিতে এমন তারতম্য যে মুসলমান অধিকারের প্রাক্কালে সমগ্র দেশের সাধারণ অবস্থা পর্যালোচনা করা খুবই দুরূহ। দক্ষিণ ভারত তখনও বহুকাল অক্ষত হয়ে থাকার সঙ্গতি রাখত ; সেখানকার রাজ্যগুলি তখনও তাদের বাড়তির যুগ পার হয়ে যায় নি, তাই ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের ইতিহাসে ঘুণ ধরে নি, শিল্প সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে বহু কীর্তির পরিচয় মিলেছে। কিন্তু মোটের উপর দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতেই ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার গতি যেন মন্থর হয়ে এসেছিল, প্রাণশক্তি কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল, সমাজ শৃঙ্খলা কঠোর হতে হতে আতিশয্য-দোষদুষ্ট বহু অনাচারকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে ক্রমশ এক অদ্ভুত অবনতির লক্ষণ প্রকট হতে থাকে ; কাব্যরীতির মধ্যে বিদ্যার ব্যর্থ অহমিকা, ভাবের দৈন্যকে আচ্ছাদন করার জন্য ভাষার কৃত্রিমতা, শব্দের কসরত দেখা দিল, যে সততা বিনা মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব তা যেন নিশ্চিহ্ন হতে লাগল। "শিশুপালবধ",

সাহিত্যক্ষেত্রে অধোগতি

"নৈষধ চরিত", "গাথাসপ্তশতী", এমনকি জয়দেব-কৃত "গীতগোবিন্দ" প্রভৃতি রচনায় পূর্বের তুলনায় অধোগতির পরিচয় স্পষ্ট ; অর্থগৌরবের চেয়ে লালিত্য, ঝঙ্কার প্রভৃতি গুণের আদর তখন বেশী। শিল্পক্ষেত্রেও ক্রমশ ভূষণবাহুল্য যেন এক রোগে পরিণত হল ; ভাস্কর্যে নৈতিক মানের অবনতি-লক্ষণ ক্রমাগত দেখা যেতে লাগল। ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে শঙ্করাচার্যের অমিত প্রতিভা অবশ্যই অবিস্মরণীয় ; তিনি সম্পূর্ণ একক ছিলেন না, তাও সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষের চার কোণে মঠ স্থাপন করে সন্ন্যাসী-জীবন সংগঠিত করার বিরাট পরিকল্পনা সত্ত্বেও দেখা গেল যে ক্রমশ সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই সমাজের বোঝামাত্র, গৈরিকের অন্তরালে অন্তঃসারশূন্য আলস্যের প্রশ্রয় ঘটল। পাশুপত, কাপালিক, গুহ্যসমাজ প্রভৃতির উদ্ভবে সমাজ যে লাভবান হয়েছিল, তা নয় ; বরং বিপরীত ফল ঘটেছে—নরবলি, গোপন তন্ত্রমন্ত্রের মরীচিকা ইত্যাদি বিচিত্র ব্যাপার দেখা গেছে। জাতিভেদের কঠোরতা ও নিয়মের আতিশয্য সমাজে স্থাণু ভাব এনে দিয়েছে, মানুষের মহিমাকে খণ্ডিত করেছে। এতে সমাজ প্রকৃতই দুর্বল হয়েছে, নির্মম পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। রাষ্ট্রের বন্ধনও সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে পড়েছে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য চরম সঙ্কট মুহূর্তেও এমনই আত্মকলহে নিমগ্ন ছিল যে, কিছুতেই প্রকৃত সংহতি নিয়ে তারা তুর্কী আক্রমণকে প্রতিহত করার কাজে নামতে পারে নি। রাষ্ট্রের উত্থানপতন সম্বন্ধে জনসাধারণ উদাসীন হয়ে পড়েছিল ; সমাজ-জীবন তখন এমনই ক্লেদগ্রস্ত যে রাজনৈতিক চেতনার প্রত্যাশা করাই ছিল অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। ব্যক্তিগত তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত প্রচুর, কিন্তু সমষ্টিগত সংহতি অনুপস্থিত বলে বিদেশী তুর্কীরা হিন্দুস্থান অধিকারে সমর্থ হয়েছিল।

শিল্প ও ভাস্কর্যে অবনতি

ধর্ম বিষয়ে অনাচার ও অন্তঃসার-শূন্যতা

সমাজের স্থাণুভাব

রাষ্ট্রক্ষেত্রে আত্মকলহ ও সমষ্টিগত সংহতির অভাব

একাদশ শতকে উত্তর ভারতে প্রধান প্রধান রাজ্য

গজনী থেকে সুলতান মাহ্‌মুদ যখন ভারত আক্রমণে এগিয়ে এলেন, তখন সমবেত হয়ে উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলি বাধাদানে সমর্থ হয় নি। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চিম পঞ্জাবের শাহী বংশ, কাশ্মীরের লোহর বংশ, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজপুত রাজ্য এবং বাংলার পালরাজ্য ছিল উত্তর ভারতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শক্তি। তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল কনৌজ ; এখানকার প্রতীহার রাজবংশ ছিল রাজপুতদের

রাজপুত রাজ্য-গুলির অগ্রণী ভূমিকা

মধ্যে প্রধান, নবম শতাব্দী থেকেই রাজপুত রাজ্যগুলি উত্তর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় নেমেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম বিজয় যখন আসন্ন, তখন সবচেয়ে শক্তিশালী ও মর্যাদাবান ছিল আজমীরের চৌহান এবং কনৌজে প্রতীহার বংশের স্থলাধিকারী গহড়ওয়াল, এই দুই রাজপুত বংশ। সুলতান মাহ্‌মুদের আক্রমণ, কিংবা দ্বাদশ শতকে মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রয়োজন নিদারুণ হলেও সাময়িক সংহতি স্থাপন করে এই সমস্ত রাজ্য সমবেতভাবে বাধা দিতে পারে নি। শাহী বংশকে যেমন প্রায় এককভাবে মাহ্‌মুদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল, তেমনই আবার ঘটল দ্বাদশ শতাব্দীতে, যখন মহম্মদ ঘুরীকে বাধা দিতে প্রকৃত পক্ষে আজমীর-দিল্লীর চৌহান বংশকেই প্রায় একক অবস্থায় দেখা গেল। রাজপুতদের নানা গুণ ছিল, কিন্তু দুগ্ধভাণ্ডে একবিন্দু গোমূত্র পড়ে যেমন সমস্ত নষ্ট করে দেয়, তেমনই একটি মাত্র দোষ তাদের গুণাবলীকে ব্যর্থ করে দিত—তা হল অহমিকা, বংশ নিয়ে, নিজের সাহস ও রণনৈপুণ্য নিয়ে, মর্যাদা নিয়ে দর্প, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ।

সমবেত প্রতিরোধের অভাব

রাজপুত চরিত্রের ত্রুটি

মালবের পরমার বনাম গুজরাটের চালুক্য

চৌহান বনাম গহড়ওয়াল

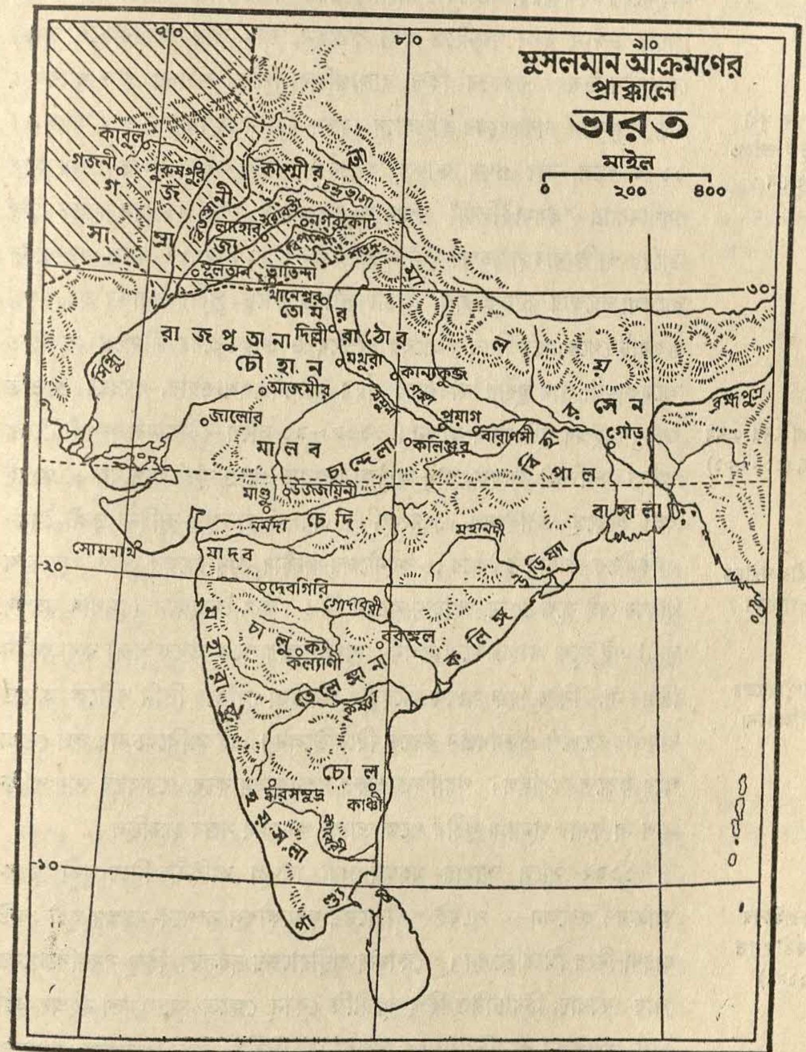
মালবের পরমার রাজ্য এবং গুজরাটের চালুক্য রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে শত্রুতা চলেছিল; তেমনই শত্রুতা ছিল কনৌজের গহড়ওয়াল ও দিল্লী-আজমীরের চৌহান বংশের মধ্যে। গহড়ওয়ালরাজ জয়চাঁদ তাঁর অমতে এবং মর্যাদাহানি ঘটিয়ে কন্যা সংযুক্তাকে বিবাহ করার জন্য চৌহান বীর পৃথ্বীরাজের উপর এমনই বিরূপ ছিলেন যে তরাইন-এর প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীষ্টাব্দ) মহম্মদ ঘুরীর বিরুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে সাহায্য দিতে তিনি বিরত ছিলেন। মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের মধ্যে বীরের কোন অভাব ছিল না; কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব বিক্রমাদিত্য ও লক্ষ্মীকর্ণ, পরমার বংশের সিন্ধুরাজ ও ভোজদেব, চান্দেল্ল নরপতি ধঙ্গ ও বিদ্যাধর, গহড়ওয়ালরাজ গোবিন্দচন্দ্র এবং চৌহানবংশের কীর্তিমান পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি যে কোন দেশের বীর কাহিনীতে সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণে সকলের একত্র হয়ে প্রতিরোধ যে অবশ্যকর্তব্য, তা বুঝার বিশেষ পরিচয় তাঁদের কাছে পাওয়া যায় নি।

সমসাময়িক রাজাদের বীরত্ব

ঐক্যের অভাব

ঘুর বংশ : মুসলমান কর্তৃক ভারত জয়

পারস্যের পূর্বাঞ্চল থেকে এসে ঘুর বংশের ক্ষমতান্বেষীরা সুলতান মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর গজনী রাজ্য অধিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। ঘুর


মুসলমান আক্রমণের
প্রাক্কালে
ভারত
মাইল
০ ২০০ ৪০০
৭০
৮০
৯০
৩০
২০
১০
কাবুল
গজনী
পুরুষপুর
কাশ্মীর
চন্দ্রভাগা
লাহোর
নগরকোট
মুলতান
ভাতিন্দা
শতদ্রু
থানেশ্বর
তোমর
রাজপুতানা
দিল্লী
রাঠোর
চৌহান
মথুরা
কান্যকুব্জ
আজমীর
সিন্ধু
জালোর
যমুনা
গঙ্গা
প্রয়াগ
বারাণসী
সেন
গৌড়
ব্রহ্মপুত্র
মালব
চান্দেলা
কলিঞ্জর
পাল
মাণ্ডু
উজ্জয়িনী
নর্মদা
চেদি
বাংলা
মহানদী
সোমনাথ
যাদব
দেবগিরি
গোদাবরী
চালুক্য
কল্যাণী
বরাঙ্গল
তেলেঙ্গানা
কলিঙ্গ
কৃষ্ণা
চোল
দ্বারসমুদ্র
কাঞ্চী
কাবেরী

গজনীর সুলতান বংশের উচ্ছেদ সাধন

দলপতি আলাউদ্দীন ইয়ামিনি সুলতান বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন, মাহ্‌মুদের বংশধরেরা পঞ্জাবে পলায়ন করে আশ্রয় লাভ করে। তারপর গিয়াস্-উদ্দীন যখন গজনীতে রাজ্য করছেন, তখন তাঁর সহকারীরূপে ভ্রাতা মৈজুদ্দীন উত্তর ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক ভারত অভিযান

এই মৈজুদ্দীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১১৭৫ সালে তাঁর প্রথম ভারত অভিযান ঘটে; তখন মুলতান জয় করে সেখানকার "ইসমাইলিয়া" সম্প্রদায় ইসলামের বিকৃতি সাধন করছে বলে তাদের শাস্তি-ব্যবস্থা মহম্মদ ঘুরী করেছিলেন। ১১৭৫-৭৬ সালে গুজরাটের বাঘেলা রাজ্যের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমের কাছে ঘুরীর পরাজয় হয়, কিন্তু গুজরাট থেকে সরে গিয়ে পঞ্জাবের পশ্চিমে ও ভারতবর্ষের সীমান্তে অবস্থিত অনেকগুলি স্থান ঘুরীর অধিকারে যায়। ক্রমে পেশাওয়ার, লাহোর প্রভৃতি

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (১১৯০-৯১)

জায়গা মহম্মদ ঘুরী দখল করেন। ১১৯০-৯১ সালে চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের রাজ্যে ভাতিণ্ডা নামক স্থান অধিকার করায় প্রচণ্ড যুদ্ধ লেগে যায়; একেই বলা হয়েছে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ। এখানে রাজপুত বাহিনী তুর্কী সৈন্য-

ঘুরীর পরাজয় ও পলায়ন

বাহিনীকে পরাভূত করে; কনৌজের জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের প্রতি আক্রোশ থাকায় এই যুদ্ধে কোন সহায়তা করেন নি। স্বয়ং মৈজুদ্দীন (অর্থাৎ মহম্মদ ঘুরী) এই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন; পৃথ্বীরাজের পক্ষে তাঁকে বন্দী করা কঠিন

পৃথ্বীরাজের অবিবেচনা

ছিল না, কিন্তু শত্রু সম্বন্ধে অহেতুক উদারতা দেখিয়ে তিনি ঘুরীকে আহত অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে দিয়েছিলেন। এই অবিবেচনার ফল ভোগ পরে করতে হয়েছিল; পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে একেবারে তার শক্তি নাশ না করায় পুনরায় ঘুরীর পক্ষে ভারত আক্রমণ সম্ভব হয়েছিল।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১১৯২)

১১৯২ সালে আবার মহম্মদ ঘুরী বিপুল বাহিনী নিয়ে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করলেন। পূর্বেই পৃথ্বীরাজের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে মহম্মদ ঘুরী স্পষ্ট ধারণা নিয়ে গিয়েছিলেন। কোথায় পৃথ্বীরাজের দুর্বলতা, হিন্দু সমরবিন্যাসের দোষ কোথায়, চিরাচরিত হিন্দু যুদ্ধরীতি কোন্ ক্ষেত্রে অচল, তা মহম্মদ ঘুরী বেশ অনুশীলন করেছিলেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দুপক্ষে সাহসের অভাব ছিল না, কিন্তু পরিচালনা ব্যাপারে ঘুরী যেমন নিজের হাতে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন, পৃথ্বীরাজ তা করেন নি। হস্তিবাহিনীর ব্যবহারে দেখা যেত যে অনেক সময় শত্রুর অশ্বারোহীদের আকস্মিক এবং দ্রুত আক্রমণে শঙ্কিত হয়ে তারা রণক্ষেত্রে এক বিপর্যয় সৃষ্টি করত। নিপুণ

পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু

যোদ্ধার দল তখন দিশাহারা না হয়ে পারত না। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত

ও নিহত হলেন। একে একে দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি নগর বিজেতার পদানত হল। এর পর চন্দাবারের যুদ্ধে জয়চাঁদ পরাস্ত হলেন, গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে তুর্কী আধিপত্যের পথ বেশ প্রশস্ত হয়ে গেল। আজমীরে মহম্মদ ঘুরী হিন্দু মন্দির ও ধর্মস্থানে স্থাপত্যের যে সমস্ত নিদর্শন ছিল তার ধ্বংসসাধন করে মসজিদ, মক্তব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করলেন। কুতবউদ্দীন আইবাক্ এবং ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বক্তিয়ার নামে ঘুরীর দুই অনুচর উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কাজে বহু সাফল্য অর্জন করলেন, বক্তিয়ারের বঙ্গ বিজয়-বৃত্তান্ত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মহম্মদ ঘুরী আর একবার ভারতবর্ষে এসে বিদ্রোহ দমন করলেন, গজনী ফেরার পথে আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে (১২০৬ সাল)।

চন্দাবারের যুদ্ধ

উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

মহম্মদ ঘুরী যে অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সুলতান মাহ্‌মুদের খ্যাতি তাঁর চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব অধিক বললে ভুল হবে না। মাহ্‌মুদের মতো বহুগুণান্বিত ব্যক্তি তিনি ছিলেন না সত্য, কিন্তু ইতিহাসে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে মহম্মদ ঘুরীকে কখনও বিস্মৃত হওয়া যাবে না। ভারতবর্ষের ভাগ্যে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছিল, তাতে মহম্মদ ঘুরীর অবদান বিপুল। সংগঠন, শৃঙ্খলা ও সংহতির জোরে অধোগামী, বিচ্ছিন্নশক্তি হিন্দু রাজ্যের অবসান ঘটাতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। জাতিভেদ ও অন্যান্য সঙ্কীর্ণ প্রথায় হৃতবল হিন্দু সমাজকে বিদেশাগত, দীর্ঘকায়, ধর্মাবেগচালিত, পৌত্তলিকতাবিরোধী, একান্ত একাগ্রচিত্ত শত্রুদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সাহসে হিন্দু মুসলমানের সমকক্ষ হলেও তার সমররীতিতে গ্লানি ছিল, চিরাচরিত যুদ্ধরীতি নূতন পরিস্থিতিতে অচল হয়ে পড়েছিল। পৃথ্বীরাজের মতো ব্যক্তিও যুদ্ধ পরিচালনাকালে ঔদার্যের বশবর্তী হয়ে কিংবা নিছক অমনোযোগিতার ফলে ভুলভ্রান্তি করেছিলেন। যারা আক্রমণকারী, প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাওয়া ছাড়া যাদের অন্য পথ নেই, বিদেশে হয় জয়লাভ নয় মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুদ্ধ করা যাদের পক্ষে অনিবার্য, ধর্মাবেগের মাদকতা যাদের সংহতি ও সংগ্রাম-শক্তিকে বহু গুণ বর্ধিত করে, তাদের পক্ষে খণ্ডিত ভারতের আত্মম্ভরী রাজাদের পর্যুদস্ত করা অসম্ভব হল না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একেবারে নূতন উপাদান এই মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে প্রবেশ করল; তার ফলাফল যে যুগান্তকারী হবে, এ তো অবধারিত সত্য।

মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব

হিন্দু বনাম মুসলিম শক্তি

ভারত-ইতিহাসে নূতন উপাদান

তুর্ক-আফগান শাসনের যুগ
(১২০৬-১৫২৬)

দাস বংশ

মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চল

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে মহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্যের অধিপতি বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, পঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত ছিল তার বিস্তৃতি। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটেছিল; রাজপুত রাজাদের মধ্যে যারা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, ঝড়ের মুখে তৃণের মতো তাদের শক্তিকে যেন উড়িয়ে নেওয়া হল। আজমীরে পৃথ্বীরাজের এক ছেলে সুলতানের আধিপত্য স্বীকারে বাধ্য হল। কুতব-উদ্দীন আইবাক নামে বিশ্বস্ত অনুচরের হাতে বিজিত রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে মহম্মদ ঘুরী গজনী ফিরে গেলেন, ১২০৩ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনি গজনীর সুলতান হলেন। এদিকে কুতবউদ্দীন রাজধানী স্থাপন করলেন দিল্লীতে; ভবিষ্যতে ভারতে মুসলিম শক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লীতে যে হবে, তার আভাস তখন মিলেছিল। ১১৯৪ সালে সুলতান স্বয়ং এসে কনৌজের জয়চাঁদকে পরাজিত করলেন; মীরাট থেকে কাশী পর্যন্ত সুবিস্তৃত সমভূমি তাঁর কবলে এল। হিন্দুস্থানের মর্মস্থল এইভাবে অধিকৃত হওয়ার পর রাজ্যের প্রসার সহজ হয়ে গেল। বক্তিয়ার দুঃসাহসী দল নিয়ে বিহার প্রদেশ দখল করলেন; ১১৯৭ সালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মহামূল্য গ্রন্থাগার বহু শতাব্দী ধরে সঞ্চিত হয়েছিল, তাকে অতি বর্বর ও নৃশংস ভাবে ধ্বংস করা হল। ১১৯৯ সালে নদীয়া গিয়ে লক্ষ্মণসেনকে রাজপ্রাসাদ থেকে লুকিয়ে পালাতে বাধ্য করা হল, ক্রমশ সারা বাংলায় মুসলিম শাসন ছড়িয়ে পড়ল। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে পঞ্জাব থেকে বাংলার প্রান্ত পর্যন্ত সুলতানী রাজ্য প্রসারিত হল। ঘুরীর নামে কুতবউদ্দীনই দিল্লী থেকে শাসন চালাচ্ছিলেন।

কুতবউদ্দীনকে মহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি নিয়োগ

দিল্লীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা

কনৌজের পতন

বিহার অধিকার

বাংলা অধিকার

সুলতান কুতবউদ্দীন

দিল্লীর সুলতান পদে কুতবউদ্দীন

নিঃসন্তান মহম্মদ ঘুরীর স্থান নিলেন কুতবউদ্দীন ১২০৬ সালে। দিল্লীতে উপস্থিত আমীর আর সেনাপতিরা সুলতান কে হবে তাই তখন স্থির করত।

কুতবউদ্দীন নিজে এবং তাঁর পরবর্তী দুই জন স্থলতান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন ; তাই কায়কাবাদ পর্যন্ত (১২০৬-১২৯০) স্থলতানদের "দাসবংশ" বলা হয়ে থাকে। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অবশ্য এই ভূতপূর্ব ক্রীতদাসেরা সমুচ্চ রাজপদে নিযুক্ত থাকত ; সেকালে এমন ব্যাপার একেবারে অদ্ভুত মনে হত না। প্রকৃতপক্ষে দাসবংশীয় না বলে এদের "ইল্‌বেরি তুর্কী" বলাই সমুচিত। যাই হোক, কুতবউদ্দীনের রাজ্যকাল ছিল মাত্র চার বৎসর। তিনি গজনী অধিকারের চেষ্টা করেন, সাময়িক সাফল্যও তাঁর মিলেছিল, কিন্তু তা বজায় রাখতে তিনি পারেন নি। এতে স্থফলই হয়েছিল, কারণ ভারতবর্ষে রাজ্যের দিকে একাগ্র মনোযোগ দেওয়া তখন সম্ভব হল। মোটের উপর তিনি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন বলে ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ লিখে গেছেন ; আর একজন লেখক হাসান-নিজামীর মতে তিনি ছিলেন দরাজ ধরনের মানুষ, লক্ষ টাকা দান করতে কিংবা লক্ষ মানুষের প্রাণ নিতে তাঁর কুণ্ঠা হত না। দিল্লী ও আজমীরে মসজিদ নির্মাণ তিনি করেছিলেন ; ধর্ম-বিষয়ে তাঁর আগ্রহের পরিচয় এভাবে মিলেছে। লাহোরে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সভাসদেরা প্রথমে তাঁর অকর্মণ্য পুত্র আরাম শাহ্‌কে স্থলতান করতে চান, কিন্তু শীঘ্রই ব্যবস্থা পালটাতে হয় ; ওমরাহরা বিহারের শাসনকর্তা ইল্‌তুৎমিসকে রাজ্যভার নিতে আহ্বান করেন।

দাসবংশ

কুতবউদ্দীনের রাজ্যকাল

চরিত্র

ইল্‌তুৎমিস্‌-এর স্থলতানি লাভ

স্থলতান ইল্‌তুৎমিস

১২১০ থেকে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর স্থলতানশাহীর ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে উত্তরাধিকারের লড়াই হচ্ছে। মাঝে মাঝে শক্তিশালী রাজার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও প্রায়ই যারা সিংহাসনে বসছে বা বসার চেষ্টা করছে তারা দুর্বল, দুর্নীতিপরায়ণ, অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি ; তাদের উপলক্ষ করে ষড়যন্ত্র আর নরহত্যা ঘটে চলেছে। যাই হোক, তথাকথিত দাস বংশের রাজ্যকালে ইলতুৎমিস (১২১১-৩৬) এবং বল্‌বন (১২৬৬-৮৬), এই দুইজন স্থদক্ষ স্থলতানকে দেখা যায়। ইল্‌বেরি তুর্ক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ইল্‌তুৎমিস প্রথম জীবনে ছিলেন কুতবউদ্দীনের ক্রীতদাস, পরে হন জামাতা। দিল্লীর আমীর-ওমরাহদের মধ্যে একদল আরাম শাহের পক্ষাবলম্বী ছিল, নবাগতকে তারা চায় নি। রাজধানীতে এই শত্রুদলকে দমন করা বা নিজের কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য করার প্রয়োজন ছিল। গজনী থেকে বিতাড়িত তাজউদ্দীন ইল্‌দিজ্‌ ঈর্ষান্বিত হয়ে ভারতবর্ষের দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিপাত করতে

স্থলতানশাহীর সাধারণ চরিত্র :

সিংহাসন নিয়ে কলহ

ইল্‌তুৎমিস-এর পরিচয়

রাজ্যের সঙ্কট : রাজধানীতে শত্রু

তাজউদ্দীন

পঞ্জাব
বাংলা

থাকেন, পঞ্জাব অধিকারেও প্রবৃত্ত হন। বাংলা দেশের শাসনভার যে আলী মর্দানের হাতে ছিল, তিনি চেষ্টা করলেন নিজে স্বাধীন হয়ে বহুদূরে অবস্থিত দিল্লীর আধিপত্য অমান্য করতে। সিন্ধুদেশের শাসনকর্তা নাসির-উদ্দীন কুবাচা অনুরূপভাবে স্থলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। হিন্দুদের মধ্যেও স্থলতানী শাসনকে আঘাত করার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল ; গোয়ালিয়র ও রণথম্বরে যে স্থরক্ষিত দুর্গ ছিল, সেখান থেকে স্থলতানের কর্তৃত্ব অপসৃত হয়েছিল। রাজ্যের এই সঙ্কট সময়ে ইল্‌তুৎমিস অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে বিদ্রোহ দমন করে নিজের শক্তি ও মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।

সিন্ধুদেশ

হিন্দুশক্তির বিরুদ্ধতা

মোঙ্গল-আক্রমণ : চেঙ্গিস খান

এই সময়কার আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস খান-এর অধীনে "মোঙ্গল" (অথবা মুঘল, মোগল) যোদ্ধাদের দুর্ধর্ষ আক্রমণ। চেঙ্গিসের নায়কত্বে মোঙ্গল শক্তি প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়ে চীন এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার বহু দেশকে বিধ্বস্ত করেছিল ; বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত নগর চেঙ্গিসের আক্রমণে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম ঘটেছিল। ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে খিভার শেষ শাহ জালালউদ্দীনকে চেঙ্গিস সিংহাসনচ্যুত করায় তিনি ভারতবর্ষে আশ্রয় খোঁজেন। ইল্‌তুৎমিস পলাতক রাজাকে স্থান দিতে অস্বীকার করেন, তাই জালালউদ্দীন এদেশ থেকে চলে যাওয়ায় এবং ভারতবর্ষের গরম আবহাওয়া অসহ্য মনে হওয়ায় চেঙ্গিস ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে মোঙ্গলদের প্রথম আবির্ভাব এইভাবে হয়েছিল ; পরবর্তী যুগে মোঙ্গল আক্রমণ যে আরও ব্যাপক রূপ নিয়েছিল, তা স্থবিদিত।

মোঙ্গল-অপসরণ

খলিফা কর্তৃক উপাধিদান

যাই হোক, ইল্‌তুৎমিস বোগদাদের খলিফার কাছ থেকে কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে "স্থলতান-ই-আজম" (প্রধান স্থলতান) উপাধি পেয়েছিলেন। বাংলা, সিন্ধুদেশ, রণথম্বর, গোয়ালিয়র ইত্যাদি উপদ্রুত অঞ্চল তিনি পুনরধিকার করেছিলেন। মালব আক্রমণ করে ভিল্‌সা (প্রাচীন বিদিশা) দুর্গ জয় করেন, উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করে সেখানকার মহাকাল মন্দির ধ্বংস করেন, বিক্রমাদিত্যের মূর্তি দিল্লীতে নিয়ে যান। ১২৩৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। সচরাচর তাঁকেই যে দাস বংশের শ্রেষ্ঠ স্থলতান বলা হয়, তা অহেতুক নয়। বিপদের দিনে অটল থেকে তিনি রাজ্য রক্ষা করেছিলেন, নিজের শক্তি বাড়িয়েছিলেন। যুদ্ধ ও দেশ শাসন-ব্যাপারে দক্ষতা ছাড়া শিল্প সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ ছিল। দিল্লীতে কুতব-মিনারকে তাঁরই কীর্তি বলা চলে ; এর নামকরণ স্থলতান কুতবউদ্দীনের নাম থেকে নয়। বোগদাদের কাছে উন্‌

বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য জয়

ইল্‌তুৎমিস-এর কৃতিত্ব

কুতব-মিনার

বলে জায়গাতে কুতবউদ্দীন নামে এক ধার্মিক ছিলেন, ইল্‌তুৎমিসের রাজ্য-কালে তিনি দিল্লীতে আসেন; তাঁরই স্মৃতি রক্ষার্থে কুতব-মিনার নির্মিত হয়েছিল। আয়তনে, প্রসাদগুণে, নির্মাণ-কৌশলে কুতব-মিনার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমায় বিরাজ করছে।

সুলতানা রাজিয়া

ইল্‌তুৎমিসের ছেলেরা অপদার্থ হওয়ায় তিনি কন্যা রাজিয়াকে (১২৩৬-১২৪০) তাঁর উত্তরাধিকারিণী বলে মনোনীত করে যান। কিন্তু বহুগুণান্বিতা হলেও স্ত্রীলোক বলে আমীরদের মধ্যে অনেকে রাজিয়াকে সিংহাসনে বসাতে রাজী ছিল না; তাদের সহায়তায় রুকনউদ্দীন নামে ইল্‌তুৎমিসের এক অক্ষম পুত্র দিল্লীর তখ্‌ত দখল করে বসেন। এই ব্যভিচারী ও অকর্মণ্য সুলতান এবং তাঁর মাতা এমনই কাণ্ড আরম্ভ করলেন যে রুকনউদ্দীনকে সরিয়ে রাজিয়াকেই সিংহাসনে বসানো হল। দিল্লীর রাজাসনে আর কখনও কোন নারীকে দেখা যায় নি; রাজিয়াকে তাই এদিক থেকে অনন্যা বলা চলে। পিতার জীবনকালেই রাজিয়ার ন্যায়বোধ, সততা, সুবিচার-শক্তি ইত্যাদি গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কথিত আছে যে রাজিয়া সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে কোরাণ পাঠ করতে পারতেন। যুদ্ধবিদ্যা তাঁর অজানা ছিল না, শাসন-বিষয়েও তাঁর দক্ষতা ছিল। পুরুষের বেশে তিনি রাজসভায় বসতেন, বিদ্রোহ দমনের জন্য অস্ত্রধারণে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, সুশাসনের জোরে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর ওমরাহদের চোখে কিছুতেই যে একজন স্ত্রীলোককে সুলতান বলে মানতে হবে, তা বরদাস্ত হচ্ছিল না। তা ছাড়া শোনা যায় যে ইয়াকুৎ নামে একজন হাবসী রাজপুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের লক্ষণ তিনি দেখাতে থাকলে আমীর-ওমরাহেরা চক্রান্ত করার দারুণ সুযোগ পেয়ে গেল। পঞ্জাবে অবস্থিত সির্‌হিন্দের শাসনকর্তা আল্‌তুনিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরতে রাজিয়া স্বয়ং বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে যান, কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দিনী হন, ইয়াকুৎ যুদ্ধে নিহত হন। এর পর রাজিয়া আল্‌তুনিয়াকেই বিবাহ করেন এবং উভয়ে একত্র দিল্লী সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়; শত্রুহস্তে উভয়েরই মৃত্যু ঘটে (১২৪০)।

উত্তরাধিকারিণী রাজিয়া

রুকনউদ্দীনের সিংহাসন লাভ

অনন্যা রিজিয়া

নারী-অপরাধে রিজিয়ার জীবনে বিপর্যয়

ওমরাহদের চক্রান্তে মৃত্যু

এর পর রাজিয়ার ভ্রাতা মুইজ্‌উদ্দীন বহ্‌রাম দুই বৎসর রাজত্ব করেন (১২৪০-৪২)। ইল্‌তুৎমিসের রাজ্যকাল থেকে চল্লিশ জন তুর্কী আমীর

মুইজ্‌উদ্দীন বহ্‌রাম

তুর্কী আমীর-প্রাধান্য

রাজ্যে প্রায় সমস্ত ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করে; সুলতান স্বয়ং ব্যক্তিত্ব-শালী ও ক্ষমতাবান হলে তারা তাঁকে মেনে চলত, নইলে কেবল নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে ব্যস্ত থাকত। সুলতান তাদের হাতের পুতুল হতে নারাজ দেখে এই আমীরের দল ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। ষড়যন্ত্রের ফলে দেখা গেল যে মোঙ্গলরা যখন পঞ্জাবে ঢুকে লাহোর দখল করল (১২৪১), তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রেরিত সৈন্যবাহিনী মাঝপথ থেকে দিল্লী ফিরে এসে আমীরদের চক্রান্তে সুলতানকে বন্দী করে রেখে হত্যা করল।

চক্রান্তের ফলে সুলতানের মৃত্যু

সুলতান নাসিরউদ্দীন

এই আমীরের দল তারপর ইল্‌তুৎমিসের পৌত্র আলাউদ্দীন মাসুদ শাহকে সিংহাসনে বসিয়েছিল (১২৪২-৪৬)। তখন বাংলা দিল্লীর আধিপত্য এক প্রকার পরিত্যাগ করেছিল, বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্‌রিল খান এগিয়ে এসে অযোধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ করতে পেরেছিলেন। ১২৪৫ সালে মোঙ্গলরা আবার এদেশে আসে, কিন্তু তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। যাই হোক, সুলতান ক্রমশ অকর্মণ্যতার পরিচয় দিতে থাকায় আমীর আর মালিকের দল একজোট হয়ে ব্যভিচারী ও বিলাসব্যসনে মত্ত আলাউদ্দীনকে সহজেই সরিয়ে দিয়ে ইল্‌তুৎমিসের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীনকে (১২৪৬-৬৬) সিংহাসনে বসিয়ে দিল। ধর্মভীরু শাসক বলে তাঁর খ্যাতি আজও ভারতবাসী স্মরণ করে রেখেছে; কিন্তু শান্তিপ্রিয় ও নীতিপরায়ণ হলেও তদানীন্তন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার শক্তি তাঁর ছিল না। রাজ্যের ভার প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাতে না থেকে ছিল শ্বশুর উলুঘ খান-এর হাতে। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ্দীন তাঁর "তবাকৎ-ই-নাসিরী" গ্রন্থ সুলতানকে উৎসর্গ করে দেন। নিজ হস্তে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের প্রতিটি বাক্য লিখে ধার্মিক সুলতান সময় অতিবাহিত করতেন। মোঙ্গলরা তখন আবার হানা দিয়েছিল, কিন্তু রাজ্যের সমস্ত মুশকিল আসান করার দায়িত্ব ছিল উলুঘ খানের হাতে।

অকর্মণ্যতার জন্য সুলতান মাসুদ শাহের অপসারণ

সিংহাসনে নাসিরউদ্দীন

চরিত্র

উলুঘ খান

ধার্মিক সুলতান

গিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বন

নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর শ্বশুর উলুঘ খান গিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বন নাম নিয়ে দিল্লীর সুলতান হলেন (১২৬৬-৮৭)। এই সঙ্গে সঙ্গে ইল্‌তুৎমিসের বংশের অবসান ঘটল। বল্‌বন প্রথম জীবনে মোঙ্গলদের কাছে বন্দী

প্রথম জীবন

হয়েছিলেন ; তারপর ক্রীতদাসরূপে হাত ঘুরতে ঘুরতে আসেন ইল্‌তুৎমিসের প্রাসাদে, সেখানে "চল্লিশ জন ক্রীতদাসের" অন্যতম হয়েছিলেন। অভিজাত শ্রেণীর দর্পচূর্ণ করা, বিদ্রোহ দমন, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, শাসন সংগঠন ইত্যাদি ব্যাপারে বল্‌বনের কৃতিত্ব প্রভূত প্রশংসার দাবি রাখে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন যে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা সুলতানের সার্বভৌম শক্তিকে যেন বিদ্রূপ করছে। নাসিরউদ্দীনের প্রধান মন্ত্রণাদাতারূপে তিনি দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী জমিদারদের শায়েস্তা করেছিলেন, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর প্রভৃতি স্থানের হিন্দু সামন্ত রাজাদের দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন, আমীর আর মালিকের দল কিভাবে শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয় তা দেখেছিলেন।

বল্‌বনের কৃতিত্ব

প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কার্যাবলী

সুলতান হয়েই তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিদেশ থেকে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করার বিশেষ আয়োজন করলেন। মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বদা উদ্যত থাকার জন্য নিজের দুই পুত্রকে সৈন্যদলসহ মুলতান এবং অপর কয়েকটি স্থানে মোতায়েন করলেন। কেন্দ্রীয় শাসনকে সর্বত্র বলবৎ করার জন্য সকলের জন্য সুবিচারের ব্যবস্থা করলেন। নিরপেক্ষ বিচারের ফলে পূর্বে অভিজাত শ্রেণী যে প্রায়ই অবলীলাক্রমে অনাচার অত্যাচার করে দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেত, তা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তচর নিযুক্ত করে সংবাদ সংগ্রহ করতেন, যাতে কোথাও আমীর-ওমরাহেরা ষড়যন্ত্র না করতে পারে। সামরিক শক্তি সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন যে সামরিক শক্তির সঙ্গে সুশাসনের সামঞ্জস্য সাধন না করতে পারলে রাজ্যের বিপদ। দিল্লীর অনতিদূরে আল্‌ওয়ার অঞ্চলে মেওয়াটি দস্যুদের দমন করে চলাচল-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়েছিল। উত্তরে জাট, খোকর, ভট্টি প্রভৃতি যুদ্ধনিপুণ জাতিকে নিজের আধিপত্যে টেনে এনেছিলেন। রোহিলখন্দে যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তাকে দলন করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। ১২৭৯ সালে বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্‌রিল খান বিদ্রোহ ঘোষণা করে একাধিকবার দিল্লীর সৈন্যদলকে পরাস্ত করেন ; বয়োবৃদ্ধ সুলতান স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন, যুদ্ধ জয় করে তুঘ্‌রিল খানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন, নিজের এক পুত্রকে বাংলার শাসনভার দিয়ে আসেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের যে আয়োজন তিনি করেন তা সফল হয়েছিল, মোঙ্গলরা পরাস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু ১২৮৭ সালে

মোঙ্গল প্রতিরোধ ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় শাসনের দৃঢ়তাসাধন

গুপ্তচর নিয়োগ

মেওয়াটি দস্যু দমন

রোহিলখন্দের বিক্ষোভ দমন

বাংলার বিদ্রোহ দমন

মোঙ্গল আক্রমণের সফল প্রতিরোধ

মোঙ্গল আক্রমণে বাধা দিতে গিয়ে বল্‌বনের প্রিয় পুত্র মহম্মদ প্রাণ হারান। পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধ স্থলতানের মৃত্যু হয়।

স্থলতানের মৃত্যু

প্রকৃত মর্যাদা ও সাফল্যের সঙ্গে বল্‌বন রাজত্ব করেছিলেন। রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য খ্যাত এই স্থলতান ঐতিহাসিক বরানী প্রভৃতির কাছে বহু প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁর শাসন স্থকঠোর হলেও স্থনিয়ন্ত্রিত ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে কোন কলুষ ছিল না; তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এতে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। পারস্যের রাজসভার অনেক আদবকায়দা তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। মনের ঔদার্য ছিল বলেই মোঙ্গল আক্রমণে মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত পনেরো জন রাজাকে তিনি নিজের রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও শাসন ও বিচার-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতার সমর্থক হয়ে ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে তিনি সাহায্য করেছিলেন। গুণীর সমাদরে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না; ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ্দীন তাঁর সভায় ছিলেন। বল্‌বনের রাজসভার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব অবশ্য ছিলেন আমীর খস্‌রু, মনীষা ও প্রতিভায় যাঁর সমকক্ষ ইতিহাসে কদাচ দেখা গিয়েছে। বল্‌বনের নাম অতি সঙ্গত কারণেই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

বলবনের কার্য বিচার

স্থনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা

নিরপেক্ষ শাসননীতি

মিনহাজ-উদ্দীন ও আমীর খস্‌রু

বল্‌বনের মৃত্যুর পর দাসবংশের অধঃপতনকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব রইল না। তাঁর পৌত্র কায়কাবাদ (১২৮৭-৯০) আমীর আর মালিকদের সমর্থনে স্থলতান হয়ে বসলেন; পিতা বুঘ্‌রা খান্ বাংলা দেশের শাসনভার নিয়েছিলেন। তিনি পুত্রের সিংহাসনপ্রাপ্তি প্রথমে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু অষ্টাদশবর্ষীয় এই তরুণ অপদার্থ ও দুশ্চরিত্র বলে রাজাসনের যে মর্যাদা বল্‌বন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ক্রমে নষ্ট হয়ে গেল। স্থলতানের অকর্মণ্যতার পরিচয় এমনভাবে পাওয়া যাচ্ছিল যে বুঘ্‌রা খান আর বরদাস্ত করতে না পেরে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন; পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হওয়ার পর অপত্য-স্নেহ জয়ী হয়। কায়কাবাদ বাংলার স্বাধীনতা মেনে নেন এবং বুঘ্‌রা খান পুত্রকে বহু সদুপদেশ দিয়ে ফিরে যান। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এই কুৎসিত অধ্যায়ের অবসান কুৎসিতভাবেই ঘটল। ১২৯০ সালে জালালউদ্দীন ফিরুজ কায়কাবাদকে হত্যা করে খল্‌জী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন। দাস বংশের ইতিহাসে আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশী; তাই এর বিবরণ আলোচনাতেও যেন ক্লান্তি আসে। কিন্তু সদ্য বিদেশাগত এই শাসকদের সাফল্য অকিঞ্চিৎকর নয়; উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু রাজ্য

স্থলতান কায়কাবাদ

পিতাপুত্র সাক্ষাৎ

জালাল্‌উদ্দীন ফিরুজ কর্তৃক সিংহাসন অধিকার

দাস বংশের ত্রুটি ও সাফল্য

বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেও পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাংলা, রাজপুতানা, গোয়ালিয়র, সিন্ধুদেশ ও মধ্য ভারতের কোন কোন স্থানে তুর্কী শাসন ক্রমে বেশ কায়েম হয়ে আসছিল।

খল্‌জী বংশ

জালালউদ্দীন : খল্‌জী বংশ-পরিচয়

জালালউদ্দীন ফিরুজ খল্‌জ বংশের প্রতিষ্ঠা করে বৎসর ছয়েক (১২৯০-৯৬) রাজত্ব করেছিলেন। এই খল্‌জীরা তুর্কী কি আফগান, তাই নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। মনে হয় যে তারা প্রকৃতপক্ষে তুর্কী হলেও বহুদিন আফগানিস্তানের বাসিন্দা হওয়ায় ইতিহাসলেখক বরানী তাদের তুর্কী বলেন নি। তৎকালীন রীতি অনুসরণ করে কায়কাবাদ এবং অপর বহুজনের প্রাণনাশ করে রাজ্য অধিকার করলেও জালালউদ্দীন মোটের উপর শান্তিপ্রিয় ও ধর্মভীরু ধরনের লোক ছিলেন, কিছুকাল কতকটা জনপ্রিয়তাও তিনি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু শাসনব্যবস্থা খুব সবল ছিল না; বল্‌বনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক চজ্জু সেনাধ্যক্ষপদে থেকে বিদ্রোহ করার পর বিদ্রোহদমন সত্ত্বেও সুলতান যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তুর্কী অভিজাতশ্রেণী রাজ-শক্তিকে শ্রদ্ধা করত তা হয় নি। রাজদ্রোহের সন্দেহে হঠাৎ রুষ্ট হয়ে এক দরবেশকে হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারার হুকুম সুলতান দিলেন। কিন্তু রণথম্বর দুর্গ জয় করতে না পেরে সুলতান যখন সাশ্রুনেত্রে বলেন যে একজন মুসলমানেরও প্রাণ বিপন্ন করে দুর্গ জয়ের আগ্রহ তাঁর নেই, তখন আমীর-ওমরাহেরা সুলতান সম্বন্ধে শ্রদ্ধা অনুভব করে নি।

জালালউদ্দীন-এর স্ববরোধী আচরণ

জালালউদ্দীনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল আক্রমণকারী মোঙ্গলদের পরাজিত করা। ১২৯২ সালে হলাকুর এক পৌত্র দেড়লক্ষ মোঙ্গলসৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে জালালউদ্দীনের প্রেরিত সৈন্যদলের হাতে পরাভূত হন। বহু মোঙ্গলকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে সুলতান দিল্লীর কাছাকাছি তাদের বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন; এরাই "নব মুসলমান" বলে পরিচিত হয়েছিল।

মোঙ্গল পরাজয়

অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনের সঙ্গে সুলতান নিজের কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে আলাউদ্দীনই বিশ্বাসঘাতকতা করে একান্ত শুভার্থী পিতৃব্যকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলেন (১২৯৬)।

ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনের ষড়যন্ত্রে মৃত্যু

আলাউদ্দীন খল্‌জী

কারার শাসক-পদে নিয়োগ

জালালউদ্দীনের জীবদ্দশায় আলাউদ্দীন কারার (এলাহাবাদের নিকটস্থ) শাসনভার পেয়েছিলেন; তখনই তাঁর মনে যথাসম্ভব শীঘ্র দিল্লীর সুলতানী

মালব আক্রমণ ও ভিলসার দুর্গ লুণ্ঠন

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিকড় গজিয়েছিল। ১২৯২ সালে মালব আক্রমণ করে এবং ভিলসার দুর্গ লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন তিনি দিল্লীতে আনেন; স্নেহান্ধ পিতৃব্য তাঁকে অযোধ্যার শাসনভারও তখন দেন। সুলতানের অনুমতি বিনাই উচ্চাভিলাষী আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে গিয়ে দেবগিরি (দৌলতাবাদ) আক্রমণ করেন। অতর্কিত বিপদ এড়াবার জন্য যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্র বিপুল পরিমাণে সোনা আর মণিমুক্তা, কয়েক হাজার ঘোড়া এবং চল্লিশটি হাতী ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। যুবরাজ শঙ্করদেব তখন রাজধানীতে ফিরে অপমানজনক শর্ত অস্বীকার করে আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করায় যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে আলাউদ্দীন বিজয়ী হন; পূর্ব-প্রতিশ্রুত শর্ত ছাড়াও প্রচুর ক্ষতিপূরণ তিনি আদায় করলেন, দিল্লীর সুলতানকে বাৎসরিক করদানে রামচন্দ্রকে সম্মত হতে হল। জয়গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে অগাধ ধনরত্ন নিয়ে আলাউদ্দীন ফিরলেন; দাক্ষিণাত্যে মুসলিম বিজয়ের সূত্রপাত ঘটিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন তিনি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। জালালউদ্দীন স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য কারা গেলেন, সাক্ষাৎ ঘটল, কিন্তু পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাউদ্দীন পিতৃব্যকে হত্যা করলেন। অর্থ ও উপাধির লোভে দিল্লীর ওমরাহদের বশীভূত করে আলাউদ্দীন সিংহাসনে বসলেন; পিতৃব্যের পক্ষে যারা ছিল তাদের শাস্তি দিয়ে নিজের অধিকারকে নিরঙ্কুশ করলেন। তাঁর ঘটনাবহুল রাজত্বের (১২৯৬-১৩১৬) এইভাবে পত্তন হল। নিষ্ঠুর, পাপাশয়, স্বার্থমগ্ন শাসক বলে বরানী-প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা তাঁর নিন্দা করেছেন; এই নিন্দা ভিত্তিহীন নয়, কিন্তু নানাদিক থেকে আলাউদ্দীনের শাসনকালের যে ঔজ্জ্বল্য আছে, তাও অনস্বীকার্য।

দেবগিরি আক্রমণ

রামচন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার

জালালউদ্দীনের মৃত্যু

সিংহাসন অধিকার

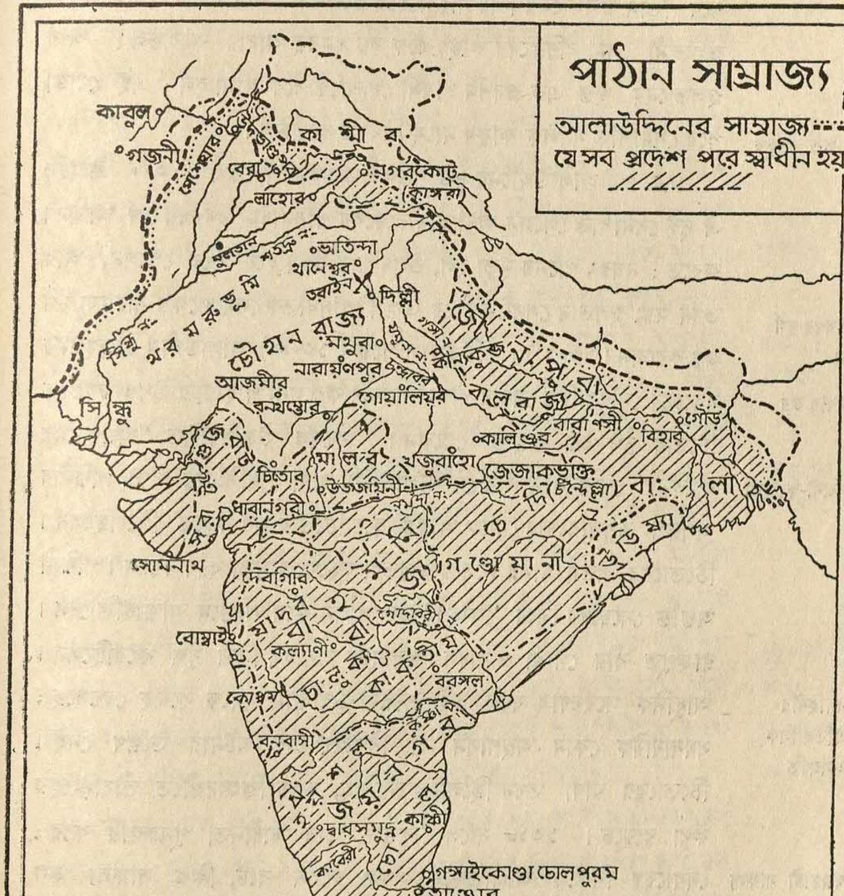
বরানী-প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মন্তব্য

আলাউদ্দীনের যুদ্ধজয় ও সাম্রাজ্য-বিস্তার

গুজরাট আক্রমণ

১২৯৭ সালে তিনি রাজপুত চালুক্য রাজ্য গুজরাট আক্রমণ করলেন। চারশো বৎসর পূর্বে যে রাজ্য ইসলামের অভিযানকে বারবার প্রতিহত করেছিল, আলাউদ্দীনের সেনাপতি উলুখ খান এবং নসরৎ খান-এর আঘাতে সেই রাজ্যের পতন হল। পরে মুসলিম সুলতানদেরই শাসনে গুজরাটের স্বতন্ত্র সত্তা বিকাশ পেয়েছিল, কিন্তু রাজপুত রাজ্য আর সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। গুজরাটের রাজা কর্ণদেব কাপুরুষের মতো পলায়ন করলেন, কন্যা দেবলাদেবীকে নিয়ে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের কাছে আশ্রয়

রাজা কর্ণদেবের পলায়ন


পাঠান সাম্রাজ্য
আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য
যে সব প্রদেশ পরে স্বাধীন হয়
কাবুল
গজনী
কাশ্মীর
নগরকোট
(কাঙ্গরা)
লাহোর
মুলতান
ভাতিন্দা
থানেশ্বর
তরাইন
দিল্লী
মরুভূমি
চৌহান রাজ্য
মথুরা
কান্যকুব্জ
নারায়ণপুর
আজমীর
গোয়ালিয়র
রনথম্ভোর
সিন্ধু
বারাণসী
গৌড়
কালিঞ্জর
বিহার
খজুরাহো
জেজাকভুক্তি
(চান্দেল্লা)
চিতোর
উজ্জয়িনী
ধারানগরী
সোমনাথ
গণ্ডোয়ানা
দেবগিরি
বোম্বাই
কল্যাণী
বরঙ্গল
কোঙ্কন
বনবাসী
দ্বারসমুদ্র
কাঞ্চী
গঙ্গাইকোণ্ডা চোলপুরম
তাঞ্জোর
মাদুরা
রামেশ্বরম
কোপম
কয়াল
অনুরাধাপুর

নিলেন। স্বয়ং রানী কমলাদেবী সুলতানের সৈন্যদলের হাতে বন্দী হলেন; পরে তিনি সুলতানের প্রিয় মহিষী হয়েছিলেন। ক্যাম্বে বন্দর পর্যন্ত গিয়ে সুলতানী সেনা বণিকদের কাছ থেকে বহু ধনরত্ন আদায় করেছিল। আর সুলতানের জন্য এক সুদর্শন হাবসী খোজাকে ধরে আনা হল; এই খোজা পরে সেনাপতি মালিক কাফুর নামে বিখ্যাত হয়েছিল।

মালিক কাফুর

এর পর আলাউদ্দীনের দৃষ্টি পড়ল রাজস্থানের দিকে। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দুই সেনাপতি গেলেন রাণা হামীরদেবের শাসনাধীন রণথম্বর দুর্গ আক্রমণ করতে; নসরৎ খানের মৃত্যু হল, উলুখ খান জখম হয়ে ফিরে গেলেন, আর তখন স্বয়ং সুলতান সেখানে গিয়ে এক বিশ্বাসঘাতক সেনাধ্যক্ষের সাহায্যে দুর্গ জয় করলেন (১৩০১)। কিছুকাল পরে (১৩০৩) আলাউদ্দীন রাজস্থানের সবচেয়ে গৌরবান্বিত মেবার রাজ্য আক্রমণ করলেন, পাহাড়ের উপর সুরক্ষিত চিতোর দুর্গ জয় করতে গেলেন। কর্নেল টড-সঙ্কলিত "রাজস্থানের কাহিনী" থেকে জানা যায় যে আলাউদ্দীন রাণা ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর অপরূপ রূপলাবণ্যের মোহে আকৃষ্ট হয়ে চিতোর জয় করতে গিয়েছিলেন। চিতোরের পতন আসন্ন হলে রাজপুতরা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করেন। পদ্মিনী অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে "জৌহর" ব্রত পালন করে আগুনে আত্মাহুতি দেন। রাজপুত বীর গোরা ও বাদল অসামান্য দুঃসাহস নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আধুনিক গবেষণার ফলে এই পদ্মিনী-উপাখ্যান সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে; সমসাময়িক কোন অনুশাসন বা বিবরণে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। চিতোরের রাণা তখন ছিলেন রতনসিংহ, অথচ কিংবদন্তীতে ভীমসিংহের কথা রয়েছে। ১৩১৮ সালে চিতোর তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে; মেবারের বিরুদ্ধে আলাউদ্দীন সফল হলেন বটে, কিন্তু সাফল্য হল ক্ষণস্থায়ী। যাই হোক, চিতোর জয়ের পর মালবের উজ্জয়িনী, ধারা, মণ্ডু, চন্দেরী প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত স্থান আলাউদ্দীন অধিকার করেন।

রণথম্বর দুর্গ জয়

মেবার জয়

পদ্মিনী-কাহিনী

কাহিনীর ঐতিহাসিক অসঙ্গতি

স্বল্পস্থায়ী সাফল্য

অন্যান্য রাজ্য অধিকার

উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র আধিপত্য স্থাপন করে আলাউদ্দীন এবার দাক্ষিণাত্য জয়ে অগ্রসর হলেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র ইতিপূর্বে আলাউদ্দীনের সমরশক্তির তিক্ত আস্বাদ পেয়েছিলেন; কিন্তু প্রথম পরাজয়ের পর দিল্লীতে নিয়মিত কর প্রেরণে তিনি অবহেলা করতে থাকেন। তা ছাড়া গুজরাটের রাজা কর্ণদেবকে আশ্রয় দিয়ে সুলতানের রোষভাজন হয়েছিলেন। মালিক কাফুরকে আলাউদ্দীন দেবগিরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালেন; কাফুরের হাতে পরাজিত হয়ে রামচন্দ্র আবার বশ্যতার অঙ্গীকার

দাক্ষিণাত্য অভিযান

দেবগিরি আক্রমণ

জানালেন। তারপর কাফুর এগিয়ে গেলেন পূর্বে, তেলেঙ্গানার ওয়ারঙ্গল রাজ্য আক্রমণ করলেন; সেখানকার কাকতীয় বংশের রাজা প্রতাপরুদ্রদেব শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পেরে না উঠে সন্ধি করলেন, সুলতানের বশ্যতা মেনে নিয়ে বাৎসরিক কর প্রদানে সম্মত হতে হল (১৩০৯)। আলাউদ্দীন নাকি কাফুরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "রাজা যদি প্রচুর ধনরত্ন, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি দিতে রাজী থাকেন এবং প্রতি বৎসর টাকাকড়ি এবং হাতী পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেন" তো খুব বেশী কঠোর ব্যবস্থা না নিলেও চলবে। কাফুর যুদ্ধজয়ের নিদর্শনস্বরূপ যা দিল্লী পাঠালেন, তার "ওজনের চাপে হাজার উট গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে থাকে"! তখনও কাফুরের কর্তব্য শেষ হয় নি; ১৩১০ সালে হয়সল বংশীয় রাজা বীরবল্লালের রাজধানী দ্বারসমুদ্র (বর্তমানে মহীশূরের অন্তর্গত হালবিদ) তিনি আক্রমণ করলেন। বীর-বল্লাল পরাজিত হয়ে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করলেন, প্রচুর ধনসম্পদ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হলেন। ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে কাফুর পাণ্ড্য-রাজকে পরাস্ত করে রাজধানী মাদুরা দখল করলেন; কথিত আছে যে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়ে সেখানে এক মসজিদ তিনি নির্মাণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে দেবগিরির রামচন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর পুত্র শঙ্করদেব রাজ্যের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করায় (১৩০৯) কাফুর তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন, দেবগিরির স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়ে যায়। এই অভিযানের ফলে আরব সাগরের উপকূলস্থ দাভোল ও চৌল বন্দর আলাউদ্দীনের দখলে আসে। দক্ষিণ ভারতে এই ব্যাপক ও তদানীন্তন পরিস্থিতিতে তড়িৎগতি অভিযানের ফলে বহু নগর ও জনপদ লুণ্ঠিত হল, অগণিত মন্দির ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু মনে হয় যে উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের উজ্জীবন ক্ষমতা ছিল বেশী; পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সেখানে বিজয়নগর, বহমনি প্রভৃতি যে রাজ্য দেখা দেয় তারা উত্তর ভারতীয় শক্তির আঘাতকে প্রতিহত করার সঙ্গতি রাখত।

ওয়ারঙ্গল রাজ্য আক্রমণ

আহৃত সম্পদের পরিমাণ

দ্বারসমুদ্র আক্রমণ

পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ

দেবগিরির স্বাতন্ত্র্য লোপ

দাভোল ও চৌল বন্দর অধিকার

দক্ষিণ ভারতের উজ্জীবন শক্তি

আলাউদ্দীনের শাসনকালে ক্রমাগত মোঙ্গল আক্রমণের বিপদ দেখা দিয়েছিল; সংখ্যায় ও তীব্রতায় ঐ আক্রমণ সুলতানের পক্ষে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়েছিল। ১২৯৬ সালে তাদের প্রথম আক্রমণ জলন্ধরের কাছে প্রতিহত হয়; উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শাসক জাফর খান তাদের পরাস্ত করেন। পরবৎসর এগিয়ে এসে তারা জাফর খানের হাতে আবার পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। ১২৯৯ সালে বিপুল মোঙ্গল বাহিনী একজন খ্যাতনামা

মোঙ্গল আক্রমণের পৌনঃপুন্য ও তীব্রতা

মোঙ্গল আক্রমণের সফল প্রতিরোধ

নায়কের নেতৃত্বে অভিযান করে ; দিল্লীর কাছাকাছি যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত তারা এসে হাজির হয়। এবার জাফর খান ছিলেন স্থলতানী সৈন্যদলের নেতা, প্রচণ্ড যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কথিত আছে যে জাফর খানের মতো স্থদক্ষ রাজপুরুষের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকায় স্থলতান একটু শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, তাই তাঁর মৃত্যুতে আলাউদ্দীনের দুঃখ না হয়ে স্বস্তি বোধ হয়েছিল। যাই হোক, মোঙ্গল বাহিনীও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে তারা যুদ্ধের পর আর এগিয়ে চলার চেষ্টা করে নি। অবশ্য তখনও মোঙ্গলদের এদেশে এসে লুঠতরাজ আর রাজ্য জয়ের প্রলোভন যায় নি ; ১৩০৪ সালে তারা আবার এল, লাহোরের কিছু উত্তরে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে গেল। তখনও মোঙ্গল আক্রমণের পালা শেষ হয় নি, তাই ১৩০৭-০৮ সালে তাদের পঞ্চম ও সর্বশেষ আক্রমণ প্রতিহত হল। এই বারবার মোঙ্গল আক্রমণের বিপদ স্থলতানকে যে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সীমান্তের কাছে আলাউদ্দীন তাই সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে সেখানে সর্বদা সৈন্য মোতায়েন করে রাখার ব্যবস্থা করেন, উত্তর-পশ্চিমে দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গের সংস্কার তিনি করেন। মোঙ্গল বিপদের হাত থেকে সাম্রাজ্যকে নিস্তার দিতে পারা আলাউদ্দীনের এক প্রধান সাফল্য বলে অবশ্যই পরিগণিত হবে। এ বিষয়ে নির্মম হতেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। দিল্লীর কাছাকাছি এলাকায় "নব মুসলমানরা" বিদ্রোহ করলে তিনি এক দিনে ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করতে সঙ্কুচিত হন নি।

সীমান্তে স্থদৃঢ় রক্ষা ব্যবস্থা

নির্মম প্রতিবিধান

শাসক আলাউদ্দীন

আলাউদ্দীনের রাষ্ট্রনীতি

আলাউদ্দীন নিজে একবার লেখেন : "প্রজারা যখন কথা শোনে না, অশ্রদ্ধা দেখায় আর আমার আদেশ অমান্য করে তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়, তারা যাতে শাসন মেনে চলে তার বন্দোবস্ত করতে হয়। এটা আইনসঙ্গত কি বে-আইনী, তা আমি জানি না ; রাজ্যের কল্যাণের জন্য কিংবা কোন বিশেষ আপৎকালে প্রয়োজনীয় বলে আমি যা মনে করি, সেই অনুসারে হুকুম জারি করে থাকি। খোদার সামনে বিচারের দিন যখন আমার আসবে, তখন যে আমার বেলা কি ঘটবে, তা জানি না।" এই কথাগুলির মধ্যে একটা আধুনিক স্থর আছে। উলেমা আর সামন্ত আর উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের উপর নির্ভর না করে রাজা নিজের হাতে ক্ষমতা রাখবে এবং নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী

ব্যবহার করবে, এই ছিল তাঁর মত। স্থলতানের প্রাধান্য সর্বময় না হলে তখনকার পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র দুর্বল হতে বাধ্য ছিল; অভিজাত আর উলেমা-কাজী প্রভৃতির কর্তৃত্ব এক প্রকার অরাজকতারই শামিল হত। অবশ্য মুশকিল এই যে, স্থলতান যে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি হবেন, এমন কোন নিশ্চিতি ছিল না। উত্তরাধিকার নিয়ে পরস্পর-দ্বন্দ্বের অমানুষিক প্রকাশকেও ঠেকিয়ে রাখার কোন উপায় বার করা যায় নি। কিন্তু রাজা পঙ্গু হলে তখন রাজ্যও দুর্বল হত একেবারে অনিবার্যভাবে। মনে হয় আলাউদ্দীন এই সমস্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং নিজের কর্তব্য বলে যা বুঝেছিলেন তা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

স্থলতানের সর্বময় কর্তৃত্বের ভালোমন্দ দিক

শাসন-সৌকর্যে নিরলস আগ্রহ

দেশে বিদ্রোহ কেন ঘটে, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি স্থির করেন যে রাজকার্যে স্থলতান যদি সর্বদা আগ্রহান্বিত থাকেন, আলস্য ও অবহেলা পরিহার করে চলেন তো শাসন ভালোভাবে চলবে। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান প্রভৃতি বদ অভ্যাস খুব ছিল; আলাউদ্দীন নিজে মদ্যপান ত্যাগ করলেন, পানপাত্র প্রভৃতি ভেঙে ফেলে দিলেন, আর সর্বত্র মদ্যপান ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান স্থলতানের অনুমতি বিনা সম্পন্ন হবে না। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল এই যে, আমীর-ওমরাহের দল নিজেদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা করতে পারে বলে মাঝে মাঝে দল পাকিয়ে বিদ্রোহ করে রাজশক্তিকে যে কোন মুহূর্তে বিপন্ন করে তোলার ক্ষমতা রাখে। কোথাও কেউ যাতে সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত না থাকে, সেজন্য গোয়েন্দা আর গুপ্তচরদের দেশময় ছড়িয়ে রাখলেন, রাজ্যের কোন খবর তাঁর অজানা রইল না। হাজি মৌলার বিদ্রোহ প্রভৃতি কতকগুলি ঘটনা দেখে স্থলতান অত্যন্ত সতর্ক ও কঠোর হয়ে পড়লেন। সরকারী কর্মচারীরা যাতে রাজার কর্তৃত্ব মেনে চলে সেজন্য মুসলমানদের মধ্যে সমাজে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের বহু লোককে তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত করে-ছিলেন। রাজকর্মচারীদের জায়গীর দেওয়ার প্রথা তিনি রহিত করে দেন। প্রজাদের মধ্যে অর্থের প্রাচুর্য ঘটলে বিদ্রোহের সামর্থ্য ও মনোবৃত্তি দেখা দিতে পারে ভেবে তিনি এমন ব্যবস্থা চাইলেন যাতে আমীর, মালিক, মহাজন, কারও হাতে খুব বেশী টাকা জমতে না পারে। শোনা যায় যে কোন হিন্দু সাহস করত না বাড়িতে সোনা বা রূপা বা ঐশ্বর্যের অন্যান্য কোন নিদর্শন রাখতে। দোয়াব অঞ্চলের চাষীদের কাছ থেকে নাকি উৎপন্ন

আভ্যন্তরীণ সম্ভাব্য বিদ্রোহ প্রতিরোধের ব্যবস্থা

মদ্যপান নিষিদ্ধীকরণ

অভিজাতদের সামাজিক মেলামেশার উপর নিয়ন্ত্রণ

গুপ্তচর নিয়োগ

নিম্নস্তর থেকে উচ্চ পদে কর্মচারী নিয়োগ

জায়গীর প্রথা রদ

অতিসঞ্চয়ের পথে বাধা আরোপ

ফসলের অর্ধাংশ সরকারী রাজস্ব বলে আদায় করা হত। শুধু যে হিন্দুদের দুর্দশা বাড়ল, তা নয়, অনেকেরই তিনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন, যে কোন অজুহাতে রাজকোষের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হল।

সামরিক শক্তি-নির্ভর শাসন

আলাউদ্দীনের শাসন বহুল পরিমাণে নির্ভর করত সামরিক শক্তির উপর। সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল, নূতন কায়দায় সমর-শিক্ষা ও সংগঠনের আয়োজন হয়েছিল। সৈন্যদের বেতন ছিল অল্প, কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট রাখার দরকার ছিল। তাই দাক্ষিণাত্য থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে আসার পর যখন অনিবার্য অর্থনৈতিক নিয়মে মুদ্রার মূল্য হ্রাস পেল, মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমল, তখন তিনি বিশেষ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন, যাতে জিনিসপত্রের দাম খুব বেশী না বাড়ে। এতে সম্ভবত ব্যবসা-বাণিজ্য কতকটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কিন্তু স্থলতানের চিন্তা ও পরিকল্পনায় মৌলিকতাও কিছু আমরা লক্ষ্য করি। চাল, আটা, চিনি, তেল, কাপড় প্রভৃতির মূল্য আলাউদ্দীন সরকারী হুকুমে বেঁধে দিয়েছিলেন ; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে আটার মন ছিল প্রায় দুই আনা, ধানের মন ছয় পয়সা, দেড় পয়সায় এক সের চিনি আর তিন সের গুড়। বাঁধা দরের বেশী কেউ নিলে কড়া শাস্তি হত, অতিরিক্ত মজুত রাখা নিষিদ্ধ ছিল, ওজনে কম দিয়ে ঠকালে গায়ের মাংস কেটে শাস্তি দেওয়া হত। স্থলতান এ সমস্ত বিষয়ে খুবই কঠোর বলে রাজকর্মচারীরা সন্ত্রস্ত থাকত, ব্যবসায়ীরা তো শঙ্কিত ছিলই। কোনও কোনও পণ্ডিতের অভিমত হল যে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণনীতি প্রকৃতই স্থলতানের প্রজাহিতৈষণার পরিচায়ক, কিন্তু এই মতের পক্ষে যুক্তি থাকলেও একে পুরাপুরি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রজাসাধারণের শুভেচ্ছা স্থলতান অর্জন করতে পেরেছিলেন বলে কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু রাজশক্তিকে নিরঙ্কুশ করা এবং অভিজাতদের নখদন্তহীন অবস্থায় রেখে দেওয়ার যে চেষ্টা আলাউদ্দীন করেছিলেন, তা নানা দিক থেকে পর্যালোচনা করার মতো ঘটনা।

মুদ্রামূল্য হ্রাস **প্রতিরোধে** ভোগ্যপণ্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

মূল্য হারের নমুনা

ব্যবসায়ে শঠতা নিবারণে কঠোর ব্যবস্থা

আলাউদ্দীনের কার্য বিচার

আলাউদ্দীনের শেষ জীবন ও খল্‌জী বংশের পতন

বহুস্থানে দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার

শেষ জীবনে আলাউদ্দীনকে বহু দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। গুজরাট, মেবার, দেবগিরি প্রভৃতি দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছিল। যে শাসনব্যবস্থা নিয়ে তাঁর আগ্রহ ও গর্ব, তা ক্রমে দুর্বল হতে থাকে। মালিক কাফুরের প্রভাব ও প্ররোচনায় পারিবারিক শান্তি তাঁর ছিল

না ; তারই হাতে ক্রীড়নকরূপে বৃদ্ধ স্থলতান দিনযাপন করতেন, ১৩১৬ সালে হয়তো কাফুরেরই বিষপ্রয়োগে তাঁর মৃত্যু হয়। অবশ্য পিতৃব্য-হত্যা ও অন্যান্য যে উপায়ে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন, তা মনে রাখলে আলাউদ্দীন সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কিন্তু এই সমস্ত রাজাকে নিছক ব্যক্তি হিসাবে বিচার করা চলে না। সেইজন্যই দেখা যায় যে, একদিকে আলাউদ্দীন সম্বন্ধে বিরাগ পোষণ করে ইতিহাসলেখক বরানী স্থলতানের নির্মমতা সম্বন্ধে বলেছেন যে আলাউদ্দীন যত লোককে হত্যা করেছেন, মিশরের কোন অত্যাচারী "ফ্যারাও" তা করেন নি। আবার ইবন বতুতার মতো স্থবিবেচক বিদেশী তাঁকে "শ্রেষ্ঠ স্থলতানের অন্যতম" বলে বর্ণনা করেছেন। আলাউদ্দীন জীবনে অন্যায় অপকর্ম বড় কম করেন নি, কিন্তু তাই বলে ভুলতে পারা যায় না যে, ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রথম প্রকৃত পথিকৃৎ হলেন তিনি। তাই তাঁকে শুধু খল্‌জী বংশের শ্রেষ্ঠ স্থলতান বললে অনেক কথা অকথিত থেকে যাবে ; বাস্তবিকই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান নরপতিদের মধ্যে তাঁর স্থান খুবই উচ্চে। মুসলিম সাম্রাজ্য তখন ভারতবর্ষে যে বৃহদাকার পরিগ্রহ করে, এক মুঘল বাদশাহ্ অওরংজীব ছাড়া আর কারও শাসনকালে সেরূপ দেখা যায় নি।

মালিক কাফুরের ষড়যন্ত্রে আলাউদ্দীনের মৃত্যু

আলাউদ্দীনের চরিত্র-বিচার

বরানী ও ইবন বতুতার মন্তব্য

সিদ্ধান্ত

শুধু যুদ্ধ জয় নয়, শাসন সংগঠনে তাঁর যে কৃতিত্ব ও মৌলিকতা ছিল, তাও স্মরণীয়। পিতৃব্যের প্রতি ব্যবহারে তাঁর ক্ষমতালোলুপতা প্রকট ; ত্রিশ হাজার "নব মুসলমানের" মৃত্যুদণ্ডে তাঁর নৃশংসতা স্পষ্ট। কিন্তু ঐ দুই অপরাধে অভিযুক্ত করা যায় না, এমন রাজা সে যুগে একান্ত বিরল। তাই আলাউদ্দীন যে স্থবিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন, উলেমা প্রভৃতির নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকৃত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের সূত্রপাত কিয়ৎপরিমাণে করেছিলেন এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রবিরোধকে স্থায়িভাবে পরাভূত করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন, তা ভুলে যাওয়া সঙ্গত হবে না। "দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ্ (আলেকজাণ্ডার)" উপাধি গ্রহণ এবং নূতন এক ধর্ম প্রচারের যে অভিপ্রায় তিনি পোষণ করতেন বলে জানা যায়, তা থেকে তাঁর উচ্চাভিলাষই লক্ষ্য করা যায়। ধর্মপ্রচারের অভিপ্রায় তিনি অবশ্য পরিত্যাগ করেন, কিন্তু দম্ভ ও উচ্চাশা তাঁর মতো শক্তিশালী ও আত্মম্ভরী ব্যক্তির পক্ষে অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। যাই হোক, এক বিপুল সাম্রাজ্যের স্রষ্টারূপে তিনি স্মরণীয়। শিল্প-ব্যাপারেও তাঁর আগ্রহ ছিল ; কুতবমিনারের

নৃশংসতার স্বপক্ষে যুক্তি

আলাউদ্দীনের কৃতিত্ব

উচ্চাকাঙ্ক্ষা

শিল্পে উৎসাহ

"আলাই দরওয়াজা" এবং অনেক মসজিদে তাঁর শিল্পরুচির ছাপ আছে, কুতবের দ্বিগুণ এক মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। আমীর খস্রু তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন ; হাসান প্রভৃতি অন্যান্য কবিকেও সেখানে দেখা যায়। আলাউদ্দীনের চরিত্রে আকর্ষণীয় উপাদানের অভাব আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কৃতিত্বের বিচারে ইতিহাস তাঁকে যে সমুচ্চ স্থান দিয়েছে তা অনস্বীকার্য।

গুণীর সমাদর

শেষ কথা

পরবর্তী খল্‌জী শাসন সম্বন্ধে যা জানা যায়, তাতে বিরক্তি ছাড়া অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় না। আলাউদ্দীনের তিন ছেলেকে বন্দী করে নাবালক শিহাবউদ্দীনকে সিংহাসনে শিখণ্ডীর মতো বসিয়ে মালিক কাফুরের দৌরাত্ম্য কিছুদিন চলল ; কারাগারে খিজ্‌র খান ও সাদি খান-এর চোখ উপড়ে ফেলা হল! কাফুরেরও দিন ফুরিয়ে এল, সবাই মিলে তাকে হত্যা করল। আলাউদ্দীনের তৃতীয় ছেলে মুবারক রাজাসনে বসে শীঘ্রই ছোট ভাই শিহাবউদ্দীনের চোখ উপড়ে দিল, মুবারক শাহ উপাধি নিয়ে শাসন চালাল (১৩১৬-২০)। শাসনব্যবস্থায় কঠোরতা হ্রাস করে সস্তায় কিছু জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর সুলতান দেখালেন যে তিনি প্রকৃতই অকর্মণ্য। রাজসভায় বিচিত্র কাণ্ড ঘটতে লাগল ; স্বয়ং মুবারক মেয়ে সেজে গহনা পরে নাচতেও নাকি বাকি রাখেন নি। ভাগ্যগুণে গুজরাট ও দেবগিরির বিদ্রোহ দমন করতে পেরে মুবারকের স্পর্ধা আর সীমা মানতে চাইল না, নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা তিনি করলেন। খস্রু নামে যে বন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী পদে তিনি বসিয়েছিলেন, তারই চক্রান্তে মুবারকের মৃত্যু হল ; কয়েক মাস অত্যাচার অনাচার চলার পর দেখা গেল যে, আলাউদ্দীন যে অভিজাতদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন তারা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আলাউদ্দীনের বংশধর তখন কেউ না থাকায় অভিজাতদের পরামর্শে পঞ্জাবের একাংশের শাসক গাজী মালিক বৃদ্ধ হলেও গিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লক উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন (১৩২০-২৫)।

মালিক কাফুরের দৌরাত্ম্য

সুলতান মুবারক শাহ

অভিজাতদের শক্তিবৃদ্ধি

দিল্লীর সিংহাসনে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক

তুঘ্‌লক বংশ

গিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লক

শাসনকৃতিত্ব

শুধু তুঘ্‌লক বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে নয়, নিজের শাসনকৃতিত্বের জন্যও গিয়াসউদ্দীন তুঘ্‌লক শাহ ইতিহাসে মর্যাদার স্থান পেয়েছেন। নিজে তুর্কী বলে আমীর, মালিক প্রভৃতির মধ্যে সমর্থকের তাঁর অভাব ছিল না ; আলাউদ্দীনের কঠোর আইনে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরত দিয়ে কিছু প্রশংসাও

তিনি পেয়েছিলেন। অবশ্য চোর-ডাকাতের উপদ্রব নিবারণের জন্য তাঁকেও বেশ কড়া হতে হয়েছিল, আর হিন্দুদের সম্পর্কে আলাউদ্দীনের নীতিই তিনি চালিয়ে যান। নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে তিনি সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। তাঁর রাজ্যকালের প্রধান ঘটনা হল দাক্ষিণাত্যে ওয়ারঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ, এবং বাংলা দেশে দিল্লীর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ১৩২৩ সালে কাকতীয় বংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সপরিবারে দিল্লীতে আনীত হলেন, সুলতানের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হলেন। বাংলাতে দিল্লীর আধিপত্য প্রায়ই নামমাত্র ব্যাপারে পর্যবসিত হয়ে যেত, কিন্তু সেখানে রাজ্য নিয়ে শাম্‌স্‌উদ্দীন ফিরুজের তিনপুত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ নিয়ে সুলতান পুত্র জুনা খানকে দিল্লীতে নিজের প্রতিনিধি করে রেখে বাংলা দেশে গেলেন। যুদ্ধের পর নাসিরউদ্দীন হলেন বাংলার শাসনকর্তা, দিল্লীর কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। মরক্কোবাসী ইবন বতুতার প্রসিদ্ধ রচনায় আছে যে বাংলায় এবং বিহারের উত্তর অঞ্চলে জয়লাভ করে সুলতান যখন দিল্লীতে ফিরছেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যে তোরণ নির্মিত হয়েছিল, তারই একটা ধসে পড়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে, কিন্তু ব্যাপারটি নিছক দুর্ঘটনা ছিল না, এর পিছনে ছিল যুবরাজ জুনা খান-এর দুরভিসন্ধি। যাই হোক, বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর জুনা খান মহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লক নাম নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসলেন (১৩২৫-৫১)।

ওয়ারঙ্গলের রাজা প্রতাপ-রুদ্রের পরাজয়

বঙ্গদেশ কর্তৃক দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার

গিয়াসউদ্দীনের আকস্মিক মৃত্যু

দিল্লীর সিংহাসনে মহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লক

মহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লক

বিপরীত গুণের সমাবেশে যে এক অদ্ভুত চরিত্র সৃষ্টি হয়, আর তেমনই চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি রাজাসনে বসলে ভালো এবং মন্দ দুই ব্যাপারই যে অজস্র ঘটতে পারে, তারই পরিচয় মিলছে মহম্মদ তুঘ্‌লকের ক্ষেত্রে। তাঁর চরিত্র এবং কৃতিত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যত আলোচনা আর মতপার্থক্য দেখা গেছে, তা ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের যুগে আর কোনও রাজা সম্বন্ধে সম্ভবত হয় নি। বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগ, গণিত, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যাপারে বুৎপত্তি মহম্মদ তুঘ্‌লককে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল, তা একাধারে সে যুগের অন্য কোন সুলতানে দেখা যায় নি। তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধতাকে তিনি পরিহার করেছিলেন। শাসনে যে উদার, ধর্মনিরপেক্ষ ধারা তিনি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, তা সুলতানী আমলে প্রায় অভূতপূর্ব। তাঁর নৈতিক

চরিত্রে বিপরীত গুণের সমাবেশ

অনন্যসাধারণ বিদ্বান

শাসন বিষয়ে উদার ও ধর্ম নিরপেক্ষ

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র

চরিত্রে কোন কলুষ স্পর্শ করেছিল বলে জানা নেই ; অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, বদান্যতার জন্য তিনি খ্যাত ছিলেন। মৌলিক চিন্তা এবং নিজের আদর্শ ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিতেন ; যেখানে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেও দেখা গিয়েছে যে তাঁর দূরদৃষ্টির অভাব ছিল না, গভীর চিন্তা বিনা তিনি কোন পরিকল্পনা স্থির করতেন না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ মনঃসংযোগ না করার ফলে। মহম্মদ তুঘ্‌লক সম্বন্ধে প্রকৃতই বলা চলে যে, বহুবিধ গুণ, এমন কি প্রতিভা সত্ত্বেও, যাদের সদিচ্ছা ও দূরদৃষ্টি অবস্থার বিপাকে একান্ত বিফল হয়েছে, তেমনই যে কয়েকজন ব্যক্তির কথা ইতিহাস জানে, মহম্মদ তুঘ্‌লক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সমুচ্চ পরিকল্পনা তত্ত্বের দিক থেকে নিখুঁত হয়েও যে কর্মের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে, তারই মর্মন্তুদ বিবরণ বার বার মহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজ্যকালে পাওয়া যায়।

মৌলিক চিন্তা ও দূরদৃষ্টি কিন্তু বাস্তব জ্ঞানের অভাব

মর্মন্তুদ পরিণতি

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বহু বিপরীত গুণের সমাবেশ তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল, পরস্পরবিরোধী উপাদানে তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছিল। ইবন বতুতার কথা থেকে মনে হবে যে, স্থলতান একাধারে দয়ালু ও নির্মম ছিলেন ; পরদুঃখে বিগলিত-হৃদয় স্থলতান অকাতরে দান করার পর মুহূর্তেই হয়তো ক্রুদ্ধ হয়ে অনেকটা অকারণে কারও প্রাণদণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। নিজের মত বা পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করতে পারার মতো মনের ঔদার্য তাঁর ছিল না ; নিজে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, অপরের ক্ষেত্রে সেই মৌলিক চিন্তার আদর তিনি করেন নি। মাঝে মাঝে তাই তাঁকে মনে হয়েছে একেবারে অস্থিরমতি ; বিচক্ষণ লোক যে-স্থৈর্যগুণের অধিকারী না হলে চলে না, তা তাঁর ছিল না। ফিরিস্তা, বরানী, ইবন বতুতা প্রভৃতির লেখা থেকে অনেক সময় মনে হবে যে স্থলতান ছিলেন নিছক খামখেয়ালী ; দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী নিয়ে যাওয়া, কিংবা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা, কিংবা তামার নোট প্রচলনের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ব্যাপারে একেবারে হঠাৎ মন স্থির করে এমন একগুঁয়েমি নাকি তিনি দেখাতেন যে মাঝে মাঝে স্পষ্ট সন্দেহ হয় তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল কিনা। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা মোটের উপর মহম্মদ তুঘ্‌লককে শুধু মাত্র অব্যবস্থিতচিত্ত নরপতি বলতে চান না। সহজে তিনি একান্ত অধৈর্য হয়ে পড়তেন ; ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অনেক অন্যায় কাজ তিনি করেছেন ; বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার মতো সুবিবেচনা ও

মহম্মদ তুঘ্‌লক সম্পর্কে ইবন বতুতা

ফিরিস্তা, বরানী, প্রভৃতি

আধুনিক ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত

কৌশল তাঁর জানা ছিল না। তাই অসাধারণ গুণাবলী সত্ত্বেও তাঁরই শাসনকালে জনসাধারণের বিক্ষোভ বাড়ল, যে বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তিনি হয়েছিলেন, তার পতন আসন্ন হয়ে পড়ল। শিক্ষিত, পরিশ্রমী, চিন্তাশীল, প্রতিভাবান হয়েও তাই কাজের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতাই ফুটে উঠল। বাস্তববুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধিকারী হলে অসঙ্কোচে মহম্মদ তুঘ্‌লককে প্রকৃত মহত্ত্বের আসনে বসানো যেত। বহুগুণান্বিত এই ব্যক্তিকে, বাস্তববোধের অভাব সত্ত্বেও, সুপণ্ডিত ঈশ্বরীপ্রসাদ যে মধ্যযুগীয় রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে কর্মক্ষম ("unquestionably the ablest man among the crowned heads of the Middle Ages") বলে বর্ণনা করেছেন, তাকে অতিকথন বলে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। ঈশ্বরীপ্রসাদের মন্তব্য

ইবন বতুতা, বরানী, ফিরিস্তা প্রভৃতির কথা থেকে মনে হতে পারে যে মহম্মদ তুঘ্‌লক সারা জীবন ধরে কেবল অবান্তর ও উদ্ভট কতকগুলো পরিকল্পনার পিছনে ছুটেছেন, মায়া-মরীচিকাই তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে বে-হিসাবী হলেও তাঁর কোন কাজই নিছক স্বপ্নবিলাস ছিল না। আর বাস্তবিকই কোন হঠকারিতার কাজ তিনি সচরাচর করেন নি। মসনদে বসে তিনি গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে কৃষকদের করভার বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ; এর ফলে শোনা যায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। কিছুকাল প্রজারা খাজনা দিতে অস্বীকার করায় সুলতান কঠোরভাবে অবাধ্যতার দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু আবার তিনিই প্রজাদের কৃষিঋণ দিলেন, জলসেচের ব্যবস্থা করলেন, খাজনা কমাবার হুকুম দিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর অনেক নিন্দাবাদ হয়েছে, কিন্তু সম্ভবত রাজকোষে অর্থাভাব হওয়ায় অত্যন্ত উর্বর এলাকায় করভার বৃদ্ধি একেবারে অযৌক্তিক ছিল না, কৃষকদের মধ্যে যারা সম্পন্ন তাদের বিদ্রোহী মনোভাব দমনেরও প্রয়োজন হয়তো ছিল। স্বপ্নবিলাসী অভিযোগ ক্ষালন কৃষকদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ, তদ্বিপরীতে কর-হ্রাস ও কৃষিঋণ দান ও সেচ-ব্যবস্থা কর-বৃদ্ধির যৌক্তিকতা

১৩২৬-২৭ সালে সুলতান দিল্লী থেকে দেবগিরিতে (দৌলতাবাদ) রাজধানী স্থানান্তরের আদেশ দেন। সব দিক ভেবে, আটঘাট বেঁধে, তিনি একাজ করেন নি ; তাই শেষ পর্যন্ত দুর্বলচিত্ততা ও অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন বলে তাঁকে নিন্দিত হতে হল। আবার যখন আট বৎসর পরে দেবগিরি থেকে দিল্লীতে রাজধানী ফেরত আনা হল, তখন প্রজাদের কষ্টের অবধি ছিল না, রাজকোষও নিঃস্ব হবার উপক্রম ঘটল। সাধারণ লোকের যে নিদারুণ ক্লেশ ও দুর্গতি তিনি এই কাণ্ডটি করতে গিয়ে ঘটিয়েছিলেন, দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর তারবিপর্যয়কারী ফলাফল

তাতে কোন সন্দেহ নেই। জনসাধারণের কষ্ট আর রাজ্যের অর্থনাশ, এই দুই দিক থেকে দেখতে গেলে রাজধানী পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিশ্চয়ই নিন্দার্হ। কিন্তু এই বিষয়ে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। খুব

সমসাময়িক বিবরণের সম্ভাব্য অতিরঞ্জন

সম্ভবত ইবন বতুতার কাহিনীতে বেশ খানিকটা রংচং চড়ানো হয়েছে। সুলতান দিল্লী থেকে দেবগিরি যাওয়ার সুবিধার জন্য নূতন এক রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন; পথে যাতে সকলে রাত্রি যাপনের জায়গা পায়, তারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু হুকুম ছিল যে দিল্লীর প্রত্যেকটি লোককে দেবগিরি যেতে হবে, ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ কোন ভেদাভেদ চলবে না। ইবন বতুতা বলেছেন যে, সুলতান হুকুম দিয়েছিলেন দিল্লীর কোথাও কেউ লুকিয়ে আছে কিনা খোঁজ করতে, আর বহু অন্বেষণের পর একজন খোঁড়া আর একজন কানাকে আবিষ্কার করা হয়। বরানী লিখেছেন যে, দিল্লীতে একটা কুকুর বা বিড়াল পর্যন্ত ফেলে যাওয়া হয় নি। হয়তো জোর করেই বলা যায় যে, এ সব কথায় অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই আছে। যাই হোক, সাতশো মাইল রাস্তা পার হয়ে যেতে সকলেরই যে অসম্ভব কষ্ট হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই; বহুজনের পথেই মৃত্যু ঘটেছিল।

রাজধানী স্থানান্তরের যৌক্তিকতা

দিল্লী থেকে রাজধানী স্থানান্তরণ একেবারে অযৌক্তিক ছিল না; বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী দেশের কেন্দ্রস্থলে থাকার সার্থকতা ছিল, তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণ যখন ক্রমান্বয়ে চলেছিল তখন সীমান্ত থেকে দিল্লী বেশ কাছে হওয়ায় দেবগিরি নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ হতে অনেক বেশী উপযোগী ছিল।

ভ্রান্তনীতির পরিচায়ক

কিন্তু সব দিক ভেবে দেখলে সুলতানের এই বহুনিন্দিত কাজটি একেবারে অসঙ্গত না হলেও যে ভ্রান্ত নীতির পরিচায়ক, তা স্বীকার করতে হবে।

মোঙ্গল আক্রমণ সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী বিবরণ

১৩২৮-২৯ সালে মোঙ্গলরা যখন এগিয়ে এসে একেবারে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়, তখন সুলতান তাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে বহু ধনরত্ন ইত্যাদিতে তুষ্ট করে ফিরিয়ে দেন। ফিরিস্তা এই কথা লিখে মহম্মদ তুঘ্‌লকের নিন্দা করেছেন। বদাউনী প্রভৃতি লেখক অবশ্য বলেছেন যে যুদ্ধে জয়লাভ করে সুলতান মোঙ্গলদের ভারত ত্যাগে বাধ্য করেন। এ বিষয়ে সত্য নির্ধারণ দুরূহ ব্যাপার।

কার্য সমালোচনা

কিন্তু মনে হয় যে মোটের উপর সীমান্ত রক্ষা ব্যাপারে মহম্মদ তুঘ্‌লক তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নি, এবং হয়তো তারই ফলে ভবিষ্যতে মোঙ্গল আক্রমণের জয়লাভ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীকে অর্থ দিয়ে তুষ্ট করে ফিরিয়ে দেওয়া ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা নয়, যে কোন রাজার পক্ষে ঐরূপ ব্যবস্থা

করা সর্বদা ভুল, তাও নয়। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা রাজা আলফ্রেড তো ডেন্‌দের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে দেশভাগ পর্যন্ত করেছিলেন, আক্রমণকারী-দের টাকা দিয়ে তুষ্ট করা সেখানে বেশ কিছুকাল রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোঙ্গলদের সম্বন্ধে মহম্মদ তুঘ্‌লক যে নীতি অবলম্বন করেন, তাকে দুর্বলতার পরিচায়ক মনে করা হয়তো ঠিক হবে না। পারস্য বিজয়ের পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন, হিমালয় অঞ্চলে যিনি অভিযান প্রেরণ করেন, মোঙ্গল আক্রমণ ঘোরতর হয়ে উঠলে যথোচিত ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি পরাঙ্মুখ হতেন না।

মুদ্রাসংস্কার

মহম্মদ তুঘ্‌লক মুদ্রাসংস্কারের যে চেষ্টা করেন, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তৎকালীন লেখকরা এর নিন্দাই করেছেন; অভিনব ব্যবস্থা সর্বদাই এরূপ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে থাকে। এর পূর্বে চীনদেশে কুবলাই খান কাগজের নোট প্রচলন করেছিলেন; তদানীন্তন জগতে এটা বিপ্লবেরই সামিল ছিল। মহম্মদ তুঘ্‌লক যে শুধু "একটা নতুন কিছু করো" ভেবে তামার মুদ্রা চালাতে চেয়েছিলেন, তা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রা সম্পর্কে মহম্মদ তুঘ্‌লকের কৃতিত্ব ও আগ্রহ ছিল প্রভূত; নূতন এক স্বর্ণমুদ্রা তিনি প্রচলন করেন, সোনা এবং রূপার আনুপাতিক মূল্য অনুযায়ী মুদ্রার মধ্যে ধাতুর পরিমাণ নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেন। বিপুল সৈন্য বাহিনীর ব্যয়ভার, শাসনকার্যের খরচ, রাজার দানধ্যান ইত্যাদি কারণে রাজকোষ ক্ষীণ হয়ে আসছিল বলে সম্ভবত তিনি তামার মুদ্রা চালাতে চাইলেন। তার প্রতীকমূল্য ছিল ধাতুমূল্যের চেয়ে কম, অর্থাৎ বর্তমান যুগে মুদ্রাব্যবস্থায় যা অবলীলাক্রমে ঘটেছে, তাই তিনি তখন প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন।

মুদ্রা সম্পর্কে আগ্রহ

তামার মুদ্রা প্রচলন

যুগোপযোগী না হওয়ার ফলে বিপর্যয়

সাধারণ লোকের কাছে এই অনভ্যস্ত কাণ্ড খারাপ লাগল, ব্যবসা-দাররাও এই মুদ্রাসংস্কারকে মানতে চাইল না, বাণিজ্য ব্যাপারে মুশকিল ঘটতে থাকল। যে সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে এই প্রতীক মুদ্রার প্রচলনে বিপদ ঘটতে পারে, সে ব্যবস্থা তেমন কিছু হয় নি; জাল চলল খুব বেশী। সুলতান কিন্তু এ ব্যাপারে অন্যায় কিছু করতে চেয়েছিলেন মনে হয় না। যখন এই তামার প্রচলন তিনি বন্ধ করতে বাধ্য হলেন, তখন সরকারী তহবিল থেকে তার বিনিময়ে পূর্ণ মূল্য সোনায় দিলেন; যারা জাল করেছিল তারা প্রচুর অর্থ পেল, রাজার ক্ষতি হল। একেবারে খামখেয়ালী, বেয়াড়া ধরনের লোক হলে তিনি একাজ করতেন না, সেরেফ জানিয়ে দিতেন যে তামা বাতিল হয়ে গেল।

ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দান

মহম্মদের কার্য বিচার

যাই হোক, যার ধাতুমূল্য অল্প, তাকেই সরকারী ছাপ দিয়ে অধিকমূল্যের প্রতীকস্বরূপ প্রচলন করা চতুর্দশ শতাব্দীর পরিস্থিতিতে সম্ভব না হলেও সুলতানের মৌলিক চিন্তা ও প্রতিভার পরিচয় এই নিষ্ফল কার্যক্রমেও বেশ পাওয়া যায়। আরও মনে রাখা উচিত যে, সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী যে রৌপ্যাভাব ঘটেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মহম্মদ তুঘ্‌লক এই প্রতীকমুদ্রা প্রচলনের প্রয়াস করেছিলেন।

পারস্য জয়ের প্রয়াস

পরিকল্পনা ত্যাগের কারণ

মধ্য এশিয়ায় তখন পরিস্থিতি এমন যে পারস্য দেশের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে মহম্মদ তুঘ্‌লকের পক্ষে পশ্চিমে রাজ্য জয়ের বাসনা একেবারে অলীক স্বপ্নবিলাস ছিল না। কথিত আছে যে পারস্য জয়ের উদ্দেশ্যে প্রায় তিন চার লক্ষ সৈন্য সমাবেশ তিনি করেছিলেন, মিশরের রাজা এ বিষয়ে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নি, মহম্মদ তুঘ্‌লক পরিকল্পনা পরিহার করতে বাধ্য হন। অবশ্য এতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর, কিন্তু প্রায় সর্ব ব্যাপারেই তিনি ধনক্ষয় করেছিলেন। ভারত ও চীনের মধ্যস্থলে অবস্থিত কারাজল বা কূর্মাচল প্রদেশ অধিকার করে সেখানকার পার্বত্য অধিবাসীদের বশে আনার জন্য তিনি যুদ্ধ করেন। মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, চীন বিজয়ের এক বিরাট পরিকল্পনা তাঁর ছিল, কিন্তু কথাটা সত্য নয়। বরানীর মত হল এই যে, চীন বা তিব্বত জয়ের বাসনা তাঁর ছিল না, কারাজলের পার্বত্য জাতিগুলিকে স্ববশে আনতে চেয়েছিলেন। এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলেও প্রচুর অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় এতে হয়েছিল।

কূর্মাচল-বিজয় কাহিনী

জনকল্যাণমূলক কাজ

বিচার বিষয়ে স্তায়পরায়ণতা

উচ্চপদে হিন্দুনিয়োগ

অনেক ক্ষেত্রে যাঁকে জনতার কল্যাণ সম্বন্ধে উদাসীন মনে হয়েছে, সেই সুলতানই কৃষির উন্নতি ও দুর্ভিক্ষের প্রশমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন, নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করেন। বিচার-বিষয়ে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও তিনি প্রয়োজন মনে করলে সর্বোচ্চ বিচারকরূপে কাজী, মুফ্‌তি প্রভৃতি মুসলিম আইন-বিশেষজ্ঞদের মত অগ্রাহ্য করতেন, মুসলিম উলেমাদেরও শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না। ইবন বতুতার লেখা থেকে জানা যায় যে রাজস্ব বিভাগে রতন নামে এক হিন্দু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্য মহম্মদ তুঘ্‌লকের যে ছিল, তা অনস্বীকার্য। সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন বলে কথিত আছে। চিতোর এবং রণথম্বরে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাওয়া যুক্তিযুক্ত বলে তিনি মনে করেন নি। যাই হোক,

তাঁর নানা কাজে সুবিবেচনা ও বাস্তববোধের অভাব এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যে রাজ্যময় বিদ্রোহ হতে থাকে, তাকে কঠোর হস্তে দমন করলেও অশান্তির নিরসন হয় নি। তাঁর শেষ জীবনে বাংলা, অযোধ্যা, মালব, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, সুলতান স্বয়ং রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যুদ্ধ করে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৩৫১ সালে সিন্ধু প্রদেশে বিদ্রোহ দমনে নিরত থাকার সময় মহম্মদ তুঘ্‌লকের মৃত্যু হল। ইতিহাসকার বদাউনী বলেছেন যে, রাজা আর প্রজা উভয়েই যেন পরস্পরের হাত থেকে নিস্তার পেল!

বাস্তববোধের অভাবে দেশে বিদ্রোহ ও অশান্তি

যুদ্ধময় শেষজীবন ও মৃত্যু

আধুনিক গবেষকরা অবশ্য মহম্মদ তুঘ্‌লক সম্বন্ধে পূর্বপ্রচলিত নিন্দা মেনে নিতে রাজী হন নি। সুলতানের কর্মপদ্ধতিতে ত্রুটি ছিল, জনসাধারণের দীর্ঘদিনের সংস্কারকে পরিবর্তিত করার মতো ধীর, স্থির বুদ্ধি তাঁর ছিল না, অপরের পরামর্শ গ্রহণে তিনি অক্ষম ছিলেন, নিজের কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা তিনি কখনও পান নি। অধীর আগ্রহের ফলে ভুল করেছেন, অপকর্মের জন্য দায়ী হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মন ছিল জাগ্রত, তাঁর প্রতিভা ছিল বিচিত্র। ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর ঔদার্য সমসাময়িক মুসলিম লেখকদের কাছে অপাংক্তেয় ছিল বলে নিজেদের বিদ্বেষ ও পক্ষপাত তাদের রচনায় অতিশয়োক্তি ও অবিচারে প্রকাশ পেয়েছে। তাই মনে হয় যে, সচরাচর মহম্মদ তুঘ্‌লককে যে ভাবে তুর্কী আধিপত্যের পতন ব্যাপারে দায়ী করা হয়, তা ঠিক নয়। আধুনিক গবেষণা মহম্মদ তুঘ্‌লকের স্থান পূর্বের চেয়ে সমুচ্চে স্থিরীকৃত করেছে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক না কেন, নানা দিক থেকে মহম্মদ তুঘলকের রাজ্যকাল যে স্মরণীয়, তাতে সন্দেহ নেই।

মহম্মদের চরিত্র-বিচার

ইতিপূর্বে কয়েক বার ইবন বতুতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। ১৩৩৩ সালে তিনি উত্তর আফ্রিকার মরক্কো থেকে এদেশে আসেন। মহম্মদ তুঘ্‌লক তাঁকে কাজীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর "সফরনামা" গ্রন্থ থেকে তদানীন্তন ভারতবর্ষের এবং বিশেষত বাংলা দেশের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। জিনিসপত্রের দাম তখন কেমন ছিল, তার চমৎকার খবর এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আছে। ইবন বতুতা কিছুকাল দৌত্যভার নিয়ে চীনদেশে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই বিচক্ষণ মরক্কোবাসীর কাছ থেকে মহম্মদ তুঘ্‌লকের শাসনকাল সম্বন্ধে এক স্বচ্ছ, সুন্দর, মৌলিক ও মোটের উপর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ আমরা পেয়েছি।

ইবন বতুতার পরিচয়

সফরনামা

ফিরুজ বিন্ রজব

মহম্মদ তুঘ্‌লকের মৃত্যুর পরে সামান্য একটু গোলযোগের পর তাঁর পিতৃব্যপুত্র ফিরুজ বিন্ রজব (১৩৫১-৮৮) সিংহাসন আরোহণ করেন।

শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়বান কিন্তু ধর্মান্ধ ও দুর্বল

শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়বান হলেও ফিরুজ তুঘ্‌লককে দুর্বল, ধর্মান্ধ সুলতান মনে করা অনুচিত হবে না। দিল্লীর সুলতানশাহীর দিন যে ঘনিয়ে আসছিল, তার লক্ষণ ফিরুজের রাজ্যকালে স্পষ্ট হতে থাকে, কিন্তু সেই অধোগমন রোধ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন ও নগরকোট অধিকার তিনি করেছিলেন, কিন্তু বাংলা যখন প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীর আনুগত্য বর্জন করল তখন তিনি বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও তা নিবারণ করতে পারেন নি। তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে তাই বাংলা ছাড়া জৌনপুর, মালব, গুজরাট একে একে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৩৫৪ সালে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের সঙ্গে সন্ধি করে বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করার পর ফিরবার সময় উড়িষ্যা আক্রমণ করে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে হানা দিয়ে বিগ্রহ দিল্লী নিয়ে যান, হিন্দুর ধর্মাবেগকে প্রচণ্ড আঘাত দেন। নিজে ন্যায়বান হয়েও হিন্দুর ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি, ব্রাহ্মণদের উপর তিনিই প্রথমে "জিজিয়া" কর চাপিয়ে দেন। নিজে সুন্নি ছিলেন, তাই শিয়া মুসলমানরাও ফিরুজের হাতে সুবিচার পান নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে ফিরুজের আদেশে তিনশত সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদ করা হয়েছিল।

বিদ্রোহ দমন

বাংলার স্বাধীনতার স্বীকৃতি

হিন্দু ধর্মাবেগকে রূঢ় আঘাত

জিজিয়া প্রবর্তন

সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ

রাজস্ব, শাসন ও বিচার বিভাগের সংস্কার

মোটের উপর ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে অনুদার হলেও রাজস্ব, শাসন ও বিচার বিভাগে কিছু উন্নতি সাধন তিনি করেছিলেন। তাঁর রাজ্যকালে অনেক অসঙ্গত শুল্ক ও কর নিষিদ্ধ হয়েছিল, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদনের মতো দণ্ডবিধির কয়েকটি নিষ্ঠুর ধারা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি অনেকগুলি খাল কেটে দেন। পূর্তকার্যে তাঁর অবদান লক্ষ্য করে কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন যে শের শাহের পূর্বে আর কোন মুসলিম নরপতি ফিরুজের মতো আগ্রহ নিয়ে জনহিতকর প্রচেষ্টায় রত হন নি। যমুনা এবং ঘর্ঘরা নদীর বাঁধ নির্মাণ করে তিনি যে কাজের সূত্রপাত করেন, পঞ্জাবের পূর্তবিন্যাসে তার পরিণতি ভবিষ্যতে দেখা দিয়েছে। রাজধানীর পরিধি তিনি আরও বিস্তৃত করেছিলেন; তাঁর আত্মজীবনীতে হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং বহু মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বহু বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে জনকল্যাণের প্রয়াস তিনি

পূর্তকার্য

কল্যাণ-প্রয়াস্

করেছিলেন ; গোঁড়া সুন্নি মুসলমান হিসাবে তিনি অসংখ্য মাদ্রাসা স্থাপন করেন। অনেকগুলি শহর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, এদের মধ্যে আছে জৌনপুর, হিস্‌সার, ফিরুজপুর, ফিরুজাবাদ প্রভৃতি। বহু উদ্যান তিনি রচনা করিয়েছিলেন। দুটি অশোকস্তম্ভ তিনি কিভাবে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেন, তার বেশ চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়।

চরিত্র-বিচার

আদর্শ মুসলিম নরপতি বলে তাঁর প্রশংসা আছে আফিফ, বরানী, আজিজ্‌-উল্‌-মুল্‌ক্‌ প্রভৃতি ঐতিহাসিকের লেখায়। কিন্তু সামরিক নেতা-রূপে তিনি ব্যর্থতাই দেখিয়েছেন। শাসন-ব্যবস্থাতেও সাময়িক উন্নতি কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটলেও মোটের উপর তখন অবনতি দেখা দেয়। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই সাম্রাজ্যের নানা স্থানে অব্যবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তাঁর বিশেষ ছিল না ; অপাত্রে দয়া করার অভ্যাস তাঁর ছিল ; জায়গির প্রথার ভিত্তিতে সামরিক সংগঠনের ফলে শাসন-ব্যবস্থার অধঃপতন নিশ্চিত হয়েছিল ; তাঁর রাজ্যকালে ক্রীতদাসদের সংখ্যা অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পায় এবং তা থেকে সামাজিক অবনতিই সূচিত হয়েছিল। অবশ্য নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান হিসাবে হিন্দুদের প্রতি তাঁর যে মনোভাব দেখা গিয়েছিল, তাকে প্রশংসা করা কঠিন। কিন্তু জনহিতকর বহু কার্যের পত্তন করেছিলেন বলে ফিরুজ তুঘ্‌লক স্মরণীয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা ধর্মগত কারণে হয়তো অতিরিক্ত স্তুতি তাঁর সম্পর্কে করেছেন। কিন্তু তাদের অতিশয়োক্তিগুলি বাদ দিয়ে মনে হয় যে নানাদিক থেকে প্রজাহিতৈষী সুলতান হিসাবে তিনি প্রকৃতই প্রশংসার পাত্র। প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য তাঁর নেই, কর্মশক্তির প্রাচুর্যেও তিনি বিশিষ্ট নন। কিন্তু মোটের উপর তৎকালীন পরিস্থিতিতে ধর্মান্ধ হলেও তাঁকে অশ্রদ্ধেয় মনে করা উচিত হবে না।

সামরিক নেতা হিসাবে ব্যর্থতা

জায়গির প্রথার কুফল

ক্রীতদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি

প্রজাহিতৈষী সুলতান

চারিদিকে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ

ফিরুজের রাজ্যকালেই দেখা গিয়েছিল যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে শৈথিল্য এসে গেছে, বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থান দেখা দিচ্ছে। ফিরুজের মৃত্যুর পর যে কয়জন তুঘ্‌লক রাজা মসনদে বসেন, তাঁরা ছিলেন অপদার্থ ও অক্ষম, দুর্ভোগেরও তাঁদের অন্ত ছিল না, কারাগারে কিংবা অপঘাতে মৃত্যুই ছিল তাঁদের নির্দিষ্ট নিয়তি। রাজ্য-পরিচালনার ভার সুলতানের হাতে না থেকে চলে গিয়েছিল কোন কোন অমাত্যের কবলে। স্বার্থান্বেষী নেতৃত্বে রাজ্যের সর্বনাশ এগিয়ে এল ; চতুর্দিকে বিবাদ-বিসংবাদ, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ চলতে থাকল, জৌনপুর, মালয়, খান্দেশ, গুজরাটে স্পর্ধিত স্বাধীন রাজ্য দিল্লীকে যেন ব্যঙ্গ করল। সুলতানশাহীর পতন যখন আভ্যন্তরীণ দুর্বিপাকের চাপে প্রায়

চরমবিশৃঙ্খলা

বিভিন্ন প্রাদেশিক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব

তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণ

আসন্ন, তখন বজ্রাঘাতের মতো ভারতের বুকে পড়ল তৈমুর লঙ্গের আক্রমণ। শেষ তুঘ্‌লক স্থলতান নাসিরউদ্দীন মাহ্‌মুদ যখন প্রতিদ্বন্দ্বী নসরৎ শাহ্‌-এর হত্যা সাধন করে মসনদে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, তখন এই আক্রমণ ঘটল।

তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণ

তৈমুর লঙ্গের পরিচয়

সাম্রাজ্য বিস্তার

কথিত আছে যে পায়ে খোঁড়া বলে তৈমুরের নাম হয় তৈমুর "লঙ্গ"। আনুমানিক ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ায় বিখ্যাত সমরকন্দ শহরে তাঁর জন্ম হয় ; তেত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি হন সমরকন্দের আমীর। চঘ্‌তাই তুর্কদের নায়ক হয়ে পারস্য, আফগানিস্তান ও পশ্চিম এশিয়ার বহুস্থান অধিকার করে তিনি হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন। চেঙ্গিজ খানের মতো দিগ্বিজয়ী হয়ে বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্বন্ধে অজুহাতের কোন দরকার ছিল না, কিন্তু গোঁড়া মুসলমান হিসাবে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তুর্কী স্থলতানেরা এদেশে এসে হিন্দুধর্মের ছোঁয়াচে সত্য ধর্ম ইসলামকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেন নি বলে শাস্তি বিধান হল তাঁর উদ্দেশ্য। এতে একটু আশ্চর্য লাগে, কারণ হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে তুর্কী স্থলতানদের মায়া-মমতা কিছু ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এরকম অজুহাত যে তৈমুরের কাছ থেকে শোনা গেল, নিশ্চয়ই তা একেবারে অহেতুক হতে পারে না। বিদেশী বিধর্মীকে আত্মস্থ করার যে প্রতিভা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বার বার লক্ষ্য করা গেছে, মুসলিম সভ্যতা ও জীবনধারার প্রখর স্বাতন্ত্র্য ও তেজস্বিতা সত্ত্বেও হয়তো ভারতবর্ষের সমন্বয়-প্রতিভা তাকে কিয়ৎপরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। প্রচণ্ড গোঁড়া মুসলমানের কাছে হয়তো তার লক্ষণমাত্র মারাত্মক মনে হয়েছে। সন্দেহ নেই যে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতিধারা সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও স্থলতানী যুগে সমন্বয়ের পথে কতকটা অগ্রসর হয়েছিল, তা না হলে সে যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির যে ছবি আমরা পাই তা সম্ভব হত না। তৈমুর ভারত আক্রমণের যে অজুহাত দিয়েছেন, অদ্ভুত ঠেকলেও তাকে উড়িয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

ভারত আক্রমণের অজুহাত

অজুহাতের অন্তর্নিহিত সত্য

সমন্বয়ের পথে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি

১৩৯৮ সালে তৈমুরের পৌত্র পীর মহম্মদ একদল যোদ্ধা নিয়ে মুলতান দখল করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তৈমুর স্বয়ং এদেশে হাজির হলেন। সিন্ধু, ঝিলাম ও রাভি নদী তিনি বিপুল বাহিনী নিয়ে অতিক্রম করলেন ; দুর্ধর্ষ

দুর্ধর্ষ অভিযান

ও ভয়ঙ্কর এই অভিযানে অগাধ সম্পত্তি লুঠ হল, হাজার হাজার লোককে গোলাম করে দেওয়া হল। অসংখ্য লোকের জীবন নাশ করে তৈমুর উপস্থিত হলেন দিল্লীর উপকণ্ঠে ; শোনা যায় যে বিদ্রোহ করতে পারে এই অজুহাতে এক লক্ষ হিন্দু বন্দীকে তিনি হত্যা করেন, অবিশ্বাস্য নারকীয় কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে হিটলারের ইহুদী-নিধন ইত্যাদি পাশবিক কুকীর্তির কথা আমরা জানি ; তৈমুরের নামোচ্চারণেই ঘৃণা অনুভব করার নৈতিক অধিকার বর্তমান জগতের নেই। তবুও তখনকার ক্রূর হত্যাকাণ্ডের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। পনেরো দিন দিল্লীতে থাকার পর তৈমুর স্বদেশে ফিরে যান ; এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নরমেধযজ্ঞের এই প্রচণ্ড পুরোহিত দিল্লীর অনেক স্থপতিকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন সমরকন্দে জুম্মা মসজিদ নির্মাণের জন্য। মীরাট, কাংড়া, জম্মু প্রভৃতি এলাকা দখল করে খিজির খান সৈয়দকে মুলতানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তৈমুর ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন (১৩৯৯)। দিল্লী আর উত্তর ভারতের একটা বিস্তৃত অঞ্চল তৈমুরের আক্রমণে যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বদাউনীর লেখা থেকে জানা যায় যে, হত্যাকাণ্ড বন্ধ হওয়ার পর এল দুর্ভিক্ষ আর মহামারী ; তৈমুর যাদের মারেন নি, তারাও এবার মরল, শহরে বাতি দেওয়ার কেউ রইল না। "পূর্ণ দুই মাস কাল দিল্লীর আকাশে একটা পাখিকে পর্যন্ত উড়তে দেখা যায় নি।" ১৪০৫ সালে তৈমুর লঙ্গের মৃত্যু হয় ; ইতিহাসে এত বড় অত্যাচারী এবং দুর্দান্ত ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা গিয়েছে। দিল্লীর পতনোন্মুখ সুলতানশাহী এমন আঘাত তখন পেল যে তার পক্ষে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠা সম্ভব হল না।

নিষ্ঠুর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড

তৈমুরের ভারত-ত্যাগ

উপদ্রুত অঞ্চলের শ্মশানীভূত অবস্থা

সুলতানশাহীর উপর চরম আঘাত

তৈমুর আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুলতান মাহ্‌মুদ দিল্লী ছেড়ে গুজরাটে পালিয়ে যান। বিপদ কাটার পর দিল্লীতে ফিরে নামমাত্র কিছুকাল তাঁর রাজ্য চলল। তখনকার রেওয়াজ অনুসারে মল্লু ইক্‌বাল খান নামে এক আমীরের হাতেই যা কিছু ক্ষমতা ছিল। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তুঘ্‌লক বংশের এই শেষ সুলতান মারা যেতে মুলতানে তৈমুর যাঁকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান, সেই খিজির খান সৈয়দ দিল্লী দখল করলেন।

তুঘ্‌লক বংশের পতন

সৈয়দ বংশ

সৈয়দ বংশের মেয়াদ হল ১৪১৪ থেকে ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। হজরত মহম্মদের বংশধর বলে দাবি করতেন বলে খিজির খান এবং তাঁর পরিবারের

সকলে ছিলেন সৈয়দ ; অবশ্য এ দাবি সত্য কিনা, বলা কঠিন। খিজির নিজে বোধ হয় কখনও স্থলতান বা ঐরকম কোন গৌরব দাবি করেন নি ; তৈমুরের ছেলে শাহ্ রুখ্‌কে তিনি উপঢৌকন পাঠিয়ে আনুগত্য জ্ঞাপন করতেন বলে কথিত আছে। মানুষ হিসাবে খিজির খানের কিছু গুণ ছিল, কিন্তু দিল্লীর বাইরে বেশী দূর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয় নি। মুবারক (১৪২১-৩৪), মহম্মদ (১৪৩৪-৪৫), আলাউদ্দীন (১৪৪৫-৫১), এই তিন জনকে নিয়ে সৈয়দ বংশ ; মুবারক ছাড়া বাকি উভয়ই ছিলেন অপদার্থ ও অকর্মণ্য। আফগান জাতির লোদী উপদল-সম্ভূত বহ্‌লুল খান লোদীর হাতে আলাউদ্দীন আত্মসমর্পণ করে বদাউনে চলে গেলেন। এই সৈয়দ বংশের সম্পর্কে অকিঞ্চিৎকর কিছু যে তথ্য পাওয়া যায়, তার প্রধান সূত্র হল এহিয়া-বিন্-আহ্‌মদ (বা সরহিন্দি) লিখিত "তারিখ-ঈ-মুবারক-শাহী" গ্রন্থ।

লোদী বংশ

দিল্লীর প্রথম আফগান স্থলতান

বহ্‌লুল খান লোদী হলেন দিল্লীর প্রথম আফগান (বা পাঠান) স্থলতান। লক্ষ্য করার বিষয় যে পূর্বগামীদের চেয়ে এই লোদী বংশের সাহস, বিবেচনা ও কর্মক্ষমতা বেশী বই কম ছিল না। কিন্তু অধঃপতন তখন এতদূর অগ্রসর যে তাকে রোধ করা কারও পক্ষে সম্ভব হল না।

বহ্‌লুল লোদীর কৃতিত্ব ও গুণাবলী

বহ্‌লুল লোদী সামান্য অবস্থা থেকে নিজের গুণে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। দিল্লী-স্থলতানশাহীর নষ্ট শক্তি ও মর্যাদা কিয়ৎ পরিমাণে তিনি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। আফগান অভিজাতদের হিংসা-দ্বেষ তাঁকে ক্রমাগত বাধা দিয়েছিল। তবু জৌনপুরের মহম্মদ শাহ্‌কে পরাজিত করার কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন। দয়া-দাক্ষিণ্য, বিদ্যোৎসাহিতা, শাসন-নৈপুণ্য ইত্যাদি গুণ তাঁর ছিল। ১৪৮৯ সালে গোয়ালিয়র জয় করে প্রত্যাবর্তনকালে পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭) বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে বিখ্যাত ; তিনি ছিলেন বহ্‌লুলের দ্বিতীয় পুত্র। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। বিহার, বিশেষত উত্তর বিহারে তিরহুত অঞ্চল জয় করে রাজ্যের বিস্তৃতি তিনি বাড়িয়েছিলেন ; বাংলার স্থলতান হুসেন শাহ্-এর সঙ্গে সন্ধি হয়, উভয়ে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। জায়গিদারদের কিছুটা

কৃতী শাসক

রাজ্য বিস্তার

জায়গীরদার নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রিত করে আফগান অভিজাতদের ঔদ্ধত্যকে তিনি দমন করতে পেরেছিলেন। প্রজাদের অর্থনৈতিক কল্যাণের দিকে তাঁর মনোযোগ ছিল; বহু গুপ্তচর মারফত রাজ্যের সব এলাকার খবর তিনি পেতেন। ন্যায়পরায়ণ, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ, অথচ পরাক্রমশালী শাসক বলে তাঁর প্রসিদ্ধি হয়; জৌনপুর থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁর শক্তি স্বীকৃত হয়েছিল। সিকন্দর হলেন আগ্রা শহরের প্রতিষ্ঠাতা; শীঘ্রই এই আগ্রা শহর হিসাবে খাস দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। নানা গুণ থাকলেও সিকন্দর হিন্দুদের সম্বন্ধে অনুদার নীতি অনুসরণ করতেন; তাঁরই হুকুমে মথুরার বহু মন্দির ধ্বংস করা হয়, হিন্দুরা নানাভাবে লাঞ্ছিত হত।

কল্যাণকামী ক্ষমতাশালী দয়ালু সুলতান

আগ্রা শহর প্রতিষ্ঠা

হিন্দু সম্পর্কে অনুদার নীতি

সিকন্দরের মৃত্যুর পর মসনদে বসেন পুত্র ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬)। অকর্মণ্য ইব্রাহিম একেবারেই ছিলেন না, কিন্তু বিচার-বিবেচনা কিংবা দূরদৃষ্টি বলে কোন গুণ তাঁর ছিল না। আফগান অভিজাতদের সম্পর্কে কোন বিশেষ পক্ষপাত বা আনুকূল্য না দেখাতে তারা সবাই মিলে সারা রাজ্যে অসন্তোষের বিষ ছড়িয়ে দিল। দরিয়া খান লোহানীকে সামনে রেখে বিহার দিল্লীর আধিপত্য নাকচ করে দিয়েছিল। লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদীর এক ছেলের সঙ্গে সুলতান দুর্ব্যবহার করায় গণ্ডগোল বাড়ল। দৌলত খান এবং আলম খান (ইব্রাহিমের খুল্লতাত) কাবুলের আমীর, ইতিহাসের মঞ্চে সদ্য উদীয়মান বাবর-এর কাছে সাহায্য চাইলেন ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। বিহারের দরিয়া খান লোহানী এই আমন্ত্রণে যোগ দিলেন। বাবর ছিলেন তৈমুর শাহের বংশধর; চেঙ্গিজ খানও তাঁর একজন পূর্বপুরুষ। তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একেবারে আকাশস্পর্শী। সাগ্রহে দৌলত খান প্রভৃতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। পানিপথের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ও মৃত্যু হল (১৫২৬)। তুর্ক-আফগান সুলতানশাহীর অবসান এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবযুগের পত্তন ঘটল।

ইব্রাহিম লোদী

আফগান অভিজাতদের মধ্যে বিক্ষোভ

ইব্রাহিমকে অপসারণের চেষ্টা

বাবরের পরিচয়

পানিপথের যুদ্ধ

সুলতানশাহীর অবসান

তুর্ক-আফগান শাসন বিলুপ্তির কারণ

তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের পতন এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা; প্রকৃতপক্ষে তুঘ্‌লক বংশের শক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই পতন অনিবার্য

হয়ে উঠেছিল। সৈয়দ ও লোদী বংশের শাসন তাকে সামান্যই বিলম্বিত করতে পেরেছিল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় যে কদাচ কোন সুলতান জনহিতকর কোন প্রয়াসে নামলেও, প্রকৃতপক্ষে সুলতান-শাহী নিছক সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রজাসাধারণের রাজ্য সম্পর্কে কোন অনুরাগ বা আসক্তি ঘটবার তেমন কোন কারণ দেখা যায় নি ; শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর যে ব্যবধান ছিল, তাকে কোনভাবে অপসৃত করার কোন উদ্যম লক্ষ্য করা যায় নি। জায়গিরদারী প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক প্রথা তখন এমনই বলবৎ ছিল যে অভিজাত বংশীয়েরা সুযোগ পেলেই রাজশক্তিকে বিড়ম্বিত করত, রাষ্ট্রের ঐক্য বা শক্তি সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, নিজেরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। এর ফলে রাজশক্তি কখনও কেন্দ্রীভূত ও আত্মনির্ভর হতে পারে নি ; আমীর-ওমরাহের দল আর প্রভাবশালী রাজপুরুষেরা রাজাকে ভাঙতে বা গড়তে পেরেছে। মহম্মদ তুঘ্‌লকের মতো সুলতানের রাজত্বের শেষ দিকেও তাই দেখা যায় যে বাংলা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি এলাকায় দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকৃত হচ্ছে।

সমর-শক্তি-নির্ভর শাসন

প্রজার অনুরক্তির অভাব

জায়গিরদারী প্রথা ও অভিজাতদের অত্যধিক ক্ষমতা

অভিজাত বংশীয়দের মধ্যে বিলাসব্যসনের আতিশয্য ও নৈতিক অধঃপতন ক্রমশ পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। সাধারণত সুলতানরাও সমান-অপরাধী ছিলেন। আলাউদ্দীন খল্‌জী বিলাসব্যসন নিষিদ্ধ করেন, কিন্তু শুধু সরকারী হুকুমে সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। ফিরুজ তুঘ্‌লকের মতো সুলতান জায়গীরপ্রথা ও দাসপ্রথার পরিপোষক হওয়ায় শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট হতে থাকল। রাজ্যের ঐক্য ও ক্ষমতা এবং সমাজের সংহতি নিশ্চিত করার কোন প্রকৃত প্রচেষ্টা আর হল না। মধ্যযুগীয় সামন্ত-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিকেন্দ্রিত রাজ্য বিখণ্ডিত হতে লাগল।

বিলাসব্যসনের আধিক্য ও নৈতিক অধঃ-পতন

সামন্ত-ব্যবস্থার ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা

সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা স্মরণীয়, যেমন আলাউদ্দীন খল্‌জী ও মহম্মদ তুঘ্‌লক, তাঁদের ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে, কঠোর শাসন কিংবা কাণ্ডজ্ঞানহীন পরিবর্তন সাধনে দেশবাসীর রাজ্য সম্বন্ধে অনুরাগ দূরে থাক, বিরাগ এসে উপস্থিত হল। মহম্মদ তুঘ্‌লকের সময় সুলতানশাহী বহু উচ্চে আরোহণ করে আবার দ্রুতগতিতে অধঃপতনের দিকে গেল। ফিরুজ তুঘ্‌লকের পর তেমন উল্লেখযোগ্য সুলতান আর দেখা যায় নি ; লোদী বংশ কিছু পরিমাণে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল বটে, কিন্তু তখন নানা

সুলতানদের কঠোর ও অবিবেচনা-প্রসূত নীতির ফলে দ্রুত অধঃপতন

কারণে অধঃপতন এতদূর চলে গেছে যে তাকে ঠেকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

প্রজাসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয় নি, আর অভিজাতদের সঙ্গে রাজশক্তির একপ্রকার সঙ্ঘর্ষই ঘটতে থেকেছে। ফলে সামরিক শক্তিবলে যুদ্ধজয় মাঝে মাঝে রাজ্যের ভাগ্যকে উজ্জ্বল করে তুললেও মৌলিক কোন সমস্যা, বে-সামরিক শাসন-সম্পর্কিত কোন সমস্যারই প্রকৃত সমাধান সম্ভব হয় নি। স্থলতানদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে কিছু ভালো কাজ করেছেন, কিন্তু স্থলতানশাহী প্রজাদের সক্রিয় সমর্থনের জোরে লৌহদৃঢ় হতে পারে নি। আলাউদ্দীন ও মহম্মদ তুঘ্‌লক ছাড়া আর কোন স্থলতান ধর্ম থেকে রাজ্যশাসন-নীতিকে পৃথক করে দেখতে পারেন নি। এতে ক্রমাগত ক্ষতি হয়েছে, রাজ্যের বনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অভিজাত বনাম রাজশক্তি সঙ্ঘর্ষ

প্রজা সাধারণের সক্রিয় সমর্থনের অভাব

ঘন ঘন মোঙ্গল আক্রমণে তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের সমরশক্তি হ্রাস পেতে থাকে; হয়তো বলা যায় যে মোঙ্গলদের সম্বন্ধে স্থলতানদের কোন নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম অনুস্থত হয় নি। তৈমুরের আক্রমণে এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র এমন আঘাত পেল যে, তার ধাক্কা সামলে ওঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আবার হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষোভ ক্রমশ হিন্দু রাজশক্তির পুনরুত্থানে সাহায্য করল; ফিরুজ তুঘ্‌লক, সিকন্দর লোদী প্রভৃতি স্থলতানের হিন্দু পীড়ন-নীতিতে স্থলতানশাহীরই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হল। উত্তর ভারতে রাজপুত রাজারা আর দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর হল এই পুনরভ্যুত্থানের নায়ক। সম্পূর্ণ নির্বান্ধব অবস্থায় লোদী বংশকে বাবরের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হল। প্রতিরোধ-প্রচেষ্টায় স্থলতান-শাহীর ব্যর্থতা নানা কারণ-সম্পাতে তখন যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। পানিপথের যুদ্ধের প্রাক্কালে এমনই পরিস্থিতি ছিল যে, তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের পতনে এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জনও কেউ করল না; ইতিহাসের বিচারে ইতিপূর্বেই যা বাতিল হয়ে গিয়েছিল, অস্ত্রবলে বাবর তাকেই অপস্থত করে দিলেন।

মোঙ্গল আক্রমণ

তৈমুরের আক্রমণ

হিন্দুরাজশক্তির পুনরভ্যুত্থান-প্রয়াস

সর্বজন পরিত্যক্ত নির্বান্ধব স্থলতান

॥ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

বঙ্গ, বহমনি, বিজয়নগর ও অন্যান্য রাজ্য

তুঘ্‌লক শাসনের শেষ দিক থেকে যখন দিল্লীতে তুর্কী রাজ্য ক্রমশ হীনবল হতে লাগল, তখন থেকে দিল্লীর চেয়ে বাংলা, জৌনপুর, গুজরাট, মালব প্রভৃতি এলাকার দিকে নজর না দিলে সে যুগের শাসন ও সভ্যতার সম্যক পরিচয় মিলবে না। দিল্লীর সুলতানশাহীতে কর্তৃত্ব ছিল তুর্কী আমীরদের হাতে, হয়তো বা কখনও সীমান্তের বাইরে থেকে আফগান বা অন্য কোন গোষ্ঠী হাজির হচ্ছিল। বাংলায়, জৌনপুরে, গুজরাটে আর কতকটা মালবেও তখন এদেশের স্বকীয় ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সুলতানী শাসনের আলাদা চেহারা দেখা দিল, মুঘলযুগে এই সমন্বয়-প্রবণতারই আরও স্পষ্ট প্রকাশ প্রতিভাত হয়েছিল। দিল্লীর দখল যখন রাজধানীর বাইরে একটা সঙ্কীর্ণ এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তখন ভারতবর্ষে ইসলামের মহিমা লক্ষ্য করতে হলে দিল্লীর বদলে আহ্‌মদাবাদ, মণ্ডু, জৌনপুর, লখ্‌নাওতী প্রভৃতি শহরের দিকে তাকানো দরকার ছিল। উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে সুলতানশাহীর যুগে যে সব রাজ্য দেখা যায়, তাদের সম্পর্কে কিছু খবর না রাখলে তখনকার ইতিহাসের প্রকৃত পরিচয় অজানা থেকে যাবে।

রাজধানী দিল্লীতে বিদেশী প্রভাব

রাজধানী-বহির্ভূত অঞ্চলে সুলতানী শাসনের প্রকৃত রূপ

জৌনপুর

তুর্ক-আফগান আমলে যে সব রাজ্য দিল্লীকে অগ্রাহ্য করে ক্রমে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল উত্তর ভারতে বাংলা এবং দাক্ষিণাত্যে বহমনি ও বিজয়নগর রাজ্য। আরও কয়েকটি রাজ্যের কথাও বলা দরকার। মহম্মদ তুঘ্‌লকের জীবদ্দশাতেই জৌনপুরে মালিক সর্‌ওয়ার প্রায় স্বাধীনভাবে শর্‌কী বংশের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৯৪)। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ইব্রাহিম ১৪০২ সালে মসনদে বসেন, জৌনপুরকে মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট কেন্দ্র করে তোলেন। জৌনপুরের স্থাপত্যে এক অভিনব ধারা লক্ষ্য করা যায়; বিখ্যাত "অতাল" মসজিদ ও অন্যান্য সৌধ, তোরণ ইত্যাদি নির্মাণে মুসলিম পরিকল্পনা এবং

মালিক সর্‌ওয়ার

ইব্রাহিম

স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য

হিন্দু স্থাপত্য-পরম্পরার এক সুন্দর সমন্বয় সেখানে ঘটেছিল। মুঘল যুগের পূর্বে স্থাপত্যে মুসলিম ও হিন্দু ধারার সংমিশ্রণ যেমন সুসমঞ্জসরূপে দেখা যায়, তেমন আর কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। তৈমুরের আক্রমণের পর থেকে মুসলিম বিদ্বান ও শিল্পীসাহিত্যিকের দল দিল্লী থেকে জৌনপুরে বসবাস আরম্ভ করায় সেখানে প্রকৃতই এক সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়ে ওঠে। বহ্‌লুল লোদীর আমলে জৌনপুর আবার দিল্লীর অধিকারভুক্ত হয়, কিন্তু জৌনপুর ইতিমধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা অর্জন করেছিল, তা মনে করে রাখা দরকার।

সংস্কৃতিকেন্দ্র

দিল্লীর অধিকার-ভুক্তি

কাশ্মীর

ভারতবর্ষের সুদূর উত্তরে "ভূস্বর্গ" বলে খ্যাত কাশ্মীর রাজ্যে আনুমানিক ১৩৪৫ সালে শাহ্‌ মির্জা নামে একজন রাজকর্মচারী সেখানকার হিন্দু রাজার মৃত্যুর পর বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করে শামস্‌উদ্দীন শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে মসনদে বসেন সিকন্দর শাহ্‌; শোনা যায় তিনি প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, এবং তাঁরই আমলে কাশ্মীরের হিন্দুদের বহুলাংশ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। ধর্ম-বিষয়ে রাজার মনোভাব নিশ্চয়ই এ ঘটনাকে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত যে, কাশ্মীর এবং বাংলার মতো যে সমস্ত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার পূর্বে হয়েছিল, যেখানে পৌরাণিক হিন্দু সমাজের কঠোর শাসনে নিম্নস্তরের বহু লোক জাতির গণ্ডীর বহির্ভূত হতে বাধ্য থাকত, সেখানেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা ব্যাপকভাবে ঘটে, অথচ উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে একেবারে নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান শাসন সত্বেও মুসলমানের সংখ্যা অল্প। যাই হোক, সিকন্দর শাহের কিছু পরে কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি জৈন্‌-উল্‌-আবেদিন সিংহাসনে বসেন (১৪২০-৭০)। এমন উদারচেতার সাক্ষাৎ ইতিহাসে বেশী মেলে না; "কাশ্মীরের আকবর" বলে তাই তিনি খ্যাত হয়ে আছেন। প্রজাহিতৈষণা, পরধর্ম সম্বন্ধে আন্তরিক সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির জন্য আগ্রহ তাঁকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে রেখেছে। বহু ব্রাহ্মণকে তিনি আশ্বাস দিয়ে কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনেন; "মহাভারত" ও "রাজতরঙ্গিণী" ফারসী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা তিনি করে দেন, আরবী ও ফারসী বহু গ্রন্থ হিন্দীতে তরজমা করান; সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত তাঁর আনুকূল্যে অগ্রগতির পথে চলে। মুদ্রানীতির

শামস্‌উদ্দীন শাহ্‌

সিকন্দর শাহ্‌

বাংলা ও কাশ্মীরে মুসলিম-দীক্ষিতের সংখ্যাধিক্যের কারণ

জৈন্‌-উল্‌-আবেদিন: কাশ্মীরের আকবর

কৃতিত্ব

উন্নতিবিধান করে, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে, হিন্দুদের উপর থেকে "জিজিয়া" ও অনুরূপ কর উঠিয়ে নিয়ে, গ্রামের শাসনভার পল্লীসমাজের উপর দিয়ে, রাজপথে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তিনি পরম কৃতিত্ব ও সুবিবেচনা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর

কাশ্মীরের মুঘল সাম্রাজ্য-ভুক্তি

পরবর্তী রাজারা ছিল অকর্মণ্য। ১৫৪০ সালে মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনের আত্মীয় মির্জা হায়দর কাশ্মীর জয় করেন, কিন্তু চূড়ান্তভাবে কাশ্মীর ১৫৮৯ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়।

মালব

আলাউদ্দীন খল্‌জী মালব রাজ্য অধিকার করেন, কিন্তু প্রায় একশত

স্বাধীনতা ঘোষণা

বৎসর পরে (১৪০১) সেখানকার আফগান শাসনকর্তা নিজেকে স্বাধীন

হুসাং শাহ্‌

বলে ঘোষণা করেন। এর পর হুসাং শাহ্‌ রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন, বিখ্যাত হিন্দু রাজা ভোজদেব মণ্ডুতে যে শহর নির্মাণ করেন সেখানে

মণ্ডুর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য

রাজধানী নিয়ে যান, মণ্ডুর স্থাপত্যশিল্পে তখন মুসলিম ও হিন্দু ধারার চমৎকার সংমিশ্রণ দেখা যায়। হুসাং শাহের পুত্র গজনী খান-এর মন্ত্রী মাহ্‌মুদ খান খল্‌জী রাজ্য অধিকার করে দিল্লীর দিকে এগিয়ে যান, ব্যর্থ হয়ে মেবারের রাণা কুম্ভ এবং বহমনি রাজ্যের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হন।

মাহ্‌মুদ খান

মালবের মুসলমান রাজাদের মধ্যে মাহ্‌মুদ সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত ; হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর প্রজারা স্বস্তিতে বাস করত, দ্বিতীয় মাহ্‌মুদের

মেদিনীরাও

প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মেদিনীরাও নামে এক হিন্দু। মেবার এবং গুজরাটের হাতে মালব রাজ্যকে পরাজিত হতে হয়েছিল ; তবে ১৫৬১ সালে আকবর

মুঘল সাম্রাজ্য-ভুক্তি

স্থায়িভাবে মালবকে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে নেন। হুমায়ুন ও শের শাহ্‌ অল্পকালের জন্য মালব জয় করেছিলেন, কিন্তু আকবরের বিজয় হল চূড়ান্ত ঘটনা।

গুজরাট

গুজরাটকে আলাউদ্দীন খল্‌জী ১২৯৭ সালে রাজ্যভুক্ত করে নিয়ে-

সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ

ছিলেন। এখানেও প্রায় একশো বৎসর পরে প্রাদেশিক শাসনকর্তা জাফর খান সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ নাম নিয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন

আহ্‌মদ শাহ্‌ ও আহ্‌মদাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠা

(১৪০১)। তাঁর পৌত্র আহ্‌মদ শাহ্‌ (১৪১১-৪২) হলেন আহ্‌মদাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা। গুজরাটের অনেকগুলি বন্দর ছিল বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির বাহন ; রাজ্যে প্রচুর অর্থাগম হত, তারই একাংশ ব্যয় করে আহ্‌মদাবাদের

মতো শহর বহু সুন্দর সৌধে শোভিত হল। এই রাজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুলতান হলেন আহ্‌মদ শাহের পৌত্র আবুল ফতে খান, মাহ্‌মুদ বেগরহা নামে যিনি পরিচিত হয়েছিলেন। এঁর নৌবাহিনী বেশ শক্তিশালী ছিল ; ১৫০৮ সালে মিশরের সঙ্গে মিলে বোম্বাইয়ের কাছে এক জলযুদ্ধে গুজরাট নৌবাহিনী পর্তুগীজদের পরাজিত করে, কিন্তু দেখা গেল যে, পর বৎসর পর্তুগীজরা আবার নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়ে সুলতানের কাছ থেকে দিউ (Diu) নামক স্থানে কুঠি স্থাপনের অধিকার আদায় করল। গুজরাট আর মালব এই দুই মুসলমান রাজ্য যাতে একত্র না হতে পারে সেদিকে মেবার রাজ্যের বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাই মেবার আর গুজরাটে প্রায়ই যুদ্ধ হত ; আবু পাহাড়ে অচলগড় দুর্গ পর্যন্ত ছিল মেবারের প্রতিপত্তি। ১৫৩৪ সালে গুজরাটের বাহাদুর শাহ্‌ চিতোর দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন। এই বাহাদুর শাহ্‌ হলেন গুজরাটের শেষ স্বাধীন সুলতান ; হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর বারবার যুদ্ধ হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৫৭২ সালে গুজরাট আকবর বাদশাহের সাম্রাজ্যের অংশীভূত হয়ে যায়।

আবুল ফতে খান

পর্তুগীজদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ

মেবার-গুজরাট দ্বন্দ্ব

শেষ স্বাধীন সুলতান বাহাদুর শাহ্‌

উড়িষ্যা

ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলে উড়িষ্যা রাজ্যকে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত এক পরাক্রান্ত রাজ্যে পরিণত করেন (১০৭৬-১১৪৮)। সম্ভবত পুরীর জগন্নাথ মন্দির তাঁর রাজ্যকালে নির্মিত হয়েছিল। মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে এই রাজবংশ দীর্ঘকাল স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হয়েছিল। শক্তিশালী রাজা নরসিংহ (১২৩৮-৬৪) কোনারকের অপূর্ব সূর্যমন্দিরের নির্মাতা বলে খ্যাত হয়ে রয়েছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কপিলেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি রাজাসন অধিকার করে উড়িষ্যার রাজ্যসীমা কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন বলে কথিত আছে ; এটা কতদূর সত্য, বলা কঠিন। দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সঙ্গে উড়িষ্যার সঙ্ঘর্ষ প্রায়ই ঘটতে থাকে। বিজয়নগর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০) রাজ্যের দক্ষিণাংশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রতাপরুদ্রের শাসনকালে শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যায় যান ; বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম প্রচারের ফলে উড়িষ্যায় প্রাক্তন সামরিক শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া অযৌক্তিক মনে

অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ

পুরীর মন্দির নির্মাণ

কোনারকের সূর্যমন্দির

কপিলেন্দ্র

রাজা প্রতাপরুদ্র

উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম

হয়। যাই হোক, ষোড়শ শতাব্দীতে রাজ্যের বহু ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। মুকুন্দ হরিচন্দন নামে এক রাজা (১৫৫৯-৬৮) মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে উড়িষ্যার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার কর্‌রানী সুলতানের পক্ষ থেকে আক্রমণ চালিয়ে উড়িষ্যা দখল করা হয়; কথিত আছে যে, তখন কালাপাহাড় বলে পরিচিত একজন হিন্দু মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুলতানের সেনাপতিরূপে পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করে বিগ্রহকে চূর্ণ করার চেষ্টা করেন।

মুকুন্দ হরিচন্দন

উড়িষ্যায় কালাপাহাড়

মেবার

রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে কীর্তিমান ও শক্তিশালী ছিল মেবার; রাজপুত গরিমার তেজোদৃপ্ত প্রকাশ দেখা যায় মেবারের অসম-সাহসে, শিশোদিয়া রাজবংশের কৃতিত্বে। সপ্তম শতাব্দীতে গুহিলা রাজপুতগোষ্ঠীর নায়ক বাপ্পারাও এই রাজ্যের স্থাপয়িতা বলে কথিত আছে। আরব সেনাপতি মহম্মদ বিন্ কাসিম সপ্তম শতাব্দীতে নাকি মেবারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। আলাউদ্দীন খল্‌জীর ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান চিতোর দুর্গ জয়ে সমর্থ হলেও কিন্তু মেবারের সম্পূর্ণ বশীকরণ সম্ভব হয় নি। প্রসিদ্ধ রাণা হামীর চিতোর পুনরুদ্ধার করেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যু (১৩৮২) থেকে ১৪৪০ সালে রাণা কুম্ভের সিংহাসন আরোহণ পর্য্যন্ত মেবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল। রাণা কুম্ভ আবার মেবার-গর্বকে সমুন্নত করে ধরলেন; ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে তাঁর প্রতিষ্ঠা সর্বস্বীকৃত। গুজরাট ও মালবের মুসলমান রাজ্যকে তিনি যুদ্ধে পরাভূত করেন; প্রতিবেশী শক্তিরা যাতে মেবার জয়ে অসমর্থ হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন, কুম্ভলগড়কে নিয়ে বত্রিশটি দুর্গ নির্মাণ করে-ছিলেন। আজও চিতোর দুর্গে তাঁর জয়স্তম্ভ সে যুগের রাজপুত স্থাপত্য প্রতিভা এবং রাণা কুম্ভের মহত্ত্বের অপূর্ব নিদর্শনস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন মহৎ একজন ব্যক্তিকে তাঁর পুত্র উদয় হত্যা করে; সুখের বিষয় যে, রাজপুত প্রধানেরা উদয়কে রাজাসনে বসাতে অস্বীকৃত হয়ে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই স্থানে অধিষ্ঠিত করে। রায়মল্লের পুত্র রাণা সঙ্গ বা সংগ্রামসিংহ ১৫০৯ সালে রাজাসনে বসে মেবারের দৃপ্ত ইতিহাসে আবার এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করে দেন। কথিত আছে যে তিনি শতাধিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন; তার চিহ্ন ছিল তাঁর দেহে আশীটি যুদ্ধক্ষতে! দিল্লী,

বাপ্পারাও

চিতোরে মুসল-মান-অধিকারের অস্থায়িত্ব

রাণা কুম্ভ

চিতোরের জয়স্তম্ভ

রাণা সংগ্রাম-সিংহ

মালব, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে বার বার যুদ্ধে তাঁর সাহস ও বীর্যের খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করে মুঘল বাবরকে সংগ্রামসিংহের সঙ্গে লড়তে হয়; খানুয়ার ক্ষেত্রে (১৫২৭) প্রায় পঙ্গু অবস্থাতেও অসমসাহসে যুদ্ধের পর সংগ্রামসিংহের পরাজয় হল। মুঘল প্রাধান্যের যুগে অচিরে রাজপুত গৌরবরবি অস্তমিত হল।

খানুয়ার যুদ্ধে সংগ্রামসিংহের মৃত্যু

বঙ্গদেশ

স্থলতানী আমলে বাংলার ইতিহাসে বেশ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দিল্লী থেকে বহুদূরে অবস্থিত বলে সাম্রাজ্যের একটা অনিশ্চিত অংশ হিসাবেই বাংলা যেন ছিল, প্রায়ই সংবাদ আসত যে বাংলা দিল্লীর কর্তৃত্ব মানতে রাজী নয়। পূর্বে দেখা গিয়েছে যে রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাস্ত করে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে এবং পরে বাংলা দেশের অন্যান্য অংশে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। স্থলতান কুতবউদ্দীন যখন দিল্লীর মসনদে, তখন বাংলা দেশ দিল্লীর আনুগত্য মানত, কিন্তু তারপরই আলী মর্দান নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। ইল্‌তুৎমিস আবার বাংলাকে দিল্লীর অধিকারভুক্ত করে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী নিয়ে গণ্ডগোলের সময় বাংলা বিগড়ে গিয়ে স্বাধীন হয়ে যায়। স্থলতানা রাজিয়ার শাসনকালে বাংলা দিল্লীর আধিপত্য মেনেছিল মনে হয়, কিন্তু বল্‌বন-এর আমলে মোঙ্গল আক্রমণের স্থযোগ নিয়ে বাংলা আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করে, শাসনকর্তা তুঘ্‌রিল খানকে শায়েস্তা করার জন্য দুইবার সৈন্য পাঠিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর স্থলতান বল্‌বন স্বয়ং অভিযানের নায়ক হয়ে যান। স্থলতানের সঙ্গে আর পেরে না উঠে তুঘ্‌রিল খান পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁকে পাকড়াও করে মারা হল। বল্‌বন তখন নিজের ছেলে বুগ্‌রা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গেলেন। কিন্তু বাংলা ঠিক দিল্লীর আজ্ঞাবহ হয়ে রইল না। বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র (অর্থাৎ বুগ্‌রা খান-এর পুত্র) কায়কাবাদ সিংহাসনে বসেন। বুগ্‌রা খান পুত্রের অপদার্থতায় বিরক্ত হয়ে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন, পথে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হয়, পুত্রকে সদুপদেশ দিয়ে বুগ্‌রা খান ফিরে যান, কিন্তু স্থির হয় যে বাংলায় তাঁকে স্বাধীন বলে মানা হবে। আলাউদ্দীন খল্‌জীর মৃত্যুর পর আর কিছুতেই বাংলাকে শায়েস্তা করা সম্ভব নয় বলে মনে হল। শেষকালে গিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লক নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে বাংলাকে

বঙ্গদেশ কর্তৃক পুনঃপুনঃ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার

আলী মর্দান

বিদ্রোহী তুঘ্‌রিল খান

দিল্লী কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতার স্বীকৃতি

আলাউদ্দীনের পর বাংলায় পুনরায় বিক্ষোভ

শাসন-সৌকর্যে বাংলা বিভাগ

তিন ভাগে ভাগ করে দেন—পশ্চিম বাংলায় লক্ষ্মণাবতী, পূর্ব বাংলায় সোনার গাঁ আর দক্ষিণ বাংলায় সাত গাঁ, এই তিন শাসন-কেন্দ্র স্থাপন করে আলাদা শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। রাজনৈতিক গণ্ডগোল কিন্তু সহজে কাটল না, বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই থাকল, প্রায়ই দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকৃত হতে লাগল।

ইলিয়াসশাহী বংশ

বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্

১৩৪৫ সাল নাগাদ দেখা গেল যে তুঘ্‌লক সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরায় বাংলার অনিশ্চিত স্বাধীনতাকে যেন নিশ্চিত করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার সুলতান হয়ে বসলেন (১৩৪৫-৫৭)। পাণ্ডুয়াতে তাঁর রাজধানী ছিল, বাংলা ও বিহারের বহু অঞ্চল তাঁর অধিকারে আসে। উড়িষ্যা, ত্রিহুত প্রভৃতি এলাকা তিনি আক্রমণ করেছিলেন। কাশী পর্যন্ত তাঁর সৈন্যদল অগ্রসর হয়ে যায়। ১৩৫১ সালে ফিরুজ তুঘ্‌লক তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য বহু সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন, বহুদিন অবরোধ করেও একডালা দুর্গ জয় করতে না পেরে ফিরুজ ফিরে গেলেন। মহম্মদ তুঘ্‌লক ও ফিরুজ তুঘ্‌লকের মতো দুই শক্তিশালী সুলতানের বিরুদ্ধে ইলিয়াসশাহের এই সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁর শাসনে হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি ছিল, একত্র মিলে তারা যুদ্ধ করেছিল। সংস্কৃতি এবং বিশেষত স্থাপত্যের বিকাশে তাঁর অবদান ছিল। ইলিয়াস শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতানের মধ্যে একজন প্রকৃত কৃতী ও যশস্বী ব্যক্তি ছিলেন।

শামসুদ্দীনের সমর কৃতিত্ব

সুলতানী অভিযানের ব্যর্থতা

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি

কৃতী সুলতান

সিকন্দর শাহ্

তারপর বাংলার মসনদে বসেন তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ্ (১৩৫৭-৯৩)। ফিরুজ তুঘ্‌লক আবার বাংলাকে দমন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। সুনিপুণ শাসক বলে সিকন্দরের খ্যাতি আছে; পিতার মতো তিনিও স্থাপত্য-শিল্পের সহায়ক ছিলেন, দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছিলেন। পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদ সিকন্দরই নির্মাণ করান। সিকন্দরের দুর্ভাগ্যেরও পরিচয় মেলে যখন দেখা যায় যে পুত্র গিয়াস্‌উদ্দীন বিদ্রোহী হয়ে সোনার গাঁয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করছেন। শেষ পর্যন্ত গিয়াস্‌উদ্দীন পিতাকে যুদ্ধে নিহত করে সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হন (১৩৯৩-১৪১০)। পিতৃহন্তা হয়ে রাজ্য আরম্ভ করলেও গিয়াস্‌উদ্দীন শক্তিশালী শাসক ছিলেন; সুকবি, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ বলেও তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় হত। তৎকালীন

আদিনা মসজিদ নির্মাণ

খ্যাতিমান শাসক

গিয়াস্‌উদ্দীন

জগতে বাংলার মর্যাদার পরিচয় মেলে যখন দেখা যায় যে চীন সাম্রাজ্যে গিয়াস্‌উদ্দীন নিজের দূত প্রেরণ করেছিলেন ; মিং সম্রাট এবং বাংলার স্থলতানরা বহুদিন ধরে এই সম্পর্ক রক্ষা করতেন। মিং রাজবংশের ইতিহাস থেকে চীনা পর্যটক মা-হুয়ান বাংলা দেশ ভ্রমণ করে যা লিখেছিলেন তা পাওয়া গেছে। জনসাধারণের জীবন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান সংবাদ এতে আছে ; বাঙালীর পোশাক, মেয়েদের বেশভূষা, বাংলার বিখ্যাত মসলিন এবং নানা রকম কারুকর্মের প্রভৃত প্রশংসা মা-হুয়ানের লেখায় রয়েছে। চীনা ইতিহাস থেকে তৎকালীন বাংলার আতিথেয়তা ও সমৃদ্ধির কথা জানা যায়, গিয়াস্‌উদ্দীনের পৌত্র শাম্‌স্‌উদ্দীনও চীন দেশে যে দূত পাঠান, তার খবর আছে।

চীনে দূত প্রেরণ

চীনা পর্যটক মা-হুয়ানের বিবরণ

ইলিয়াসশাহী বংশের কয়েকজন স্থলতানের পর দেখা যায় যে আনুমানিক ১৪১৫ সালে ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার কংসনারায়ণ বা গণেশ বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সময় দনুজমর্দন নামে এক হিন্দু রাজা পাণ্ডুয়া থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ; তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। খুব জোর করে এই সমস্ত খবর বলা শক্ত। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করে জালালউদ্দীন নামে রাজত্ব করেন। ইলিয়াসশাহী বংশ ১৪৪২ সালে আবার ক্ষমতা উদ্ধার করে এবং ১৪৮৬ পর্যন্ত রাজত্ব চালায়। নাসিরউদ্দীন, রুকনউদ্দীন প্রভৃতি স্থলতানের আমলে লক্ষ্য করা যায় যে অ্যাবিসীনিয়া থেকে হাবসী ক্রীতদাসেরা রাজসভায় প্রবল হয়ে উঠছে, কিছুকাল তাদের দৌরাত্ম্যে প্রজাসাধারণের দুর্গতির অবধি ছিল না। ১৪৮৬ থেকে ১৪৯৩ সালে বাংলা দেশে হাবসী সিদি বদর-এর রাজত্বও চলেছিল। সেই অরাজকতার সময় স্থবুদ্ধি উদয় হওয়ায় বাংলায় মুসলিম অভিজাতবর্গ সিদি বদর-এর মন্ত্রী আলাউদ্দীন হুসেনকে বাংলার স্থলতান হতে আহ্বান করলেন। হুসেন শাহ্ উপাধি নিয়ে রাজ্য করে (১৪৯৩-১৫১৮) তিনি বাংলার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সূচনা করলেন।

ভাতুড়িয়ার জমিদার কংসনারায়ণ

রাজা দনুজমর্দন

যদু বা জালালউদ্দীন

ইলিয়াসশাহী বংশ পুনরায় ক্ষমতাসীন

হাবসী প্রাধান্য

স্থলতান হুসেন শাহ্

হুসেন শাহ্

হুসেন শাহের রাজ্যকাল বাংলার ইতিহাসে খুবই স্মরণীয়। বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, স্থনিপুণ শাসকরূপে প্রথমেই তিনি হাবসীদের আপদ বিদায় করলেন, প্রাসাদ-রক্ষীরা যাতে রাজার উপর টেক্কা না দিতে পারে তার

হাবসী বিতাড়ন

বন্দোবস্ত করলেন। জৌনপুরে শর্কী সুলতানদের কাছ থেকে বিহারের

রাজ্য বিস্তার

অনেকটা অংশ অধিকার করলেন, উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেন, কিছুকাল ত্রিপুরা ও আসাম তাঁর অধিকারে রইল। উদার ও

গুণী শাসক

ন্যায়পরায়ণ বলে জনতার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তিনি অর্জন করেছিলেন। প্রজাহিতৈষণা, বিদ্যা ও বিদ্যোৎসাহিতা, স্থাপত্যশিল্প বিষয়ে আগ্রহ

কল্যাণমূলক কাজ

ইত্যাদি ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। রাজ্যের বহু স্থানে মসজিদ, চিকিৎসালয় প্রভৃতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দানধ্যানে অকাতর ব্যয় করতে তিনি সঙ্কুচিত ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গুণগ্রাহিতার পরিচয় তিনি দিতেন। তাঁরই রাজ্যকালে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল।

উচ্চপদে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ

হুসেন শাহ্-এর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অনেক হিন্দুকে দেখা যায়; পরম বৈষ্ণব রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর নাম এই উপলক্ষে স্মরণীয়। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, আর গোপীনাথ বসু ও পুরন্দর খান নামে দুই কায়স্থকেও উচ্চপদে নিযুক্ত দেখা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

ইতিহাসে হুসেন শাহ্-এর স্থান খুব উচ্চে। তাঁরই আগ্রহে ও আনুকূল্যে বহু বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। "বিদগ্ধ মাধব" ও "ললিত মাধব" নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন রূপ গোস্বামী। সুলতানের প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতায়

ভাগবতের বাংলা অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন মালাধর বসু; এই অনুবাদের জন্য সুলতান মালাধর বসুকে "গুণরাজ খান" উপাধি দেন।

মহাভারতের বাংলা অনুবাদ

হুসেন শাহ-এর সেনাপতি পরাগল খান-এর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। তাই বুঝা

হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্য ও সংস্কৃতি-সমন্বয়

কঠিন নয় যে সে যুগে বাংলার হিন্দু-মুসলমানে চমৎকার সৌহার্দ্যের ভাব দেখা গিয়েছিল। এই সৌহার্দ্যেরই নিদর্শন হল সত্যপীরের আরাধনা; শোনা যায় যে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানকে একসূত্রে গ্রথিত করার উদ্দেশ্যে

সত্যপীর

হুসেন শাহ এই আরাধনার প্রচলন করেন। সত্যপীর যে হিন্দু দেবতা সত্যনারায়ণ থেকে পৃথক নন তা স্পষ্ট; সত্যপীরের কাহিনী, "শিন্নি" কথাটির ব্যবহার, সবই তদানীন্তন হিন্দু ও মুসলমানের নিকটসম্বন্ধ

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হৃদয়বান শাসক

স্থাপনের পরিচায়ক। হুসেন শাহ্ প্রকৃতই একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নেই। সিকন্দর লোদীর আক্রমণে পলায়মান জৌনপুরের শর্কী সুলতানকে আশ্রয় দেওয়ার মতো সৎসাহস ও হৃদয়বত্তা তাঁর সর্বদাই ছিল। ১৫১৮ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটলে পুত্র নস্রৎ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নস্‌রৎ শাহ্‌

নস্‌রৎ শাহ্‌ (১৫১৮-৩৩) পিতার মতো উদার ও ন্যায়বান শাসক ছিলেন; ভ্রাতাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি যে ঔদার্য প্রদর্শন করেন তা সে যুগে রাজপরিবারে অভাবনীয় ছিল। সুদক্ষ নরপতি ও বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক বলে নস্‌রৎ শাহ্‌ বিখ্যাত হয়ে আছেন। গৌড়ের "কদম রসুল" ও "বড় সোনা" মসজিদ তাঁরই শাসনে নির্মিত হয়। মহাভারতের বাংলা অনুবাদে তাঁর আনুকূল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় প্রথম পূর্ব বাংলায় পর্তুগীজ বোম্বেটেদের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছিল। প্রাসাদ-রক্ষীদের হাতে এই সুলতানের মৃত্যু হয়, ক্রমশ বাংলার দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে। এই বংশের শেষ রাজা শের শাহ্‌ কর্তৃক পরাভূত হন। তারপর কররানী নামে এক পাঠান বংশ বাংলা ও উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করে; ১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবর বাংলা দেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নেন। বাংলায় তখনও বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে, এবং ত্রিপুরা, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু রাজারা মোটামুটি স্বাধীনতা বজায় রেখে চলছিল। তুর্কী শাসনের শেষ যুগে ঈশা খান, চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রভৃতি "বারো ভুঁইয়া" প্রায় স্বাধীন জমিদার হিসাবে ছিলেন। বাংলার স্বাতন্ত্র্যপরায়ণতার বহু দৃষ্টান্ত মুঘল যুগের ইতিহাসেও দেখা যাবে।

নস্‌রৎ শাহের উদারতা

সাহিত্য ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক

পর্তুগীজ উপদ্রব

শের শাহ্‌ কর্তৃক বাংলা আক্রমণ

মুঘল সাম্রাজ্য-ভুক্তি

আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্য

বারো ভুঁইয়া

বাংলায় মুসলিম শাসনের বৈশিষ্ট্য

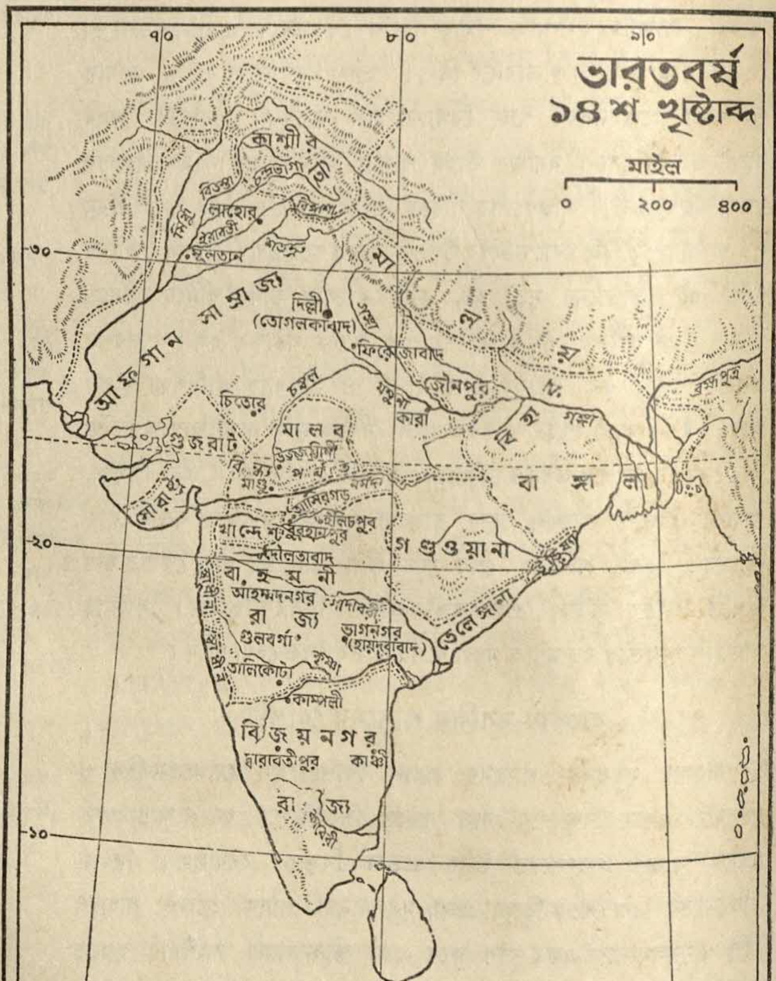
বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, তখন হিন্দু ও মুসলমান একত্র বন্ধুভাবে বাস করতে শিখেছিল। ধর্ম ও আচারগত প্রভেদ সত্ত্বেও পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। নিছক রাজনৈতিক দিক থেকে হিন্দুরা প্রজা, মুসলমানরা শাসক হলেও সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানকে একত্র বাস করে একই জীবনধারায় অংশীদারী করতে হয়েছিল, তাই উভয়েরই চালচলন, আহার-বিহার ইত্যাদিতে কিছু পরিবর্তন ঘটল। সুলতানী শাসনে বাংলা সাহিত্যের যে উন্নতি সাধিত হয়, তার উল্লেখ পূর্বে করা গেছে। সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রেরও যথেষ্ট চর্চা ও সমাদর তখন ছিল। নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে টোল, চতুষ্পাঠী ইত্যাদি বিদ্যায়তনে সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শনের চর্চা হত। বাংলার নব্যন্যায় সে যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রশস্তি অর্জন করেছিল। স্থাপত্যের তদানীন্তন নিদর্শন এখনও যা রয়েছে, তা নিয়ে গর্ব করা চলে। গৌড়ের

হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি

বাংলা সাহিত্যের বিকাশ

সংস্কৃত চর্চা ও নবদ্বীপের খ্যাতি

স্থাপত্যকৃতি


ভারতবর্ষ
১৪শ খৃষ্টাব্দ
মাইল
০ ২০০ ৪০০
৭০
৮০
৯০
৩০
২০
১০
কাশ্মীর
লাহোর
মুলতান
আফগান সাম্রাজ্য
দিল্লী
(তোগলকাবাদ)
ফিরোজাবাদ
জৌনপুর
চম্বল
যমুনা
কারা
গঙ্গা
ব্রহ্মপুত্র
চিতোর
মালব
উজ্জয়িনী
গুজরাট
মাণ্ডু
সৌরাষ্ট্র
নর্মদা
বাঙ্গালা
আসিরগড়
খান্দেশ
দৌলতাবাদ
গণ্ডওয়ানা
বাহমনী
আহম্মদনগর
রাজ্য
গোদাবরী
গুলবর্গা
ভাগনগর
(হায়দরাবাদ)
তেলেঙ্গানা
কৃষ্ণা
তালিকোটা
কাম্পলী
বিজয়নগর
দ্বারাবতীপুর
কাঞ্চী
রাজ্য
কাবেরী

ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ, খুলনার নিকট বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ প্রভৃতি ইমারতগুলির শিল্পগত উৎকর্ষ নিঃসন্দিগ্ধ।

বহমনি রাজ্য

বাংলা থেকে এবার দক্ষিণ ভারতের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। মহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজ্যকালে দাক্ষিণাত্যে সেনাপতিদের মধ্যে যখন বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন তাদের একজন ১৪৩৭ সালে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই সেনাপতির নাম হাসান বা জাফর খান। আগে শোনা যেত যে ছেলেবেলায় গঙ্গু নামে এক ব্রাহ্মণের কাছে কাজ করেছিল বলে হাসানের নামকরণ হয় "বহমন"। কিন্তু একথা এখন অনেকেই স্বীকার করে না। ফিরিস্তার গ্রন্থে ঐ ব্রাহ্মণ-প্রভু সম্বন্ধে কাহিনী রয়েছে, কিন্তু এমনও হতে পারে যে পারস্যের প্রসিদ্ধ রাজা বহমন-এর বংশ থেকে উদ্ভূত বলে হাসান দাবি করতেন এবং "বহমন শাহ্" উপাধি নিয়েছিলেন বলে রাজ্যের নাম হয় "বহমনি"। যাই হোক, এই রাজ্য নর্মদা এবং কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম রাজধানী ছিল গুল্‌বর্গা, হাসান এর নাম দেন "হাসানাবাদ"; পশ্চিম উপকূলে গোয়া এই রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। ১৩৫৮ সাল পর্যন্ত হাসান গঙ্গু বহমনি-র রাজত্ব চলেছিল।

হাসান গঙ্গু বহমনি

বহমনি নাম সম্পর্কে কিংবদন্তী

রাজ্যের বিস্তৃতি

রাজধানী

হাসানের পর ১৫২৬ পর্যন্ত চৌদ্দজন স্থলতান রাজ্য করেন। এঁদের সকলেই যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন; অধিকাংশ স্থলতানই ছিলেন অত্যাচারী। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে দেখিয়েছেন যে এঁদের মধ্যে ছয় জন স্থলতানকে সিংহাসনচ্যুত হতে হয়, চার জনের হত্যার সংবাদ পাওয়া গেছে আর দু'জনকে অন্ধ করে আজীবন কারারুদ্ধ রাখা হয়েছিল! পঞ্চম স্থলতান ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও বিদ্যোৎসাহী, পারস্যের মহাকবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা ছিল, কিন্তু তিনি হলেন ব্যতিক্রম। যুদ্ধবিগ্রহে অবিরাম লিপ্ত হয়ে থাকার প্রধান কারণ হল এই যে, দক্ষিণে ছিল বিজয়নগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে ওয়ারঙ্গলের হিন্দু রাজ্য। বিশেষ করে বিজয়নগরের সঙ্গে সীমান্ত ও অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে ক্রমাগত সঙ্ঘর্ষ চলত, বহমনি স্থলতানকে সর্বদা বহু লক্ষ সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হত। এরূপ আবহাওয়ায় সুস্থ, সভ্য জীবন ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকত।

পরবর্তী ১৪ জন স্থলতানের স্বল্প-স্থায়ী রাজত্ব

সতত যুদ্ধ-প্রস্তুতির কারণ

মহম্মদ শাহ্

বিজয়নগর ও ওয়ারঙ্গল রাজ্যের পরাজয়

মহম্মদ শহ্ (১৩৫৮-৭৩) বিজয়নগর এবং ওয়ারঙ্গল এই উভয় রাজ্যকে পরাজিত করে তৎকালীন বহমনি রাজ্যের শক্তির প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। ওয়ারঙ্গল রাজ্যের কাছ থেকে গোলকুণ্ডা শহর এবং ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ প্রভূত অর্থ মহম্মদ শাহ্ পান। বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে বিজয়ী বহমনি সৈন্য বহু লক্ষ লোকের প্রাণনাশ করে বলে কথিত আছে। এই সব বর্ণনায় অতিরঞ্জন কিছু থাকলেও মহম্মদ শাহের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে রাজ্যের দুর্দিন লেগে যায়; পঁচিশ বৎসরে পাঁচজন সুলতানের রাজত্ব শেষ হয়, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলে। ফিরুজ শাহ্ যখন সুলতান (১৩৯৭-১৪২২), তখন বিশৃঙ্খলার শেষ হয়, শক্তিশালী শাসক বলে তাঁর খ্যাতি দেখা যায়। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন। গুণীজনের সঙ্গ পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁরই রাজ্যকালে মহারাষ্ট্রে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। বিজয়নগরের সঙ্গে বারবার যুদ্ধও ঘটেছিল। সেখানকার রাজা প্রথম দেবরায়কে পরাস্ত করে তাঁর কন্যাকে ফিরুজ শাহ্ নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে আসেন। দুইবার বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তৃতীয়বার তাঁর পরাজয় ঘটে। সুলতানের শেষ জীবন দুঃখে কেটেছিল, নিজের ভাই আহ্মদ শাহ্ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে হত্যা করেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার মতে ফিরুজ শাহ্ বহমনি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতান। রাজ্যকে সাফল্য ও গৌরবের শিখরে তিনি তুলতে পেরেছিলেন বলা হয়। শিল্পবিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল; ফিরোজাবাদ শহরে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করেন। কেউ কেউ তাঁকে "দাক্ষিণাত্যের আকবর" আখ্যা দিয়েছে, কিন্তু তুলনা যে কষ্টকল্পিত তা বলাই বাহুল্য।

বিজয়নগরের হত্যাকাণ্ড

ফিরুজ শাহ্

মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ

বিজয়নগরের সাথে যুদ্ধ

মৃত্যু

ফিরুজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ফিরিস্তার অভিমত

আহ্মদ শাহ্

আহ্মদ শাহের সামরিক কৃতিত্ব

আহ্মদ শাহ্ (১৪২২-৩৫) বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে পরাজিত করেন, বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদে আদায় করেন। বিজয়নগরের লাঞ্ছনা তখন দারুণ হয়েছিল; বহমনি সুলতানকে বার্ষিক কর দিতে রাজী হতে হয়েছিল। কাকতীয় রাজবংশকে পরাভূত করে ওয়ারঙ্গল রাজ্য আহ্মদ শাহ্ অধিকার করেন। গোলকুণ্ডার বিখ্যাত হীরক খনি তাঁর অধিকারে আসে। গুজরাট ও মালবের সঙ্গে

যুদ্ধে নেমে এই দুর্জয় যোদ্ধা সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বহমনি রাজ্যের শক্তি ও ব্যাপ্তি তিনি বৃদ্ধি করেছিলেন। রাজধানী গুলবর্গা থেকে বিদরে তিনি স্থানান্তরিত করেন, বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ খুব ছিল, কিন্তু ধর্ম-ব্যাপারে তিনি অন্ধ আক্রোশ বিধর্মীদের সম্বন্ধে পোষণ করতেন। যথেষ্ট শক্তি ও সাফল্য সত্ত্বেও তাই প্রকৃত সদ্বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির অধিকারী তাঁকে বলা যায় না।

বিদরে রাজধানী স্থানান্তর

মন্তব্য

বহমনি রাজ্যের পতন

পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন (১৪৩৫-৫৭) বিজয়নগরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, বাৎসরিক করও আদায়ে সমর্থ হন। শাসন-ব্যাপারে তিনি কঠোর ছিলেন, কিন্তু শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে পিতার মতো তাঁরও আগ্রহ ছিল। হুমায়ুন শাহ্ (১৪৫৭-৬১) অত্যাচারী এবং অপদার্থ বলে রাজ্যে ভীতি ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক করতেন; "জালিম" (অত্যাচারী) বলে তিনি অভিহিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুকে তাই সমসাময়িক কবি ভগবানের আশীর্বাদ বলে বর্ণনা করেছেন। যাই হোক, এতদিন পর্যন্ত স্বৈরাচারী শাসন সত্ত্বেও বহমনি রাজ্য শক্তিশালী ছিল, প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে শঙ্কিত অবস্থায় রাখত। কিন্তু এইবার ভাঙনের সূত্রপাত দেখা গেল। মালবের সুলতানরা বার বার আক্রমণ করল; রাজধানী বিদর পর্যন্ত কিছুকাল অবরুদ্ধ হয়েছিল। রাজ্যে কর্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে একদিকে তুর্কী, ইরানী প্রভৃতি বিদেশী ও অন্যদিকে দক্ষিণী সর্দারদের মধ্যে রেষারেষি বেড়ে উঠল, গণ্ডগোল ঘটতে লাগল।

সুলতান আলাউদ্দীন

হুমায়ুন শাহ্

ভাঙনের সূত্রপাত

শেষ তিনজন সুলতানের মন্ত্রী মাহ্‌মুদ গাওয়ানের নাম এখানে উল্লেখ-যোগ্য। প্রাক্তন মন্ত্রীকে হত্যা করে মন্ত্রীর পদ লাভ করে থাকলেও মাহ্‌মুদ গাওয়ান যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কূটকৌশল নিয়ে রাজ্যের স্বার্থরক্ষা ও শক্তি বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বিদেশী এবং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অভিজাতদের মধ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর অভাব ছিল না। সুলতান তৃতীয় মহম্মদকে কেবলই তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে শেষ পর্যন্ত মাহ্‌মুদ গাওয়ানকে প্রাণ হারাতে হয়। উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইয়োরোপের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রাশিয়ার "কাইজার" রাজ্যের মহত্ত্বের যিনি প্রকৃত স্রষ্টা সেই বিস্‌মার্ককে পদচ্যুত করেন; একে বলা হয়েছে "dropping the pilot", জাহাজের কর্ণধারকেই জলে ফেলে দেওয়া। তার চেয়ে

মাহ্‌মুদ গাওয়ান:

শাসননিপুণ ও কূটনীতিবিদ্

শত্রুর ষড়যন্ত্রে মৃত্যু

সদৃশ ঘটনার উল্লেখ

আরও অকৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া গেল বহমনি রাজ্যের ইতিহাসে। মাহ্‌মুদ গাওয়ানের মতো সুনিপুণ ও বিচক্ষণ শাসক সে যুগে বিরল। যোদ্ধা হিসাবেও তাঁর সাফল্য স্মরণীয়; বিজয়নগর রাজ্যের হাত থেকে গোয়া বন্দর তিনি দখল করেন, উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং দক্ষিণে কাঞ্চী আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন তিনি নিয়ে আসেন। রাজ্যের নানা স্থানে দুর্গ প্রতিষ্ঠা ও সীমান্ত রক্ষার যে ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন, তা অনুকূল পরিস্থিতিতে রাজ্যকে খুবই শক্তিশালী করত। ধ্বংসোন্মুখ রাজ্যে যে শান্তি-শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হয় নি, সেজন্য কৃতিত্ব প্রধানত মাহ্‌মুদ গাওয়ানের প্রাপ্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আড়ম্বর বর্জন করতেন; বিদরে একটি বিপুল বিদ্যায়তন এবং গ্রন্থাগার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কৃষির উন্নতিকল্পে জল-সেচ প্রভৃতি জনহিতকর ব্যবস্থা তিনি করেন। বহুগুণান্বিত এই ব্যক্তিকে অকৃতজ্ঞ সুলতানের আদেশে প্রাণ হারাতে হয়েছিল, কিন্তু বহমনি রাজ্যের ইতিহাসে তিনি এক সমুজ্জ্বল ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন।

গাওয়ানের কৃতিত্ব

বহমনি রাজ্যের অধঃপতনকে আর বেশীদিন মুলতুবী রাখা সম্ভব হয় নি। চতুর্দশ সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ্‌ (১৪৮২-১৫১৮) যখন রাজাসনে, তখন কাসিম বারিদ নামে এক মন্ত্রী সর্বেসর্বা হয়ে বসেন, এবং পরে তাঁরই উত্তরাধিকারীরা বিদরে এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশ প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নিজেদের এলাকায় স্বাধীন হতে লাগল। ১৫২৬ সালে বহমনি রাজ্যের বিলোপ ঘটে পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্য সেই স্থলে দেখা দিল—আহ্‌মদনগরের নিজামশাহী বংশ, বেরারের (বিদর্ভ) ইমাদশাহী বংশ, বিদরের বারিদশাহী বংশ, বিজাপুরের আদিলশাহী বংশ এবং গোলকুণ্ডার কুতবশাহী বংশ স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করল। সংক্ষেপে বলা যায় যে কিছুকাল পরে বিজাপুর বিদরকে গ্রাস করল, আহ্‌মদনগর বেরার অধিকার করল। তার ফলে আহ্‌মদনগর, বিজাপুর আর গোলকুণ্ডা এই তিনরাজ্য বেশ প্রবল হয়ে উঠল। মুঘল বাদশাহদের পক্ষেও এদের শায়েস্তা করা সহজ হয় নি। ১৬৩৭ সালে শাহজহান আহ্‌মদনগর অধিকার করেন; বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আরও বহুদিন স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখে। ১৬৮৬-৮৭ সালে অওরংজীব ঐ দুই রাজ্য জয় করেন।

মাহ্‌মুদ শাহ্‌

বিদরে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা

বহ্‌মনি রাজ্যের বিলোপ ও পঞ্চ রাজ্যের উদ্ভব

বিজাপুর, আহ্‌মদনগর ও গোলকুণ্ডা

১৪৭০ থেকে ১৪৭৪ সালে রুশ পর্যটক আথানেসিয়স নিকিটিন বহমনি রাজ্যে ভ্রমণ করে যে বৃত্তান্ত লিখে যান, তাতে অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য

আছে। বিদরকে তিনি দেখেন এক প্রকাণ্ড শহর। স্থলতান (তৃতীয় মহম্মদ) ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয়; অভিজাত সম্প্রদায় বিপুল অর্থের অধিকারী ছিল। সর্বদা বিলাসব্যসনে তাদের সময় কাটত। বিদেশীয় অভিজাতেরা রাজ্যে খুব প্রভাব ও প্রতিপত্তি ভোগ করত। স্থলতান শিকারে গেলে সঙ্গে সঙ্গে হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে যেন এক বিরাট বাহিনী যেত। দেশের সাধারণ কৃষকের দীনহীন অবস্থার কথাও এই পর্যটক লিখে গেছেন। ধনী ও নির্ধনের অবস্থার মধ্যে এই বিপুল তারতম্য যে রাষ্ট্রকেই তুর্বল করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

বিদেশীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও বহমনি রাজ্যের কথা

বিজয়নগর

এইবার উল্লেখ করতে হয় বহমনি রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত বিজয়-নগরের কথা। উভয় রাজ্যের ইতিহাস যুদ্ধের বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ; উভয় শক্তির সজ্ঘর্ষ চলেছিল অবিরামভাবে। ফিরুজ শাহের সঙ্গে প্রথম দেবরায়ের যুদ্ধ, আহ্‌মদ শাহের সঙ্গে দ্বিতীয় দেবরায়ের যুদ্ধ ইত্যাদি থেকে জানা যায় যে উভয় পক্ষ ক্রমাগত প্রাণপণ যুদ্ধ করে চলেছিল। বিজয়নগরের পক্ষ থেকে বহু বিপর্যয় সত্ত্বেও প্রচণ্ড প্রতিরোধ ঘটেছিল বলে দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতের মতো অবস্থা হয় নি, মুসলিম অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। বিজয়নগর রাজ্যের বিশালতা ও বৈশিষ্ট্যতাই ইতিহাসে আকর্ষণীয় স্থান নিয়ে আছে। এই রাজ্যের উদ্ভব সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কিছু জানা নেই। কিংবদন্তী অনেক আছে, কিন্তু প্রধানত ইয়োরোপীয় পর্যটকদের বিবরণের উপর নির্ভর করে জানা যায় যে হরিহর ও বুক্ক নামে তুই হিন্দু নায়ক এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৩৩৬)। সম্ভবত এঁরা ছিলেন ওয়ারঙ্গলের কাকতীয় রাজবংশের কর্মচার। কথিত আছে যে বিদ্যারণ্য মাধব নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ মন্ত্রণা দিয়ে এদের সাহায্য করেছিলেন। এই মাধব নাকি ছিলেন বেদের বিশ্রুতকীর্তি ভাষ্যকার সায়নাচার্যের ভ্রাতা।

বিজয়নগর রাজ্যের গুরুত্ব

রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ

হরিহর ও বুক্ক

সঙ্গম বংশ

হরিহর ও বুক্ক নিজেরা কখনও রাজা বলে পরিচয় দেন নি, কিন্তু সঙ্গম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে তাঁরা অভিহিত হয়েছিলেন। বুক্ক রাজা উপাধি না নিয়েও চীন সম্রাটের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন। বুক্কের জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র কুমারকম্পন মাতুরার তৎকালীন মুসলমান স্থলতানকে পরাজিত করে মাতুরাকে বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভূত করেন;

বুক্ক কর্তৃক চীনে দূতপ্রেরণ

বুক্কের মাতুরা অধিকার

এই বিষয়ে কম্পনের মহিষী গঙ্গাদেবী সংস্কৃতে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। ১৩৭৯ সালে বুক্কের মৃত্যুর পর পুত্র দ্বিতীয় হরিহর উপাধি নিয়ে রাজাসনে বসেন, নিজেকে "মহারাজাধিরাজ" "রাজপরমেশ্বর" প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেন। বুক্কের মতো তাঁকেও বহমনি রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ফিরুজ শাহের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে, ক্ষতিপূরণরূপে প্রভূত অর্থ দিতে হয়। কিন্তু অপর দিকে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর রাজ্যের বিস্তৃতি বাড়তে থাকে; মহীশূর, কাঞ্চী, ত্রিচিনাপল্লী প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় হরিহর শৈব ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কেও সহিষ্ণুতা ও আনুকূল্য তিনি দেখাতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে সঙ্ঘর্ষ কিছুকাল চলে; প্রথম দেবরায় সিংহাসনে বসলে আবার দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছিল (১৪০৬-২২)।

দ্বিতীয় হরিহর

ফিরুজ শাহের হাতে পরাজয়

রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি

ধর্মসম্পর্কে উদার মনোভাব

প্রথম দেবরায়

পূর্বে বলা হয়েছে যে বহমনি রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজয় ঘটে, প্রথম দেবরায় সুলতান ফিরুজ শাহ্‌কে নিজের এক কন্যাকে তাঁর অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে দিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে দুইবার পরাজিত হয়েও তাঁর প্রতিশোধ স্পৃহা নষ্ট হয় নি; তৃতীয়বার যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হলেন, বহমনি রাজ্যের পূর্বে ও দক্ষিণে কিয়দংশ তাঁর দখলে এল; পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-৪৬) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সঙ্গম বংশের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজা। অবশ্য বহমনি রাজ্য তখনও পরাক্রমশালী; দ্বিতীয় দেবরায়কে যুদ্ধে নেমে পরাস্ত হয়ে প্রতিকূল শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু গতানুগতিক পথে না গিয়ে সৈন্যবাহিনীর উন্নতিসাধনে তিনি প্রবৃত্ত হলেন, মুসলমানদের সৈনিক পদে নিযুক্ত করতে কুণ্ঠিত হলেন না। দেশের শাসন, বাণিজ্য, নৌশক্তি, সর্ব ব্যাপারে অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সমুদ্রপথে বাণিজ্য যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সেজন্য লক্ষ্মণ নামে এক কর্মচারীকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বহমনি রাজ্যের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে ব্যর্থ হলেও দক্ষিণে সিংহলের উপকূল পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছিল। ইতালিয়ান পর্যটক নিকোলো কোন্তি এবং আরব আবদুর রজাক তাঁকে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে বর্ণনা করেছেন; তৎকালীন বিজয়নগরের সমৃদ্ধি দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন।

বহমনি রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ

সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা

দ্বিতীয় দেবরায়

নানা উন্নতিমূলক কার্য

রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন

বিদেশী পর্যটকদের মন্তব্য

শালুভ বংশ

পরবর্তী রাজা মল্লিকার্জুন (১৪৪৬-৬৫) বহমনি এবং উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্যের সমবেত আক্রমণ থেকে বিজয়নগরকে কোনক্রমে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর পর যখন রাজা হলেন বিরূপাক্ষ (১৪৬৫-৮৬), তখন তাঁর অকর্মণ্যতার ফলে রাজ্যে বহু স্থানে বিদ্রোহ দেখা যায়, মাহ্‌মুদ গাওয়ান গোয়া দখল করে নেন, পাণ্ড্য রাজা কাঞ্চী আক্রমণ করেন, উড়িষ্যার হিন্দু রাজা আবার বহমনি রাজ্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজয়নগরকে বিপন্ন করেন। তখন বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভূত চন্দ্রগিরি প্রদেশের শাসক শালুভ বংশীয় নরসিংহ বিরূপাক্ষকে অপসৃত করে নিজে সিংহাসন আরোহণ করেন (১৪৮৬-৯৩)। নূতন রাজবংশ যেন মুমূর্ষু রাজ্যকে নূতন জীবন এনে দিল। নরসিংহ বহমনি ও উড়িষ্যা রাজ্যের আক্রমণে যে রায়চুর দোয়াব ও উদয়গিরি হস্তচ্যুত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ তিনি দমনে সমর্থ হন, সুদূর দক্ষিণে জয়যাত্রা করে রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন। পুত্র ইম্মদি নরসিংহ পিতার মৃত্যুর পর রাজাসনে বসেন কিন্তু তাঁর কর্মক্ষমতা ছিল নগণ্য, পিতার আমলের বিশ্বস্ত সেনাপতি নরস নায়ক রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। নরস নায়কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বীর নরসিংহ পিতার পদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী, শালুভ বংশের অপদার্থ রাজাকে সরিয়ে নিজে সিংহাসন দখল করলেন, তুলুভ রাজবংশের এভাবে প্রতিষ্ঠা হল (১৫০৫)। এই বীর নরসিংহের ভ্রাতা কৃষ্ণ দেবরায় শুধু তুলুভ বংশের নয়, বিজয়নগরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট (১৫০৫-৩০)।

রাজা মল্লিকার্জুন

রাজা বিরূপাক্ষ

নানা দিক থেকে রাজ্যের উপর আক্রমণ

নরসিংহ কর্তৃক শালুভ বংশের প্রতিষ্ঠা

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, রাজ্যের প্রসার সাধন

ইম্মদি নরসিংহ

তুলুভ বংশের প্রতিষ্ঠা

তুলুভ বংশ—কৃষ্ণ দেবরায়

প্রবলপরাক্রান্ত রাজা বলে কৃষ্ণ দেবরায় বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যকালে বিজয়নগর শক্তি ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছিল। উড়িষ্যার রাজা একাধিকবার বহমনি রাজ্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিজয়নগরের সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন বলে কৃষ্ণ দেবরায় প্রথমেই উড়িষ্যা অভিমুখে সৈন্যদল নিয়ে গেলেন, উদয়গিরি পুনরুদ্ধার করলেন, অন্যান্য কয়েকটি স্থান জয় করে নিলেন। ইতিমধ্যে বহমনি রাজ্য পাঁচ ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তাঁর সুবিধা ঘটল, বিজাপুরের সুলতানকে পরাস্ত করে রায়চুর

উড়িষ্যা অভিযান

বিজাপুর আক্রমণ

দোয়াব আবার দখল করে নিলেন, গুলবর্গা দুর্গটিকে ধূলিসাৎ করে দিলেন। কথিত আছে যে, হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন বলে কৃষ্ণ দেবরায় বিপুল বিজয় সত্ত্বেও বিজাপুর সুলতানের প্রতি সদ্ব্যবহার করেছিলেন। দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত শক্তি প্রসারিত করে দিয়ে তিনি ভারত মহাসাগরে কয়েকটি দ্বীপেও কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন বলে শোনা যায়।

দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত শক্তির প্রসার

কিন্তু কৃষ্ণ দেবরায় যে শুধু যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতনামা ছিলেন তা নয়। শাসন ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। পর্তুগীজ পাএস (Paes) প্রভৃতির বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনি উদারচেতা, অতিথিবৎসল, পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। পর্তুগীজদের লেখা থেকে তাঁর শক্তি ও মহত্ত্বের বহু পরিচয় মেলে। পর্তুগীজদের সঙ্গে তিনি মিত্রতা স্থাপন করেন। আলবুকার্ক-কে ভাটখাল নামক এক স্থানে ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেন। ভবিষ্যতে পর্তুগীজদের এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় বণিকদের ভূমিকা যে কেমন হবে, তা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না ; নচেৎ তিনি বোধ হয় পর্তুগীজদের প্রশ্রয় দিতেন না। সামুদ্রিক শক্তি সম্বন্ধে তৎকালীন অন্যান্য ভারতীয় নরপতির মতো তাঁরও স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তিনি সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন ; সম্ভবত নিজেও কৃতী কবি ও বিদ্বান ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর ভক্তি ছিল। বহু মন্দির নির্মাণ ও জনহিতকর কর্মে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। স্বয়ং শাসনের সর্ব বিভাগে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করে হিন্দু রাজার প্রাচীন আদর্শ অনুসরণে প্রয়াসী ছিলেন। পারস্য ও অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্র থেকে তাঁর কাছে দূত আসত। বস্তুত আকবরের পূর্বে ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে তাঁর মতো বহুগুণান্বিত নরপতি খুবই বিরল।

চরিত্র-বিচার

পাএস প্রভৃতির বিবরণ

পর্তুগীজদের সঙ্গে মিত্রতা

প্রাসঙ্গিক মন্তব

বহুগুণান্বিত নরপতি

বিজয়নগরের পতন

কৃষ্ণ দেবরায়ের মৃত্যুর পর রাজ্যভার পড়ে পরপর অচ্যুত রায় ও সদাশিব রায় নামে দুই অযোগ্য রাজার হাতে। আরবিজু-বংশীয় রাম রায় নামক মন্ত্রীর উপর সদাশিব একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। রাম রায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল না। কূট কৌশলে তাঁর অক্ষমতা দেখা গেল, আর বিজয়নগরের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় এমন অহঙ্কারের পরিচয় তিনি দিলেন যে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য সুলতানদের সঙ্গে প্রায়ই অহেতুকভাবে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে হয়েছিল, রাজ্যের শক্তিক্ষয়

রাম রায়ের অবিমৃষ্যকারিতা

ঘটেছিল। প্রথমে কিছু সাফল্য অর্জন করলেও পরিণামে বিজয়নগরের সর্বনাশ তিনি ডেকে এনেছিলেন। সুলতানদের পরস্পর বিসংবাদে অংশ গ্রহণ করে ১৫৪৩ সালে তিনি আহ্‌মদনগর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে হাত মিলিয়ে একত্র বিজাপুর আক্রমণের যে আয়োজন করেন, বিজাপুরের মন্ত্রী আসাদ খান-এর কূট কৌশলে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তারপর ১৫৫৮ সালে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিজয়নগর সম্মিলিতভাবে আহ্‌মদনগর আক্রমণ করে। তখন বিজয়নগরের সৈন্যদলের উল্লাস ও ঔদ্ধত্যে আহ্‌মদনগরের সকল অধিবাসী প্রতিশোধের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। রাম রায়ের ব্যবহারে সুলতানরাও অপ্রসন্ন ছিলেন। তাই সকলে একযোগে বিজয়নগর আক্রমণ করা স্থির হয়েছিল। ১৫৬৫ সালে তালি-কোটার যুদ্ধক্ষেত্রে বিজাপুর, বিদর, গোলকুণ্ডা ও আহ্‌মদনগর অর্থাৎ বেরার ব্যতিরেকে অপর সমস্ত সুলতানী রাজ্য একত্রিত হয়ে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামল। বৃদ্ধ রাম রায় স্বয়ং যুদ্ধে নেতৃত্ব করলেন। প্রচণ্ড লড়াইয়ে রাম রায় শত্রু হস্তে বন্দী অবস্থায় প্রাণ হারালেন। বিজয়-নগর শহর বিধ্বস্ত হল, অকথ্য অত্যাচারের তাণ্ডব সেখানে অনুষ্ঠিত হল। কথিত আছে যে অতি সমৃদ্ধ বিজয়নগর পাঁচমাস ধরে লুণ্ঠিত হয়েছিল, অগাধ ধনরত্ন সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল, যে শহর ছিল মনোহারী, বিদেশী পর্যটকেরা যার প্রশংসায় শতমুখ ছিল, সেই শহর পড়ে রইল এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ হয়ে। এত আকস্মিকভাবে এত বড় শহরের এমন চরম দুর্গতির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব অল্পই পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরির সুপ্তিভঙ্গ ঘটে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের অপরূপ নগরী পম্পিয়াই (Pompeii) ভস্মীভূত হয়েছিল। প্রায় যেন অগ্ন্যুৎপাতের মতো সামগ্রিক ধ্বংসলীলা দেখা গেল বিজয়নগরে। হঠাৎ যেন এক ধূমকেতুর পুচ্ছস্পর্শে মহানগরীর প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল, বিপুল তার আয়তন জুড়ে শুধু মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকল।

সুলতানদের পরস্পরবিরোধে অংশ গ্রহণ

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির একজোটে বিজয়নগর আক্রমণ

তালিকোটার যুদ্ধ

বিজয়নগর শহরের ধ্বংস সাধন

ধ্বংসের ব্যাপকতা

শহর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেলেও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন তখনই ঘটে নি। অবশ্য আরবিভু বংশের কর্তৃত্বে বিজয়নগরের অস্তিত্ব বজায় থাকলেও তালিকোটার যুদ্ধক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে গেল যে দাক্ষিণাত্যে নিরঙ্কুশ হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হবে না, ক্রমশ মুসলমান কর্তৃত্ব বিস্তার যে অনিবার্য তার আভাস পাওয়া গেল। যাই হোক, পেনুগোণ্ডা থেকে বিজয়নগর রাজ্য পরিচালিত করলেন রাম রায়ের ভ্রাতা তিরুমল;

তালিকোটার সঙ্কেত

তিরুমল

একেবারে যে বিজয়নগর তখন "গত-গৌরব, হৃত-আসন, নত-মস্তক লাজে" অবস্থান করছিল, তা নয়, কিন্তু খুব বেশীকাল অধোগতিকে স্থগিত রাখা গেল না। রাজা ভেঙ্কট চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করলেন; তিনিই উদেয়ার বংশকে মহীশূর রাজ্য স্থাপনের অনুমতি প্রদান (১৬১২ সাল) করেছিলেন, বিজয়নগর রাজ্যের সংহতি যে আর রক্ষা করা যাবে না তা বুঝা গেল। ক্রমে রাজ্যের নায়করা নিজ নিজ এলাকায় প্রধান হয়ে উঠলেন। বিজয়নগরের গৌরব চিরতরে বিলীন হয়ে গেল।

রাজা ভেঙ্কট

রাজ্যের সংহতি লোপ ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা

বিজয়নগরের সমৃদ্ধি

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে বহু বিদেশী পর্যটকের সাক্ষ্য রয়েছে। ইতালিয়ান নিকোলো কোন্তি (১৪২০), পর্তুগীজ পাএস (১৫২২), নুনিজ ও বারবোসা (১৫১৬), এবং পারস্য দেশের আবদুর রজ্জাকের নাম এই উপলক্ষে খুবই উল্লেখযোগ্য। বিজয়নগর শহরের বর্ণনায় তাঁদের লেখনী ছিল অক্লান্ত; বাস্তবিকই শহরের আকার ও সৌন্দর্য তাঁদের মনকে অভিভূত করেছিল। কোন্তি বলেছেন যে, বিজয়নগরের পরিধি ছিল পঞ্চাশ বর্গমাইল; সেখানকার সৈন্য সমারোহ ছিল বিপুল। প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য সর্বদাই নাকি প্রস্তুত হয়ে থাকত। ১৪৪৩ সালে আবদুর রজাক যখন আসেন, তখন বিজয়নগরের চার পাশে দেখেছিলেন সাতটি বিরাট প্রাচীর আর সাতটি বিশাল সিংহদ্বার। সেখানকার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এমনই হয়েছিল যে তিনি লিখে গেছেন যে, শহরের অধিবাসীরা সবাই মণিমুক্তার অলঙ্কার পরত। রাজকোষের রত্নসম্ভার ছিল বিস্ময়কর। একটা বিরাট গহ্বর সোনায় পরিপূর্ণ ছিল। আবদুর রজাক তো একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন: "বিজয়নগরের মতো সমৃদ্ধ শহর দুনিয়ার আর কোথাও মানুষের চোখে পড়ে না; দুনিয়ার আর কোথাও যে এমন শহর আছে তা মানুষ কখনও শোনে নি, ভবিষ্যতেও শুনবে না।" পর্তুগীজ পর্যটক পাএস তেমনই ঐশ্বর্যের বিবরণ দিয়েছেন; বিশাল সৈন্য বাহিনী আর বিশেষ করে অসংখ্য যুদ্ধহস্তী দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "খাদ্যদ্রব্যের দিক থেকে বিজয়নগর জগতের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর।" বারবোসার বর্ণনা থেকে বিজয়নগর যে নানা দেশের কত রকম ব্যবসার কেন্দ্র ছিল তা জানা যায়; রেশম, কর্পূর,

বিজয়নগরের সমৃদ্ধি সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকগণ :

নিকোলোকোন্তি

আবদুর রজাক

পাএস

বারবোসা

কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতির আমদানি দেখে বুঝা যায় যে শহরের বিত্তবানরা বিলাসিতার সরঞ্জাম সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিল।

শাসনব্যবস্থা

শাসনব্যবস্থার দিক থেকেও বিজয়নগরের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় সৌষ্ঠব ছিল, সংগঠনের লক্ষণ সুস্পষ্ট ছিল। সম্ভবত এজন্যই বলা যায় যে মূলত যুদ্ধ পরিচালনার সর্ববিধ আয়োজন রাষ্ট্রের এক প্রধান লক্ষ্য হলেও সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপেও বিজয়নগরকে আমরা দেখতে পাই। বিশাল রাজ্যটি দুই শত অঞ্চলে বিভক্ত করা ছিল, প্রত্যেক এলাকার ভার ছিল স্বতন্ত্র শাসনকর্তার হাতে। সচরাচর রাজপরিবার থেকে কিংবা অভিজাত সম্প্রদায় থেকে শাসনকর্তা বাছাই করা হত। তখন ছিল সামন্ততন্ত্রের যুগ, তাই প্রতি এলাকার শাসনকর্তার দায়িত্ব ছিল নির্দিষ্ট রাজস্ব ও সৈন্য সরবরাহ করা। সর্ব ব্যাপারে রাজার কর্তৃত্ব অবশ্য ছিল অখণ্ড ও অবাধ। তবে এর অর্থ এ নয় যে সর্বদা স্বৈরশাসন প্রচলিত থাকত। কৃষ্ণ দেবরায় স্বয়ং "আমুক্ত-মাল্যদা" নামক গ্রন্থে রাজধর্ম সম্বন্ধে লিখেছেন, সর্বজনের হিতসাধনে নিরত থাকা যে রাজার কর্তব্য তা বলেছেন। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান অবশ্যই ছিল, কিন্তু রাজার শক্তি যখন সীমাহীন তখন সমাজে এই আদর্শের স্বীকৃতির প্রভূত মূল্য ছিল। শাসনকার্য পরিচালনায় সুবন্দোবস্ত ছিল; কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্য মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিতের দল ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজসভায় শিল্পী, সাহিত্যিক, জ্যোতির্বিদ, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি থাকতেন। ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্যাদা ছিল; তাদের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড প্রচলিত ছিল না। গ্রাম-অঞ্চলে পল্লী-সমাজের হাতে কিছু ক্ষমতা হয়তো ছিল; গ্রাম শাসন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ভার ছিল মহানায়কাচার্য নামে রাজকর্মচারীর উপর। সরকারের আয় প্রধানত আসত ভূমি-রাজস্ব থেকে; প্রজারা যে গুরু করভারে পীড়িত হত, তাতে সন্দেহ নেই। একদিকে অতুল ঐশ্বর্য ও অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুর্দশা সর্ব দেশের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মতো যে বিজয়নগরেরও বৈশিষ্ট্য ছিল, তা বহু সূত্র থেকে জানা যায়। যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন সর্বদা ঘটত বলে বিপুল সৈন্যবাহিনী রাখতে হত, তাতে অর্থব্যয়

সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা ও তার ফল

দুই শত আঞ্চলিক বিভাগ

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা

রাজার ক্ষমতা

শাসন পরিচালন ব্যবস্থা

পল্লী-সমাজ

মহানায়কাচার্য

গুরু করভার

সামরিক আয়োজন

হত অসম্ভব পরিমাণে। আবদুর রজাক বলেছেন যে রাজ্যে এগারো লক্ষ সৈন্য এবং এক হাজার যুদ্ধ হস্তী ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রভূত ; দ্বিতীয় দেবরায় মুসলমান অশ্বারোহীরা আরও নিপুণ বলে তাদের নিযুক্ত করার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। বিজয়নগরের যোদ্ধাদের শক্তি, দক্ষতা ও সাহস সম্বন্ধে পর্তুগীজ পর্যটকেরা প্রশংসায় কার্পণ্য করেন নি।

বিজয়নগরের শিল্পসংস্কৃতি

রাজসভার সমারোহ ও স্থাপত্য উৎকর্ষ সম্বন্ধে বহু বর্ণনা পাওয়া গেছে। কৃষ্ণ দেবরায়-প্রমুখ রাজারা অনেকেই বৈষ্ণব ছিলেন ; বিজয়নগরবাসীদের অধিকাংশ বিষ্ণুর উপাসক বলে মনে হয়। কিন্তু ধর্ম ব্যাপারে কোন অসহিষ্ণুতার লক্ষণ দেখা দেয় নি ; বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল না, মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতিকেও একেবারে ঠেলে রাখা হয় নি। যেখানে অনেকেই বৈষ্ণব, সেখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকলে মৎস্যমাংসাশী ছিল শুনে একটু আশ্চর্য হতে হয়। সতীদাহ, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে। বিজয়নগরে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল মনে হয় ; সঙ্গীত, জ্যোতির্বিদ্যা, এমনকি অসিচালনা ও মল্লযুদ্ধেও মেয়েদের নৈপুণ্যের কথা শোনা যায়। কয়েকজন মেয়ে সরকারের হিসাব রক্ষা-কাজে নিযুক্ত ছিল মনে হয়। নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক হয়েও রাজারা সচরাচর সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না ; সংস্কৃত, তেলুগু, তামিল ও কানাড়ী ভাষার উন্নতিসাধনে তাঁদের অবদান অল্প নয়। কৃষ্ণ দেবরায় স্বয়ং বিদ্বান, সুলেখক ও শিল্পানুরাগী ছিলেন ; তেলুগু ভাষায় নাকি তিনি "অমুক্তমলয়দেয়ি" নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রানীদের মধ্যে গঙ্গাদেবী লিখেছিলেন "মধুর বিজয়ম্" এবং তিরুমলম্বা দেবী লেখেন "বরদাম্বিকা পরিণাম্" কাব্য। কৃষ্ণ দেবরায়ের রাজসভায় "অষ্টদিগ্‌গজ" বলে খ্যাত আটজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন ; তাঁদের মধ্যে অন্যতম, কবি পেদন তেলুগু ভাষায় অন্যতম স্রষ্টা বলে কীর্তিত হয়েছেন। বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার সায়ণাচার্য, এবং তাঁর ভ্রাতা মাধবাচার্য, এবং ভক্তিমার্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বল্লভাচার্য বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করেছেন। শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরি মঠ রাজানুকূল্যে পুষ্ট হয়েছিল। স্থাপত্য ও শিল্পবৈভবে বিজয়নগরের স্থান খুব উচ্চে। যেহাম্পিতে

ধর্ম

মেয়েদের অবস্থা

ভাষা ও সাহিত্য

অষ্টদিগ্‌গজ

কবি পেদন

বেদের টীকাকার সায়ণাচার্য

বিজয়নগরের লুপ্ত ঐশ্বর্যের নিদর্শন পড়ে রয়েছে, তার নাম হল হাম্পি-হস্তিনাবতী ; সুপ্রাচীন যুগের সঙ্গে বিজয়নগরের পরম্পরাগত সম্পর্ক এভাবে সূচিত হয়েছে। রাজপ্রাসাদ, সাধারণ সৌধ, পূর্তকর্ম প্রভৃতির যে পরিচয় মেলে তা মহামূল্য। বিট্ঠল দেবের অপূর্ব মন্দির আজও তৎকালীন শিল্পোৎকর্ষের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কৃষ্ণ দেবরায়ের সময়ে নির্মিত "হাজার মন্দিরের" ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। ঐতিহাসিক সিউয়েল যে বিজয়নগরকে "বিস্মৃত সাম্রাজ্য" অভিহিত করেছেন, তা আজ ইতিহাসে একেবারে বিস্মৃত নয়। হাম্পি-হস্তিনাবতী

॥ উনবিংশ অধ্যায় ॥

সুলতানী যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি সঙ্ঘাত ও ভারতের সমন্বয়ী বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা

ভারতীয় জীবনে স্বতন্ত্র ও নূতন উপাদানের আবির্ভাব

পূর্ববর্তী বিদেশী জাতি ও মুসলমানের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য

ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের যে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়, তা পূর্ববর্তী যুগে বিদেশী ও বিধর্মীদের এদেশে আসার বিবরণ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ব্যাপার। বহু মুসলমান ভারতবর্ষে এসে বসবাস করে, মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যাও ক্রমে নানা কারণে বাড়তে থাকে। ভারতবর্ষের জীবনে তখন নূতন এবং শক্তিশালী এক উপাদানের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটতে লাগল, তাও হল অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে গ্রীক, শক, হুন প্রভৃতি যারা এদেশে আসে, তারা ক্রমশ নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলে ভারতবাসীদের মধ্যে মিশে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকে হিন্দুধর্মের প্রচণ্ড ধ্বজাধারী হয়ে উঠেছিল। যে রাজপুতরা নিজেদের হিন্দুকুলচূড়ামণি মনে করতে অভ্যস্ত হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে তো দেখা গিয়েছে যে সম্ভবত তাদের উদ্ভব হয়েছিল বিদেশীদের মধ্য হতে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিদেশাগতদের মধ্যে মুসলমানরাই প্রথম কিছুতেই এদেশের অতিথিপরায়ণ পরিবেশে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাতে রাজী হয় নি, পৃথক সত্তা তারা বজায় রাখতে পেরেছিল।

মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের কারণ

কঠোর একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে একান্ত নিষ্ঠা, বিধর্মী পৌত্তলিকদের প্রতি অনতিক্রম্য ব্যবধান-বোধ ও বিতৃষ্ণা, ইসলামের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত সকলের সম্পর্কে ভ্রাতৃভাব, সামাজিক রীতিনীতিতে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের সংহত করে হিন্দুদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে আরও পুষ্ট করে; এদেশে মুসলমানরা ছিল বিজয়ীর জাতি, তারা শাসক, আর হিন্দুরা সচরাচর ছিল শাসিত, সুতরাং বিজয়গর্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মনে করে রাখা উচিত যে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ সত্ত্বেও মুসলমান যুগে হিন্দু মুসলমান মিলে সমাজ ও সংস্কৃতিতে নূতন রূপান্তর সঙ্ঘটন করেছিল। মহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে

এবং পরে যে তুর্কী ও আফগানেরা এদেশে আসে, প্রকৃতপক্ষে তারা তদানীন্তন ইসলামের সমুচ্চ সভ্যতার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে নি। যে তুর্কী মালিকদের হাতে এদেশের শাসনক্ষমতা ক্রমশ কবলিত হল, তারা বোগদাদ কিংবা কাইরো কিংবা কর্ডোভা-তে যে মুসলিম সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল তার বিশেষ সংবাদই রাখত না। কিন্তু তবুও নূতন এক তেজস্বী, প্রাণবন্ত ধারা ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হওয়ায় দেখা গেল যে মুসলমান তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চললেও ভারতবর্ষের সমন্বয়-প্রতিভা খণ্ডিত হয় নি, মুসলমান শাসনের যুগে বহু দুর্বিপাকের মধ্যেও সমাজ ও সংস্কৃতির নব নব উন্মেষ দেখা গেল।

ভারতাগত মুসলমানগণের সাংস্কৃতিক মান

তেজস্বিতা ও প্রাণপ্রাচুর্য

ভারতের সমন্বয়-ধারার অক্ষুণ্ণতা

স্থলতানী রাষ্ট্রের স্বরূপ

তুর্ক-আফগান শাসনে সরকার পরিচালনার যে পদ্ধতি গড়ে ওঠে, তার ভিত্তি অবশ্যম্ভাবীরূপে সামরিক হয়েছিল। হিন্দু রাজ্যগুলির বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে, দেশের বাইরে থেকে মোঙ্গলদের মতো আক্রমণকারীদের ধাক্কা সামলে, মসনদে বসার আগে প্রায় প্রত্যেক স্থলতানকে ক্ষমতার লড়াইয়ে নেমে শক্তি পরীক্ষা দিতে হওয়ায়, পরিস্থিতি তখন এমন যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বহুলাংশে সমরভিত্তিক হওয়া অনিবার্য ছিল। গোঁড়া মুসলমানের কাছে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র বোগদাদের খলিফাকে সর্বাধিনায়ক বলে মানবার বাধ্যবাধকতা ছিল; কিন্তু দূর দেশে রাজ্য স্থাপন করে স্থলতানরা দেখলেন যে, ঐভাবে খলিফার বশ্যতা ঘোষণা বাস্তব অবস্থায় প্রয়োজন বা সঙ্গত নয়। দিল্লীর একাধিক স্থলতান তাই প্রকাশ্যে খলিফার প্রাধান্য অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এক দিকে খলিফার মর্যাদা বিষয়ে গোঁড়া মুসলমানদের ধারণাকে অমান্য করা, এবং অন্য দিকে শাসন ব্যাপারে বিশেষত দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থায়, উলেমা, মওলানা প্রভৃতি মুসলিম ধর্ম-ব্যাখ্যাতাদের নির্দেশ মেনে চলার দায়িত্ব অস্বীকার করা স্থলতানদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল, আর ঠিক সেজন্যই তাদের সামরিক শক্তি একান্ত অপরিহার্য ছিল।

শাসনের সমর-ভিত্তিক রূপ ও তার কারণ

স্থলতানগণ কর্তৃক খলিফার প্রাধান্যকে অস্বীকার

উলেমার নির্দেশকে অবহেলা

কোরানের বিধিনিষেধ অবশ্যমান্য বলে নিশ্চয়ই ঘোষিত হত, উলেমা প্রভৃতির মর্যাদাও সাধারণত স্বীকৃত হত—কেবল আলাউদ্দীনের মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী স্থলতানের পক্ষেই উলেমাদের উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ধর্মাশ্রয়ী (theocratic) রাষ্ট্র বলতে যা বুঝায়, মুসলিম ভারতে

ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র-রূপের ব্যত্যয়

মাঝে মাঝে তার লক্ষণ দেখা দিলেও এদেশে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা সমীচীন হবে না। প্রায়ই দেখা গেছে যে নিছক ধর্ম ব্যাপারে সুলতানের সম্পূর্ণ স্বকীয় সিদ্ধান্ত সামগ্রিক ভাবে মুসলমানদের জীবনে কার্যকরী হতে পারে নি। ইসলামের শিক্ষায় কতকগুলো গণতান্ত্রিক ধারাও বেশ সুস্পষ্ট হয়েছিল। একই সঙ্গে সম্রাট এবং ধর্মগুরু বলে নিজেকে স্বীকৃত করে নেওয়া সুলতানদের পক্ষে সম্ভব হয় নি; মাঝে মাঝে সেদিকে চেষ্টা হলেও তা স্থায়ী বা সফল হতে পারে নি। অবশ্য সর্ব দেশেই তখন স্বৈরতন্ত্রের যুগ; তাই এদেশেও মুসলমান রাজারা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা; শাসন, বিচার, যুদ্ধ সর্ব বিভাগেই সর্বাধিনায়ক।

সুলতানদের ধর্মগুরুরূপে স্বীকৃতিলাভের অসুবিধা

রাষ্ট্র ব্যাপারে সুলতানের সর্বাধিনায়কত্ব

রাষ্ট্রের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে তখন ছিল সামন্ত সমাজের যুগ। প্রাদেশিক শাসনকর্তা, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ প্রভৃতি নিযুক্ত করা হত সচরাচর অভিজাত বংশীয়দের মধ্য থেকে। সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে এই অভিজাতেরা কেবল সুলতানকেই তাদেরও উচ্চে অধিষ্ঠিত বলে স্বীকার করত। সুযোগ পেলে সুলতান কাকে করা হবে, তা তারাই স্থির করতে চাইত। সুলতানের উত্তরাধিকারী মাঝে মাঝে সুলতান নিজে মনোনয়ন করলেও দেখা গিয়েছে যে, মসনদে কে বসবে তাই নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে, লড়াই পর্যন্ত হচ্ছে; রাজ্য যখন দুর্বল, সুলতান বলে যিনি মনোনীত তাঁর কৃতিত্ব যখন কম, তখন অভিজাতেরাই অনেক সময় সুলতান বাছাই করে দিত। বলবন বা আলাউদ্দীনের মতো শক্তিশালী রাজা তাই এই অভিজাতদের দমন করে রাখতেন, কিন্তু দুর্বল রাজার আমলে তাদের প্রাধান্য রোধ করা শক্ত হত। পাশ্চাত্যের তুলনায় এদেশে অভিজাতরা বংশানুক্রমে মর্যাদা ভোগ করেন নি; তুর্কী, আফগান, হাবসী, মিশরী, আরব ইত্যাদি নানা জাতির লোক অভিজাত পর্যায়ে থাকায় তাদের মধ্যে সংহতি, পরস্পর মৈত্রী কিংবা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মমতার প্রায়ই অভাব দেখা যেত। সুলতানের "মজলিস-ই-খাল্‌ওয়াৎ" কিংবা "বার-ই-খাস" কামরায় তারা বসে মন্ত্রণা দিত, গল্পগুজব করত। সাধারণত তাদেরই মধ্যে থেকে ওয়াজির (প্রধান মন্ত্রী), কাজী-উল-কাজাৎ (প্রধান বিচারপতি) প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ নিয়োগ করা হত। প্রাদেশিক শাসনে, যুদ্ধকালে তাদেরই হাতে ক্ষমতা থাকত। কিন্তু মোটের উপর বলা যায় যে শের শাহ্‌-এর পূর্বে সমগ্র দেশকে বিভিন্ন অংশে নিয়মিতভাবে

অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব

অভিজাত শ্রেণীর প্রকৃতি ও তার ফল

উচ্চতম পদে অভিজাত শ্রেণী

বিভক্ত করে প্রকৃত স্থনিয়ন্ত্রিত বেসামরিক শাসন প্রবর্তিত হয় নি ; মাঝে মাঝে কিছু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এক রকম কাজ চলে গিয়েছে বলে বাস্তবিকই স্থসংগঠিত শাসন পদ্ধতি স্থিরীকৃত হতে পারে নি। তাই মসনদ নিয়ে লড়াই, বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে লড়াই, দেশের ভিতরে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে লড়াই ইত্যাদি নিয়েই রাষ্ট্রের ব্যস্ততা ছিল বেশী। রাজশক্তির কেন্দ্র ছিল সেনানিবাস ও দুর্গগুলি ; সেখানে অভিজাতবর্গ রাজার চেয়ে শক্তিশালী হলেই রাষ্ট্র বিপন্ন হয়ে উঠত। এই যুগের অভিজাত শ্রেণীর একত্র হয়ে স্থলতানের স্বৈরশাসন রোধ করার ইচ্ছা বা শক্তি সাধারণত ছিল না। আবার নিজেরাও ক্ষমতা হস্তগত করার মতো যোগ্যতা তারা দেখায় নি। স্থলতানী শাসনের অধোগতি রোধ করা যে সম্ভব হয় নি সেজন্য এই অভিজাতদের দায়িত্ব তাই কম নয়। এই আমলে রাষ্ট্রের সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র এমনই ছিল যে তার পক্ষে কিছুতেই জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থন অর্জন করা সম্ভব হয় নি। সামরিক ও সাংগঠনিক শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

স্থনিয়ন্ত্রিত বেসামরিক শাসনের অভাব

সামরিক ব্যস্ততা

রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে অভিজাতদের ঔদাসীন্য

রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি

স্থলতানী শাসনে দেশের গ্রাম্য জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেছিল বলে মনে হয় না। হয়তো প্রাচীন পল্লী সমাজব্যবস্থায় যে কথঞ্চিৎ স্বায়ত্তশাসনের স্থযোগ ছিল তা লোপ পায় নি। ধর্মসংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের কাছ থেকে "জাকৎ" বলে কর আদায় করা হত। প্রথম দিকে হিন্দুদের "জিজিয়া" কর দিতে হত ; সামরিক কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি তারা পেত এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে তাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাচ্ছে বলে এই কর আদায় করা হত। পরবর্তী যুগে নিছক ধর্মগত কারণে হিন্দুদের কাছ থেকে "জিজিয়া" একটি বাড়তি কর হিসাবে নেওয়া হত। হিন্দু সামন্ত ও জমিদারদের কাছ থেকে ভূমিকর, স্থলতানের খাস জমি "খালসা" থেকে রাজস্ব, যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ, গৃহকর, গোচারণ-কর, জলকর ইত্যাদি নিয়ে রাজকোষ পুষ্ট করা হত। সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল ; আলাউদ্দীন এ বিষয়ে স্থায়ী সংগঠন নির্মাণ করেন, জায়গীরদারদের উপর নির্ভরশীল হতে তিনি চান নি। পদাতিকদল ছাড়া অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনী ছিল, গোলন্দাজ তখন ছিল না, শুধু পাথর, লোহার গোলক ইত্যাদি নিক্ষেপের একরকম যন্ত্র মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হত। অশ্বারোহীরাই সৈন্যদলে সবচেয়ে বেশী কাজে

গ্রাম্য জীবনের অপরিবর্তনীয়তা

জাকৎ ও জিজিয়া

রাষ্ট্রের অর্থাগমের উৎস

সৈন্যবাহিনীর সংগঠন

সাংগঠনিক ত্রুটি

লাগত। সৈন্যবাহিনীতে হিন্দুরাও থাকত কিন্তু সাধারণত তুর্কী, ইরানী ইত্যাদি বিদেশীর সংখ্যা ছিল বেশী, নায়কেরা হত বিদেশাগত অভিজাত বংশীয় ব্যক্তি। এর ফলে রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে সৈন্যদলের একাত্মবোধ প্রায়ই দেখা যেত না। যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে কারও কোন বিশেষ আবেগ বা আগ্রহ থাকত না।

হিন্দু-মুসলিম জীবনের মিলিত ধারা ও সংস্কৃতির সমন্বয়-প্রবণতা

সুলতানী যুগের প্রামাণিক ইতিহাস

এই যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন জিয়াউদ্দীন বরানী; ইনি মহম্মদ তুঘ্‌লক ও ফিরুজ তুঘ্‌লকের সমসাময়িক ছিলেন। এঁর লেখা "তারিখ-ই-ফিরুজশাহী" প্রামাণিক ইতিহাস বলে গণ্য হয়েছে, পরবর্তী লেখকেরা একে অনুসরণ করেছেন। শাম্‌স-ই-সিরাজ কৃত ইতিহাস এবং ইয়াহিয়া বিন্ আহ্‌মদ সরহিন্দি-র "তারিখ-ই-মুবারকশাহী" এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মুশকিল এই যে বরানী-প্রমুখ গোঁড়া মুসলমান ঐতিহাসিকরা ইসলামের ধ্বজাধারী বলে সুলতানের যেরূপ চরিত্র অঙ্কন করতে ব্যগ্র থেকেছেন, তা থেকে মনে হয় তাঁরা একদেশদর্শী ভাবেই লিখেছেন। মন্দির ধ্বংস, হিন্দুর দেবমূর্তি চূর্ণ করা, বহু হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করানো কিংবা হত্যা করা, এই ধরনের কাহিনী বর্ণনার পিছনে সম্ভবত সুলতানদের কাফের-বিরোধী অভিযান-জনিত গৌরবের অধিকারী বলে দেখাবার সচেতন চেষ্টা আছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মুসলিম বিজয়ের প্রারম্ভে এবং তারপরে বেশ কিছুকাল ধরে মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে বিদ্বেষ, আক্রোশ, আতঙ্কের মনোভাব ছিল। মুসলিম বিজয়ে ধর্মাবেগ একটা বড় অংশ নিয়েছিল। সুতরাং সেই ধর্মাবেগের আতিশয্য যে প্রকাশ পেতে থাকবে তা অস্বাভাবিক নয়। এই জন্য দেখা যায় মিশর থেকে একজন উৎসাহী বিদ্বান আলাউদ্দীনকে লিখেছেন : "শুনেছি আপনি হিন্দুদের এমন দুর্দশা ঘটিয়েছেন যে তাদের স্ত্রীপুত্রকন্যা মুসলমানদের দ্বারে অন্নভিক্ষা করছে। এ কাজটি করে আপনি ধর্মের যথার্থ সেবা করেছেন। এই একটি মাত্র কাজের ফলে আপনার সমস্ত পাপ মুছে যাবে।"

সুলতানের চরিত্রচিত্রণে একদেশদর্শিতা

হিন্দু-নিগ্রহকে প্রাধান্য দান

প্রারম্ভিক অত্যাচার ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

মিশরীয় বিদ্বানের উক্তি

বাস্তব জীবনের তাগিদে ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া

কিন্তু হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে মনান্তর ও পরস্পর বিদ্বেষ যতই হোক না কেন, বাস্তব জীবনের তাগিদ এমনই ছিল যে সবচেয়ে ধর্মান্ধ যারা, তাদেরও ধরন-ধারণ বদলাতে হয়েছিল। মুসলমানরা যখন এদেশ আক্রমণ করে,

তখন তারা সঙ্গে নিজের দেশের চাষীদের নিয়ে আসে নি। ইচ্ছা থাকলেও স্থলতানেরা সৈন্যদের দিয়ে চাষবাসের কাজ চালাতে পারতেন না। তুর্কী আমীরদের হাতে জায়গির তুলে দেওয়া যেত, কিন্তু চাষের কাজ হিন্দুদের হাতেই রাখতে হত। হিন্দু জমিদার ও কৃষকদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সবাইকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার কোন চেষ্টাও করা হয় নি। যদি সে চেষ্টা হত, তা হলে গঙ্গা যমুনায় যে দোয়াব অঞ্চল একটানা সাতশো বৎসর মুসলিম শাসনে থেকেছে, সেখানে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখা যেত না। প্রকৃত পক্ষে ভূমি ব্যবস্থার কোন মূলগত পরিবর্তন হয় নি; পল্লী অঞ্চলের হিন্দুরা মোটামুটি পূর্বেকার মতো জীবনযাত্রা চালিয়ে গিয়েছেন। পরিবর্তন ঘটেছিল ভাসা-ভাসা ভাবে, সমাজের উপর তলায়, শহর অঞ্চলে, সম্পত্তি বিন্যাসে।

হিন্দুচাষীর প্রয়োজনীয়তা

পরিবর্তন শহরে সীমাবদ্ধ, পল্লী অঞ্চলে অব্যাহত জীবনযাত্রা

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও দেখা যায় যে আচমকা একটা বড় দরের পরিবর্তন ঘটে নি। মুসলমান আক্রমণকারীরা সচরাচর ছিল দুঃসাহসী যোদ্ধা; বাণিজ্য বিষয়ে তারা অবজ্ঞা পোষণ করত, বহুকাল থেকে "হুণ্ডি" ইত্যাদি প্রচলনে ব্যবসাক্ষেত্রে ঋণগ্রহণ ইত্যাদি যে রীতি এদেশে স্থাপিত হয়েছিল, তা এই যোদ্ধার দলের কাছে ছিল যেন এক রহস্য। অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা নিযুক্ত ছিল তাদের উপর নানা ভাবে সরকারের চাপ পড়ত; কেন্দ্রীয় সরকার আর প্রাদেশিক শাসক সবাই নানা উপায়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করত। কিন্তু মুসলমান যুগে সর্বদা দেখা গেছে যে হিন্দু "বেনিয়া" অর্থনৈতিক ব্যাপারে অপরিহার্য হয়ে রয়েছে।

প্রকৃতিধর্মে মুসলমানগণের বাণিজ্য-বিমুখতা

হিন্দু বেনিয়ার অপরিহার্যতা

স্থলতানী আমলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মুসলমান কর্তৃপক্ষীয়েরা সর্বদা আক্রোশ ও বিদ্বেষ পোষণ করতেন মনে করা ভুল। এমনও সাক্ষ্য রয়েছে যে আলাউদ্দীন কিংবা ফিরুজ তুঘ্‌লকের মতো যাদের দারুণ হিন্দুবিদ্বেষী বলে দুর্নাম, তাঁরাও কোন কোন হিন্দু ধর্মনেতাকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। পাণিক্কর জানিয়েছেন যে জৈন বৃত্তান্ত থেকে দেখা যায়, সুদূর কর্ণাটক থেকে আচার্য মহাসেনকে এনে আলাউদ্দীন তাঁর সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেছেন, দিল্লীর দিগম্বর জৈন সাধু পূর্ণচন্দ্র এবং শ্বেতাম্বর সাধু রামচন্দ্র স্থরীর সঙ্গে আলাউদ্দীনের সদ্ভাব ছিল। গিয়াসুদ্দীন তুঘ্‌লকের উপর দুইজন জৈন কর্মচারীর নাকি খুব প্রভাব ছিল। স্বয়ং ফিরুজ তুঘ্‌লক হিন্দু বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও কবি রত্নশেখরকে প্রভূত সম্মান দেখাতেন।

স্থলতানদের হিন্দুসাধু প্রীতি

হিন্দু কর্মচারী

কবি রত্নশেখর

নিম্নস্তরের রাজকার্যে হিন্দু নিয়োগ

শাসন ব্যাপারেও দেখা যায় যে প্রদেশ এবং জেলায় রাজপুরুষেরা মুসলমান হলেও নিম্নস্তরের কর্মচারীরা হিন্দুই ছিল। পাটোয়ারী, হিসাবনবিস প্রভৃতি সচরাচর ছিল হিন্দু; গ্রামের মোড়ল প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বভাবতই হিন্দু না হলে চলত না। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল যে উচ্চপদেও হিন্দুরা নিযুক্ত হচ্ছে। মালবে মেদিনী রাও, বাংলায় হুসেন শাহ্-এর আমলে পুরন্দর খান, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কথা সহজে মনে পড়বে। গোলকুণ্ডার সুলতানেরা মাঝে মাঝে হিন্দুদের মন্ত্রিপদে নিয়োগ করতেন। বিজাপুরের য়ুসুফ আদিল শাহ্ শুধু যে হিন্দুদের দায়িত্বশীল কাজে লাগাতেন তা নয়, দপ্তরের দলিল দস্তাবেজ রাখা হত মারাঠী ভাষায়। কাশ্মীরের ঋষিকল্প সুলতান জৈন-উল্-আবেদিন আকবরের পূর্বেই হিন্দুদের সম্পর্কে যে উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ্ সম্বন্ধে হিন্দু প্রজাদের ভক্তিশ্রদ্ধা এমন ছিল যে তারা তাঁকে "জগদ্‌গুরু" আখ্যা দিয়েছিল। হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই সর্বদা শত্রুতার ভাব নিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। যে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্মের ধারক-বাহক, প্রায় অবিরাম মুসলিম প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে যার সঙ্ঘর্ষ চলত, সেই বিজয়নগরে দেখা যায় যে দ্বিতীয় দেবরায় সৈন্যদলে মুসলমানদের নিযুক্ত করছেন। আসাদ খান নামে বিজাপুরের এক বিখ্যাত সেনাপতি বিজয়নগরে মহানবমী উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন। পরাক্রান্ত আলাউদ্দীনের অনিবার্য রোষকে উপেক্ষা করে হিন্দু শিরোমণি হাম্মীরদেব বিদ্রোহী মুসলমান রাজাকে রণথম্বর দুর্গে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন নি। বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাণা সঙ্গের সৈন্যবাহিনীতে একদল মুসলিম যোদ্ধা ছিল। এই ভাবে হিন্দু ও মুসলমানের নৈকট্যকে উভয় পক্ষের পরস্পর প্রীতির লক্ষণ মনে করলে ভুল হবে, অনেক সময়ে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অপর সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন নীতি অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু হয়তো প্রথমটা অনিচ্ছা সত্ত্বে এবং কতকটা অজ্ঞাতসারেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার সূত্রপাত হয়েছিল। আর ক্রমে উভয় সভ্যতার সংমিশ্রণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুফল দেখা দিয়েছিল। শিল্পে, কারুকর্মে, সঙ্গীতে, চিত্রাঙ্কনে, সৌধনির্মাণ রীতিতে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আদব-কায়দায়, আচার-ব্যবহারে, খেলাধূলায়, খানাপিনাতে এই সংমিশ্রণ লক্ষ্য না করে উপায় নেই। এজন্যই সুপণ্ডিত মার্শাল একবার বলেছিলেন যে দুইটি একান্ত

উচ্চপদে হিন্দু

দেশীয় ভাষায় হিসাব রক্ষণ

জৈন্-উল্-আবেদিন

বিজাপুরের সুলতান

হিন্দুরাজ্যে সৈন্যদলে মুসলমান নিয়োগ

হিন্দু উৎসবে মুসলমানের যোগদান

দুই সভ্যতার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়মুখিতা

মার্শাল-এর মন্তব্য

ভাবে পৃথক অথচ বিপুল ও স্থগঠিত সভ্যতার এরূপ সংমিশ্রণের উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গিয়েছে। হিন্দু আর মুসলিম সংস্কৃতি একে অন্যকে গ্রাস করতে পারে নি। কিন্তু পরস্পর প্রভাবিত হয়ে উভয়ের চরিত্রে নবরূপ দেখা দিয়েছিল। বাবর যে এদেশে এসে "একটা বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী ধারা" লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, বরং বাবরের অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থানী ধারা

হিন্দুদের মধ্য থেকে অনেকে যখন মুসলমান হল, তখন স্বভাবতই হিন্দুর আচার-ব্যবহার কতকটা মুসলমান সমাজে প্রবেশের সম্ভাবনা ঘটল। স্থলতানদের অনেকে হিন্দুকন্যা বিবাহ করায় তাই হল। হিন্দুর সাধু-সন্তের মতো মুসলমানদের মধ্যে পীর পয়গম্বর প্রভৃতি সম্মান পেতে লাগলেন। ইসলামে জাতিভেদের কোন স্থান নেই, কিন্তু এদেশে বহুকাল ধরে জাতিভেদ মানুষের মজ্জায় প্রবেশ করেছিল বলে দেখা গেল যে বিবাহাদি ব্যাপারে মুসলমান সমাজেও শ্রেণীগত বৈষম্য লক্ষিত হচ্ছে। পর্দাপ্রথা মুসলমান মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্রমশ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে মেয়েদের অবরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে থাকল। ইসলামের প্রখর প্রভাব থেকে হিন্দু সমাজকে বাঁচাবার জন্য জাতিভেদ প্রথা পূর্বের চেয়ে কঠোর হয়ে উঠল। পূর্বে পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের যে শক্তি হিন্দু সমাজের অনেকটা ছিল তা হ্রাস পেল, সমাজ সঙ্কীর্ণ ও আচারসর্বস্ব হয়ে উঠতে লাগল। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এই সঙ্কীর্ণতা ও জাতিভেদ, মেয়েদের অবরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে কঠোরতা খুব বেশী দেখা গেল। যারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক, তাদের অস্থবিধা বৃদ্ধি পেল, জাতের বিড়ম্বনায় তাদের আত্মসম্মান কেবলই আহত হতে থাকল। সন্দেহ নেই যে হিন্দু সমাজের এই অনুদার মূর্তি অনেককে ঠেলে দিল মুসলমান সমাজের দিকে, সেখানে অন্তত "জাতের নামে বজ্জাতি" মানুষের মর্যাদাকে ক্রমাগত ছোট বড় নানা আঘাতে খণ্ডিত করত না। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের মধ্যেই দেখা দিল সমাজসংস্কারের বাণী নিয়ে সাধু-সন্তের আবির্ভাব, ধর্মের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে সহজ সরল মর্মস্পর্শী কথায় তাঁরা মানুষের মহিমা প্রচার করলেন।

মুসলিম সমাজে হিন্দু ধারার অনুপ্রবেশ

হিন্দু সমাজে পর্দাপ্রথার প্রবর্তন

জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি

নিম্নশ্রেণীর মধ্য থেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ

সংস্কৃতির সজ্ঘাতের উপর প্রতিক্রিয়া

সংস্কার আন্দোলন

হিন্দু রক্ষণশীলতার প্রকাশ দেখা গেল ১৩৩৫ থেকে ১৩৬০ সালের মধ্যে লেখা, বিজয়নগরের মাধব বিদ্যারণ্য-কৃত পরাশর-স্মৃতির উপর

স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যার মাধ্যমে রক্ষণশীলতার প্রকাশ

টীকাগ্রন্থ "কালনির্ণয়", কিংবা বিশ্বেশ্বর-কৃত "মদন পারিজাত" গ্রন্থে (১৩৬০-৭০)। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার কুল্লুকভট্ট, এবং শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৫-১৫৩৩) সমসাময়িক রঘুনন্দনের স্মৃতি-বিষয়ক রচনা এ দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য। মুসলিম আক্রমণ যখন চলছে, তখন মেধাতিথি নূতন সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে স্মৃতি-বিধান আলোচনা করেছিলেন; সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল হিন্দু আইন ও রীতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত সুবিখ্যাত গ্রন্থ "মিতাক্ষরা"। চতুর্দশ শতাব্দীতে চণ্ডেশ্বর স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে নিবন্ধ লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

অপর দিকে দেখা যায় রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য, একনাথ, নানক ও বামনপণ্ডিতের ন্যায় মহাজনকে। মুসলমানের আগমনে বিপন্ন বোধ করে হিন্দু সমাজগ্রন্থিকে আরও কঠোর করে তোলার কথা তাঁদের মনে স্থান পায় নি। উভয় ধর্ম ও সমাজের নিকট-সংস্পর্শের ফলে এক নূতন ও উদার ধর্মচিন্তার সাক্ষাৎ তখন পাওয়া যায়। ইসলাম এদেশে যে প্রখর একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য ও ধর্মাবেগ উপস্থাপিত করেছিল, তারই সংস্পর্শে ভারতবর্ষীয় চিন্তার ধারা প্রভাবিত হল। শিব বা কৃষ্ণ বা দেবী বা অপর যে কোন নামে ভগবানকে আহ্বান করা হোক না কেন, তিনি যে এক ও অভিন্ন, এবং ভক্ত যে শুধু তাঁরই কাছে প্রাণের আবেগ উৎসর্গ করছে, এ কথা নানা ভাবে ও ভঙ্গীতে এই সাধু-সন্তদের মুখ থেকে শোনা গেল। পৌত্তলিকতা ও বহু দেবদেবীর উপাসনা যে মূলত অযৌক্তিক, তাই হল এ কথার তাৎপর্য, কিন্তু ইসলামের মতো তাঁরা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান প্রয়োজন মনে করেন নি। তাছাড়া জাতিভেদ ও আচার-সর্বস্বতা যে একেবারে অন্তঃসারশূন্য, তা বলতে তাঁরা কখনও কুণ্ঠিত হন নি। দক্ষিণ ভারতে ইতিপূর্বে যে ভক্তি আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কল্পনা করে এই সাধু-সন্তেরা এ যুগে নূতন করে সেই আন্দোলনের জোয়ার প্রবাহিত করে দিলেন। স্থফী সাধুদের রচনার সঙ্গে এর প্রগাঢ় সাদৃশ্য আছে; হিন্দু মুসলমানের ধর্মচিন্তায় এই আত্মীয় সম্পর্ক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পথকে সুগম করতে সহায় হল। তখনকার সাধু-সন্তদের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু আর মুসলমানকে যে একত্র দেখতে পাওয়া গেল, তা খুবই স্মরণীয়।

নূতন উদার ধর্মচিন্তার উদ্ভব

মুসলিম প্রভাব: এক ও অভিন্ন ভগবান

জাতিভেদ ও আচারসর্বস্বতার প্রতিবাদ

ভক্তি-আন্দোলন

হিন্দু মুসলিম ধর্মচিন্তার সাদৃশ্য

বৈষ্ণব দর্শনের দিকপাল রামানুজাচার্যের শিষ্য রামানন্দ সম্ভবত

এলাহাবাদের লোক, বারাণসী ছিল তাঁর প্রচার কেন্দ্র। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় নি। তবে জানা গেছে যে তিনি কনৌজী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন। তিনি রাম নাম করে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই শিষ্য বলে গ্রহণ করতেন, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি আর সঙ্কীর্ণতার তিনি প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। তাঁর যে বারোজন প্রধান শিষ্য, তাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিল এবং নাপিত, মুচি, মুসলমান জোলা প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক দেখা যায়; জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি তিনি মানতেন না। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য কবীর হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, তাই নিয়ে তর্ক আছে; কেউ কেউ বলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে মুসলমান তাঁতির ঘরে মানুষ হয়েছিলেন। কবীরের জীবনকাল সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে, মতদ্বৈধ নেই শুধু তাঁর প্রচারিত বাণীর সরল মহিমা সম্বন্ধে। হিন্দু বা মুসলমানের স্বতন্ত্র ধর্মানুষ্ঠানে তাঁর কোন আস্থা ছিল না। আল্লা আর রামে কোন প্রভেদ নেই, হিন্দু আর মুসলমান একই মাটির তৈরী দুইটি পাত্র বিশেষ, অন্তরের কলুষ দূর করে মানুষ যদি প্রার্থনা করে তো তা একই ভগবানের কাছে পৌছাবে, মানুষে মানুষে তফাত নেই, সবাই মানুষ আর সব ধর্মই এক—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। সরল হিন্দীতে রচিত কবীরের "দোঁহা" বা দুই পংক্তির কবিতাগুচ্ছ সাহিত্যের সম্পদ, ভাবের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই "দোঁহা"গুলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে রামানন্দ ও কবীরের শিষ্য ছিল অসংখ্য, উত্তর ভারতে তাঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

রামানন্দ

জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিষ্যত্বে গ্রহণ

কবীর

কবীরের উদার ধর্ম

কবীরের শিক্ষা

কবীরের দোঁহা

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকে তাঁর এক পরম বিদ্বান ও ধার্মিক হওয়ার মতো বহু লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যখন তাঁর বয়স চব্বিশ, তখন সংসার পরিত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থান পর্যটন করে প্রেম ও বৈরাগ্যের বাণী প্রচার করতে থাকেন; কথিত আছে যে পুরীতে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন (১৫৩৩)। বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে চৈতন্য হলেন সর্বাগ্রগণ্য; তাঁর ভক্তি ও প্রেমমূলক প্রচারের মাহাত্ম্য এক দিকে বৃন্দাবন পর্যন্ত, এবং অপর দিকে দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত উড়িষ্যায়, বিস্তৃত হয়েছিল। জাতিভেদ তাঁর কাছে গ্রাহ্য ছিল মনে হয় না; তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন "যবন হরিদাস"। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে

শ্রীচৈতন্য

সন্ন্যাস গ্রহণ

শ্রীচৈতন্যের প্রচার-মাহাত্ম্যের বিস্তৃতি

বাংলায় নব যুগের সূচনা

নয়, বাংলার সমাজের ইতিহাসে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব এক নব যুগের সূচনা করেছিল।

তুকারাম ও রামদাস

মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, নামদেব প্রভৃতি সাধু-সন্ত যে মহৎ পরম্পরা সৃষ্টি করেন তা পরবর্তী যুগে তুকারাম, রামদাস পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। ভগবানকে লাভ করা যায় প্রেম ও ভক্তি দিয়ে, মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই, বিভিন্ন ধর্ম হল একই লক্ষ্যে পৌছাবার আলাদা রাস্তা, এই সমস্ত শিক্ষা তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে ১৪৬৯ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন এক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, নানক নামে যিনি শিখ ধর্মের প্রবর্তক বলে কীর্তিত হয়েছেন। গুরুমুখ-নিঃসৃত যে বাণী শিখ ধর্ম-গ্রন্থে রয়েছে, তা সর্বজনের কাছেই পরম শ্রদ্ধার্হ ; উপনিষদের শিক্ষাকে তুলে ধরে সহজ ভাবে ও ভাষায় একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন নানক। মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের নিন্দাবাদ তিনি করেন; হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ তিনি মানতে চান নি, উভয় সম্প্রদায়ের লোক সাগ্রহে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সহিষ্ণুতা, পরস্পর সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। শুধু শিখদের ধর্মগুরু বললে তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না; সে যুগের ধর্ম-আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোধা, ইতিহাসে ভাস্বর স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন।

ধর্মমত

নানক

নানকের একেশ্বরবাদ

হিন্দু মুসলমান উভয়কেই শিষ্যত্বে গ্রহণ

নানকের মাহাত্ম্য

ভক্তিবাদের প্রাচীনত্ব

ভক্তিবাদ ভারতবর্ষে তখন নূতন নয়, বহুদিন পূর্বেই তার পত্তন হয়েছিল। পঞ্চরাত্র, ভাগবত প্রভৃতি চিন্তাধারা খুবই প্রাচীন। রামানুজ ও বল্লভাচার্যের মতো মনীষী তার দার্শনিক ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন। জয়দেব থেকে মীরাবাই পর্যন্ত বহু কবি ও স্রষ্টার রচনায় তা পুষ্ট হয়েছে। কিন্তু একথাও বলা প্রয়োজন যে ভক্তি আন্দোলনের আকস্মিক প্লাবন যেমন একদিক থেকে দেখলে হিন্দু ও মুসলিম ভাবধারার সংমিশ্রণের সৃষ্টি, তেমনই অন্য দিক থেকে মুসলমান শাসনে বাস্তব জীবন ব্যাপারে আশা-হত হিন্দুমনের পলায়নী প্রবৃত্তিরও পরিচায়ক মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। গীতায় ভক্তিযোগের কথা আছে, কিন্তু মীরা কিংবা চৈতন্য যেভাবে ভক্তি-মার্গের ব্যাখ্যা করেছেন, তার সঙ্গে গীতার সাদৃশ্য অল্প ; ভক্তির আবেগে মাতোয়ারা হওয়া আর গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শের মধ্যে বিপুল প্রভেদ আছে। অবশ্য চৈতন্যের শিক্ষায় জ্ঞানের স্থান নগণ্য নয়, কিন্তু ভক্তিরসের প্রাবল্যে আর সব কিছু নিমজ্জিত হয়ে গেছে। চতুর্দশ ও

ভক্তিবাদের পুষ্টি

সমসাময়িক ভক্তিবাদের স্বরূপ

প্রাচীন ও আলোচ্য ভক্তি-বাদের পার্থক্য

পঞ্চদশ শতাব্দীর ভক্তি আন্দোলন এবং গীতায় শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য, তা তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা মনে রাখলে বুঝা যাবে। যাই হোক, আলোচ্য সময়ে ভারতের বহু অঞ্চলে ভক্তিবাদের প্রচারে জনগণের মনপ্রাণ আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। তখন হিন্দু ও মুসলিম ধর্মচিন্তার মধ্যে যে সমন্বয় চেষ্টা ঘটেছিল, তাতে মুসলমান ফকির ও সন্তদের অবদান অল্প নয়। নিজাম্‌উদ্দীন আউলিয়া, শাহ্‌ জালাল, মৈনউদ্দীন চিস্তি প্রভৃতি মহাত্মারা আজও হিন্দু মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। কথিত আছে যে বাংলার হুসেন শাহ্‌-এর আমলে সত্যপীরের পরিকল্পনায় হিন্দু ও মুসলমানের একাত্মবোধ প্রকাশ পায়। আজও উভয় সম্প্রদায়ের লোক মুসলমান ফকিরদের দরগায় "শিন্নি" দেয়, মানত করে। বিশেষত বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলিম ভাবধারার এই মিলন যে কত স্পষ্ট, তা দেখা যায় পীরের গান, গ্রাম্য ছড়া ইত্যাদি লোক-সাহিত্যের মধ্যে।

ধর্মীয় সমন্বয়-সাধনে মুসলমান ফকিরদের অবদান

বাংলায় হিন্দু মুসলমানে একাত্মবোধ

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবে এবং দুই শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের ফলস্বরূপ দেখা গেল যে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটছে, লোকসাহিত্যের প্রসার ও উৎকর্ষ বাড়ছে। চাঁদ বরদই-এর মতো লেখকের হাতে হিন্দী সুপরিণত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু রামানন্দ এবং কবীর সরল হিন্দী ভাষায় প্রচার করলেন বলে যে হিন্দীর ভাবসমৃদ্ধি ও প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি পেল, তাতে সন্দেহ নেই। একনাথ প্রভৃতি সন্তের বাণী মারাঠী ভাষায় প্রচারিত হওয়ায় মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যে সৌষ্ঠব ও শিল্পরস দেখা দিল। নানক এবং তাঁর শিষ্যেরা যে ভাষায় প্রচার করলেন, গাথা লিখে দিলেন, তাই হল "গুরুমুখী", পঞ্জাবের ভাষা। বাংলার বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবির রচনা এবং রাজস্থানে ব্রজভাষায় মীরাবাঈয়ের অপরূপ ভজন সাহিত্যকে যেন নূতন রস সিঞ্চন করে সঞ্জীবিত করল।

হিন্দী

মারাঠী

গুরুমুখী

বাংলা ও ব্রজভাষা

ধর্মনির্বিশেষে এদেশের সুলতান আর রাজারা যে প্রায়ই সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, কবি ও শিল্পীরা যে তাঁদের কাছে প্রভূত উৎসাহ ও সাহায্য পেতেন, তার পরিচয় আমরা পূর্বে বহুবার পেয়েছি। বিদ্যাপতি ছিলেন এক হিন্দু রাজার সভাকবি। গৌড়রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস

সুলতান ও রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা

বিদ্যাপতি

কৃত্তিবাস

বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন ; "কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস তুমি" বলে উনবিংশ শতকের মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন তাঁকে সম্বোধন জানিয়েছেন।

কবি বিজয়গুপ্ত

মালাধর বসু

বাংলার স্থলতান হুসেন শাহ্-এর প্রশস্তি গেয়েছেন "মনসামঙ্গল" কাব্যের বিখ্যাত কবি বিজয়গুপ্ত। বর্ধমানের মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কাব্য রচনা করে হুসেন শাহ্-এর কাছ থেকে "গুণরাজ খান" উপাধি পেয়েছিলেন। হুসেন শাহ্-এর পুত্র নসরৎ শাহ্ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন ;

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

তাই তাঁরই নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন, পদ্মপুরাণেরও তরজমা প্রকাশ হয়।

ফারসী ভাষার উন্নতি

দিল্লীর স্থলতানরা ফারসী ভাষা সম্পর্কে উৎসাহ পোষণ করায় সেকালে এদেশে ফারসী সাহিত্যের কিছু উন্নতি হয়েছিল। অবশ্য তুর্ক-আফগান যুগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার বিরাট মুসলমান বিদ্বান-দের সঙ্গে তুলনীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। মাত্র একজন মনীষীরই

আমীর খসরু

নাম করা যায়, যিনি ছিলেন সর্ববিদ্যাপারংগম—আমীর খসরু। বল্‌বনের রাজ্যকালে এঁর সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয় ; দীর্ঘকাল জীবিত থেকে গদ্যে-পদ্যে বহু ফারসী গ্রন্থ লিখে তিনি অমর হয়ে আছেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ বলে তাঁর খ্যাতি সহজে ম্লান হবে না। হিন্দীর তিনি

উর্দু ভাষা

অনুরাগী ছিলেন ; ফারসী শব্দ ঢুকিয়ে পশ্চিমী হিন্দীকে উর্দু বলে এক নূতন অথচ মূলত ভারতীয় ভাষার প্রবর্তনে তাঁর অবদান কম নয়।

জৌনপুরে বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র

বহমনি রাজ্য

জৌনপুরে, বিশেষত স্থলতান ইব্রাহিম শাহ্ শার্কীর আমলে বিদ্যাচর্চা খুব হত ; সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছিল। বহমনি রাজ্য ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকেও শিল্পসাহিত্য ব্যাপারে উদাসীন ছিল না।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি সে যুগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃত ভাষার চর্চা একেবারে লোপ পায় নি। গুজরাটে হেমচন্দ্র সূরীর "পুরুষ-চরিত" প্রভৃতি সংস্কৃত রচনা, আলাউদ্দীনের কালে লেখা "পৃথ্বীরাজ-বিজয়" ও "হাম্মীর বিজয়", মহারাণা কুম্ভের লেখা গীতগোবিন্দের টীকা, বস্তুপালকৃত "নরনারায়ণীয়", রূপগোস্বামীর বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রভৃতির কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এ ছাড়া অবশ্য সায়ণ, মাধবাচার্য, রঘুনন্দন প্রভৃতির কথাও স্মরণীয়। সাধারণের জীবন থেকে

সংস্কৃতচর্চার গুরুত্ব

বিচ্যুত হয়ে গেলেও সংস্কৃত তখনও ছিল কাশ্মীর থেকে কেরল পর্যন্ত শিক্ষিত হিন্দুর অবশ্যপঠনীয় ভাষা। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে

সংস্কৃতের সম্পর্ক তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় নি; "দেবভাষা"-র দুহিতা বলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সংস্কৃতের অপার সম্পদ থেকে অবিরাম ঋণগ্রহণেও সমর্থ রইল।

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ে নূতন শিল্পরীতির বিকাশ

সুলতানী যুগে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে নূতন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে, তার চমৎকারিতা এদেশের গর্বের বস্তু। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য শুধু অভিনব নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টির দিক থেকে তার মূল্য প্রভূত। তাজমহল প্রভৃতি মুঘল যুগের শিল্পকীর্তি পূর্ববর্তী যুগের সৃষ্টিকে ম্লান করে দিয়েছে মনে করা ভুল হবে। শুধু যে এদেশের মুসলমান স্থাপত্যের স্থানীয় নমুনা কিংবা হিন্দু শিল্পেরই এক পরিবর্তিত রূপ তখন দেখা দিয়েছিল, তা নয়; হিন্দু ও মুসলিম ভাবধারার সমন্বয়ে এক বিশিষ্ট রূপসৃষ্টি তখন সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ অঞ্চল এবং যুগের ছাপও স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়। দিল্লীতে কুতবমিনার এবং অল্পাধিক একই রীতিতে নির্মিত মসজিদ, ইমারত ইত্যাদিতে হিন্দুস্থাপত্যের অলঙ্কার যে পরিমাণে ছিল, তুঘ্‌লক শাসনে নির্মিত মসজিদ, প্রাসাদ প্রভৃতিতে তা বর্জিত হয়ে এক কঠোর, নিরাভরণ রূপ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দিল্লী অঞ্চল থেকে দূরে গেলেই ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের প্রকৃত পরিচয় তখন পাওয়া যেত। জৌনপুর, মালব, পাণ্ডুয়া, গৌড়, গুজরাট, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ইত্যাদি স্থানে বৈচিত্র্য ও শিল্পোৎকর্ষ সম্পন্ন স্থাপত্যের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। ইতিপূর্বে তার কিছু উল্লেখও করা হয়েছে। কুতবমিনার, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মসজিদ, কুতব-মিনারের কাছে আলাই দরওয়াজা, জৌনপুরের অতাল মসজিদ, আহ্‌মদাবাদের জুম্মা মসজিদ, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসুল, গুলবর্গার জুম্মা মসজিদ, দৌলতাবাদের চাঁদ মিনার, মাণ্ডুর জুম্মা মসজিদ, গুলবর্গাতে ফিরুজ শাহ্‌ বহমনির কবর, বিজাপুরে মহম্মদ আদিল শাহের সমাধি ইত্যাদি বহু সৌধের উল্লেখ করা চলে। গুজরাটের স্থাপত্য রীতিতে মুসলিম প্রভাব বেশ প্রকট। শিল্পীরা অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু, তবে মুসলমানরা প্রধান স্থপতি হতেন। বহুস্থলে হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাংশ দিয়ে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, হিন্দু শিল্পকর্ম মুসলিম পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের শিল্পক্ষেত্রে স্ফুরণ মুঘল যুগে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু তার পত্তন হয় সুলতানী আমলে। এই যুগে হিন্দু স্থাপত্যের যে দৃষ্টান্ত আছে, তাও খুব স্মরণীয়; দূরে অবস্থিত বিজয়নগর বা উড়িষ্যার মন্দিরের কথা

নূতন শিল্প-রীতির স্বরূপ

শিল্পে আঞ্চলিক ও কালিক বৈশিষ্ট্য

নূতন শিল্পধারার নিদর্শন

হিন্দু মুসলিম স্থাপত্যের আদর্শ

বিশুদ্ধ হিন্দু শিল্পনিদর্শন

ছেড়ে দিলেও মনে পড়বে চিতোরের জয়স্তম্ভের কথা। যার উৎকর্ষ একান্তই নিঃসন্দিগ্ধ।

দেশের সাধারণ অবস্থা

ভারতের সম্পদ-প্রাচুর্য

সে যুগে মার্কো পোলো, ইবন বতুতা, চীন দেশের মা-হুয়ান, পারস্যের আবদুর রজাক-প্রমুখ বহু বিদেশী পর্যটকের কথা থেকে বুঝা যায় যে ভারতবর্ষ ছিল প্রকৃতই বিপুল সম্পদের অধিকারী। কৃষিকর্ম ছিল অধিকাংশ ভারতবাসীর বৃত্তি, সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর, জাতীয় সম্পদের মূলাধার ছিল কৃষি। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ হয়েছিল প্রভূত; দেশের ভিতরে বাণিজ্য, এবং বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক, উভয়ই অগ্রসর হয়েছিল। আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী হওয়ায় দেশের আর্থিক লাভ হত বেশী; আমদানি হত সাধারণত বিলাসের উপকরণ, ঘোড়া ইত্যাদি, আর রপ্তানি হত বস্ত্র, শস্য, নীল, রেশম, মশলা ইত্যাদি। সরকারের পক্ষ থেকে শিল্পের উন্নতি সাধনে বিশেষ কোন উদ্‌যোগিতা না থাকলেও বাণিজ্য ইত্যাদি মোটের উপর ভালোভাবে চলত বলা যেতে পারে। নিকিতিন, নিকোল, কোন্তি, বার্বোসা, বার্থেমা, ইবন বতুতা, আবদুর রজাক প্রভৃতি পর্যটকের কথা থেকে তদানীন্তন ভারতের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। বিদেশীরা নাকি এদেশে সোনা হাতে নিয়ে আসে, আর সে সোনা এ দেশেই রেখে যায়—এই ছিল তাদের কথা।

কৃষিনির্ভর সমাজ

ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি ও রপ্তানির আধিক্য

আমদানি-রপ্তানি-যোগ্য পণ্য

ভারতের ঐশ্বর্য সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের মন্তব্য

জনসাধারণের জীবনযাত্রা

জনসাধারণের জীবনযাত্রা কি ভাবে চলত, তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা এখানে সম্ভব নয়। মনে হয় যে তখনও এদেশের জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ অতিরিক্ত বাড়ে নি বলে হয়তো সাধারণ কৃষকের অবস্থা বর্তমান যুগের তুলনায় খুব খারাপ ছিল না। ইবন বতুতা বাংলা দেশে দ্রব্যমূল্য অসম্ভব সস্তা বলে গেছেন; এক টাকায় তিন জনের সংসার এক মাস বেশ চলত। কিন্তু গরীবের হাতে একটা টাকাও তখন যে সহজে আসত না, তাও পরিষ্কার। ধনী দরিদ্রে তারতম্য যে ক্রমে বাড়ছিল, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের অত্যাচারে আর রাজশক্তির দুর্বলতা বা অকর্মণ্যতার ফলে গরীবের দুর্দশাও বাড়ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এক পর্তুগীজের লেখা থেকে দেখা যায় যে বাংলা দেশে জিনিসের দাম বেশী; ইবন বতুতার কথা ছিল ঠিক এর উলটো। সম্ভবত পল্লী অঞ্চলে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান এক রকম সহজে হত, কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে

মূল্য সম্পর্কে ইবন বতুতা

জনসাধারণের ক্রমবর্ধিত দুর্দশা

দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তার উপশম ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না। শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ প্রায় ছিল না; শহরে কি ঘটে, রাষ্ট্রের উত্থান-পতন ইত্যাদি ব্যাপার কখন কেন হয়, সেদিকে সাধারণ গ্রামবাসীর কোন ধারণা বা আগ্রহ ছিল না; ফলে সুসংহত সমাজে বহুমুখী উন্নতির যে সম্ভাবনা থাকে, তা তখন ছিল না। যাই হোক, বিদেশী পর্যটকেরা এক দিকে যেমন এদেশের অপার ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন, তেমনই জনসাধারণের দুর্দশাও তাঁদের দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। সামন্তপ্রথা ইতিহাসের সর্বত্র যা দেখিয়েছে, এদেশেও তাই দেখা গিয়েছিল। রাজা আর তাঁর সভাসদেরা, আমীর-ওমরাহ্ আর জায়গিরদার-জমিদারের দল অকাতরে অর্থব্যয় করতেন, বিলাসব্যসনে ব্যয় করতেন, মহাসমারোহে প্রাসাদ বা দেবালয় নির্মাণ করাতেন; কিন্তু সমাজের নীচের তলায় যারা, তাদের দুর্ভোগ চলতে থাকত; উপরে প্রদীপের আলো, তার নীচেই গাঢ় অন্ধকার। এজন্যই আমীর খসরু স্বয়ং সভাকবি হয়েও বলেছিলেন: "গরীবের চোখ থেকে ঝরে-পড়া অশ্রুবিন্দু জমাট হয়ে রাজমুকুটের প্রতিটি প্রবালকে গড়েছে।" এই গরীবেরই পরিশ্রমে যুগ যুগ ধরে শ্রেণীসমাজের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিনিদর্শন সৃষ্টি হয়েছে; এরাই ছুটে গিয়ে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য, নামদেবের কাছে প্রেম আর ভক্তির বাণী শুনে নিজেদের দুর্দশা ও জীবনের গ্লানি ভুলে থাকতে চেয়েছে। সহস্র লাঞ্ছনার উর্ধ্বে উঠে বারবার ইতিহাসে জীবনের জয় ঘোষিত হয়েছে মেহনতী মানুষের অপরাজেয় শক্তির মাধ্যমে।

সমাজের স্থাণুরূপ

সামন্ততন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য

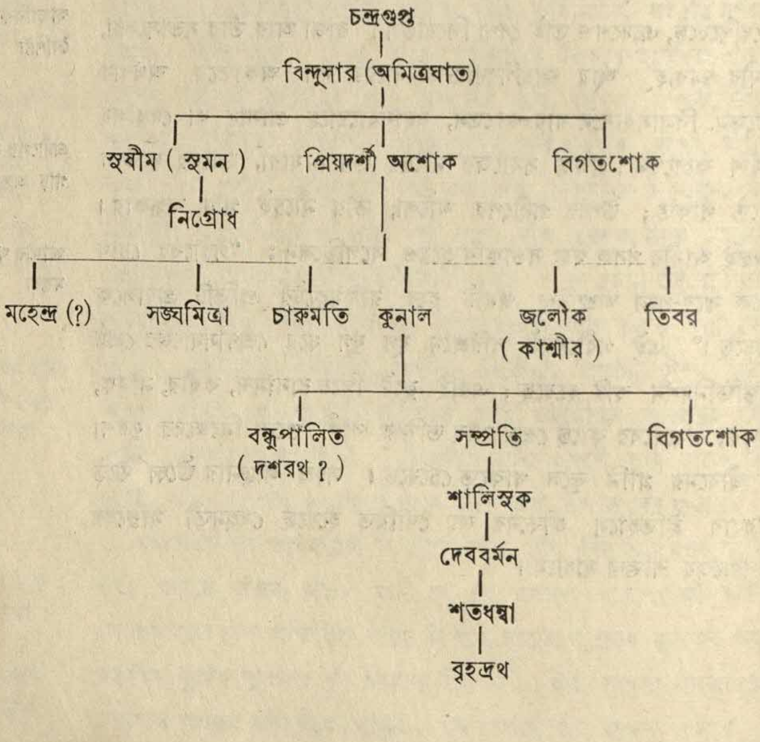
প্রদীপের নীচে গাঢ় অন্ধকার

আমীর খসরুর মন্তব্য

পরিশিষ্ট [ক]

কুলপঞ্জী

মৌর্য বংশ



গুপ্তবংশ

- মহারাজ গুপ্ত
  - ঘটোৎকচ
    - চন্দ্রগুপ্ত ১ম = কুমারদেবী (লিচ্ছবি)
      - সমুদ্রগুপ্ত
        - চন্দ্রগুপ্ত ২য় (বিক্রমাদিত্য)
          - গোবিন্দগুপ্ত (ত্রিহুত)
          - কুমারগুপ্ত ১ম (মহেন্দ্রাদিত্য)
            - স্কন্দগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য)
            - পুরুগুপ্ত (শ্রীবিক্রম)
              - নরসিংহ গুপ্ত (বালাদিত্য)
                - কুমার গুপ্ত ২য় (বিক্রমাদিত্য)
                  - বিষ্ণু গুপ্ত
              - বুধগুপ্ত
          - প্রভাবতী (বাকাটক বংশের রানী)

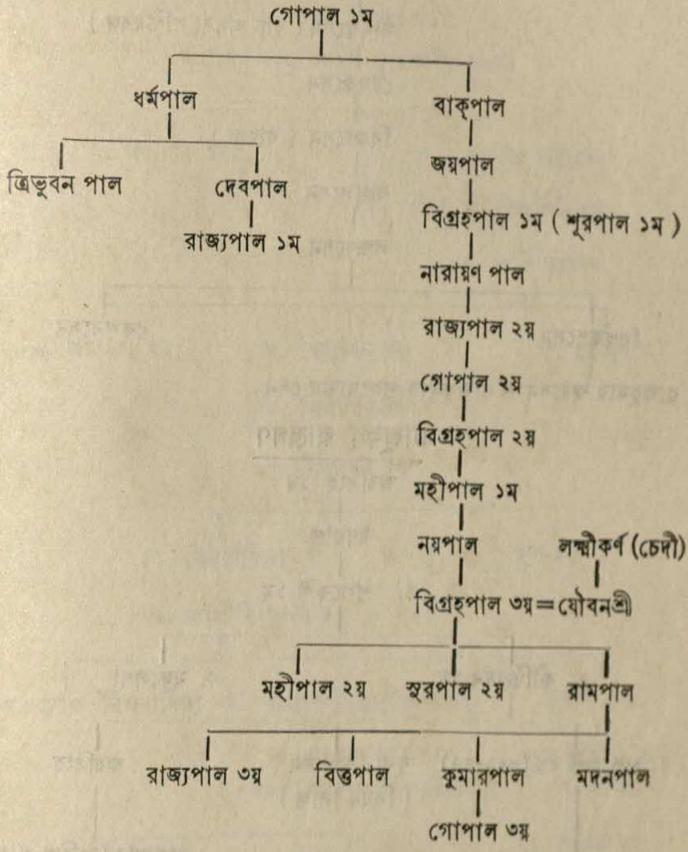
পুষ্যভূতি বংশ

- নরবর্ধন (থানেশ্বর)
  - রাজ্যবর্ধন ১ম
    - আদিত্যবর্ধন
      - প্রভাকরবর্ধন
        - রাজ্যবর্ধন ২য়
        - হর্ষবর্ধন (শিলাদিত্য) [থানেশ্বর ও কনৌজ]
          - কন্যা = ধ্রুবসেন ২য় (বলভী)
            - ধরাসেন (৪র্থ বলভী)
        - রাজ্যশ্রী (মৌখরী বংশের রানী)

প্রতীহার সাম্রাজ্য

- নাগভট ১ম
- অজ্ঞাত
  - কাকুস্থ
  - দেবরাজ (দেবশক্তি)
    - বৎসরাজ
      - নাগভট ২য় (মারু, কনৌজ)
        - রামভদ্র (রামদেব)
          - মিহিরভোজ বা ভোজ ১ম (প্রভাস, আদিবরাহ)
            - যুবরাজ নাগভট
            - মহেন্দ্রপাল ১ম
              - মহীপাল ১ম
                - দেবপাল (?)
                  - মহীপাল ২য় (?)
                - বিজয়পাল (?)
                  - রাজ্যপাল (?) (কনৌজ ও বারী)
                    - ত্রিলোচন পাল (?) (বারী)
                      - যশপাল (?)
              - ভোজ ২য়
              - বিনায়কপাল (হর্ষ)
                - মহেন্দ্রপাল ২য়

বাংলার পালবংশ ও গহরওয়াল



বাংলার সেনবংশ

- বীরসেন
  - সামন্তসেন (রাঢ় অথবা পশ্চিমবঙ্গ)
    - হেমন্তসেন
      - বিজয়সেন (বাংলা)
        - বল্লালসেন
          - লক্ষ্মণসেন
            - বিশ্বরূপসেন
              - রাজকুমার সূর্যসেন ও রাজকুমার পুরুষোত্তম সেন
            - কেশবসেন

চালুক্য রাজগণ

- জয়সিংহ ১ম
  - রণরাগ
    - ১. পুলকেশী ১ম
      - ২. কীর্তিবর্মন ১ম
        - ৪. পুলকেশী ২য় (৬০৯-৪২)
          - চন্দ্রাদিত্য
          - আদিত্যবর্মন
          - ৫. বিক্রমাদিত্য ১ম (৬৫৫-৮০) (রণরসিক)
            - ৬. বিনয়াদিত্য (৬৮০-৯৬)
              - ৭. বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩)
                - ৮. বিক্রমাদিত্য ২য় (৭৩৩-৪৬)
                  - ৯. কীর্তিবর্মন ২য় (৭৪৬-৫৭)
                - ভীম ১ম
          - জয়সিংহ
        - কুব্জ বিষ্ণুবর্মন (বিষম সিদ্ধি)
      - ৩. মঙ্গলেশা
        - জয়সিংহ
          - নাগবর্ধন (নাসিখ শাখা)

পূর্ব চালুক্য বংশ

১. কুব্জ বিষ্ণুবর্ধন ১ম
(চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর ভ্রাতা)

২. জয়সিংহ ১ম
৩. ইন্দ্র ভট্টারক
৪. বিষ্ণুবর্ধন ২য়
৫. মাঙ্গি যুবরাজ

৬. জয়সিংহ ২য়
৮. বিষ্ণুবর্ধন ৩য়
৭. কোক্কিলি

৯. বিজয়াদিত্য ১ম
১০. বিষ্ণুবর্ধন ৪র্থ

১১. বিজয়াদিত্য ২য়
নৃপ-রুদ্র

১২. কালীবিষ্ণুবর্ধন ৫ম

১৩. গুণক বিজয়াদিত্য ৩য়
যুবরাজ বিক্রমাদিত্য ১ম
যুধমল্ল ১ম

১৪. চালুক্য-ভীম ১ম
(১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাভিষেক)
১৮. তারপ, তাড়প
বা তাল ১ম

১৫. বিজয়াদিত্য ৪র্থ
১৯. বিক্রমাদিত্য ২য়
২১. যুধমল্ল ২য়

১৬। আম্মা ১ম, বিষ্ণুবর্ধন ষষ্ঠ
('রাজমহেন্দ্র')
২২. চালুক্য-
ভীম ৩য়
২৩. বাড়প
তাল ২য়
('বিষ্ণুবর্ধন')

১৭. বীতবিজয়াদিত্য ৫ম
২০. ভীম ২য়

২৪. দানার্নব
২৩. আম্মা ২য় (৯৪৫-৭০)
'বিজয়াদিত্য ষষ্ঠ', 'রাজমহেন্দ্র'

২৪. দানার্নব

২৫. শক্তিবর্মন

২৬. বিমলাদিত্য (১০১১-২২)
প্রথম রাজরাজ চোলের কন্যা
কুন্দুব্বাকে বিয়ে করেন।

২৭. রাজরাজ নরেন্দ্র ১ম (১০২২-৬৩)
প্রথম রাজরাজ চোলের কন্যা অম্মঙ্গাদেবীকে
বিয়ে করেন।

বিজয়াদিত্য ৭ম
(ভেঙ্গির রাজপ্রতিনিধি)

২৮. রাজেন্দ্র ৩য় (১০৭০-১১২২)
(পূর্ব চালুক্য ও চোল রাজ্য ঐক্যবদ্ধ করেন
এবং কুলোত্তুঙ্গ নামে রাজ্য শাসন করেন।
দ্বিতীয় রাজেন্দ্রদেব চোলের কন্যা
মদুরান্তকীকে বিয়ে করেন।

রাষ্ট্রকূট বংশ

দন্তিবর্মন ১ম

ইন্দ্র ১ম

গোবিন্দ ১ম

কর্ক বা কক্ক ১ম

ইন্দ্র ২য়
দন্তিদুর্গ (দন্তিবর্মন ২য়)
(৭৫৪)

কৃষ্ণরাজ ১ম (৭৬৮-৭২)

নন্ন
শঙ্করগণ (৭৯৩)

গোবিন্দরাজ ২য়

ধ্রুব

কম্ব
'স্তম্ভ', 'রণাভলোক'

গোবিন্দ ৩য় (৭৯৩-৮১৪)

ইন্দ্র ৩য়
(লাত শাখা)

অমোঘবর্ষ ১ম (৮১৪-৭৭)
(নৃপতুঙ্গ)

অমোঘবর্ষ ১ম (৮১৪-৭৭)
(নৃপতুঙ্গ)

- কৃষ্ণ ২য় (৮৭৭-৯৩)
  (চেদীরাজ বা কলচুরী কোক্কল্লর মেয়েকে বিয়ে করেন।)
  - জগত্তুঙ্গ
    (কলচুরী রাজকুমারী লক্ষ্মীকে বিয়ে করেন।)
    - ইন্দ্র ৩য় (৯১৫-২৭)
      (কলচুরী রাজকুমারী বিজাম্বাকে বিয়ে করেন।)
      - অমোঘবর্ষ ২য় (৯১৭-১৮)
      - গোবিন্দ ৪র্থ (৯১৮-৩৪)
        'সাহসাঙ্ক'
    - বদ্দিগ বা অমোঘবর্ষ ৩য়
      (৯৩৪-৩৯)
      - কন্যা রেবেকা
        (পশ্চিম গঙ্গরাজ ২য় ভুতুগাকে বিয়ে করেন।)
      - কৃষ্ণ ৩য় (৯৩৯-৬৮)
        - একপুত্র
          - ইন্দ্র ৪র্থ
            (মৃত্যু ৯৮২)
      - খোট্টিগ (৯৬৮-৭২)
      - নিরুপম
        - কক্কল বা কর্‌ক ২য় বা অমোঘবর্ষ ৪র্থ
          (৯৭২-৭৩)
- কন্যা শঙ্খা
  (পল্লভরাজ ৩য় নন্দীবর্মনকে বিয়ে করেন।)

কল্যাণের চালুক্য বংশ

বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩)
|
ভীম ১ম
|
কীর্তিবর্মন ৩য়
|
তৈলপ বা তৈল ১ম
|
বিক্রমাদিত্য ৩য়
|
ভীম ২য়
|
অজ্জন ১ম

অজ্জন ১ম
|
বিক্রমাদিত্য ৪র্থ
(চেদিরাজ লক্ষণের কন্যা বঁথাদেবীকে বিয়ে করেন।)
|
১. তৈলপ বা তৈল ২য়, 'আহবমল্ল' (৯৭৩-৯৭)
(রাষ্ট্রকূটরাজ কক্ক-এর কন্যা জাকবীকে বিয়ে করেন।)
|
- ২. সত্যাশ্রয়, ইরিববেদঙ্গ (৯৯৭-১০০৮)
- দশবর্মন্ বা যশোবর্মন্
  - ৩. বিক্রমাদিত্য ৫ম (১০০৮-১৪)
  - ৪. অজ্জন ২য় (১০১৪-১৫)
  - ৫. জয়সিংহ ২য় (১০১০-৪২) ('জগদেকমল্ল')
    - ৬. সোমেশ্বর ১ম (১০৪২-৬৮) ('আহকমল্ল')
      - ৭. সোমেশ্বর ২য় (১০৬৮-৭৬)
      - ৮. বিক্রমাদিত্য ষষ্ঠ (১০৭৩-১১২৭) ('ত্রিভুবনমল্ল')
        - জয়কর্ণ (ত্রৈলোক্যমল্ল)
        - ৯. সোমেশ্বর ৩য় (১১২৭-৩৮) ('ভূলোকমল্ল)
          - ১০. পার্শ, জগদেকমল্ল ২য় (১১৩৮-৫১)
          - ১১. তৈলপ ৩য় (১১৫১-৫৩) 'স্থরমদি তৈল', 'ত্রৈলোক্যমল্ল' (মৃত্যু ১১৬৩)
            - ১২. সোমেশ্বর ৪র্থ (১১৮৪-১২০০) 'ত্রিভুবনমল্ল'
        - কন্যা মৈলাল দেবী (গোয়ার কদম্ব বংশীয় ২য় জয়কেশিনের সঙ্গে বিয়ে হয়।)
      - জয়সিংহ
      - বিষ্ণুবর্ধন (বিজয়াদিত্য)
    - কন্যা হন্মা বা আবল্লাদেবী (সেউন দেশের তৃতীয় যাদবপ্রধান ভীল্লমকে বিয়ে করেন।)

পল্লভ রাজগণ

- সিংহবর্মন্ ৪র্থ
  - বিষ্ণুগোপ ৩য়
    - সিংহবর্মন্ ৫ম
      - সিংহবিষ্ণু
        - মহেন্দ্রবর্মন্ ১ম
          - নরসিংহবর্মন্ ১ম (৬২৫-৪৫)
            - মহেন্দ্রবর্মন্ ২য়
              - পরমেশ্বরবর্মন্ ১ম (৬৭৪)
                - নরসিংহবর্মন্ ২য়
                  - পরমেশ্বরবর্মন্ ২য়
                  - মহেন্দ্রবর্মন্ ৩য়
      - ভীমবর্মন্
        - বুদ্ধবর্মন্
          - আদিত্যবর্মন্
            - গোবিন্দবর্মন্
              - হিরণ্যবর্মন্
                - নন্দীবর্মন্ ২য় (৭১৭-৮২)
                  - দন্তিবর্মন্ (রাষ্ট্রকূট বংশীয় ৩য় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত)
                    - নন্দীবর্মন্ ৩য়
                      - নৃপতুঙ্গ
                      - বিজয়কম্প ?

চোলরাজগণ

- বিজয়ালয় (৮৪৭-৭১)
  - আদিত্য ১ম (৮৭১-৯০৭)
    - পরান্তক ১ম (৯০৭-৫৩)
      - রাজাদিত্য ১ম (৯৪৭-৪৯)
      - গণ্ডরাদিত্য (৯৪৯-৫৭)
        - মদুরান্তক উত্তম (৯৬৯-৮৫)
      - অরিঞ্জয় (৯৫৬-৫৭)
        - পরান্তক ২য় (৯৫৬-৭৩) ('সুন্দর চোল')

- পরান্তক ২য় (৯৫৬-৭৩) ('সুন্দর চোল')
  - আদিত্য ২য়, (৯৫৬-৬৯) বা 'করিকাল ২য়'
  - 'মহামহিম' রাজরাজ ১ম (৯৮৫-১০১৮)
    - রাজেন্দ্র চোল ১ম (১০১৮-৪৩)
      - কন্যা অম্মঙ্গদেবী (পূর্ব চালুক্যরাজ রাজরাজ ১ম)
        - রাজেন্দ্র চোল ৩য় (১০৭০-১১২২) 'কুলোত্তুঙ্গ চোল ১ম
          - রাজরাজ (ভেঙ্গির রাজপ্রতিনিধি)
          - মুম্মদি চোল (ভেঙ্গির রাজপ্রতিনিধি)
          - বীর চোল (ভেঙ্গির রাজপ্রতিনিধি)
          - বিক্রম চোল (১১১৮-৩৫)
            - কুলোত্তুঙ্গ চোল ২য় (১১৩৩-৫০)
              - রাজরাজ ২য় (১১৪৬-৭৩)
      - রাজাধিরাজ ১ম (১০৪৪-৫৪)
      - রাজেন্দ্রদেব ২য় (১০৫২-৬৪)
        - রাজমহেন্দ্র (১০৬০-৬৩)
        - কন্যামধুরান্তকী (পূর্বচালুক্যরাজ ৩য় রাজেন্দ্রকে বিবাহ করেন
      - বীর রাজেন্দ্র (১০৬৩-৬৯)
        - অধিরাজেন্দ্র (১০৬৭-৭০)
        - কন্যা (কল্যাণের ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যকে বিয়ে করেন)
    - কন্যা কুন্দব্বা (পূর্ব চালুক্যরাজ বিমলাদিত্যের সহিত বিবাহ হয়)

পরবর্তী রাজগণ

রাজাধিরাজ ২য় (১১৬৩-৭৯)
কুলোত্তুঙ্গ ৩য় (১১৭৮-১২১৮)
রাজরাজ ৩য় (১২১৬-৪৬)
রাজেন্দ্র ৪র্থ (১২৪৬-৭৯)

তথাকথিত দাসবংশ

(১২০৬—৯০)

- ১. কুতবউদ্দীন আইবক (মৃত্যু : ১২১০) (মৈজউদ্দীন মহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস) (১২০৬-১০)
  - ২. আরামশাহ্ মৃত্যু : ১২১১
  - ৩. ইলবারী তুর্ক সামসউদ্দীন ইলতুৎমিশ (জামাতা) (ক্রীতদাস) (১২১১-৩৬)
    - সিরউদ্দীন মাহ্মুদ (বাংলা)
    - ৪. রুকনউদ্দীন ফিরুজশাহ্ (১২৩৬ সালের নভেম্বরে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত)
      - ৭. আলাউদ্দীন মাস্থদ (১২৪২-৪৬)
    - ৫. কন্যা, রাজিয়া (১২৩৬-৪০)
    - ৬. মুইজউদ্দীন বহ্রাম (১২৪০-৪২)
    - ৮. নাসিরউদ্দীন মাহ্মুদ (১২৪৬-৬৬)
      - কন্যা
    - ৯. গিয়াসউদ্দীন বলবন (ক্রীতদাস) (১২৬৬-৮৭)
      - যুবরাজ মহম্মদ
        - ১০. মৈজউদ্দীন কায়কাবাদ (১২৮৭-৯০)
      - নাসিরউদ্দীন মাহ্মুদ বুগরা খাঁ (বাংলা)

দিল্লীর খলজী সুলতানগণ

(১২৯০-১৩২০)

১. জালালউদ্দীন ফিরুজ
(১২৯০-৯৬)

মস্থদ (সিয়বউদ্দীন)

২. ইব্রাহিম রুকনউদ্দীন
(স্বল্পস্থায়ী রাজত্ব)

৩. আলাউদ্দীন
(১২৯৬-১৩১৬)

যুবরাজ খিজির খাঁ

শাদী খাঁ

৪. উমর শিয়াবউদ্দীন
(প্রায় ৯৯ দিনের রাজত্ব)

৫. কুতবউদ্দীন মুবারক
(১৩১৬-২০)

৬. নাসিরউদ্দীন খসরু
(স্বল্পস্থায়ী রাজত্ব)

তুঘলক বংশ

(১৩২০-১৪১৩)

১. গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহ্ ১ম
(বলবনের তুর্কী ক্রীতদাস—গাজী মালিক)
(১৩২০-২৫)

রজব = ভট্টি রাজকুমারী

৩. ফিরুজ বিন্ রজব
(১৩৫১-৮৮)

২. মহম্মদ-বিন্-তুঘলক
(১৩২৫-৫১)

ফতে খান

জাফর খান

৫. আবু বকর
(গদীচ্যুত, ডিসেম্বর ১৩৯০)

৬. মহম্মদ শাহ নাসিরউদ্দীন
(১৩৮৯-৯৪)

৪. গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহ্ ২য়
(গদীচ্যুত ও নিহত)

৮. নশরৎ শাহ্

৭. আলাউদ্দীন
(হুমায়ুন খাঁ
মৃত্যু : ৮ই মার্চ, ১৩৯৪)

৯. মাহমুদ শাহ্
(১৩৯৪-১৪১৩)

ইলিয়াসশাহী বংশ

- শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪৫-৫৭)
  - সিকন্দর শাহ্ (১৩৫৭-৯৩)
    - গিয়াস্উদ্দীন আজম শাহ্ (১৩৯৩-১৪১০)
      - সইফউদ্দীন
        - শামসউদ্দীন ২য়
        - শিহাবউদ্দীন বায়জীদ
          - ফিরুজ
  - নাসিরউদ্দীন মাহ্মুদ শাহ্ ১ম
    - রুক্ন্উদ্দীন বারবক শাহ্
      - শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ্
        - সিকন্দর শাহ্ ২য়
    - জালালউদ্দীন ফতে শাহ্
      - নাসিরউদ্দীন মাহ্মুদ ২য়

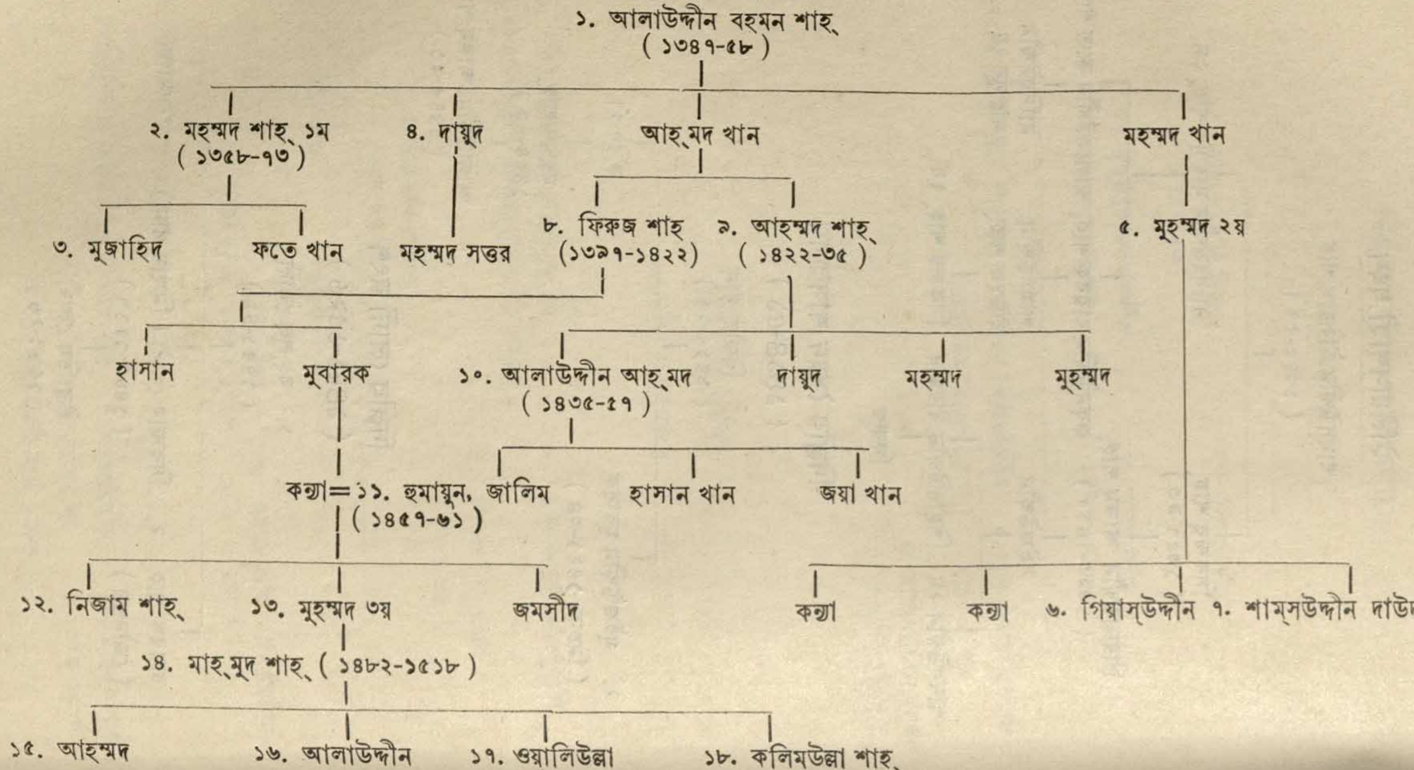
দিল্লীর সৈয়দ শাসকগণ (১৪১৪-৫১)

- ১. খিজীর খান (১৪১৪-২১)
  - ২. মুইজউদ্দীন মুবারক (নিহত, ১৪২১-৩৪)
  - ফরিদ খাঁ
    - ৩. মহম্মদ শাহ্ ১৪৩৪-৪৯)
      - ৪ আলাউদ্দীন, আলম শাহ্ (১৪৪৫-৫১)

দিল্লীর লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

- ১. বহ্লুল লোদী (১৪৫১-৮৯)
  - বারবক শাহ্ (জৌনপুর)
  - ২. সিকন্দার লোদী (নিজাম খান) (১৪৮৯-১৫১৭)
    - ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬)
  - আলম

বহমনি রাজ্য
(১৩৪৭-১৫২৬)



হোসেনশাহী বংশ

১। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্
(১৪৯৩—১৫:৮)

- ২। নস্‌রৎ শাহ (১৫১৮-৩৩)
  - ৩। আলাউদ্দীন ফিরুজ
- ৪। গিয়াসউদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ্
  - কন্যা = খিজির খাঁ

কররানী বংশ

জামাল

- তাজ খাঁ
- স্থলেমান
  - বায়জিদ
  - দায়ুদ খাঁ
- ইমদ
- ইলিয়াস

পরিশিষ্ট [খ]

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর পূর্বের সিন্ধু সভ্যতা
" ২৫০০ বৎসর পূর্বে বৈদেশিক যুগের আরম্ভ
" ১৪০০ সন (আনুমানিক) পশ্চিম এশিয়ায় আর্য দেবতার উল্লেখ।
" প্রথম শতাব্দী—রোম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক
" ২য় শতকে তামিলগণ কর্তৃক সিংহল অধিকার
" ষষ্ঠ শতাব্দী—মগধের অভ্যুদয়
" " মহাবীরের আবির্ভাব
" ৫৬৭ বুদ্ধের আবির্ভাব
" ৫২৭ মহাবীরের মৃত্যু
" ৪৮৬ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ
" ৩২৭-৩২৬ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ
" ৩২৪ চন্দ্রগুপ্তের বা মৌর্য বংশের অভ্যুদয়
" ৩২৩ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু
" ৩০১ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু
" " বিন্দুসারের সিংহাসন আরোহণ
" ২৭৩ বিন্দুসারের মৃত্যু
" ২৭৩-২৩২ অশোকের রাজত্ব অভ্যুদয়
" ১৮৩ সুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা
" ১৭১ ইউক্রেটাইডিস্ কর্তৃক ব্যাক্‌টি য়ার সিংহাসন দখল
" " পহ্লবগণ কর্তৃক সিন্ধু উপত্যকায় শাসন প্রতিষ্ঠা
" ৫৭ 'বিক্রম সম্বৎ'-এর প্রতিষ্ঠাতা, মালবরাজ যশোধর্মন্ কর্তৃক উজ্জয়িনীকে শক আক্রমণ থেকে রক্ষা ও 'বিক্রমাদিত্য' ও 'শকারি' উপাধি গ্রহণ
" ২৬-২০ পাণ্ড্যরাজ কর্তৃক রোমান সম্রাট অগস্টসের নিকট দূত প্রেরণ
" ১৩ রোমে ভারতবর্ষের বাঘ প্রদর্শিত হয়
খ্রীষ্টাব্দ ৪৩-৪৪ তক্ষশীলায় পহ্লব রাজ্য প্রতিষ্ঠা
" ৭৮ শকাব্দের প্রবর্তন
" ১০৫ চীনে কাগজের আবিষ্কার

খ্রীষ্টাব্দ ১১৯ বা ১২৫—কণিষ্কের রাজ্যভার গ্রহণ
" ১১৯-২৪ শকক্ষত্রপ নহপানের রাজ্যকাল
" ১৫০ দক্ষিণ ভারতের চের-বংশের অভ্যুদয়
" ১৯০ কারিকলচোল কর্তৃক সিংহলের কিয়দংশ অধিকার
" ২৮৪ বাকাটক বংশীয় ১ম প্রবর সেন কর্তৃক নিজেকে 'সম্রাট' ঘোষণা
" ৩২০ ১ম চন্দ্রগুপ্তের 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ ও সিংহাসন আরোহণ এবং 'গুপ্তাব্দ' প্রচলন
" ৩৩০ ১ম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু
" ৩৩০-৭৫ সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল
" ৩৮০ গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ (?)
" ৩৯৯ চীন থেকে ভারতবর্ষের উদ্দেশে ফা-হিয়েন-এর যাত্রা
" ৪১৪ ফা-হিয়েন-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
" ৪১৪-৫৫ ১ম কুমারগুপ্ত, 'মহেন্দ্রাদিত্য'-এর রাজ্যকাল
" ৪১৪ ফা-হিয়েন-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
" ৪৫৫-৬৭ স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকাল
" ৪৯৫ হূন নায়ক তোরমান কর্তৃক পঞ্জাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা
" ৫২৫-৭৫ বাংলায় গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেবের রাজ্যকাল
" ৫২৮ গুপ্তবংশের শেষ রাজা বালাদিত্যগুপ্তের নিকট মিহিরগুলের পরাজয়
" ৫৩০ মালবরাজ যশোবর্মনের নিকট হূনদের পরাজয়
" ৬০৪ রাজ্যবর্ধন কর্তৃক হূন আক্রমণ প্রতিহত
" ৬০৫ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু ও রাজ্যবর্ধনের সিংহাসন আরোহণ
" ৬০৬ এই সময়ের কিছু পূর্বে বাংলা দেশের প্রথম সার্বভৌম নরপতি শশাঙ্ক কর্তৃক গৌড়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা
" ৬২৫-৪৫ পল্লবরাজ নরসিংহবর্মনের রাজ্যকাল
" ৬২৯ চীন থেকে হিউয়েন সাং-এর ভারত অভিমুখে যাত্রা
" ৬৩০-৪৪ ভারতে অবস্থিতি
" ৬৩৪ চালুক্যরাজ ২য় পুলকেশীর নিকট হর্ষবর্ধনের পরাজয়
" ৬৩৭ শশাঙ্কের মৃত্যু
" ৬৪১ হর্ষবর্ধন কর্তৃক মগধ অধিকার
" ৬৪২ পল্লভরাজ নরসিংহ বর্মন-এর নিকট দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাজয়

খ্রীষ্টাব্দ ৬৪৩ হর্ষ কর্তৃক 'ধর্মসভা'র অনুষ্ঠান
" ৪৬ বা ৬৪৭ হর্ষবর্ধনের মৃত্যু
" ৬৭২ মধ্যদেশে আদিত্য সেনের অভ্যুদয়
" ৭০০-৪০ যশোবর্মনের রাজ্যকাল
" ৭১১ মুসলিম শক্তি কর্তৃক স্পেন কবলিত
" ৭১১-১২ ইরাকের শাসনকর্তা হাজাজ কর্তৃক সিন্ধুদেশ আক্রমণ
" ৭১৩ মহম্মদ বিন্ কাশিম কর্তৃক সিন্ধুদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা
" " আরব কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ
" ৭৩১ যশোবর্মন কর্তৃক চীনে দূত প্রেরণ
" ৭৪০ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কর্তৃক কাঞ্চী নগরী অধিকার
" ৭৫২ রাষ্ট্রকূট বংশীয় দন্তিদুর্গের নিকট চালুক্যদের পরাজয়
" ৭৬০ কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের মৃত্যু
" ৭৭০-৮১০ ধর্মপালের রাজ্যকাল
" ৮১০-৫০ দেবপালের রাজ্যকাল
" ৮১৫-৭৭ রাষ্ট্রকূটবংশীয় অমোঘবর্ষের রাজ্যকাল
" ৮১৫-৭৭ সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের রাজ্যকাল
" ৮৩৬ প্রতীহার বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মিহিরভোজের সিংহাসন অধিকার
" ৮৫৫ কাশ্মীরে উৎপলবংশীয় অবন্তীবর্মন কর্তৃক কর্কট বংশের উচ্ছেদ সাধন ও সিংহাসন অধিকার
" ৯০৭ (অনুমানিক) চোলরাজ পরান্তক (১ম)-এর সিংহাসন লাভ
" ৯৩৭ ঐতিহাসিক অল্‌বেরুনির জন্ম
" ৯৬২ তুর্কী আলপ্‌তিগীন কর্তৃক আফগানিস্তানের গজনীতে রাজ্যস্থাপন
" ৯৭৩ রাষ্ট্রকূট শক্তির বিলোপ
" ৯৮৫-১০১৮ চোলরাজ রাজরাজের রাজ্যকাল
" ৯৮৮ সবুক্তগীন কর্তৃক শাহীরাজ্য আক্রমণ
" ৯৮৮-১০৩৮ মহীপালের রাজ্যকাল
" ৯৯৭ সবুক্তগীনের মৃত্যু
" ৯৯৮-১০৩০ সুলতান মাহ্‌মুদের রাজ্যকাল

খ্রীষ্টাব্দ ১০০১ পিতৃশত্রু জয়পালের সঙ্গে সুলতান মাহ্‌মুদের সংঘর্ষ ও জয়পালের পরাজয়
„ ১০০১-০৮ মাহ্‌মুদ-আনন্দপাল সংঘর্ষ
„ ১০১৪ সুলতান মাহ্‌মুদ কর্তৃক থানেশ্বর অভিযান ও লুণ্ঠন
„ ১০১৮ ঐ কনৌজ অভিযান ও লুণ্ঠন
„ ১০১৯ ঐ মথুরা অভিযান ও লুণ্ঠন
„ ১০১৮-৪৩ প্রথম রাজেন্দ্রচোলের রাজ্যকাল
„ ১০২৬ অবিরাম তুর্কী আক্রমণে শাহী রাজবংশ ধ্বংস
„ „ কাথিয়াবাড়ের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন
„ ১০৩০ গজনীতে সুলতান মাহ্‌মুদের মৃত্যু
„ ১০৭৬-১১৪৭ গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্ম চোড়গঙ্গের রাজ্যকাল
„ ১১৫৮ বল্লালসেন কর্তৃক বাংলার সিংহাসন আরোহণ
„ ১১৭৫ মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান
„ ১১৭৫-৭৬ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমের নিকট ঘুরীর পরাজয়
„ ১১৭৯ লক্ষ্মণসেন কর্তৃক বাংলার সিংহাসন লাভ
„ ১১৯০ নব চালুক্য বংশের রাজত্বের অবসান
„ ১১৯০-৯১ তরাইনের প্রথম যুদ্ধ
„ ১১৯২ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ
„ ১১৯৪ কনৌজের পতন
„ ১১৯৭ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ধ্বংসস্তূপে পরিণত
„ ১২০৩ মহম্মদ ঘুরীর গজনীর সুলতানী লাভ
„ ১২০৬ মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু
„ „ কুতবউদ্দীন কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন লাভ
„ ১২১১-৩৬ ইলতুৎমিসের রাজ্যকাল
„ ১২৩৬-৪০ সুলতানা রাজিয়ার রাজ্যকাল
„ ১২৩৮-৬৪ কোনারকের সূর্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নরসিংহের রাজ্যকাল
„ ১২৪০ সুলতানা রাজিয়ার মৃত্যু
„ ১২৪১ মোঙ্গল কর্তৃক লাহোর দখল
„ ১২৪২-৪৬ আলাউদ্দীন মাসুদ শাহের রাজ্যকাল
„ ১২৪৬-৬৬ নাসিরউদ্দীনের রাজ্যকাল
„ ১২৬৬-৮৭ গিয়াসউদ্দীন বল্‌বনের রাজ্যকাল

খ্রীষ্টাব্দ ১২৭৯ বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্‌রিল খানের বিদ্রোহ
" ১২৮৭ সুলতান গিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বনের মৃত্যু
" ১২৮৭-৯০ সুলতান কায়কাবাদের রাজ্যকাল
" ১২৯০ খল্‌জী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা
" ১২৯০-৯৬ জালালউদ্দীন ফিরুজের রাজ্যকাল
" ১২৮৮ ও ১২৯২ ইতালিয়ান পর্যটক মার্কোপোলোর পাণ্ড্যরাজ্য পরিদর্শন
" ১২৯২ জালালউদ্দীনের নিকট মোঙ্গলদের পরাজয়
" " আলাউদ্দীন কর্তৃক মালব আক্রমণ
" ১২৯৬ ও ১২৯৯ মোঙ্গল কর্তৃক ভারত আক্রমণ
" ১২৯৬ আলাউদ্দীনের সিংহাসন অধিকার
" ১২৯৭ আলাউদ্দীন কর্তৃক গুজরাট আক্রমণ
" ১৩০১ সুলতান আলাউদ্দীন কর্তৃক রণথম্বর দুর্গ আক্রমণ
" ১৩০৭-০৮ পঞ্চম ও শেষ মোঙ্গল আক্রমণ
" ১৩০৯ দেবগিরির স্বাতন্ত্র্য লোপ
" ১৩১০ সুলতান আলাউদ্দীন কর্তৃক দ্বারসমুদ্র আক্রমণ
" " মালিক কাফুর কর্তৃক চোলশক্তি নিশ্চিহ্ন
" ১৩১৬ সুলতান আলাউদ্দীনের মৃত্যু
" ১৩১৬-২০ সুলতান মুবারক শাহের রাজ্যকাল
" ১৩১৮ চিতোরের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার
" ১৩২০ গিয়াসউদ্দীন তুঘলক কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার
" ১৩২৬-২৭ দিল্লী থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত
" ১৩৩৩ ইব্‌ন বতুতার মরক্কো থেকে ভারতে আগমন
" ১৩৩৬ সমরকন্দে তৈমুরলঙ্গের জন্ম
" " বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
" ১৩৪৫ শাহ্‌ মির্জা কর্তৃক সামস্‌উদ্দীন শাহ্‌ উপাধি নিয়ে বলপূর্বক কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার
" ১৩৪৫-৫৭ শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজ্যকাল
" ১৩৫১ মহম্মদ তুঘ্‌লকের মৃত্যু
" ১৩৫৭-৯৭ সিকন্দর শাহের রাজ্যকাল
" ১৩৫৮-৭৩ মহম্মদ শাহের রাজ্যকাল
" ১৩৯৭-১৪২২ সুলতান ফিরুজ শাহের রাজ্যকাল

খ্রীষ্টাব্দ	১৩৯৮	তৈমুরের পৌত্র পীর মহম্মদ কর্তৃক মুলতান দখল
"	১৩৯৯	তৈমুরের ভারত ত্যাগ
"	১৪০৫	তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু
"	১৪০৬-২২	প্রথম দেবরায়ের রাজ্যকাল
"	১৪১১-৪২	আহ্‌মদ শাহের রাজ্যকাল
"	১৪১৫	ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার কংসনারায়ণ কর্তৃক বাংলার সিংহাসন অধিকার
"	১৪২০-৭০	কাশ্মীরের নরপতি জৈন-উল্‌-আবেদিনের রাজ্যকাল
"	১৪২২-৩৫	আহ্‌মদ শাহের রাজ্যকাল
"	১৪২২-৪৬	দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজ্যকাল
"	১৪৩৫-৫৭	সুলতান আলাউদ্দীনের রাজ্যকাল
"	১৪৩৭	বহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
"	১৪৪৬-৬৫	রাজা মল্লিকার্জুনের রাজ্যকাল
"	১৪৫৭-৬১	হুমায়ুন শাহের রাজ্যকাল
"	১৪৬৫-৮৬	রাজা বিরূপাক্ষের রাজ্যকাল
"	১৪৭০-৭৪	রুশ পর্যটক আথানেসিয়স নিকিটিনের বহমনি রাজ্যে ভ্রমণ
"	১৪৮২-১৫১৮	সুলতান মাহ্‌মুদ শাহের রাজ্যকাল
"	১৪৮৫-১৫৩৩	শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাল
"	১৪৮৯	বহ্‌লুল খান লোদী কর্তৃক গোয়ালিয়র জয়
"	১৪৮৯-১৫১৭	সিকন্দর লোদীর রাজ্যকাল
"	১৪৯৩-১৫১৮	হুসেন শাহের রাজ্যকাল
"	১৫০৮	মাহ্‌মুদ বেগর্‌হার সঙ্গে পর্তুগীজদের সঙ্ঘর্ষ
"	১৫০৯	রাণা সংগ্রামসিংহের সিংহাসন আরোহণ
"	১৫১৭-২৬	ইব্রাহিম লোদীর রাজ্যকাল
"	১৫১৮	হুসেন শাহের মৃত্যু
"	১৫১৮-৩৩	নসরৎ শাহের রাজ্যকাল
"	১৫২৬	বহমনি রাজ্যের বিলোপ
"	"	ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ও মৃত্যু
"	১৫২৭	খানুয়ার যুদ্ধ
"	১৫৩৪	বাহাদুর শাহ কর্তৃক চিতোর দুর্গ আক্রমণ
"	১৫৫৯-৬৮	রাজা মুকুন্দ হরিচন্দনের রাজ্যকাল
"	১৫৬১	মালবের মুঘল সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্তি
"	১৫৬৫	তালিকোটার যুদ্ধ
"	১৫৭২	গুজরাটের মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি
"	১৫৭৬	আকবর কর্তৃক বাংলাকে মুঘলের অন্তর্ভুক্তি
"	১৫৮৯	কাশ্মীরের মুঘল সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্তি
"	১৬৩৭	শাহজাহান কর্তৃক আহ্‌মদনগর অধিকার

পরিশিষ্ট [গ]

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

প্রাচীনকাল থেকে মুঘল আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস আয়ত্ত করতে হলে বহু গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য। একাধারে বহু তথ্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিতে সন্নিবদ্ধ আছে :

Cambridge History of India, Vols. I-III ; R. C. Majumdar & A. D. Pusalker (ed.), *The Vedic Age* ; *The Age of Imperial Unity* ; *The Classical Age* ; *The Age of Imperial Kanauj* ; *The Struggle for Empire* ; R. C Majumdar & A. S. Altekar (ed.), *New History of the Indian People* ; K. A. Nilakanta Sastri (ed.), *A Comprehensive History of India*, Vol. II ; Vincent A. Smith, *Early History of India* ; *Oxford History of India* ; Rapson, *Ancient India* ; Rhys Davids, *Buddhist India* ; Radhakamal Mukherjee, *A History of Indian Civilization* ; Ishwari Prasad, *Medieval India* ; S. Lane-Poole, *Medieval India* ; Majumdar, Ray Choudhury and Dutta, *An Advanced History of India* ; K. M. Panikkar, *A Survey of Indian History* ; K. A Nilakanta Sastri, *A History of South India* ; N. K. Sinha & A. C. Banerjee, *A History of India* ; বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "ভারতের ইতিবৃত্ত"।

ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে নিম্নোক্ত বইগুলি দেখা দরকার :

Mc Grindle, *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian* ; *Kautilya Arthasastra* (ed. Shama Shastry) ; Hultzsch, *Inscriptions of Asoka* ; *Periplus of the Erythraean Sea* ; Rapson, *Catalogue of Indian Coins* ; Fleet, *Inscriptions of the Early Gupta Kings* ; *Travels of Fa Hien* ; Walters, *On Yuan-Chwang* ; Sewell & Aiyangar, *Historical Inscriptions of Southern India* ; K. A. Nilakanta Sastri, *Foreign Notices of South India* ; *Alberuni's India* (Tr. Sachan) ; Eliot and Dowson, *History of India as told by her own Historians* ; N. G. Majumdar, *Inscriptions of Bengal*.

কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ এখানে উল্লিখিত হল :

Cunningham, *Ancient Geography of India*; Marshall, *Mohenjo-daro and the Indus Civilisation* ; E. Mackay, *Indus Valley Civilisation* ; Pargiter, *Dynasties of the Kali Age* ; H. C. Raychaudhury, *Political History of Ancient India* ; *Early History of the Vaishnava Sect* ; Hopkins, *Great Epic of India* ; Kern, *Manual of Indian Buddhism* ; V. A. Smith, *Asoka* ; D. R. Bhandarkar, *Asoka* ; Radhakumud Mookerji, *Asoka* ; J. R. Macphail, *Asoka*; Kane *History of the Dharmashastras* ; K. P. Jayaswal, *Hindu Polity* ; S. Krishnaswamy Aiyangar, *Beginnings of South Indian History* ; R. G. Bhandarkar, *Early History of the Deccan* ; *Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems* ; E. J. Thomas, *Life of the Buddha* ; K. J. Saunders, *The Heart of Buddhism* ; Fick, *Social Organisation in North-East India* ; R. C. Majumdar, *Corporate Life in Ancient India* ; R. D. Banerji, *Age of the Imperial Guptas* ; Ghosal, *Hindu Political Theories* ; *Agrarian System of Ancient India* ; H. C. Ray, *Dynastic History of Northern India* ; Jouvean-Dubrenil, *Ancient History of the Deccan* ; Radhakumud Mookerji, *Fundamental Unity of India* ; *Local Government in Ancient India* ; *The Gupta Empire* ; *Harsha* ; Eliot, *Hinduism and Buddhism*; K. M. Ashraf, *Life & Conditions of the People of Hindustan* (1220-1526); R. S. Tripathi, *Aspects of Muslim Administration* ; Senart, *Caste in India* ; A.S. Altekar, *Education in Ancient India* ; N. N. Law, *Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule* ; Carpenter, *Theism in Medieval India*.

বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য :

Monahan, *Early History of Bengal* ; R. D. Banerji, *Palas of Bengal* ; বাংলার ইতিহাস ; *History of Orissa* ; অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা ; রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা ; রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস ; নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস ; R. C. Majumdar, *Gurjara-Pratiharas* ; Jouvean Dubrenil, *Pallavas* ; A. S. Altekar, *Rashtrakutas & their*

times; R. S. Tripathi, *History of Kanauj*; D. C. Ganguli, *History of the Paramaras*; R. Sewell, *A Forgotten Empire.*

বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে :

R. C. Majumdar, *Hindu Colonies in the Far East*; *Champa*, *Suvarnadvipa*; Aurel Stein, *Serindia*; *Innermost Asia*; H. G. Rawlinson, *Intercourse between India and the Western World*; P. C. Baghchi, *India and China*; N. P. Chakravarti, *India and Central Asia*; U. N. Ghosal, *Ancient Indian Culture in Afghanistan*; B. R. Chatterjee, *India & Java*; *Indian Cultural Influences in Cambodia.*

শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে :

V. A. Smith, *History of Fine Art in India & Ceylon*; A. K. Coomarswamy, *History of Indian & Indonesian Art*; J. Fergusson, *History of Indian & Eastern Architecture*; S. Kramrish, *Indian Sculpture*; E. B. Havell, *Ancient and Medieval Architecture of India*; *Indian Architecture*; *Indian Sculpture and Painting*; P. Brown, *Indian Architecture*; O. C. Ganguly, *Indian Architecture*; J. Ph. Vogel, *Buddhist Art in India, Ceylon & Java*; Lady Heringham, *Ajanta Frescoes*; G. Yazdani, *Ajanta*; Radhakamal Mukherjee, *The Culture & Art of India*; B. B. Dutt & A. N. Singh, *History of Indian Mathematics*; P. C. Roy, *History of Hindu Chemistry*; S. N. Das Gupta, *History of Indian Philosophy*; S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*; D C. Sen, *History of Bengali Language & Literature*; Rabindra Nath Tagore and Ernest Rhys, *A Hundred Poems of Kabir*; G. Grierson, *Modern Vernacular Literature of Hindustan*; Farquhar, *Outline of the Religious Literature of India*; N. MacNicol, *Psalms of the Maratha Saints*; Tarachand, *Influence of Islam on Indian Culture*; Rawlinson, *India, A Cultural History*; Garratt (ed.), *The Legacy of India.*

B. A. University Questions

[পৃষ্ঠাঙ্কে প্রশ্নের প্রাসঙ্গিক তথ্যের স্থান-নির্দেশ করা হইল।]

Calcutta University

[1950]

1. What were the measures adopted by Asoka for the spread of *Dhamma* in his empire ? (*pp. 90-91*)

2. Why is Kanishka regarded as the greatest of the Kushan emperors ? (*pp. 130-131 & 132*)
[Refer to his territorial expansion and patronage for Buddhism, art and literature & compare him with his predecessors]

3. Attempt an estimate of the achievements *either* of Chandragupta II, Vikramaditya or Harshabardhana (*pp. 146-149 or 176—183*)

4. Give a short account of Rajaraja the Great and Rajendracholadeva I. (*pp. 239- 241*)

5. Write notes on *any two* of the following :—
(*a*) Persian Conquests in India (*pp. 78-79*); (*b*) The Vakatakas (*pp. 139-140*); (*c*) Pallava Art (*pp. 234-245*); (*d*) Devapala (*pp. 209-210*)

6. In what respect did the Indian expeditions of Muhammad Ghori differ from those of Sultan Mahmud of Ghazni ? (*pp. 269 & 277*)

7. What measures did Balban adopt for consolidating the newly founded Muslim rule in India ? How far was he successful in this matter ? (*pp. 283-284*)

8. Trace in brief the history of the rise and fall of the Vijaynagar Empire ? (*pp. 325—329*)

9. Describe briefly the administrative system of Delhi Sultanate in the zenith of its power. (*pp. 290-291 & 335—337*)

[1951]

1. What are the different sources for the reconstruction of Ancient Indian History ? (*pp. 14–22*)
2. Give a brief account of the administrative system of the Mauryas. (*pp. 106—109*)
3. "Samudragupta was one of the most remarkable and accomplished kings recorded in Indian History." Elucidate. (*pp. 141—146*)
4. Trace the history of Rastrakutas. Who was their greatest king ? (*pp. 236—237*)
5. Write notes on *any two* of the following :—
   (*a*) The Nandas of Magadha (*pp. 77-78*) ; (*b*) The Early Chalukya of Vatapi (*pp. 232-233*) ; (*c*) Mihira Bhoja (*pp. 195-296*) ; (*d*) The Arab Conquest of Sind (*p. 261*).
6. In the opinion of Ibn Batuta, Alauddin Khilji was "one of the best Sultans." Do you agree ? (*pp. 292–294*)
7. In what way was Muhammad Tughluq responsible for the disintegration of the Delhi Sultanate ? (*pp. 296, 297, 300 & 301*)

[1952]

1. Give a brief account of the social and political organisation of the Vedic Aryans. (*pp. 41, 46—49 & 50—53*)
2. What do you know about the essential teachings of Buddha ? Who was mainly responsible for their spread in and outside India before the Christian era and how ? (*pp. 64-65, 68, & 90, 92, 93*)
3. Who were the Kushans ? Whom do you regard as their greatest ruler and why ? (*pp : 127—128 ; 129—132*)
4. Write what you know of the administration and military achievements of Harsha. (*pp : 180—181 & 177—178*)

5 Write notes on *any two* of the following :—
(*a*) Sixteen Mahajanapadas (*pp. 72—74*); (*b*) Menander (*p. 123*); (*c*) Conquests of Samudragupta (*pp. 142, 144*); (*d*) Pallava art (*pp. 234—245*); (*e*) Dharmapala (*pp. 207, 208, 209*)

6. Describe the principa measures adopted by Ghiyas-ud-din Balban to consolidate the authority of the Delhi Sultanate (*p. 283*)

7. "The contemporary chroniclers describe Firuz Tughluq as an ideal Muslim ruler." What is your estimate of him as a man and as an administrator ? (*pp. 302 & 303*)

[1953]

1. What do you khow about the real founder of Jainism ? In what respects do his teachings agree with or differ from those of Buddha ? (*pp. 60—61, 69—70*)

2. Trace the history of the rise of Magadha to the position of an imperial power. (*pp. 75—78 & 87*)

3. Give a critical account of the decline and downfall of the Gupta Empire, (*pp. 152—153 & 154*)

4. Write notes on *any two* of the following :—
(*a*) Gandhara Art (*pp. 132, 133*); (*b*) The Chalukyas of Vatapi. (*pp. 232—233*); (*c*) The Rushtrakutas (*pp. 236—237 & 238*); (*d*) The Senas of Bengal. (*pp. 213, 214*)

5. Give a brief account of the principal Indian expeditions of Mahmud of Ghazni. In what respects do they differ from those of Muhammad of Ghur ? (*pp. 266* to *268*; *269, 277*)

6. Estimate character of Ala-ud-din Khalji as a conqueror and an administrator. (*pp. 290—291, 292—293*)

[1954]

1. Describe the sources of Ancient Indian History (*pp. 14—22*)
2. Trace the growth of Magadhan supremacy up to the conquest of Kalinga by Ashoka. (*pp. 75—78 & 89—89*)
3. Sketch the career of Harshavardhan and describe his administrative, literary and religious achievements. (*pp. 176—183*)
4. Describe the history of the Pallavas. (*pp. 233—235*)
5. Give an estimate of the achievements of Iltutmish and Balban. (*pp. 279—280 & 283—284*)
6. Describe the tussle between Bahmani kingdom and Vijaynagar up to the Battle of Talikota. (*pp. 321—323 & 325—329*)

[1955]

1. "India offers unity in the midst of diversity." Elucidate. (*pp. 8—12*)
2. Give an account of the administrative system of the Mauryas. (*pp. 106, 107 & 108*)
3. Estimate the achievements of the Gurjara-Pratiharas. (*pp. 194—198*)
4. Give a brief account of the history of the Cholas. (*pp. 239—241*)
5. Form a critical estimate of Muhammad Tughluq. (*pp. 295—297 & 301*)

[1956]

1. Give a description of north-western India at the time of Alexander's invasion. Briefly describe the movements of Alexander in India. (*pp. 80, 81, 82*)
2. Describe the missionary activities of Asoka. Trace the influence of Buddhism on his internal administration. (*pp. 92—93, 90—91*)

3. Sketch the career of Kanishka. Account for his greatness. *(pp. 129—132)*
4. What were the causes of the downfall of the Gupta Empire ? Write a note on art in the Gupta period. *(pp. 152—154 ; 168—169)*
5. Give an estimate of Ghiyas-ud-din Balban as a ruler. *(pp. 283—284)*
6. Describe the achievements of Krishnadeva Raya of Vijaynagar. What were the effects of the battle of Talikota ? *(pp. 327—328, 329)*

[1 9 5 7]

1. Sketch the career of the founder of Buddhism. Give an estimate of the Buddha as a practical reformer. *(pp. 63—64, 65—66, & 68)*
2. Describe the Maurya system of administration. *(pp. 106, 107, 108, 109)*
3. Trace the growth of the Gupta empire from Chandragupta I to Chandragupta II. Describe the system of administration in those days. *(pp. 140, 141, 142, 144, & 147)*
4. Describe in outlines the political history of the Pallavas and write a note on Pallava art and literature. *(pp. 233—234, 235 & 245)*
5. Give an estimate of Alauddin Khalji as a conqueror and as an administrator. *(pp. 290—291 & 292—293)*
6. How far was Timur responsible for the dissolution of the Delhi Sultanate ? *(pp. 304—305, 309)*

[1 9 5 8]

1. Describe the condition of the Punjab at the time of Alexander's invasion. Examine the effects of the invasion. *(pp. 80, 82, 84 & 85)*
2. What was Asoka's conception of the duties of a King ? How far did he carry it out ? *(pp. 91- 92, 93 & 94)*
3. Give a brief summary of the accounts of Fahien and Hiuen Tsang. *(pp. 155—159 & 183—187)*

4. Describe the conquests of Rajaraja and Rajendra Chola I. Write note on Chola administration. (*pp. 239—240 & 243—244*)
5. Show how Iltutmish and Balban consolidated Turkish rule in India. (*pp. 279—280 & 283—284*)
6. Review the policy and administration of Firuz Tughluq. *pp. 302—303*)

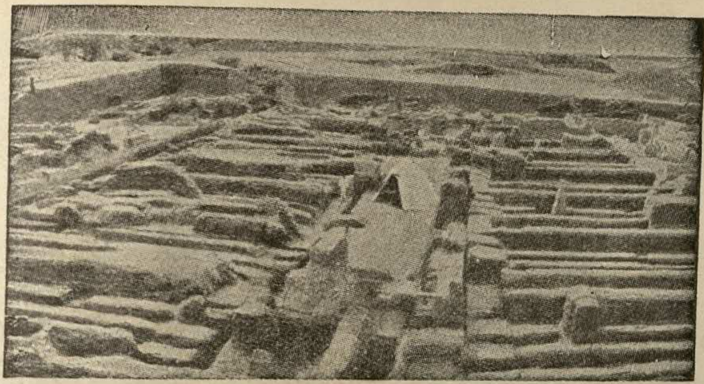
[1 9 5 9]

1. Sketch the career of Chandragupta Maurya. What information about his administrative system is derived from the fragments of Megasthenes ? (*pp. 85—87, 100—101 & 105*)
2. What were the main contributions of the Kushans to Indian culture and civilization ? (*pp 30—32 & 133 & 241*)
3. Trace the growth of the Gupta empire under Samudragupta and Chandragupta II. (*pp. 141—149*)
   What were the causes of the fall of the Gupta empire ? (*pp. 152—154*)
4. Sketch the political history of the Pallavas and write a note on art and literature in the Pallava Kingdom. (*233—235 & 245*)
5. Describe Alauddin's conquests and system of administration. (*pp. 290—291 & 292—293*)

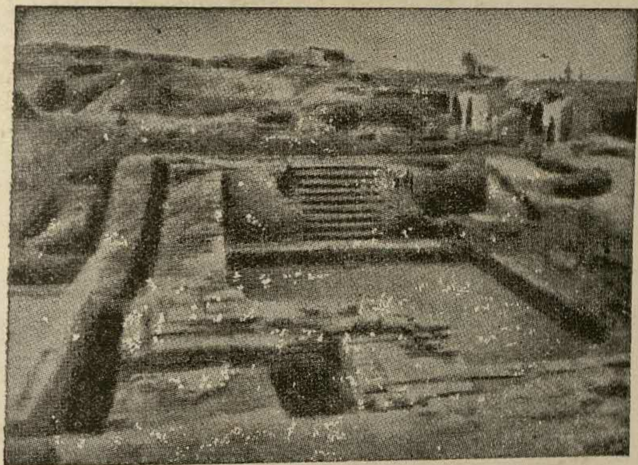
[1 9 6 0]

1. What do you know about the early Indus Valley civilization ? (*pp. 25—26, & 28—33*)
2. Who was Megasthenes ? What account has he left about Chandragupta Maurya and his capital ? (*pp. 87 & 100—101*)
3. Describe the conquests of Samudragupta and Chandragupta II. (*pp. 142—144 & 147*)
4. Sketch the political history of the Rastrakutas. What were their cultural achievements ? (*pp. 236—238 & 245*)
5. Estimate Alauddin Khalji as a conqueror and an administrator. (*pp. 290—291 & 292—293*)

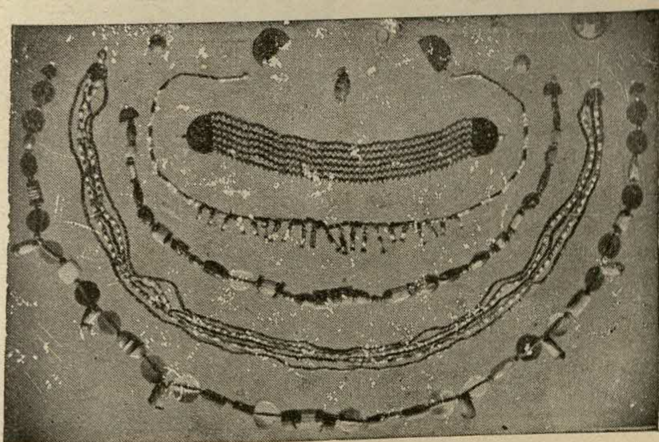
॥ ১নং প্লেট ॥



১নং চিত্র ॥ হড়প্পায় প্রাপ্ত শস্যাগারের ধ্বংসাবশেষ



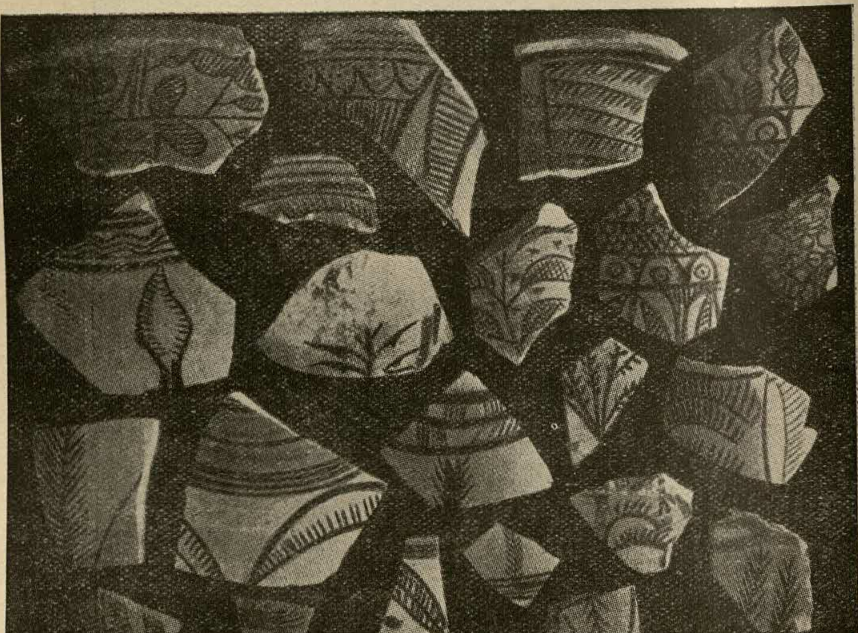
২নং চিত্র ॥ মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ



৩নং চিত্র ॥ মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত অলঙ্কার



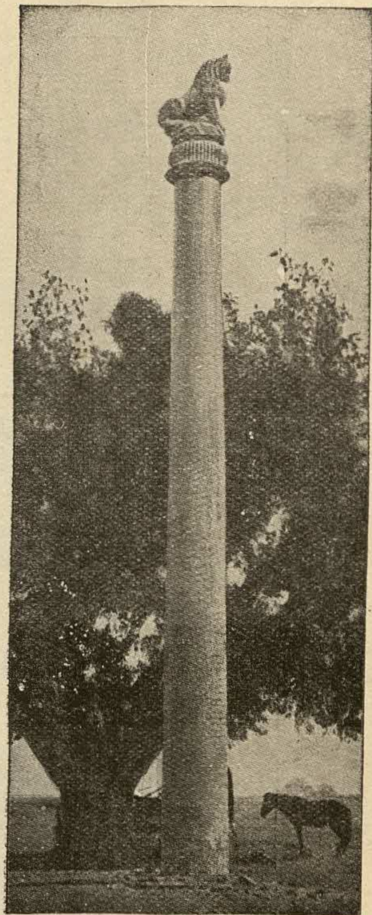
৪নং চিত্র ॥ লোথালে আবিষ্কৃত জাহাজঘাটার ধ্বংসাব.শষ



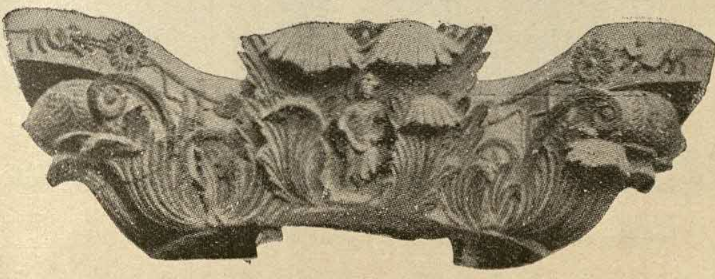
৫নং চিত্র ॥ লোথালে প্রাপ্ত চিত্রাঙ্কিত মৃৎপাত্রের ধ্বংসাবশেষ



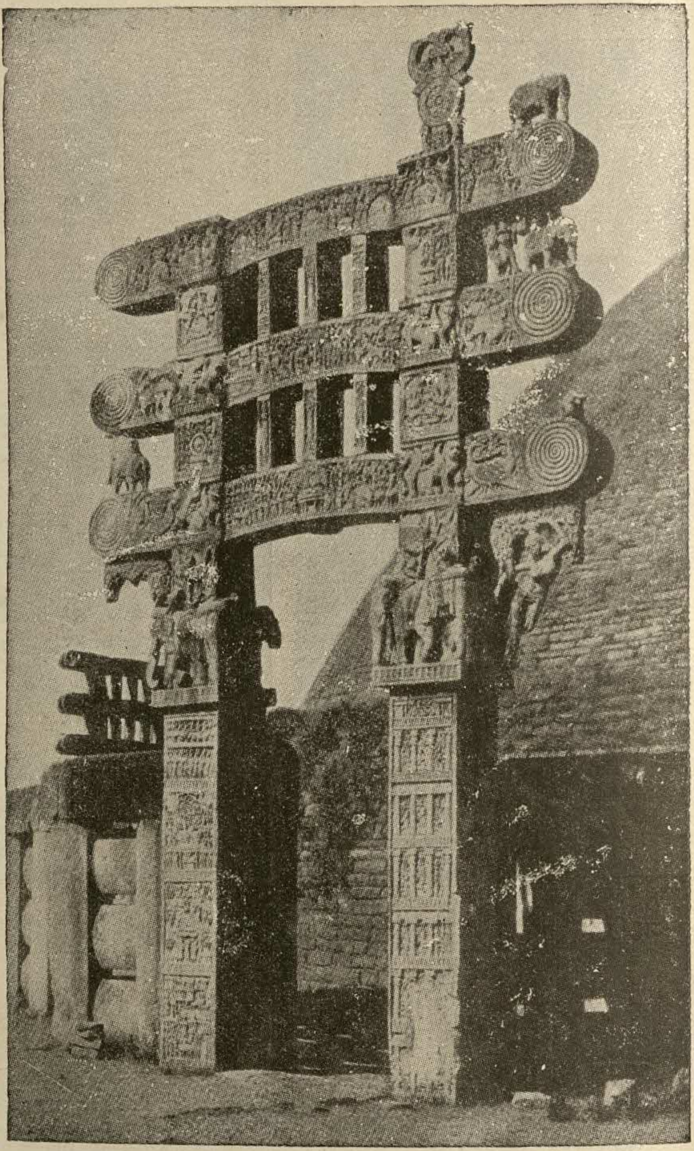
৬নং চিত্র ॥ অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি



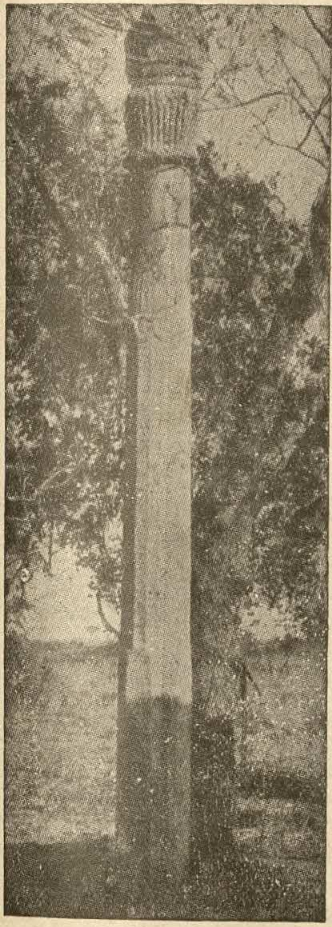
৭ নংচিত্র ॥ নন্দনগড়ের সিংহস্তম্ভ



৮নং চিত্র ॥ পেশোয়ারে প্রাপ্ত স্তম্ভশীর্ষ



৯নং চিত্র ॥ সাঁচিস্তূপের তোরণ



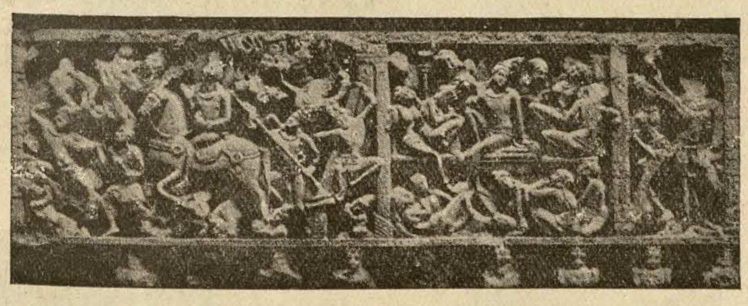
১০নং চিত্র ॥ বেসনগরের গরুড়স্তম্ভ



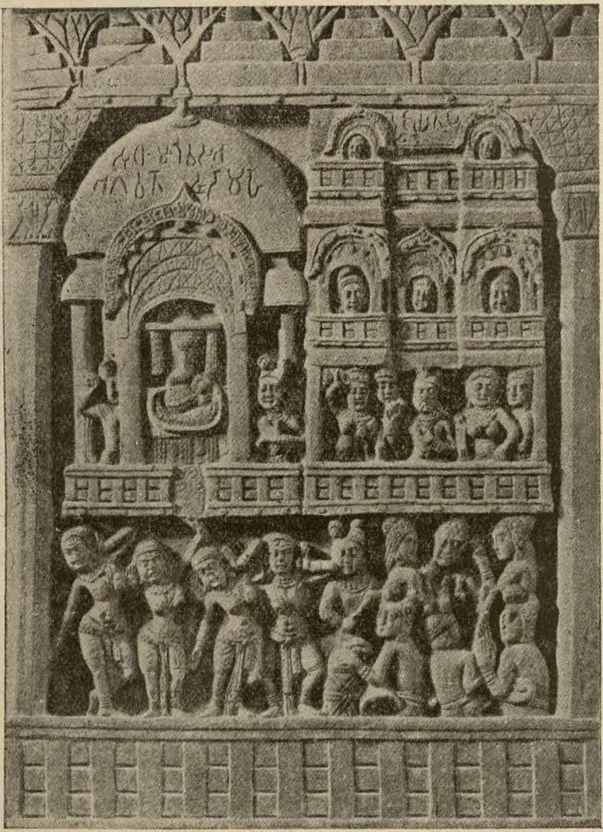
১১নং চিত্র ॥ বোধিস্বত্ত্বের মূর্তি (গান্ধার)



১২নং চিত্র ॥ শীলমোহর
(মহেঞ্জোদড়ো)



১৩নং চিত্র ॥ সিদ্ধার্থের মহানিষ্ক্রমণ ঃ (অমরাবতীতে প্রাপ্ত ভাস্কর্য)



১৪নং চিত্র ॥ ইন্দ্রসভা (ভারুতে প্রাপ্ত)



১৫নং চিত্র ॥
মহেঞ্জোদড়োয়
প্রাপ্ত শীলমোহর



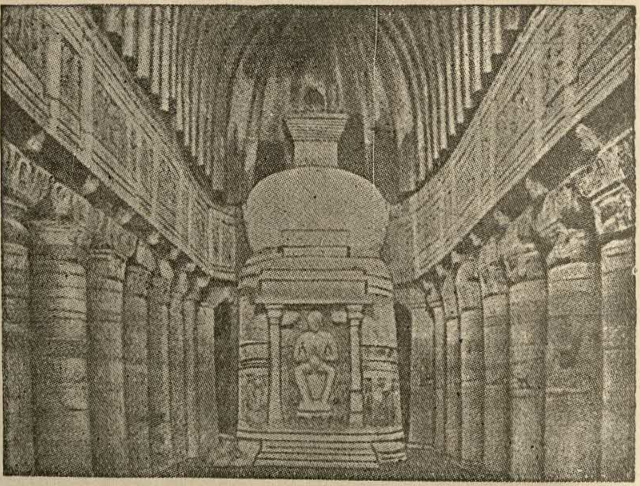
১৬নং চিত্র ॥ সিন্ধু
সভ্যতার নিদর্শন :
পশুপতিনাথ



১৭নং চিত্র ॥
মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত
মনুষ্যমূর্তি



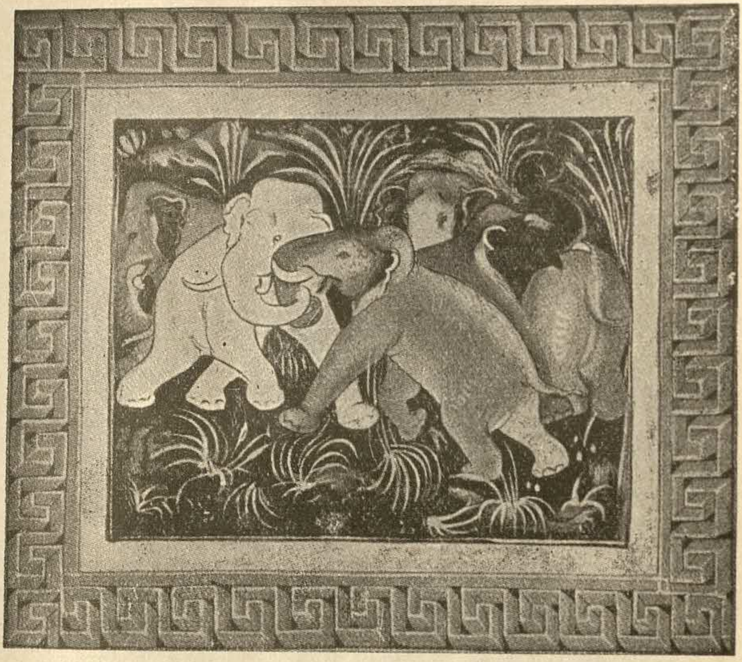
১৮নং চিত্র ॥ কণিষ্কের প্রতিমূর্তি : মথুরা



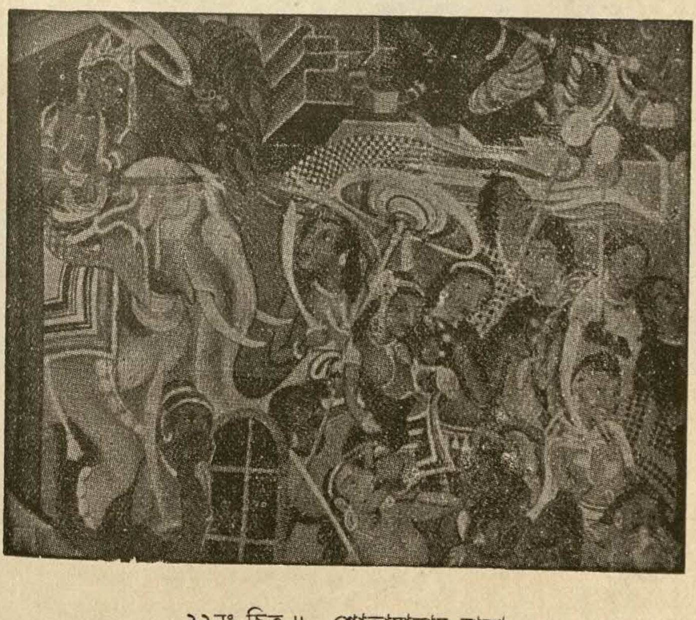
১৯নং চিত্র ॥ চৈত্য গৃহ : অজন্তা



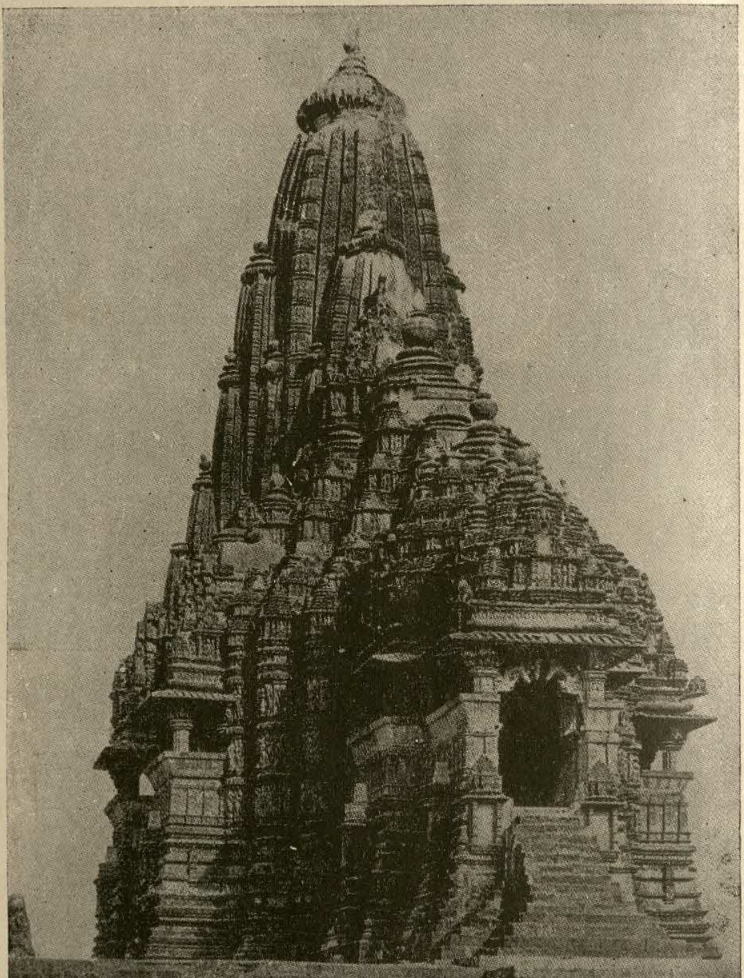
২০নং চিত্র ॥ পাথরে উৎকীর্ণ অনন্তশায়ী বিষ্ণু : দেওগড়



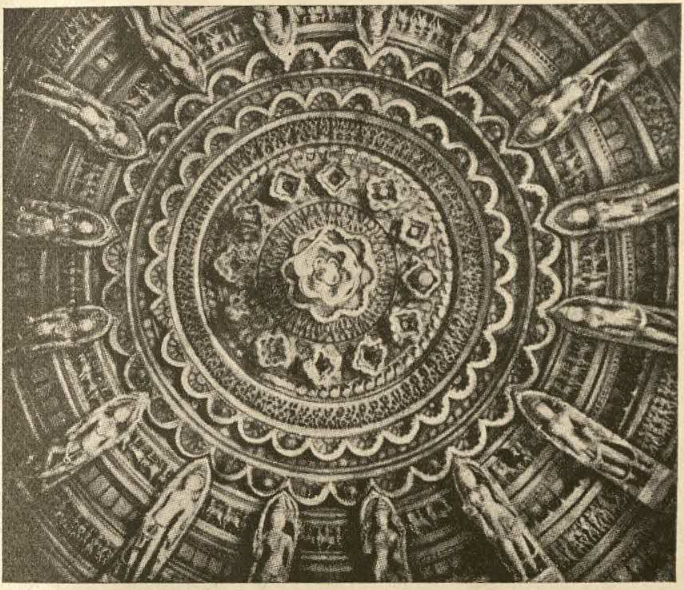
২১নং চিত্র ॥ হাতীর লড়াই



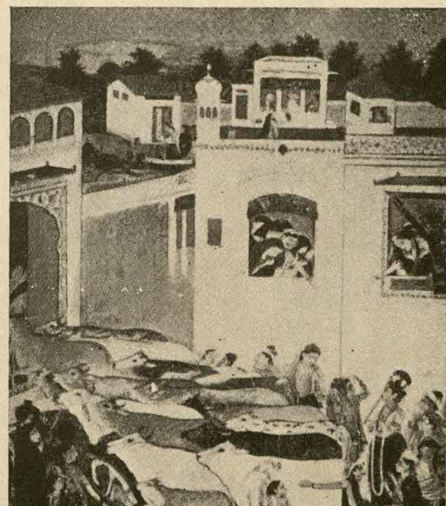
২২নং চিত্র ॥ শোভাযাত্রায় রাজা



২৩নং চিত্র ॥ মহাদেব মন্দির ঃ খাজুরাহো



২৪নং চিত্র ॥ দিলওয়ারা মন্দিরের সিলিং আবু পাহাড়



২৫নং চিত্র ॥ গোধূলি (কাংড়া চিত্র)



২৬নং চিত্র ॥ পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ নারীমূর্তি : অজন্তা



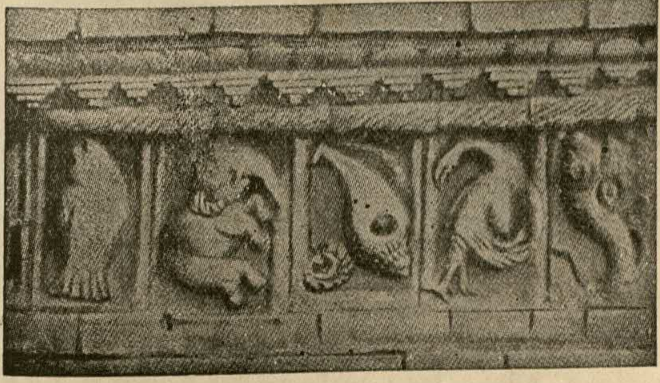
২৭নং চিত্র ॥ ব্রোঞ্জনির্মিত অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি মূর্তি বিহার



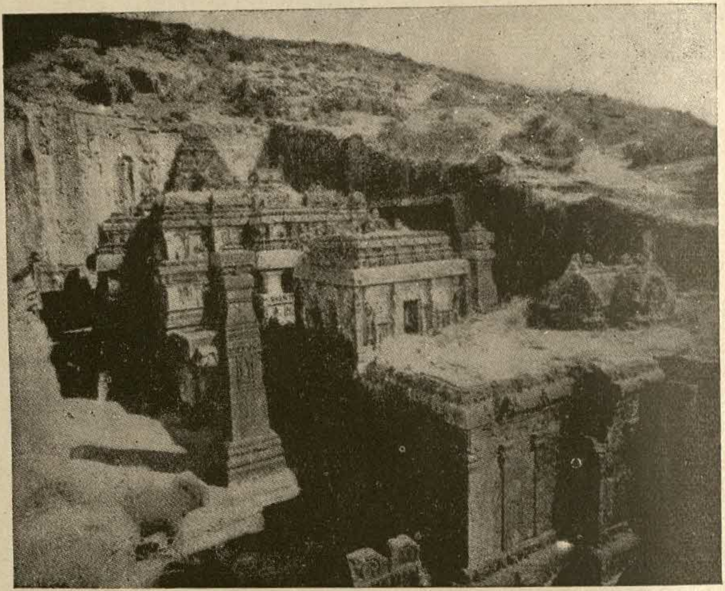
২৮নং চিত্র ॥ কার্তিকেয় মূর্তি (পালযুগের শিল্প)



২৯নং চিত্র ॥ কৃষ্ণ কর্তৃক কেশী বধ : পাহাড়পুর



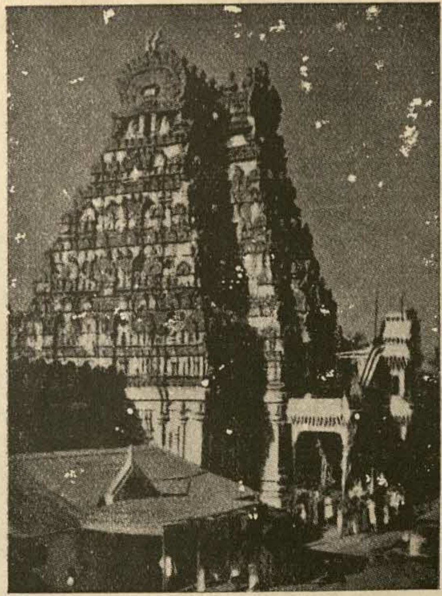
৩০নং চিত্র ॥ পাহাড়পুর বিহারের কারুকার্য



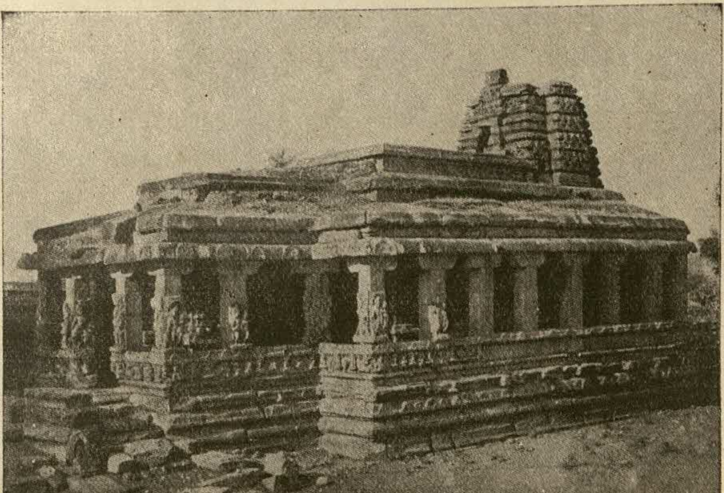
৩১নং চিত্র ॥ কৈলাস মন্দির : ইলোরা (রাষ্ট্রকূট স্থাপত্য)



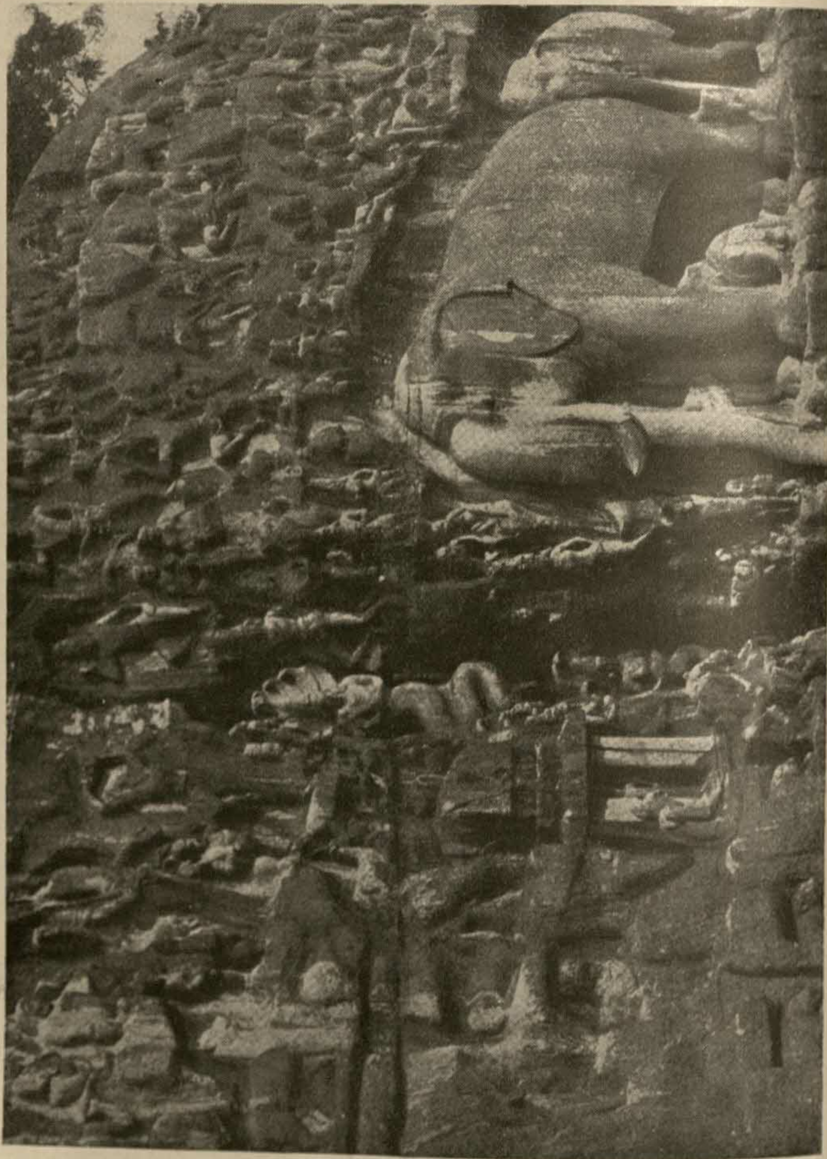
৩২নং চিত্র ॥ ধর্মরাজ রথ : মহাবলীপুরম্ (পল্লভ স্থাপত্য)



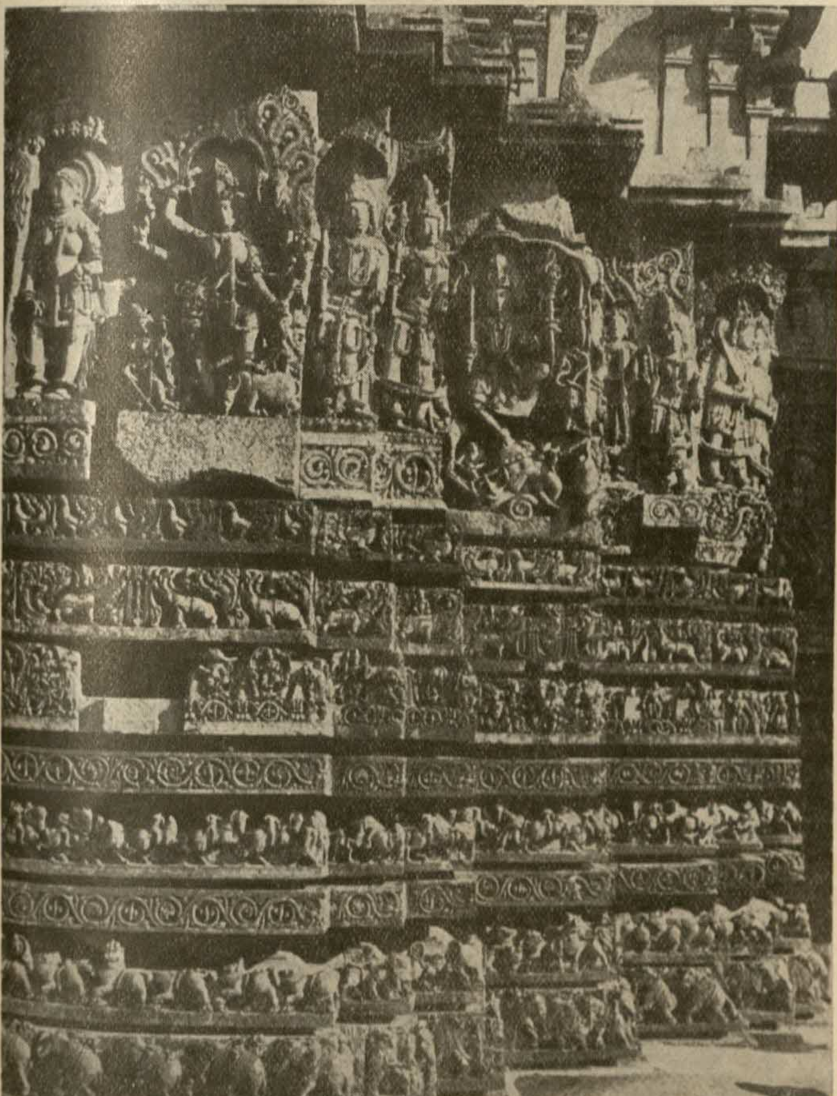
৩৩নং চিত্র ॥ রঙ্গনাথ মন্দির : শ্রীরঙ্গম (চোল স্থাপত্য)



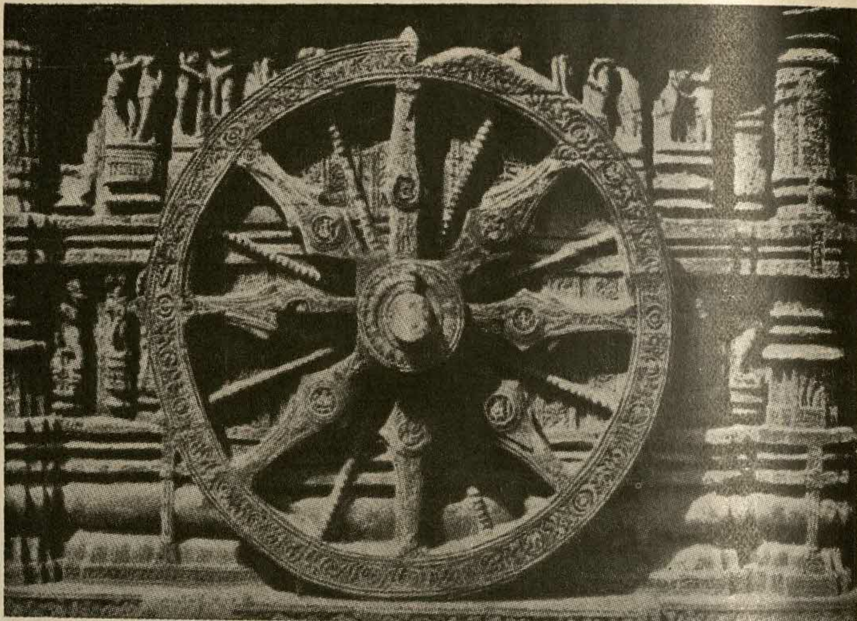
৩৪নং চিত্র ॥ দুর্গামন্দির : আইহোল (চালুক্য স্থাপত্য)



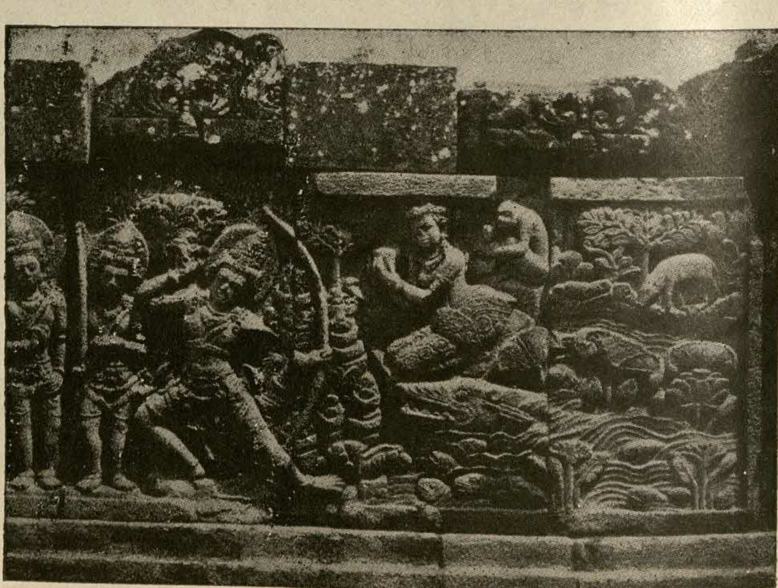
৩৫নং চিত্র ॥ গঙ্গাবতরণ : মামল্লপুরম্



৩৬নং চিত্র ॥ হয়সলেশ্বর (হয়সল শিল্পরীতি)



৩৭নং চিত্র ॥ সূর্যমন্দিরের অংশ : কোনারক



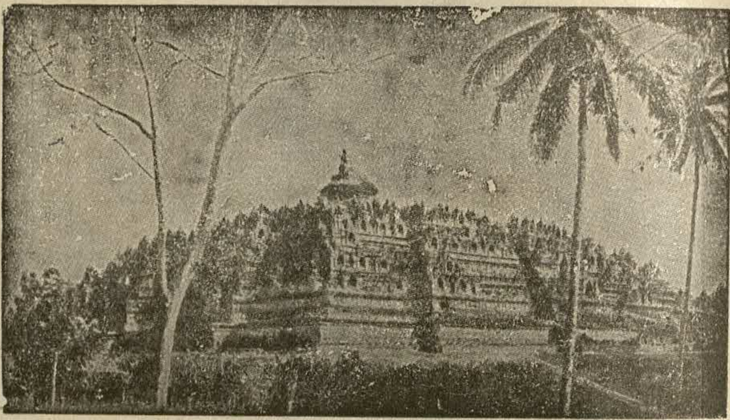
৩৮নং চিত্র ॥ শ্রীরামের কুম্ভীর শাসন : পূর্ব জাভা (উৎকীর্ণ চিত্র)



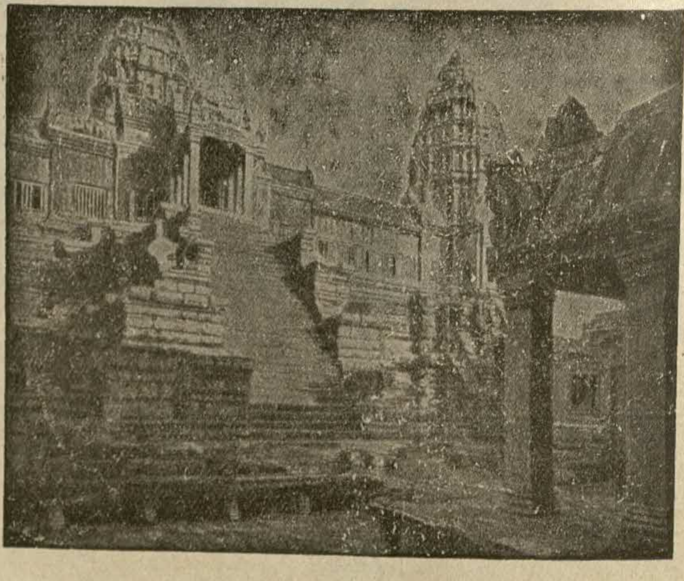
৩৯নং চিত্র ॥ পাহাড়ে **উৎকীর্ণ** ১৭৫-ফুট উচ্চ বুদ্ধমূর্তি : বামিয়ান (আফগানিস্তান)



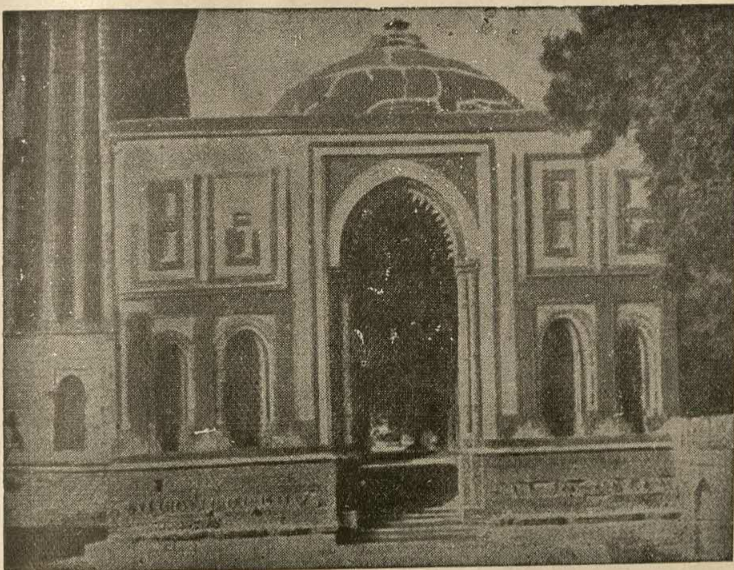
৪০নং চিত্র ॥ আঙ্কোর ঠোম-এ বায়ন মন্দিরের গায়ে চিত্র



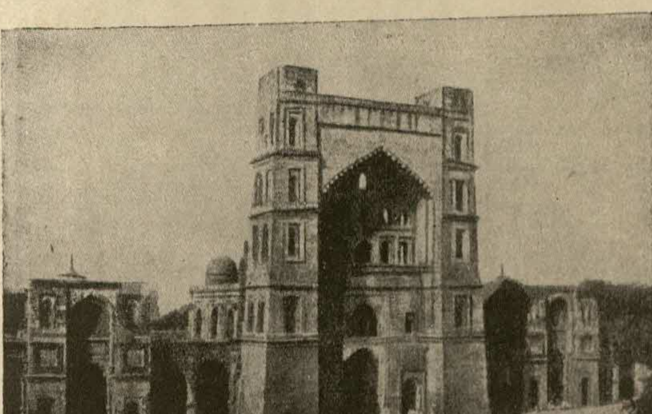
৪১নং চিত্র ॥ বরবুদুর মন্দির



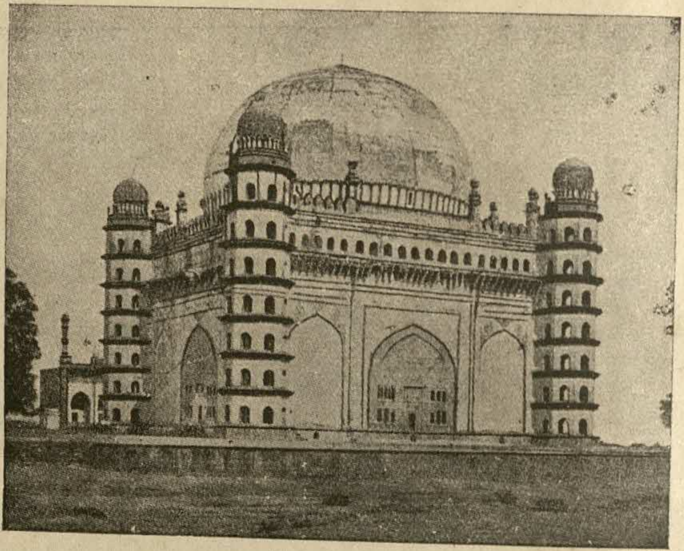
৪২নং চিত্র ॥ আঙ্কোর ভাট বিষ্ণু মন্দির



৪৩নং চিত্র ॥ আলাই দরওয়াজা : দিল্লী



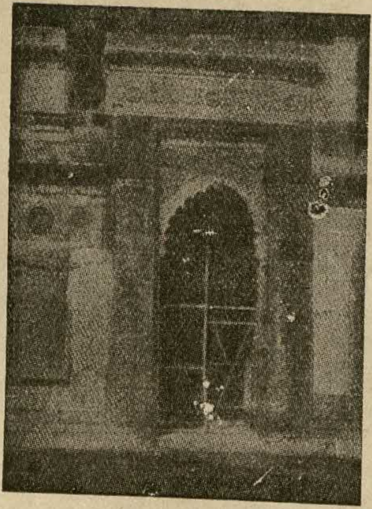
৪৪নং চিত্র ॥ অতাল মসজিদ : জৌনপুর



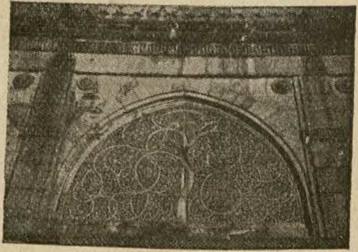
৪৫নং চিত্র ॥ গোলগম্বুজ : বিজাপুর



৪৭নং চিত্র ॥ জামে মসজিদ : আহমদাবাদ



৪৬নং চিত্র ॥ ছোট সোনা মসজিদ : গৌড়



৪৮নং চিত্র ॥ মসজিদে জালির কাজ : আহমদাবাদ